শ্রেষ্ঠ গল্প

বীরেন্দ্র দত্ত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

৪ পৌষ ১৩৭২

প্রকাশক

শ্রীশঙ্খনীল দাস

এস-পি পাবলিশিং

ঋষি বঙ্কিমনগর বারুইপুর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

মুদ্রক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ

দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স

৩২ বিডন রো কলকাতা ৭০০০০৬

বন্ধু দেবেশ ও কাকলি রায়-কে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

উপনদী শাখানদী, শীতের বেলা, বিষণ্ণ পরবাস, নির্জন দর্পণ, সমুদ্রের শব্দ, সামনে যুদ্ধ

ছোটগল্প

অমিল পয়ার, পুরনো পট ধূসর ছায়া, জলবিন্দু, বনান্তরে, খেলার ছলে, হিসেব নিকেশ, পাহাড়ে সমুদ্রে, সহজ কঠিন, মধ্যদুপুর, যীশুর পুতুল, শান্তিপর্ব, আমি ও সে, মায়াবী মঞ্চ, শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রবন্ধ

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র, রানার চলেছে, রানার, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, সাহিত্যে অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা

কবিতা

জন্ম জন্মদিন



সূচীপত্র

প্রসঙ্গত

'শ্রেষ্ঠগল্প' কথাটা ততটা অর্থবহ নয়, যতটা অর্থবহ 'বাছাই গল্প'। 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি তুলনাবাচক। কোন গল্প-সমাহারকে 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণে ভূষিত করলেই, সেই লেখকের বাকি গল্পগুলির সঙ্গে অবাঞ্ছিত তুলনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখনই আমরা একটা বিপজ্জনক এলাকায় প্রবেশ করি, কে, কাকে, কেন 'শ্রেষ্ঠ' বলছেন। লক্ষ্য করি বাংলা সাহিত্যে সকলেরই শ্রেষ্ঠগল্পের সংকলন আছে, তারপরে আছে স্বনির্বাচিত গল্প, তারপরে আছে বাছাই গল্প। প্রমথনাথ বিশীর তির্যক দৃষ্টিতে একটি তথাকথিত 'নিকৃষ্ট গল্প'-এর সংকলনও ছিল। একমাত্র লেখক যাঁর কোন শ্রেষ্ঠগল্প-সংকলনের দরকার হল না, কোনদিন হওয়া উচিতও হবে না, তিনি রবীন্দ্রনাথ—বাংলা ছোটগল্পের জনক। 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণটি আরো একটি কারণে খুব বেশী অর্থসঞ্চারী নয়। লেখক এ বিষয়ে প্রধান সাক্ষী। তিনি জানেন, তিনি এই মুহূর্তে যে গল্পটি লিখছেন সেটি তাৎক্ষণিক শ্রেষ্ঠত্বে অন্তত তাঁর কাছে সম্মানিত, তা না হলে তিনি সে গল্পটি লিখছেন কেন। আবার কয়েকদিন পরে, হয়তো পরের দিনই

তাঁর মনে হবে—এ গল্পটি তেমন কিছু হয়নি, এবার যে গল্পটি তার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে সেটাই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। হয়তো এমন করে শেষপর্যন্ত দেখা যাবে সেই লেখকের শ্রেষ্ঠগল্প অলিখিতই থেকে গেল।

লেখকের দিক থেকে যেমন সমস্যাটা এই, দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি গল্প বাছেন তাঁর সমস্যাটা আরো জটিল। তিনি কোন্ মাপ-কাঠি ব্যবহার করে বলবেন এই গল্পটি শ্রেষ্ঠ! তাঁর বিচারে কোন্‌টা অগ্রগণ্য হবে —তাঁর নিজের রসবোধ, সময়ের চাহিদা, নাকি তুলনা-বিচারের তাগিদ—নাকি সব মিলিয়ে একটা কার্যকর মাপকাঠি! তাঁর নির্বাচনের সবচেয়ে প্রতিকূলতা করে সময়। যে গল্পকে আজ তিনি 'শ্রেষ্ঠ' বিশেষণে চিহ্নিত করলেন, সে গল্পই কিছুকাল বাদে তাঁর কাছে মাঝারি মানের গল্প বলে গৌণ। উল্টো উদাহরণও যে একেবারে বিরল তা নয়। পাঠকের দিক থেকে গল্প বাছাই করে শ্রেষ্ঠগুলিকে সারিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে আরও একটি অসুবিধে আছে। লেখক যদি জীবিত হন, তাঁর বয়স যদি তেমন পরিণত না হয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট লেখক যদি এমন হন, তিনি তখনও বেড়ে চলেছেন, তাহলে শ্রেষ্ঠ গল্প গণনায় ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

প্রকাশনার দিক থেকে ভাবলে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটির একটা তাৎপর্য অবশ্যই আছে।

সাধারণত যে লেখকের নাম-ডাক আছে, যাঁর অনেকগুলি গল্প খ্যাতি পেয়েছে, প্রকাশন সংস্থা সেই লেখকের বিখ্যাত গল্প গুলির সাহায্যে শ্রেষ্ঠ গল্পের পশরা সাজিয়ে দেন। এতে একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকা যায়। সবচিন্ গল্পগুলিকে দুই মলাটের মধ্যে পেয়ে পাঠক খুশি হবেনই। দরকার হলে লেখকের সবসেরা গল্পগুলি এক জায়গায় মিলে যায়। যতগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন আমরা পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই অন্তত একটা কথা বলতে পারে, আমরা লেখকের প্রতিনিধিত্ব করি। কিন্তু লেখক যেখানে উদীয়মান সেখানে প্রশ্নটা আলাদা। সেখানে প্রকাশন সংস্থার সাহস ও সচেতনতা অভিনন্দনীয়। তিনি শুধু বৈষয়িক দূরদৃষ্টির পরিচয়ই সেখানে দিচ্ছেন না—সাহিত্যিক দায়িত্বও পালন করছেন। কথাটা অবশ্যই বলছি বর্তমান গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রকাশন সংস্থা সম্বন্ধে। খুব বেশী দিন না হলেও খুব কম দিনও নয় শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত লিখছেন। এখনো তাঁর প্রস্তুতি ও আয়োজন শেষ হয়নি। তবু এর মধ্যেই তিনি একটা কথা প্রমাণ করেছেন। সেটা হল তাঁর আন্তরিকতা। যে আন্তরিকতা থাকলে একজন লেখক হয়ে উঠতে পারেন পর্যবেক্ষণ-শীল, সে আন্তরিকতা তাঁর গল্পগুলির প্রধান গুণ। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি

অবশ্যই তাঁর দেখা ও ভাবার পরিচয় বহন করছে। একথা ঠিক, মধ্যবিত্ত জীবনে জীবিকার চাপ, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের বিপন্নতার চাপ তিনিও অন্য গল্পলেখকের মতোই অনুভব করেন। কিন্তু এইসব অনুভব ও খোঁজাখুঁজির মধ্যে তিনি কখনো কোন আমন্ত্রিত তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

লেখক—যিনি খাঁটি লেখক—তিনি জানেন প্রকরণের শেষ বিচার সে কতখানি সত্যকে প্রতিফলিত করতে পারল, তার উপরেই নির্ভর করে। আলোচ্য গল্পকারেরও বিচার হবে সেই মাপকাঠিতে। অর্থাৎ সত্যই শেষ বিচারক। বীরেন্দ্র দত্ত সমাজ-সত্য, সময়-সত্য প্রভৃতিকে অবহেলা করেন না, নিশ্চয় করেন না। কিন্তু তার চেয়েও অধিক মর্যাদা দেন তিনি অনুভূতির সত্যকে। তাঁর ঘটনা-বিরল গল্পগুলিতে যে নারী পুরুষ ঘোরাফেরা করে তাদের মনোগহন লেখকের উদ্‌ঘাটনের বিষয়। এ বিষয়ে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, অকারণ টেকনিক-বিলাস নেই—চরিত্রগুলি গল্পের মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই আমাদের চেনা মানুষ হয়ে যায়। এখানেই লেখকের আসল শক্তির পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই। অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব চরিত্র কল্পনার জন্য তিনি ব্যস্ত নন। চেনা চরিত্রগুলিই তাঁর ভরসাস্থল। চেনা চরিত্র চেনা পথেই চলতে

চলতে নিয়ে আসে অচেনার আভাস। গল্প-গুলি কখনো কখনো লিরিক্যাল যে নয়, তা নয়। কিন্তু ধাতব কাঠিন্যের মাঝখানেও গল্পগুলি বাজিয়ে তুলতে পারে একটা সুর। এই সুরটুকু শ্রীদত্তের নিজের ধন।

তিনি নিশ্চয় আরো লিখবেন। তখনই হবে সঠিক হিশাব-নিকাশ—এগুলি তাঁর সর্বার্থে শ্রেষ্ঠ গল্প কিনা। তখনই ভাবা যাবে এগুলি ছাড়িয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের হিশাব হবে কিনা। এ কথা সকল গল্পলেখক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আজকের হিশাব শুধু এই সময়-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তাহলেও আজকের সংকলনের একটা দাম অস্বীকার করা যাবে না। লেখক যা হতে চেয়েছেন, যা হয়ে উঠেছেন—তার নির্ভুল সাক্ষ্য আছে এই সংকলনে। আমরা এখানে তাঁর নির্বাচিত গল্পগুলি থেকে আলাদা করে কোন গল্পের নামোল্লেখ করছি না। কেননা, তা করতে গেলে সবগুলি গল্পকেই কমবেশী আলোচনার মধ্যে টেনে আনতে হয়। সে পদ্ধতিটি স্বীকৃত পদ্ধতি, এবং পূর্বসূরীরা সেভাবেই আলোচনা করে গেছেন বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ভূমিকাটি গল্প পাঠের পরে পড়ার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। তাহলে গল্পগুলি পাঠকের পড়া হয়ে যাবার পর ব্যাখ্যাগুলির সঙ্গে রস-গ্রহণ সম্ভব হয়। তবে, সে যাই হোক, একটা কথা এখানে বলার আছে। বীরেন্দ্র

দত্তের গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দূর থেকে প্রভাবিত, কাছ থেকে প্রভাবক তেমনি সন্তোষকুমার ঘোষ। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ভিতর-বাহিরের নানা অলিগলি, মনের ছায়াবী জগতের নানা অন্ধি-সন্ধি গল্প-গুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ ছায়া ছাড়িয়ে রোদের খবরও যে তারা রাখে না, এমন নয়। নিঃসন্দেহে বীরেন্দ্র দত্তের গল্পের জগৎ আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়



তৃণভূমি

বনশ্রী তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে।

কাল শেষ রাতে দু'চোখের ঘুম ওকে অচেতন করার ঠিক আগে যেন কোন শূন্য নির্জন প্রান্তরে দূরাগত অস্ফুট কণ্ঠ-ধ্বনির মত নিজের মধ্যে থেকেই কথাটা শুনেছিল মণিময়। একবার নয়, একাধিক বার। কথাটার সঙ্গে হাজার হাজার বিচিত্র পরিচিত-অপরিচিত রহস্যময় শব্দ জড়িয়ে মণিময়ের সারা শরীরের ক্লান্তিতে, বুকের নিভৃত স্পন্দনে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহে বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। বনশ্রী কাল রাতেই ওর নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। নতুন কেউ বনশ্রীর ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আন্দাজ করেছিল মণিময়। তাকে চেনে না, কোনদিন দেখেনি, দেখার ইচ্ছেও হয়নি মণিময়ের।

এতদিন ওর প্রয়োজন ছিল শুধু বনশ্রীকেই। বনশ্রীর হাসি, কণ্ঠস্বর, সহজ সরল উল্লসিত কথা, আচরণ, সঙ্গসুখ, গভীরতম অরণ্যের চপল হরিণীর মত চোখ মণিময়কে ভয়ঙ্কর এক ভালবাসার মায়ায় ধরে রেখেছিল। বনশ্রীর কাছে মণিময় এতদিন কি চেয়েছে, তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু বনশ্রী কাছে থাকলে, নিয়মিত ওর সঙ্গে দেখা হলে মণিময় যেন একধরণের আশ্রয় পেত। বন্ধুদের আড্ডা, অফিস, সিনেমা, সকালে উঠে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়া, রাজনীতি, আত্মীয়-স্বজনদের যান্ত্রিক ব্যবহার—সব কিছুর অবিশ্বাস, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা আর একঘেয়েমি মণিময়কে ক্রমশ বাঁচার ভূমি থেকে বিরক্ত বিচ্ছিন্ন করে তুলছিল। বনশ্রী যেন সে বিচ্ছিন্নতায় এক বিরাট কঠিন সেতু।

এখন বনশ্রীর বয়স কত? চব্বিশ পার হতে চলেছে। ওর তাই মনে হয়। মণিময়ের সবেমাত্র চৌত্রিশ পার হল। ফ্রক-পরা তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরীকে দেখেছিল মণিময়। বন্ধু সুহাসের বোন। তখনি ভাল লাগত বনশ্রীকে। এমন পরিচ্ছন্ন প্রাণশক্তি খুব কম কিশোরীর মধ্যেই চোখে পড়েছিল মণিময়ের। সে এক যুগ আগের ভাললাগা! সেটা যে এতকাল ধরে ক্রমশ গভীর ভালবাসা হয়ে এমনভাবে মণিময়কে ঘিরে ধরবে, মণিময় তার জন্য প্রস্তুত ছিল না একটুও।

আর সেই বনশ্রী তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। কাল রাতে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। বনশ্রীর কলেজের পরীক্ষা শেষে কোন্ এক মফঃস্বল শহরের আত্মীয়ের বাড়ি উৎসব আছে। সেখানে চলে যাবে আজ সকালেই। এক সপ্তাহের ওপর সেখানে থাকবে। সেখানেই নতুন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হবে ওর। শহরের প্রান্তবর্তী সবুজ মাঠ, পাখিদের বিচিত্র শব্দ, চারপাশের ঘন পাতার গাছ-গাছালি, অফুরন্ত হাওয়া আর আকাশের নীল-মাখানো রোদের মধ্যে বনশ্রী নতুন প্রেমিককে পাশে নিয়ে নতুন হয়ে ঘুরবে। কাল রাতে বনশ্রীর বাড়িতে ওর সামনে বসে ওকে দেখতে দেখতে মণিময় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, বনশ্রী ওর নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। অন্যমনস্ক বনশ্রী। মণিময় জানত, বনশ্রীর বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞ হয়েছে এতদিনের নানারকম ভালবাসার অনুভূতিতে। তা-ও মণিময়ের সঙ্গে এতদিনের পরিচয় থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আর সেই ভালবাসার গোপনতম শিক্ষায় বনশ্রী আরও কোন প্রেমিকের আশ্রয়, প্রতিশ্রুতি, সাহস পেয়েছে।

কিন্তু এমনভাবে শূন্য শুকনো কুয়ার মত হয়ে যাবে মণিময়, তা ভাবেনি, ভাববার প্রয়োজন হয়নি। বনশ্রীকে সন্দেহ করতে গিয়ে কেমন নোংরা মনে হয়েছে নিজেকে। ভালবাসার অধিকার জোর করে জানাবার ইচ্ছে মনে জাগতেই নিজেকে বিশ্রী ধরণের করুণ অসহায় অপমানকর মনে হয়েছে। কণ্ঠস্বর ভারী করে, দীর্ঘনিশ্বাস চেপে অভিমান জানানোর মত কথা গুছিয়ে নিয়ে, রেস্তোঁরায় বসে বনশ্রীর হাত হাতের মুঠোয় ধরে ভালবাসা জানাবার কথা ভাবতে গিয়ে মণিময় নিজের মধ্যেই হেসে উঠেছিল নিঃশব্দে।

বয়স হয়েছে মণিময়ের। কিন্তু বনশ্রী যেন চব্বিশ বছরেও সেই কিশোরী। কোন ভারী কথা বললেই হেসে উড়িয়ে দেবে। এ এক হাস্যকর ভালবাসা! শুধু কাল রাতে নীরব, অন্যমনস্ক বনশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক কঠিন রেখা

দেখেছিল মণিময়। দুদিকের চোয়ালে সেই রেখা বুঝিবা বনশ্রীর গোপন অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। কাল রাতে একসময়ে অন্যমনস্ক বনশ্রীকে মফঃস্বল শহরের নতুন প্রেমিকটির কাছে রেখেই মণিময় বেরিয়ে এসেছিল।

বনশ্রীর হৃদয়ের জটিলতম কয়েকটি শব্দ অনুভব করতে করতে মণিময় সিগারেট খেতে ভুলে গিয়েছিল। শুকনো কণ্ঠনালী শিরশির করছিল। নিজেকে বড় তৃষ্ণার্ত মনে হয়েছিল। তবু সিগারেট ধরাতে একবারও ইচ্ছে হয়নি। বাইরে বেরিয়ে মণিময় একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। কদিন গুমোট গরম। কাল রাতে আকাশ ছেয়ে মেঘ এসেছিল। কিন্তু বাতাস ছিল না, একটুও বৃষ্টি হয়নি। শুকনো ঘাম সারা শরীরে নিয়ে মণিময় সিগারেট টানতে টানতে একা কিছুটা হেঁটেছিল। এমন বিরাট আকাশের মত শূন্যের মধ্যে হাঁটা মণিময়ের অনেকদিন হয়নি। একসময়ে একটানা সিগারেটের ধোঁয়ায় মণিময়ের বুক, নাক জ্বালা করলে, দু'চোখে আগুনের উত্তাপ ঠেলে বেরিয়ে এলে মণিময় ট্যাক্সি করেছিল। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করতেই মণিময় একটু সরে বসেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, পাশে বনশ্রী বসবে।

মুহূর্তের ভ্রান্তি মাত্র। পরমুহূর্তেই পাশে তাকিয়ে দেখল, আসন শূন্য। কখনো একা নয়, একমাত্র বনশ্রীকে নিয়েই মণিময় বহুবার ট্যাক্সি চেপেছে, সারা কলকাতা ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই কাল মুহূর্তের ভুল হয়েছিল বনশ্রীর কথা ভেবে। একটু পরে ড্রাইভারকে অনেক দূরের একটা ঠিকানা দিয়ে ভেবেছিল, চৌত্রিশ বছরের মণিময়ের এতটা সেন্টিমেন্টাল হওয়া ছেলেমানুষি, খোকামি।

গাড়ি চলতে শুরু করলে মণিময় নতুন একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে ওর কেন যেন মনে হয়েছিল, চতুর্দিকে ওর পরিচিত ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। কেউ বুঝি ওপর থেকে একটি বিশাল শূন্য পাত্র নিক্ষেপ করেছে। সে পাত্রের মধ্যে মণিময় একা চুপ করে বসে। আর সেই পাত্র দ্রুত গড়াতে গড়াতে মণিময়কে দৃষ্টিহীন, বাকশক্তিহীন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসহীন রক্তচলাচলহীন একটি স্থবির মানুষের কাছে নিয়ে চলেছে। মণিময় তখন একটু কাঁদতে চেয়েছিল, পারেনি। দু'চোখের পাতার সীমা-বরাবর কেউ বুঝি আগুনের তাপ দিচ্ছিল চোখে সুর্মা টানার মত। এতটুকুও জল পড়েনি।

কাল অনেক রাতে ফিরে মণিময়ের ঘুম হয়নি। অন্যদিন এমনিতেই ঘুমের ওষুধ খেতে হয় মণিময়কে। কাল ভোর রাত পর্যন্ত পর পর কয়েকটা বড়ি খেয়েও

ঘুমোতে পারেনি। আর ঘুম হয়নি বলে মণিময়ের যে কষ্ট হয়েছে তা নয়। শুধু নিজেকে বড অসহায় মনে হয়েছে। বার বার মনে হয়েছে, বনশ্রী কাল রাতেই তার নতুন প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। এই চিন্তার পুনরুক্তিতে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বলে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঘুমোতে চেয়েছিল মণিময়। ঘুম আসেনি ভোর রাতেও।

তা ছাড়া কালকের গরম আরও হাজার-গুণ গুমোট মনে হয়েছিল মণিময়ের। ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেক হাঁটতে হাঁটতে মণিময়ের মনে হয়েছিল, এই অসহ্য গরমে শহরের প্রতিটি বাড়ির ইঁট পুড়ছে, ফুটপাথ থেকে আগুন উঠছে। মণিময় তখন একটু সবুজ খুঁজছিল। মাঝে মাঝে সবুজ নিঃসঙ্গ বৃক্ষ চোখে পড়েছে, কিন্তু তাতে তৃপ্ত হয়নি। বুঝিবা কোন বিশাল তৃণভূমি মণিময়কে আকর্ষণ করছিল। অন্ধকারে ঢাকা, অথবা, শুধু ভারী নিথর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হওয়া কোন তৃণভূমির উপর মণিময় কিছুকাল বসতে চেয়েছিল, হয়ত শুয়েও পড়ত। কিন্তু সে তৃণভূমি কোথাও পায় নি। কলকাতায় কোথাও নেই। কলকাতা যেমন বহুদিন পবিত্র তৃণভূমিকে গ্রাস করেছে, কাল রাতে বার বার মনে হয়েছে মণিময়ের, কলকাতা বুঝি ওকেও গ্রাস করেছে। একসময়ে হয়ত ওকে চিবিয়ে ওর হাড়গুলোকে ট্রাম লাইন, লাইটপোস্ট. ডালহৌসির সেই বিশাল বাড়িটার লোহার ফ্রেমের মত করে দেবে!

মণিময় এক অনড় ভয়ে নিজের ঘরে ফিরেছিল। দরজা-জানালা বন্ধ করে, পাখা জোরে ঘুরিয়ে, আলো নিভিয়ে নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে চেয়েছিল। ঘুম হয়নি ভোর রাত পর্যন্ত। একসময় পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি-হওয়া অ্যাশ্‌ট্রে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে জানালা খুলে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা-বাতাস মুখে-চোখে নিয়ে মণিময়ের কেন যেন মনে পড়েছিল ওর মাকে। এ সময়ে যদি মা থাকত! ছোটবেলায় মণিময় ভীষণ দুরন্ত ছিল। কাউকে ভয় পেতো না। চারপাশে অজস্র গোলমাল তৈরী করে ভয়কে দূরে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু কোন এক সময় হঠাৎ অকারণ ভয় পেলে মণিময় যেমন ভয়ঙ্কর এক অসহায়তায় শুধু মার কাছে এসে মায়ের কোলে গুঁড়ি মেরে বসে মাকেও আদর করতে বলত, এখন মা থাকলে হয়ত সেই আশ্রয়টুকু পেত। মণিময়ের নিজেকে কাল ভোর রাতে কেমন এক শিশু বলে মনে হয়েছিল। এই পৃথিবীতে সে-ই একা একটি শিশু—যে একমাত্র মায়ের আশ্রয় চায়!

বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে মা মণিময়কে

বলেছিলেন, 'খোকা, অযথা তুই সব চিন্তা করিস, গুম হয়ে বসে থাকিস। নিজের জন্যে কিছুই করলি না। জন্মটা যেন অভিশাপ। তা-ই প্রমাণ করছিস। বলে রাখি বাবা, এই বয়সের ছেলে ভালবেসে অনর্থ ঘটায়। তুই যেন তা করে বসিস না, কখ্খনো না।' মা মণিময়ের সমস্ত বিষয়ে নিরাসক্ত ভাব দেখে নিজের মত একটা কিছু ভেবে চাপা কান্নায় কেঁপে উঠেছিলেন। কাল ভোর রাতে সঙ্গে সঙ্গে মণিময় বালিশে দু'চোখ ঘষতে ঘষতে সেই যে উপুড় হয়ে শুয়েছিল, সকাল ন'টার আগে ঘুম ভাঙেনি।

এইমাত্র ঘুম ভাঙতে মণিময় টাইমপীস দেখল। বুঝতে পারছে, অতিরিক্ত গরমে ওর মাথার বালিশ ঘামে ভেজা। দু'চোখ কয়েকবার জোরে জোরে বন্ধ করে, আবার খুলে হঠাৎ-ঘুম-ভাঙার জ্বালা অনুভব করল। ভোর রাতের বড়ি-খাওয়া-ঘুম এমন অসময়ে অকারণ আচমকা ভেঙে যাওয়ায় মণিময় মাথা থেকে পা পর্যন্ত অসম্ভব ভারে স্থির হয়ে রইল। মাথায় সত্যিই যেন এক বিরাট বোঝা চাপানো। কপালের দু'পাশের শিরা হঠাৎ-ভাঙা-ঘুমের অস্বস্তিতে দপ-দপ করছে। নিশ্বাস চেপে দু'চোখের পাতায় ঘুম আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখতে চাইল মণিময়। চোখ একবার খুললেই ঘরের পাতলা আবছা অন্ধকার চোখে জড়িয়ে যেতে পারে। তাতে আর একটুও ঘুম হবে না, মণিময় জানে।

আর ওঠারই বা দরকার কি? এমনিতেই মণিময় বেলায় ওঠে। না উঠলে হরিপদ ডেকে দেয়। এখন হরিপদ নেই। গত পরশু দিন ছুটি নিয়ে ওর গ্রামে গেছে। ডেকে দেবার কেউ নেই। তার ওপর কর্পোরেশনের কেরানী। একটা সময় অফিস গেলেই হল! না গেলেই বা ক্ষতি কি? ক্যাজুয়াল লিভ যাবে, যাক। মণিময় বিড়-বিড় করতে করতে পায়ের বালিশটা মুখের ওপর চেপে ধরল। দু'চোখে আরও ঘন অন্ধকার দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে মণিময় বাইরের দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনল। প্রথমে ভাবল, পাশের ফ্ল্যাটের বা গলির সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে। কে এল এ সময়ে? এত সকালে কে আসতে পারে? মণিময় আবার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বিরক্ত হল। হরিপদ কি গ্রাম থেকে ফিরল? বলে গিয়েছিল দু-তিন দিনের মধ্যেও ফিরতে পারে। তাই বলে এসময়ে? এখন তো ওর আসার সময় নয়! এবার কড়া নাড়ার শব্দ আরও জোরে হতে এবং দরজায় দু-তিনবার ধাক্কা দেওয়ার জোর শব্দ হতেই মণিময়ের বুঝতে বাকি রইল না, হরিপদ ফিরেছে।

হরিপদ জানে, এসময়ে বাবু ঘুমে অচেতন। তাই এভাবে না ডাকলে সারাদিনে হয়ত দরজা খোলাই যাবে না।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে দরজার খিল খুলল।

দেখল মণিময়, সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। পিছনে রিক্সাওলার হাতে ভারী বেডিং, আর ছোট একটা চামড়ার সুটকেশ। মণিময় হঠাৎ কেমন বোকা হয়ে গেল। মহিলাটির দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল। মাথা অসম্ভব ভারী বলে দু'চোখের ঘুম একটুও সরেনি।

'কি দেখছ?' মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল। 'চিনতে পারছ তো? না চিনলে বলো এখনি, অন্য পথ দেখি।'

মণিময় এবার অল্প হাসল। 'ভেতরে এসো। চলে যাবে কেন?'

'বাঃ, না চিনলে, না চেনার ভান করলে ঘুরিয়ে আমাকে অপমান করা হয় না কি?' মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল। রিক্সাওলা মালগুলো দালানে রাখল। আগেই ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে বলে দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল।

'আমি কিন্তু সত্যি অবাক হয়ে গেছি অতসী, তুমি এমনভাবে কোন খবর না দিয়েই চলে আসবে।' দু-তিনটে হাই তুলে মণিময় বলল, 'তা ছাড়া এতদিন পরে ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'ইস, কি তাড়াতাড়ি ভুলে যাও তুমি?' বেডিং আর সুটকেশটা দেয়াল ঘেঁষে রাখতে রাখতে বলল, 'মনে পড়ছে না! হাওড়া স্টেশনে আমি ট্রেন ধরতে চলেছি! আর তুমি ওদিক থেকে কলকাতা আসার বাসে বসেছিলে ফিরবে বলে! সেই সময় দেখা! তুমি তোমার ঠিকানা বললে, মনে নেই?'

অনেকদিন আগে অতসীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ার কথা আবছা মনে পড়ল মণিময়ের। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে যেন! ওহ্, সে তো বছর তিনেক আগের কথা! স্ট্রেঞ্জ!'

অতসী হাসল, 'মনে রেখে কি খুব অন্যায় করেছি।'

'না, তা কেন?' মণিময় হাসল। 'আমি কিন্তু একা আসতে বলিনি।' অতসীর সিঁথিতে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বর নামক ভদ্রলোকটি কোথায়? ছেলেমেয়ে! ওদের আনোনি কেন?'

অতসী মণিময়ের থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাল। 'সে সব কথা পরে হবে। তোমার পুলিশী ব্যাপার বন্ধ রাখ তো। আমাকে একটু জিরোতে দাও।

সারারাত ট্রেন জানি, তার ওপর ট্রেন লেট। এখানে এসে তোমার বকবকানি। ভাল্লাগে না।'

'কোত্থেকে আসছ?' মণিময় ঘরের মধ্যে ঢুকল। 'এ ঘরে এসো।'

'জামুই স্টেশন থেকে উঠেছি মিথিলা এক্সপ্রেসে সেই রাত নটায়। হাওড়ায় আসার কথা ছটা কুড়িতে। এলো এই একটু আগে। গাড়ি কি লেট, তার ওপর গরম। ইস, যা কষ্ট হয়েছে ট্রেনে!'

মণিময় অতসীকে ভাল করে দেখে নিল। 'যাও, স্নান-টান সেরে নাও তা হলে।'

'সে কি! আমি একা তোমার বাড়ির সব চিনব কি করে? তোমার মা, সেই ছোট বোন—সব কোথায়! গ্রামে গেছে বুঝি? আর তুমি এখন একা হোটেলে খাচ্ছ?' অতসী একবার সারা বাড়িটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'দূর।' মণিময় বাসি-মুখে একটা সিগারেট ধরাল। 'কেউ নেই। বোনের কবে বিয়ে হয়ে গেছে। মা গেছেন মারা, আর চাকর শ্রীমান হরিপদটি দিন পনেরোর ছুটিতে গ্রামে। এখন তুমি কি করবে ভেবে দেখ।' মণিময় একটানা কথাগুলো বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। অতসী ওর শেষ কথাটার অন্য কোন অর্থ করল কিনা, মণিময় অতসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল।

অতসী কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে ঘরের মধ্যে চোখ বুলোল। হঠাৎ বলল, 'পরে কিছু ভাবা যাবে। এখন বাথরুমে জল পাওয়া যাবে তো? সাবান গামছা সব বের করা আছে? না, আমাকে বেডিং খুলে বের করতে হবে। সেও এক ঝামেলা।'

মণিময় পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল। বলল, 'হরিপদর দৌলতে ওসবের ক্রটি নেই। এমন কি রান্নাঘরে চা, জলখাবার খাওয়ার মত সব কিছুই পাবে হয়ত, একটু খুঁজে নাও।'

মণিময়ের শোয়ার ভঙ্গি দেখে অতসী হেসে ফেলল। 'আর তুমি এখন কি করবে?'

'কি আবার!' হাই তুলল মণিময়। 'নতুন করে একটু ঘুমিয়ে নি। মাথার মধ্যে ভীষণ এক ভার চেপে আছে। তোমার সব হয়ে গেলে বোলো, স্নানে যাবো। অফিস আছে।' মণিময় এবার যেন নির্বিকার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পাশ ফিরে শুলো।

অতসী সত্যি ক্লান্ত। মণিময়কে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ নেই এখনি। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মণিময়কে আরও কিছু সময় ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে অতসী ছোটখাটো অনেক কাজ সেরে নিল। মণিময়ের একতলার ফ্ল্যাটে দুটি ঘর। ঘরের সামনে চওড়া দালান। ওপাশে রান্নাঘর, আর এদিকটায় বাথরুম। মণিময় একটা ঘর ব্যবহার করে। আর একটা ঘর নোংরা। নানা জিনিসপত্তর ঠাসা সে ঘরে। অথচ জিনিসগুলো অন্য জায়গায় সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘরখানাকে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। দুটি ঘরের মাঝখানে দরজা। মণিময় ওর ঘরের দিকে খিল এঁটে দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

অতসী স্নানে যাবার আগে সব খুঁটিয়ে দেখে রান্নাঘরে এলো। সম্ভবত হরিপদ যে অবস্থায় রেখে গ্রামে গেছে, সেই অবস্থাতেই সব জিনিসপত্তর পড়ে আছে রান্নাঘরে। মণিময় বুঝি কোনদিন নিজে চা করে খেতে গিয়েছিল। অতসী মুখ টিপে হাসল। একরাশি ভিজে চায়ের পাতা ছাঁকনিতে পড়ে আছে। প্রয়োজনের বেশী এঁটো কাপ-ডিশ ওল্টানো-ছড়ানো। স্টোভের কালি-ঝুল মাখানো কেটলি মুখ খোলা অবস্থায় উপুড় করা। কিছু গুঁড়ো দুধের পাউডার আর খোলা-মুখ চিনির ডিবে ঘিরে পিঁপড়ে থিকথিক করছে। অতসী রান্নাঘরে বিশ্রী পুরনো চায়ের গন্ধ পেলো। মনে মনে একটা কৌতুক অনুভব করল। নোংরা কাপ-ডিশ, চায়ের বাসনপত্তর নিয়ে অতসী স্নানের ঘরে ঢুকল।

মণিময়কে ঠেলে তুলে বাথরুমে পাঠিয়ে অতসী নিজেই চা করতে বসেছিল। সঙ্গে কিছু নোনতা বিস্কুট এনেছিল অতসী। সেগুলি প্লেটে সাজিয়ে মণিময়ের ঘরে ঢুকে দেখল, মণিময় চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছে।

'আজ অফিস যাবে তো!' অতসী চায়ের কাপ সামনে ধরে বলল।

মণিময় সামনে থেকে খবরের কাগজ সরাল। অবাক হয়ে অতসীর দিকে তাকাল। 'না যাওয়ার কি কোন কারণ আছে?'

'না, ভাবছি যেভাবে খবরের কাগজ পড়ছ! নাও, চা ধর।'

মণিময় হাতে চায়ের কাপ নিল। 'এসব করতে গেলে কেন? আমি ভাবছিলুম, বাইরে থেকে চা এনে খাওয়াবো।'

'থাক মশাই, সে চা আজ নয় কাল সকালে হয়ত খেতে পেতাম। যা ঠেলতে হয়েছে ঘুম ভাঙানোর জন্যে! উফ্!'

মণিময় হেসে উঠল জোরে। অতসী মণিময়ের উঁচু করে বসানো তক্তপোষের

গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। চায়ে পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল, 'কটায় অফিস?'

'যখন হোক গেলেই হল।' মণিময় কাপের প্রান্ত থেকে ঠোঁট সরিয়ে বলল, 'তবে একটু পরেই বেরুব। কিন্তু আমি তো হোটেলে খেয়ে নেব, তোমার খাবারটা কি এনে দেব হোটেল থেকে?'

'কিছু দরকার নেই। তোমার শ্রীমান হরিপদ যা রান্নাঘরে রেখে গেছে, তাতেই ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিয়েছি স্টোভে। এবেলা এই খেয়ে যাও। সন্ধ্যেয় না হয় ভাল করে রান্না করা যাবে।'

মণিময়ের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কাপ-ডিস রেখে সত্যিই অবাক হয়ে অতসীকে দেখতে লাগল।

'কি দেখছ বোকার মত?' অতসী যেন একসঙ্গে দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে ধমক দিয়ে উঠল। 'সেই আগের মতো ফাজলামি করার স্বভাবটা গেল না দেখছি।' অতসী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তা ছাড়া, যতদূর মনে পড়ছে, তুমি তো এত কথা বলতে না! কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

মণিময় কোন কথা না বলে অতসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

'যাক্, তুমি তৈরী হয়ে নাও। ভাতটা চাপিয়ে এসেছি, দেখি।' অতসী দরজার দিকে এগোল।

মণিময় অতসীকে দরজার আড়াল হতে দেখেই বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো অতসী, তোমার কোন কথাই শোনা হয়নি।'

অতসীর দ্রুত পদশব্দের সঙ্গে হাসির শব্দ কানে এল। 'বসো, আসছি।'

অতসী চলে গেলে মণিময় নতুন করে সিগারেট ধরাল। মণিময় তো এত কথা বলত না? শুধু বনশ্রী পাশে থাকলে মুখর হতে ভালবাসত। এখন কেন? মণিময় আবার এক শূন্যের মধ্যে ভাসতে লাগল। মনে হল, চিন্তা থেকে সে মুক্তি পাবে! অতসী তার পুরনো বান্ধবী। 'অতসী, সত্যি, তুমি এসে আমার অনেক উপকার করলে।' মণিময় বিড়বিড় করল।

অন্যমনস্ক হয়ে মণিময় বেশ কয়েকবার পর পর সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়ল। চোখের সামনে একটা ধোঁয়ার ভাসমান আকাশ তৈরী হয়ে গেল। বনশ্রী এখন অন্য প্রেমিকের কাছে চলে গেছে। কত উল্লসিত সে এখন। তার ধারে-কাছে কোথাও মণিময় নেই। মণিময় এখানে, এই ঘরে, একা। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বনশ্রী এই ঘরে সকাল, দুপুর গল্প করে কাটিয়ে গেছে। একদিন যেন

ঠাট্টা করে মণিময় বলেছিল, 'কাল এসো না শ্রী, দুপুরে থাকব না।' 'কোথায় যাবে?' 'ট্রেনে করে কোথাও।' 'সেই বান্ধবীর কাছে বুঝি?' বনশ্রী গম্ভীর অন্যমনস্ক, অসহায় হয়ে গিয়েছিল। বনশ্রী জানত, মণিময়ের এক বান্ধবী কোন্নগরে থাকে। অফিসে কাজ করে। মাঝে মাঝে মণিময়কে যেতে বলে ওর বাড়িতে, যদিও মণিময় একটি দিনও সেখানে যাওয়ার তাগিদ বোধ করেনি। মণিময়ের মজা লেগেছিল কথাটা বলে। বনশ্রী এর পর কয়েকদিন কথা বলেনি। বনশ্রীকে এমনি করেই চিনেছিল মণিময় আপন করে।

এখন যদি বনশ্রী শোনে, অতসী ওর বাড়ি এসে উঠেছে। আজ থাকবে। অতসীর সঙ্গে মজা করে গল্প করছে, আড্ডা দিচ্ছে! বনশ্রীর কিছু মনেই হবে না। কোন দুঃখ বা ঈর্ষাও হবে না। ভালবাসায় পরাজিত মণিময় লম্পট হয়ে গেলেও বনশ্রীর দুঃখ নেই। বনশ্রী এখন স্বার্থপর। হয়ত এইভাবেই স্বার্থপর হতে হয়। মাঝে মাঝে মণিময় বনশ্রীকে স্বার্থপর বলে রাগাত, ঠাট্টা করত। ঠিক এই মুহূর্তে 'স্বার্থপর' শব্দটা মণিময়ের মুখের রেখায় কেন যেন এক কঠিনতা স্পষ্ট করে তুলল।

মণিময়ের দু'আঙুলে সিগারেটের আগুনের তাপ লাগতেই সচেতন হল। হঠাৎ মনে হল এই চেয়ারের গা ঘেঁষে বনশ্রী মাঝে মাঝে দাঁড়াত। কেমন আপন হয়ে তাকাত মণিময়ের দিকে। এখনি বুঝি বনশ্রীকেই দেখল সে! মণিময় হাসল। না, দু'চোখে অনিদ্রার আলস্য কাটেনি এখনো। একটু আগেই তো অতসী এসে দাঁড়িয়েছিল। বনশ্রী রোগা, ছোট-খাটো চেহারার। অতসীর থেকে ফর্সা রঙ্। টানা চোখ-নাক-মুখ অতসীর থেকে অনেক ভাল। অতসী তা নয়। ওর বয়স হয়েছে। বয়স হলে বনশ্রী ঐরকমই হবে! তবু এই সময়ে যেন অতসীকেই ভাল লাগছে। অতসী অনেক পুরনো বান্ধবী। বড় একা মণিময়। অতসীর সঙ্গে তবু কিছু কথা বলে ক'দিন কাটানো যাবে।

আজকের অতসীর চেহারার একটা আবছা ছবি চোখের সামনে নিয়ে মণিময় বছর বারো আগের অতসীকে ভাবতে বসল। একসঙ্গে এম-এ পড়ত ওরা। অতসী পাশ কোর্সের গ্র্যাজুয়েট ছিল, পড়ত ইস্‌লামিক হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার। মণিময় মডার্ণ হিস্ট্রির ছাত্র ছিল। একটা দল নিয়ে ইউনিভার্সিটির লন, করিডোর, গোলদীঘির ভিতর, কফি হাউস, কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাত সর্বত্র আড্ডা জমাতো। মেয়েদের মধ্যে অতসী, রেখা, সুনন্দা, অরুণা, প্রতিমা, মুক্তি ছিল। ছিল মণিময়ের বন্ধু সুহাস, পার্থ, সলিল, অনন্ত। দলের মধ্যে অতসী তেমন মোটেই

সুন্দরী ছিল না। ময়লা রঙ হলেও নাক-মুখ চোখে মোটামুটি সুশ্রী ছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সামান্য আয়োজনে সাধারণ শাড়ি-জামা গুছিয়ে পরে আসত। পাতলা ঝকঝকে চেহারা ছিল। দলের থেকে আলাদা করে প্রণয় করার মত মেয়েও ছিল না অতসী। তবে ভীষণ আড্ডাবাজ আর হুল্লোড়ে ছিল।

ফিফ্‌থ ইয়ারের শেষেই হঠাৎ অতসীর বিয়ে হয়ে যায়। বিহারে ওর এক দাদার বাড়ি থেকে বিয়ে হয়। তাই বন্ধুদের কেউই বিয়েতে যেতে পারেনি। বিয়ের পরেও খোঁজ-খবর রাখতে পারেনি। বিয়ের পরেই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের বাইরে চলে যেতে হয় ওকে। দলের আর সকলেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে। মণিময় সিক্সথ ইয়ারের শেষে পরীক্ষা না দিয়ে চাকরীতে ঢুকে পড়ে।

সেই অতসীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে হাওড়া ষ্টেশনে দেখা। দেখা আচমকা। মণিময় তখন আগের তিনখানা বাস ছেড়ে একটা ফাঁকা বাসে জানালার ধারে বসে। অতসী সামনের রাস্তা ধরে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিল।

'অতসী না? এই অতসী!' মণিময় হঠাৎ ডেকে বসল।

থমকে দাঁড়াল অতসী। একেবারে মণিময়ের জানালার সোজা, একটু দূরে। 'আরে! মণিময়?' এগিয়ে এল। 'ইস্, কতদিন পরে দেখা!'

'বাসে উঠে এস, পাশে বসার জায়গা আছে।'

'পাগল হয়েছ, আমাকে এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'চন্দননগরে মাসির বাড়ি। ওখান থেকে আজ রাতেই হাওড়া ষ্টেশনে আসতে হবে। ট্রেনে যশিডির দিকে পাড়ি দেব।'

'তোমার বর কই? ছেলে মেয়ে ক'টি?' কপালের সিঁদুর চোখে পড়তে মণিময় অকারণ কিছু কথায় সাংসারিক হয়ে উঠেছিল।

অতসী হাসল। 'বর কর্মক্ষেত্রে, ছেলে-মেয়ে আপাতত দুটি।' পাল্টা প্রশ্ন অতসীর, 'তোমার খবর কি? বিয়ে করেছ?'

'নাহ্।' একটা হাল্কা রসিকতা করতে যাচ্ছিল, সামনে এক ভদ্রলোককে আসতে দেখে প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'এসো না একদিন আমার বাড়িতে।'

'ঠিকানা কি? গেলে মাসিমা আর তোমার সেই বোনটির দেখা পাব তো?'

মণিময় ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে চাকরী কর। কিসের?'

অতসী হঠাৎ হাতঘড়ি দেখল। 'ইস্, আমার দেরী হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ ট্রেন ফেল করব। এত সব খবর এখনি দেওয়া যাবে না। চলি মণিময়, একদিন বরং কলকাতায় এসে তোমার ওখানেই উঠব।'

'সে আমার ভাগ্য! তবে একা নয় কিন্তু, চারজনে এসো! না আনলে ঢুকতেই দেবো না!'

অতসী হেসে ফেলল। 'আচ্ছা চলি।' অতসী দ্রুত হাঁটতে লাগল। বাঁ-হাতে ছোট একটা চামড়ায় সুটকেস, ডান হাতে কিড-ব্যাগ। ষ্টেশনের মধ্যে ঢোকার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মণিময় অতসীর চলে-যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। মণিময়ের মনে হয়েছিল, অতসী আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছে। সারা মুখে, চেহারায় বয়সের ঈষৎ ভার লেগেছে। তবু পোষাকে, চলায়, কথা বলায় কোথাও দশ বছরের বিবাহিত দুটি সন্তানের জননীর ভারী স্বভাব স্পষ্ট নয়। কিন্তু মণিময়ের যেন মনে হয়েছিল, অতসীর দৃষ্টি, চোখের কোল, মুখের রেখা আর কণ্ঠস্বরে যেন চাপা বিষণ্ণতা মাখানো রয়েছে। সেই সপ্রতিভ হাসি, আর চঞ্চল দৃষ্টি, আড্ডাবাজ স্বভাব কেউ বুঝি ওর মধ্যে থেকে মুছে দিয়েছে। বিয়ে হলে, সন্তান হলে, বা বয়স হলে মেয়ে-পুরুষ—সবাই বুঝি এরকম হয়? নাকি, অতসী জীবনের যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, বা হেরে যাওয়ার অসহায়তায় এমন করুণ হয়ে গেছে?

মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষকে শরীরে-মনে বুঝি কঠিন করে তোলে। অতসীও কি কোন অভিজ্ঞতায় এমন রুক্ষ হয়ে গেছে? মণিময়ও কি বনশ্রীর প্রেমের অভিজ্ঞতায় এমন কঠিন হয়ে উঠেছে? চাপা শ্বাসকষ্টে মণিময় সোজা হয়ে বসল। নিভে যাওয়া সিগারেট ধরালো। অতসীর চিন্তার মধ্যে বনশ্রীকে মনে হতেই মণিময়ের মাথাভার দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগল মণিময়। পাখার নীচেও ঘেমে গেছে।

'কার কথা এমন বিভোর হয়ে ভাবছ?'

'তোমার।'

'সত্যি! তাহলে তো ভয়ের কথা!'

'আপত্তি থাকলে ভাবব না।'

'নতুন করে প্রেমে পড়তে চাইছ নাকি?'

'বয়সটা যেভাবে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলা যায় না, একসময়ে দুম্ করে ভালবেসে ফেলতেও পারি।' মণিময় শব্দ করে হেসে উঠল।

অতসী সামনের মোড়াটায় বসে পড়ল। 'দেখ, মেয়েদের বয়সের প্রসঙ্গের ধারে-কাছে যেও না কখনো, ঠকবে।'

'মানে?' মণিময় হঠাৎ কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে ভুরু কোঁচকালো।

'আমার বয়স কত বলত?'

'আমার চৌত্রিশ। তোমার তা হলে একত্রিশ কি বত্রিশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

'বত্রিশ। বলো, এই বয়সে নতুন করে কি প্রেম হয়?'

'ভাল জমে।' বলেই মণিময় হো-হো করে হেসে উঠল।

অতসী মণিময়কে দেখল। গোলদীঘির মধ্যে ঘাসের ওপর দল নিয়ে গোল হয়ে বসে আড্ডা দেবার সময় মণিময়কে কোন দিন এইরকম শব্দ করে হাসতে দেখে নি। অথচ কত পালটে গেছে! 'মনে পড়ে মণিময় গোলদীঘির আড্ডার কথা!'

মণিময় নতুন একটা সিগারেট ধরালো। 'খুব মনে পড়ে। আমরা কতদিন হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে এর-ওর সঙ্গে গোপন প্রেমের মিথ্যে কাহিনী বলতাম, আর দলের কেউ তাই কারোর সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারত না। তাই শুধু আড্ডার দল হিসেবে ছিল ইউনিক, তাই না?'

'তা ঠিক। তবে আমার মনে হয়, শেষ দিকে কেউ কেউ গোপনে প্রেম করতে শুরু করছিল।' তাই নয়?'

'হয়ত। ঠাট্টাচ্ছলেও তো সব কথা বলে ফেলা যায়।'

'একটু আগে তুমি সেই ভেবে ভালবাসার কথা বলে ফেলেছ নাকি? সত্যি করে বলতো?' অতসী চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'এখনো সেই পুরনো আড্ডাবাজ মেয়েটা তোমার মধ্যে আছে দেখে ভীষণ ভাল লাগছে অতসী।'

'অথচ দেখ, ইচ্ছে করলেই কিন্তু ঠিক সেই আড্ডা তুমি আর দিতে পারবে না। বয়স হয়েছে না?'

'আমার কিন্তু তোমাকে পেয়ে ভীষণ ভাল লাগছে। আমি ক'দিন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলুম কারোর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে।'

অতসী সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে মণিময়ের দিকে তাকাল। 'উঁহু, সন্দেহ হচ্ছে। কোথাও কোন ধাক্কা খাওনি তো মণিময়? তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি কোন গোলমালে পড়েছ।' অতসী গলা নামাল। অভিজ্ঞের মত বলল, 'প্রেমে ব্যর্থ নাকি?'

মণিময়ের এতক্ষণ পরে আবার বনশ্রীর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। এক ধরনের চাপা বিরক্তি শূন্যের মধ্যে পাক খেতে লাগল। অতসীকে বুঝতে দিল না। ওর কথাটাকে চতুরভাবে এড়িয়ে গেল মণিময়। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'আসল কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি অতসী! হঠাৎ কলকাতায় কেন?'

মণিময়ের আগের প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার কৌশলটা অতসী আদৌ ধরতে পারল না। সহজভাবে বলল, 'একটা নার্সিং-এর ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি। কাল দুপুরে ইণ্টারভিউ।'

'একা চলে এসেছ, সঙ্গে কাউকে আনোনি!'

'সোমনাথ তো শিলিগুড়িতে থাকে বড় ছেলেকে নিয়ে। আমি ছোট মেয়েটাকে নিয়ে নার্সের কোয়ার্টারে থাকি। মেয়েকে পাশের এক নার্সের জিম্মায় রেখে দু-তিন দিনের জন্যে এসেছি। কে আর আসবে বল?'

'সঙ্গে না আসার জন্যে দুঃখ হচ্ছে তোমার? আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি!'

অতসী মুখ টিপে হাসল। 'কাকে? আমাকে?'

'তোমাকে! ইস্! বরং আমাকেই তুমি ভয় করবে। আমি একজন অবিবাহিত পুরুষ। তাই—'

অতসীর মুখ ঈষৎ লাল হল। চিবুক একটু কাঁপল চাপা লজ্জায়। 'তোমার সেই আগের মত যা তা বলে ফেলার স্বভাবটা গেল না দেখছি। পাশের বাড়ির যদি কেউ শোনে! তার ওপর চাকর-বাকর কেউ এখন নেই। সারা বাড়িতে আমরা দুজনে একা!'

'তা ঠিক। চাকরটা থাকলে এত সব কথা বলাই যেত না। ও নিশ্চয়ই কিছু ভেবে বসত।'

'কি?'

'কি আবার! তোমাকে ভাবত আগের প্রেমিকা!'

'ওকে এসব ভাবতে ট্রেনিং দিয়েছ নাকি? তাই যে কেউ আসুক, ঐ একটি কথাই ভেবে বসবে?'

'হয়ে গেছে।'

'না, না, ভাবগতিক তো ভাল নয়। সময় বুঝে হোটেলই দেখতে হবে দেখছি। তাও না পেলে ফুটপাত। তবু কিছুটা সেফ!'

অতসীর চোখ-মুখের আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে মণিময় আগের মত শব্দ করে হেসে উঠল। অতসীও চাপা হাসি সামলাতে পারল না।

দুজনের হাসি থামলে অতসী বলল, 'এই, অফিস যাবে না?'

'তোমার রান্না হয়ে গেছে নাকি?'

'কখন! শুধু ভাতে-ভাত তো!'

মণিময় বাইরে দালানের দিকে একবার তাকাল। 'এই উঠছি। ব্যাপার কি জানো, অনেক দিন পরে আগেকার দিনগুলোর মত একটা দিন পেয়েছি। নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু যা গরম। তার ওপর যত বেলা বাড়ছে, পাখার তলাতেও আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' বলেই অতসী একটু নড়ে বসে শারীরিক অস্বস্তি বোঝালো।

'ইস্, যদি বৃষ্টি নামত এখনি!' মণিময় ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হল।

'তোমার তো আবার সবুজ ঘাসের ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভাল লাগে খুব, তাই না? বিজ-বিজ শব্দ। আমার ওখানে এসো। কোয়ার্টারের সামনে বিরাট ফাঁকা ঘাসে ঢাকা জায়গা আছে। বৃষ্টি নামলে যা ভাল লাগে। থাকলে বুঝবে।'

মণিময় অবাক হয়ে অতসীকে দেখল। 'তুমি সব মনে রেখেছ তো?'

অতসী হাসল।

'তোমার কথাও মনে পড়ে অতসী। কফি হাউসে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে হাত বাড়িয়ে জানালা থেকে বৃষ্টির গুঁড়ো হাতে নিতে! তাই না?'

'তখনি খুব পেকে গিয়েছিলে দেখছি। মেয়েদের সব লক্ষ্য করতে তো!'

'অথচ দেখ, তবু তোমাকে ভালবাসায় ধরতে পারি নি!'

'ইস্, আমিই বা এগোতাম নাকি? তোমাকে আমার ভালই লাগত না!'

'কেন?' মণিময় অতসীর চোখে চোখ রাখল। 'তোমার সাহস তো কম নয়? আমার বাড়িতে বসে আমাকে একথা বলছ?'

অতসী হেসে ফেলল: 'তুমি আর কি জানবে? এভারেজ মেয়েরা সব সময়েই হিন্দী সিনেমার নায়কের মত ছেলেদের মধ্যে হালকা হুল্লোড় দেখতে ভালবাসে। তাদের প্রেমিকের মধ্যে সে রকম না পেলে এগোতে চায় না। তুমি তখন থেকেই এত কম কথা বলতে, আর গম্ভীর, দার্শনিক ছিলে!'

'আমারও তো তাই কোন মেয়েকে ভাল লাগে নি।' বলেই বনশ্রীর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। বনশ্রী বুঝি সেই রকম এক এভারেজ মেয়ে—যে কেবল হিন্দী সিনেমা দেখে তার নায়কদের মত প্রেমিকদের আদর্শ কল্পনা করেছে এতদিন? তা-ই কি চেয়েছিল মণিময়ের মধ্যে? হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গেল ভিতরটা।

অতসী সোজা তাকাল মণিময়ের দিকে। 'অবশ্য এটা হয় কম বয়সে। বেশী বয়সে এসব থিতিয়ে আসে।'

'নিজের কথা ভেবে শুধরে নিচ্ছ?' মণিময় একটু বেশী হাসল। 'আগে তুমি ঠিকই বলেছ, মেয়েরা চল্লিশ বছরেও খুকি থাকে।'

'বাজে বোকো না তো। একজন বিবাহিত ভদ্রমহিলার সামনে এসব কথা বলে না।' যেন ধমক দিল অতসী।

'শাসন করছ?'

অতসী উঠে দাঁড়াল। 'নাও, স্নান করো তাড়াতাড়ি। একসঙ্গে খেয়ে নি।'

'ওহ্, ভুলেই গেছি। তুমি সারারাত ট্রেন জার্নি করে ক্লান্ত, তাই না?' উঠে দাঁড়াল মণিময়। 'আমি অফিস বেরিয়ে গেলে তুমি বরং লম্বা একটা ঘুম দাও।

'ভাত খেলে তবে ঘুম আসবে। তার আগে দু'চোখে একটুও ঘুম নেই। শুধু ক্লান্তিটুকু জড়িয়ে আছে সারা শরীরে!' বলতে বলতে অতসী পিঠ-বুক ঈষৎ দুমড়ে-মুচড়ে চাপা ক্লান্তি সরাতে চাইল।

মণিময় ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল। ঘুমোবার কথা মনে হতেই কি একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেছে। অতসীর দিকে তাকাল। 'তাই তো। কথাটা মনেই হয় নি। শোবার কোন অসুবিধে হবে না তো?'

অতসী মণিময়ের চোখে চোখে রাখল। মণিময় হঠাৎ নিজের মধ্যে আড়ষ্টতা বোধ করল। চিন্তায় এক জটিলতা পাক খেয়ে গেল। অতসী নীরব। মণিময় অতসীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে এক কাজ কর। তুমি আমায় বিছানায় শোও, রাত্রে আমি দালানে শোব এখন।'

বিষয়টা এমনি জটিল, অস্বস্তিকর, অতসী চাইছিল না মণিময়ের সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনা হোক। সারা বাড়িতে মণিময় আর অতসী থাকবে, আর কেউ নেই। এরকম কোন ভাবনা কোন সময়েই যেন দুজনের মধ্যে না আসে। অতসী তা-ই চাইছিল। মনে পড়লে আর কিছু নয়, মণিময় আর অতসী দুজনেই অস্বস্তিকর লজ্জায় পড়ে যাবে, কিছু বলতে পারবে না। দুজনের সঙ্গে

অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন সব রকম ঠাট্টার সম্পর্ক বটে, তবু একটা জায়গায় অতসীর চুপ করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া, মণিময়ের মা, বা বোন, কেউ থাকবেই—এটা ভেবেই এসেছিল। এখন নেই বলে অতসীর দিক থেকে শোয়া নিয়ে কথা বলা বা হোটেলে চলে যাওয়া কোনটাই সম্মানের হবে না মণিময়ের কাছে।

কয়েকটি কথা মুহূর্তে ভেবে নিয়ে অতসী বলল, 'সে সব তোমার ভাবতে হবে না, পরে ভাবা যাবে। শুধু মনে রেখ, দুপুরে আমি একটু ঘুমিয়ে বেরুব। ফিরে রাঁধব দুজনের। তুমি যেন বাইরে খেয়ে এসো না। কখন ফিরবে?'

'তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে, যখন পারো ফিরবে, তবে রান্না-বান্নার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মণিময় হাসল। কোনো কথা না বলে কলঘরের দিকে এগোল।

বিকেলে মণিময়ের ফেরার আগে অতসী একা অনেক কাজ করেছে। দুপুরে ঘণ্টা-দুয়েক ঘুমিয়ে একটা কাজ সারবে বলে বেরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে বাড়ি ফেরার পথে কিছু আনাজ, মাছ কিনে নিয়ে এসেছে। মণিময়ের শোবার ঘরের পাশের ছোট ঘরটার জিনিসপত্তর সরিয়ে দালানের এক কোণে জড়ো করে রেখে ঘরটা পরিষ্কার করে ধুয়েছে মুছেছে একাই। একটা তক্তপোষ ছিল, সেটাকে পরিষ্কার করে তার ওপর অতসী নিজের হোল্ডঅলে আনা বিছানাটা পেতেছে যত্ন করে। ঘরের কোণে কাপড়ের ঢাকা-পরানো একটা টেবিল ফ্যান ধুলোমাখা অবস্থায় পড়েছিল। পাখাটা টুলের ওপর বসিয়ে প্লাগ পয়েন্ট ঠিক করে রেখেছে। মণিময়ের শোবার ঘর সুন্দর করে গুছিয়েছে। রান্নাঘরের সামনে দালানে একটা পুরনো টেবিল আর দুটো চেয়ার রেখে খাবার টেবিল বানিয়ে দিয়েছে। সব ডাঁই হয়ে ছিল ছোট ঘরটায়।

যেন একটা নেশার ঘোরে অতসী এত কাজ করেছে গড়িয়ে-আসা দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত। এরই মধ্যে, রান্না সেরেছে। ভাল করে সন্ধেয় স্নান করার জন্যে বাথরুমে এল অতসী। ওখানে হাসপাতাল থেকে ফিরে সন্ধেয় স্নান করার অভ্যেস। তার ওপর কলকাতায় আজ যা গরম : মনে হয় রাত দশটার পরেও আর একবার স্নান করতে হবে।

কলঘরে স্নান করতে করতে অতসী নিজের মত করে নানা কথা ভাবছিল। কিন্তু বাইরে এসে দেখল, চাপা গুমোট গরম কিছুটা সরতে শুরু করেছে। আকাশ

ছেয়ে ঘন মেঘ। হু হু করে মাতাল হাওয়া বইছে। মনে হয়, একটু পরেই ভীষণ ঝড় উঠবে। সকালে মণিময়ের কাছে শুনেছিল, কলকাতায় আজ প্রায় সাত-আট দিন এরকম অসম্ভব গুমোট গরম চলেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। দূরে গুম গুম করে মেঘ ডেকে উঠল। অতসী দালানের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখল। মণিময়ের এখন ফিরে আসা উচিত। বৃষ্টি নেমে এলে আসতে পারবে তো? একটু বৃষ্টিতেই তো কলকাতার ট্রাম-বাস অচল হয়ে পড়ে। একবার মেয়ের কথা মনে পড়ল। এরকম ঝড় এলেও ওখানে ভয় নেই। কি ভেবে অতসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

একটু পরে মণিময় যখন ফিরল, অতসীর প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে। একটু আগে পর্যন্ত জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অতসীর নিজেকে বড় একা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। বুকচাপা কষ্ট ওকে অস্থির করছিল বারবার।

মণিময় ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলল, 'এসব কি করেছ অতসী!'

'কি আবার?' অতসী সহজ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'তোমাকে এসব কে করতে বলল! তুমি একাই বা এসব করতে গেলে কেন?'

'ক্ষতি কিসের? আমাকেই তো থাকতে হবে?'

'মানে!' মণিময় চাপা কৌতুকে ফুলে উঠল। 'স্থায়ী একটা রেশন কার্ড তাহলে সত্যিই করাতে বলছ!'

'যাও, আবার সেই কথা! সব বিষয়ে ঠাট্টা!' একটু থেমে বলল, 'কোথায় এত কষ্ট করে সব পরিষ্কার করলাম, একটু প্রশংসা করবে, তা না!' দু'চোখ পাকাল অতসী।

মণিময় এবার অতসীকে স্থির দৃষ্টিতে দেখল। সকালের সেই ক্লান্তি অতসীর শরীরের কোথাও নেই। দুটি সন্তান হয়ে গেছে অতসীর, কেউ এই মুহূর্তে ওকে দেখলে তা ভাববেই না। ভারী খোঁপা করেছে ভিজে চুল জড়িয়ে। এতক্ষণ পরে মণিময়ের লক্ষ্য পড়ল অতসীর শরীর। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঈষৎ ভারী মনে হয়, কিন্তু নাক, মুখ, চোখ, গ্রীবা, বুক, পিঠ এমন পরিমিত স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল অতসীর, মণিময় এই প্রথম যেন তা নিঃশব্দে অনুভব করল। বত্রিশ বছরের বিবাহিতার বুঝিবা আলাদা যৌবন আছে। বনশ্রীর বয়স চব্বিশ, দেখলে মনে হবে উনিশ-কুড়ি। কিন্তু এমন স্থির দীপ্তি, চোখে-মুখে যৌবনের আলোয় এমন শান্ত শীতলতা কোনদিন ওর শরীরে দেখেনি মণিময়। তিরিশের

ওপরে মেয়েদের বয়স হলে মেয়েরা বুঝি সন্থ-সবুজ-হওয়া গাছের মত সুন্দর হয়? মণিময় নিজের পছন্দ মত একটা উপমা তৈরী করে অতসীর পরিচ্ছন্ন শরীর দেখল।

'কি ভাবছ? প্রেমিকার কথা?'

চমকে উঠল মণিময়। হাসল। 'সত্যি অতসী, তুমি আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়েছ!'

'আমাকে দেখে তাই ভাবছ? তাহলে চলো, আরও অবাক হবে।' বলেই অতসী মণিময়ের হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। 'দেখ তো, অতিথির শোবার মত হয়েছে কিনা।'

মণিময় এবার হতবাক। অতসী যে একবেলায় এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, ভাবেই নি। একবার ঘর, আর একবার অতসীকে দেখল মণিময়। 'সত্যি, সোমনাথবাবুকে এবার ঈর্ষা হচ্ছে।'

'থাক, সব কথা স্পষ্ট করে বলতে নেই মশাই।' মুখে-চোখে, হাতের ভঙ্গিতে চটুল ভাব করল অতসী।

হেসে উঠল মণিময়। অতসীও।

'রান্না শেষ করে ফেলেছ?'

'কখন!'

'কিন্তু এখনি তো খেতে বসা যায় না।'

'কে বলেছে খেতে। বরং চা করি একটু।'

'এমন ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, এ সময়ে চা-পান তো উত্তম প্রস্তাব!' এ ঘরে এল মণিময়। 'কিন্তু আর একটা প্রস্তাব আছে অতসী।'

'কি?'

'তুমি ওঘরে শুতে পাবে না। এ ঘরে আমার বিছানায় শোও, আমি বরং ও-ঘরে শুচ্ছি।'

'কেন!'

'ও ঘরটায় ইঁদুর আরশুলা আছে, তার ওপর অনেকদিন ব্যবহার করা হয় নি। তুমি আমার কদিনের গেস্ট, তার ওপর ভদ্রমহিলা। তোমাকে তো ও ঘরে শুতে দিতে পারি না।'

চিবুক তুলে মণিময়ের দিকে তাকিয়ে ছিল অতসী। মণিময়ের বলার ভঙ্গি

দেখে অতসী হেসে উঠল। 'তুমি যখন এ বাড়ির মালিক তখন আর না করি কি করে? তবে ও ঘরে আমার অসুবিধে হত না।'

'থাক, মেয়েরা সব সময় নিজের সুবিধে-অসুবিধে বুঝতে পারে না। তাই এক এক সময় ভীষণ ঠকে যায়।'

'খুব যে!' অতসী চোখ পাকাল। 'আসছি, আগে চা-টা নিয়ে আসি। তার পর দেখা যাবে।' অতসী রান্নাঘরের দিকে এগোল।

'সেই ভাল। আমিও মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নি।' মণিময় জামা-কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হল। 'ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দেবার সময় মাঝে মাঝে যেমন পিঠে আচমকা কিল বসাতে, ছেলেদের কলার ধরে টানতে, তা করবে না তো?' অতসীকে শুনিয়ে বলল মণিময়।

রান্নাঘর থেকে অতসীর হাসির শব্দ এল।

দালানে মাদুর পেতে সামান্য দূরত্বে দুজন দেয়াল ঘেঁষে বসল। মণিময়ই যুক্তি দিল, এমন হু-হু হাওয়ায় ঘরের মধ্যে বসতে ভাল লাগছে না। আজ আবার পূর্ণিমা। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও জ্যোৎস্নার হাল্কা আস্তরণ বাইরেটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। গুমোট গরমের পর চারপাশের ঠাণ্ডা পরিবেশ বড় ভাল লাগছে।

সামনে কিছু মুড়ি, ভাজা আর চায়ের কাপ নিয়ে বসল মণিময়, অতসী।

মণিময় বলল, 'দালানের আলোটা বরং নিভিয়ে দাও। হাল্কা অন্ধকারটা খারাপ লাগবে না। তাছাড়া ঘরের আলোও জানলার গরাদ দিয়ে মাদুরের ওপর পড়লে আমরা দুজনেই দুজনকে দেখতে পাবো।'

অতসী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে দালানের আলো নেভাল। বসতে বসতে বলল, 'হঠাৎ এমন হাল্কা রোমান্টিক হচ্ছ কেন? ছেলেমানুষি করতে ভাল লাগছে বুঝি?'

দালান অন্ধকার হতেই ওদের দুজনের মাঝখানে ঘরের উজ্জ্বল আলো জানালার গরাদ ডিঙিয়ে মাদুরের ওপর পড়ল। স্পষ্ট করে দুজনে দুজনের মুখ-চোখ দেখতে পাচ্ছে এবার।

মণিময় আর অতসী দুজনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। কি যেন ভাবতে ভাবতে দুজনে মুঠো করে মুড়ি খেয়ে চলল নিঃশব্দে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে প্রথমে দুজনেই চা খেয়ে নিয়েছে নিঃশেষ করে। খালি কাপ সামনে পড়ে আছে।

অতসী বলল, 'কি হল? কথা বল, এমন চুপ করে বসে থাকতে একটুও

ভাল লাগছে না।' বলা শেষ করে বাতাসে উড়ে পড়া কয়েকটা চুল চোখের ওপর থেকে সরাল।

মণিময় অতসীর দিকে সোজা তাকাল। 'তাস খেলবে?'

'তাসের খেলা জানি না।'

'তাসের কোন খেলাই না?'

'একদম না।'

মণিময় চুপ করল। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বন্ধু-বান্ধবীদের সব খবর দিয়েছে অতসীকে। অতসীর নার্সের চাকরী নেওয়ার কাহিনীও শোনা হয়ে গেছে সকালে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার সময়। আর কি কথা বলার আছে? আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে মুড়ি খাওয়া শেষ করল। অতসীর খাওয়া আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাইরে প্রবলবেগে বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূরে মেঘের গম্ভীর শব্দ। অতসী-মণিময়ের ভাল লাগছে ঠাণ্ডা ভাবটা।

'আমরা কি এরকম চুপ করে বসে থাকব?' অতসী হাসবার চেষ্টা করে গায়ের আঁচলটা আলতো করে জড়িয়ে নিল পিঠে।

'তাছাড়া আর কি? আর কিছু কথা তো বলার নেই।'

'সত্যি নেই?' অতসী নিজের মধ্যে অকারণ চমকাল। 'তোমার অনেক কথা আমি জানি না, আমার কথাও তুমি জান না। অথচ এত বছর পরে আমাদের দেখা মণিময়। এখন কি কোন কথা বলার নেই?'

মণিময় একটু অবাক হয়ে তাকাল অতসীর দিকে। 'কি জানতে চাইছ বল?'

'তুমি কেমন আছ, কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছ?' অতসী থামল। 'আমিও বা কেমন আছি, কেমনভাবে দিন চলছে—এটাও তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?'

অতসীর কণ্ঠস্বরে কি যেন এক বিষণ্ণতা মেশানো আছে—মনে হল মণিময়ের। মণিময় অতসীকে সম্পূর্ণ করে দেখল। বসার ভঙ্গিতে অতসীর শরীর ভাঙা। মাথা নীচু করে বসে। মণিময় অতসীর সারা শরীরে যেন বয়সের ক্লান্তির সঙ্গে শীতল বিষণ্ণতা মেশানো অনুভব করল। মণিময়ের হঠাৎ কিসের ভয় হল। সারাবাড়ি নিস্তব্ধ। হৃদয়ের মধ্যে যেন শব্দের অতিরিক্ত কয়েকটা শব্দ হল। অতসীকে মনে হল বড় আপন, বড় অন্তরঙ্গ।

'আমি তো বেশ ভালই আছি। দেখে বুঝতে পারছ না?' মণিময় শুকনো পাতার মত হালকা হওয়ার চেষ্টা করল মনের গভীরে।

অতসী আবছা অন্ধকারে মণিময়ের মুখের দিকে তাকাল। মণিময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানছে। অতসী গলায় ছোট শব্দ করে হাসল। 'আমার মনে হয় তুমি একটুও ভাল নেই।'

'কেন ?' মণিময় হাসবার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত বনশ্রীর মুখ, স্বভাব ছবির মত স্থির করে ভাবতে চাইছিল। অতসীর দিকে চোখ রেখে বলল, 'তোমার মতন বিয়ে করিনি বলে ?'

'না তা নয়, কাউকে ভালবাসতে চাইছ বলে !'

'কাকে, তোমাকে ?' মণিময় নড়ে বসল। বেশী হেসে অতসীর দিকে কৌতুককর দৃষ্টিতে তাকাল। 'আপত্তি এখনো নেই।' মণিময়ের মনে পড়ল, ঠিক এইভাবে ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দেবার সময় মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের কথা বলে ঠাট্টা করত।

অতসীর গলা ঠাণ্ডা, ঈষৎ গম্ভীর। 'এড়িয়ে যেতে চাইছ ?'

অতসীর বলার ভঙ্গিতে মণিময় অবাক হল। অজানা ভয় যেন চারপাশের শীতল অন্ধকার জড়িয়ে মণিময়কে ঘিরে ধরছে। মণিময় সারা মুখে লঘুতা বজায় রেখে বলল, 'আচ্ছা, কি বলতে চাইছ বল তো ? খুব চালাক তুমি। এইবার গোপন কথাটি বলে দি আর কি ?'

'বনশ্রী কে মণিময় !' অতসী চকিতে মণিময়ের দিকে তাকাল। ওর চোখে কিছু ধরতে চাইছে।

মণিময় ভিতরে চমকে উঠল। ভয়-মেশানো অন্ধকার যেন শীতলতর হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের গভীরে কেউ যেন মরা মাছের চোখের মত তাকিয়ে আছে একভাবে। 'কেউ না।' ফিসফিস করে বলল। মণিময়ের দৃষ্টি মাটির দিকে, অন্যমনস্ক। নিশ্বাস মন্থর। একটা চাপা বিরক্তি মণিময়কে বিব্রত করছে।

অতসী সময়ের কিছু বেশী সময় চুপ করে রইল। 'আমি জানি মণিময়, সে তোমার সমস্ত কিছু। আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কি করে !' যেন অনেক দূর থেকে মণিময় উত্তর শুনতে চাইল।

'তুমি কোনদিন এত হুল্লোড়ে ছিলে না, এত কথা, হালকা ঠাট্টা করতে না—আমরা যখন একসঙ্গে আড্ডা দিতাম, তাই না ? তোমাকে দেখেও তাই মনে হয়। অথচ আজ সকাল থেকে দেখছি, তুমি ভীষণ কথা বলছ, যা বলার নয় তাই বলে ফেলছ। তখনি সন্দেহ করেছি।'

'আর কিছু ?' মণিময় সহজ হবার চেষ্টা করল।

'আজ বিকেলে ঘর গুছোতে গিয়ে বনশ্রীর ফটো দেখেছি। ফটোর পিছনে ওর নাম সই করা। কয়েকটা চিঠিও চোখে পড়েছে। তবে ভয় নেই, একটিও পড়িনি। শুধু ওপরে ঠিকানায় হাতের লেখা দেখে বুঝেছি।'

মণিময় এখন পাথরের মত স্থির। কি বলবে বুঝতে পারছে না। অতসী কি বুঝতে পেরেছে, বনশ্রী এখন অন্য প্রেমিকের কাছে! ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অতসীর চোখের মণির একেবারে ভিতরে তাকাল মণিময়। নিশ্বাস চেপে বলল, 'সে এখন আমার কাছে নেই অতসী, আর কোনদিন সে আসবে না।' মাদুরের ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে মণিময় বলল। একটা কালো দাগের চারপাশে বৃত্তাকার রেখায় আঙুল রেখে খেলতে লাগল।

'বুঝতে পারি মণিময়।' অতসীর চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। মণিময় সে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়নি। অতসী এ সময়ে বলল, 'আমি এ কথা বলে তোমায় কষ্ট দিলাম মণিময় ?'

'না।' মণিময় কথাটা বলতে বলতে ঘাড় নাড়ল। 'জেনে ভালই করেছ। অন্তরঙ্গ কাউকে বলার মত একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম। তা না হলে—' মণিময় আর কিছু বলতে পারল না।

অতসী মণিময়ের অবনত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরে হাওয়ার বেগ কমে এসেছে। আকাশের কালো মেঘ আরও ঘন। চারপাশ যেন থমথমে হয়ে আসছে। জ্যোৎস্নার অতি সূক্ষ্ম আস্তরণে কালি মাখানো। শীতল হাওয়ার ঢেউ ওদের দুজনকে ঢেকে দিল।

মণিময় অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ সচেতন হয়ে অতসীর দিকে তাকাল। অতসীর ডান হাঁটু মোড়া। বাঁদিকের হাঁটু মুড়ে মাদুরের ওপর ফেলে রেখেছে। ডানদিকের হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মাদুরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। পিঠের ওপর বিকেলের সাধারণ জড়ানো ভিজে খোঁপা আধখোলা। বুক থেকে কাপড় সরে গেছে। মণিময় বত্রিশ বছরের বিবাহিত অতসীর গ্রীবা, পিঠ, বুক, হাতের ডৌল, ভারী নিতম্ব এক পলক দেখল। বয়স তিরিশের ওপর গেলে, বা বিয়ে হয়ে গেলে বুঝিবা মেয়েদের আলাদা সৌন্দর্যে ভয়ঙ্কর এক আকর্ষণ-শক্তি আসে।

'কি ভাবছ ?' মণিময়ের কণ্ঠস্বর লঘু।

অতসী ভিতরে চমকে উঠল। মণিময়ের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কিছু না।' কথাটা চাপা কণ্ঠস্বরে ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

মণিময় হাসবার চেষ্টা করল। 'ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও অতসী। জীবনে সুখী হওয়া ব্যাপারটাই একটু জটিল। এই যে তুমি ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়ে এত সুখী, অন্যে সব সময়ে যে তা-ই পাবে, কেউ কি গ্যারান্টি দিতে পারে?' মণিময় অতসীর দিকে তাকিয়ে রইল।

অতসী 'এত সুখী' কথাটা শুনেই মণিময়ের দিকে তাকিয়েছিল। মণিময় কথা বন্ধ করতেই বলল, 'আমি এত সুখী তোমায় কে বলল!'

'না হওয়ার তো কোন কারণ দেখি না!'

'ওহ, তোমার ধারণা! তাই বল।' অতসী চুপ করল। একটু পরে হঠাৎ ঈষৎ হালকা কণ্ঠেই বলল, 'তুমি আগে হাত দেখতে না, মণিময়?'

'কবে! আমাকে আবার ঠাট্টা করতে চাইছ?'

'বাঃ, আমরা যখন আড্ডা দিতাম তুমি সকলের হাত দেখতে না?'

মণিময় জোরে হেসে উঠল। 'আরে সে তো তোমাদের মত মেয়েদের সুন্দর সুন্দর হাতগুলো ধরার জন্যে! বল তুমি, এই সুযোগে একটা মেয়েকে কত কাছে আনা যায়!'

'বাজে বোকো না মণিময়।' যেন ধমক দিল অতসী। 'তুমি বলেছিলে না, মানুষের ভাগ্য জানার ব্যাপারটা ভীষণ ইন্টারেষ্টিং! একবার হাসপাতালে কি এক অসুখে এক মাসের ওপর ছিলে। তখনি এসব বিষয়ে পড়াশুনা করেছ, বলনি? আর আমি তো দেখছি, তুমি অনেককে অনেক কথা ঠিক বলে দিতে!' একটু থেমে বলল, 'প্রতিমাকে বলেছিলে, তিন মাসের মধ্যে ওর মায়ের মৃত্যু হবে। আমায় বলেছিল, তোমার বিয়ে হবে বাইরে হঠাৎ, আর তা-ও তিন মাসের মধ্যে। দুটোই কিন্তু একেবারে ঠিক ঠিক ফলেছিল। কি, মনে পড়ছে?'

মণিময় হেসে উঠল। 'এমনি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। আন্দাজে ঢিল মারা। ইস্, তোমরা কি বোকা দেখ! এত বিশ্বাস করে বসে আছ!'

'বাজে বোকো না।' অতসী মণিময়ের চোখে চোখ রাখল। 'বিয়ের পর আমার কি হবে, তা বলনি তখন।'

মণিময় বুঝল, অতসী ওর ভাগ্য সম্পর্কে সত্যি কিছু শুনতে চাইছে। একটু গম্ভীর গলায় কৌতুক করতে চাইল। 'দেখছ না অতসী, তিন মাসের কথা বলে

ঐ তিন শব্দটা দুজনের বেলাতেই বলতে চেয়েছিলাম। আসলে মানুষের জীবনে ঐ তিন-ই সত্য। আর তা-ও হল জুয়ার তিন তাসের মত। যেমন দুর্বোধ্য রহস্যময়, তেমনি এক অদ্ভুত অ্যাকসিডেন্ট। ঐ তিনকে না ধরা পর্যন্ত কেউ কিছু বলতে পারে না।' মণিময় এই মুহূর্তে বনশ্রীর নামের তিন অক্ষর ভাবছিল। আর আশ্চর্যভাবে অতসীর নামের তিন অক্ষর বার বার স্পষ্ট হতে লাগল। মণিময় অতসীকে দেখল।

'ভাল কথা বলতে পার, এ তো আমি তোমাকে আগেই বলতাম। এখন বাজে কথা ছাড়। আমার হাতটা একটু দেখ।' বলেই অতসী আলোর মধ্যে হাত মেলে ধরল। 'আমার জীবনে সুখ আছে কি না!'

মণিময় অবাক হল। অতসীর কণ্ঠস্বর একটু কঠিন শোনাল। 'সুখ' শব্দটা যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে জড়িয়ে গেল। 'তুমি সত্যি কিছু শুনতে চাইছ?'

'সত্যি।' মাথা হেঁট করে নিজের করতলের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিল অতসী।

মণিময় ওর সামনে ঝুঁকে-পড়া অতসীকে দেখল। গলার সরু হারের সঙ্গে লকেটটা বুকের খাঁজে আটকে আছে। সামনের কাপড় শিথিল হয়ে একপাশে সরে গেল। অতসীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভারী বুক উঠছে নামছে। মণিময় সামনে আলোয় মেলে-ধরা হাতের দিকে তাকাল। নরম, কোমল হাত। আলোর আস্তরণে করতলের ত্বক বিশুদ্ধ মাখনের মত মত মসৃণ। মণিময় ওর হাতের মুঠি ডান হাতে নিল। 'সত্যি, কিছু মনে নেই আমার।'

'যা মনে আছে।'

অতসীর হাত ঠাণ্ডা, করতল অনেক উষ্ণ, কররেখা অনেক স্পষ্ট। অতসীর হাতের ভারে মণিময়ের মনে হল, অতসীর হাত মণিময়ের হাতের মধ্যে নির্ভরতা চাইছে। হাতের মুঠি তুলে ধরল আরও সামনে। ঠাট্টা করেই বলল, 'ভীষণ সুখী তুমি অতসী। স্বামী, ছেলে-মেয়ে নিয়ে অফুরন্ত সুখ তোমার। এ সুখের শেষ নেই। আর সোমনাথবাবুও কদিনের মধ্যে তোমার কাছে আসবেন। হাতের রেখায় তা স্পষ্ট।'

চাপা গলায় অনেকটা পাগলের মত খিলখিল করে হেসে উঠল অতসী। এক ঝটকায় মণিময়ের হাতের মধ্যে থেকে হাত সরিয়ে নিল। 'সত্যি, তুমি সব ভুলে গেছ মণিময়! আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ?'

'মিথ্যে!' মণিময় সত্যি অবাক হল। একটু বা ভয় পেল।

অতসী চুপ করে গেল। হাতটা কোলের ওপর মৃত কোন জীবের মত ফেলে রেখে বাইরে তাকাল। পেনসিলের সীসের মত রঙ বাইরে। সিমেন্টের উঠোনের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ঠাণ্ডা বাতাস পাক খাচ্ছে।

'সোমনাথ কোনদিন আমার কাছে আসবে না মণিময়। প্রায় বছর তিনেক তো আসে নি। ছেলে নিয়ে বাইরেই আছে।'

'আর তুমি!' অস্ফুটে বলল মণিময়।

'আমি মেয়ে নিয়ে বড় একা।' থামল অতসী। 'একজন মেয়ের পক্ষে একা থাকার যে সুখ, সত্যি তাতে আমি সুখী মণিময়।'

কিন্তু কেন? মণিময় বলতে চেয়েছিল। অতসীর মুখের রেখায় চোখ বুলিয়ে তা আর বলতে পারল না।

অতসী ফিস-ফিস করে বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, আমি বলতে পারব না।' অতসী দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে নিঝুম হয়ে গেল।

মণিময় কিছু সময় অতসীর চোয়ালের এক পাশের রেখা, চিবুক দেখল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না, অতসীও না। বাতাস বইছে না।

বেশ কিছু সময় পরে মণিময় স্বগতোক্তির মত বলল, 'বৃষ্টি বোধ হয় হবে না আর। ইস, গরম একটুও ভাল লাগছে না।'

'আমার ওখানে চলে এস মণিময়। এসময়ে বৃষ্টি প্রায়ই আসে। ভাল লাগবে তোমার।' অতসী অন্য একটি মেয়ের মত কথা বলল।

'সকালে বলছিলে, তোমার কোয়ার্টারের সামনে তৃণভূমি আছে!'

'এসো না, সত্যি কিনা দেখবে! বৃষ্টি নামলে সে জায়গাটার শব্দ, গন্ধ, রঙ কত ভাল লাগে! তুমি গেলে অনেক রাত পর্যন্ত ওখানে বসে গল্প করব।' থামল অতসী। 'আমি তো গভীর রাত পর্যন্ত ঘাসের ওপর একা শুয়ে থাকি। জানো, চারপাশে অনেক দূরে দূরে পাহাড় আছে?'

মণিময়ের ভাল লাগছে অতসীকে। 'সত্যি যেতে বলছ? একবার গিয়ে যদি ভাল লেগে যায়, আর ফিরে না-ও আসতে পারি!'

'আপত্তি কি? পুরনো বন্ধুত্ব নতুন করে সাজিয়ে নেব।'

মণিময় অতসীর কথা শুনল কি শুনল না, বুকের মধ্যে হৃদয়ের শব্দের বেশী কিছু শব্দ ধরে সময়ের কিছু বেশী সময় বনশ্রীকে ভেবে নিল। 'আমার কলকাতা ভাল লাগে না, সবুজ ঘাসের ওপর হাঁটতে বড় লোভ।'

অতসী মণিময়ের দিকে তাকালে। গলায় যেন ফিসফিস শব্দ হল। 'সত্যি এসো তাহলে।'

মণিময় অতসীর কণ্ঠস্বরে শিহরিত হল। সারা শরীরে চকিতে যেন ঠাণ্ডা স্রোত বইল। স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

আচমকা মেঘ-গর্জন কানে আসতেই সম্বিৎ ফিরে এল দুজনের।

অতসী বলল, 'বৃষ্টি নামবেই। চল খেয়ে নি। বড় ঘুম পাচ্ছে।'

'চল।' মণিময় উঠে দাঁড়াল। 'আমারও যেন ঘুম পাচ্ছে।'

দুজনে অল্প কয়েকটি কথাবার্তার মধ্যে খাওয়া শেষ করে যখন শুতে এল তখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। এলোমেলো বাতাসে বৃষ্টির ফোঁটা বিক্ষিপ্ত। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ-গর্জন চারপাশ কাঁপিয়ে তুলছে।

কখন শুয়েছে অতসী, দু'চোখের পাতা একবারও এক করতে পারেনি। বৃষ্টির ঝাপটার জন্যে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে তুমুল বাতাস। অন্ধকার ঘরে জোরে পাখা ঘুরলেও একধরনের অস্বস্তিকর গরম অনুভব করল অতসী। বিছানার ওপর উঠে বসে অতসী গায়ের জামা, ব্রা খুলে ফেলল। চুলের গোছাকে খোঁপা করে বাঁধল। দু' চোখ জ্বালা করছে। অতসী জল খেতে চাইল। মণিময় শোবার আগে ঘরের কোণে কুঁজোর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অতসী অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে না, তাই উঠল না। অথচ আলো জ্বাললে জল খাওয়ার অসুবিধে ছিল না। তবু অতসী সংকোচ বোধ করল। এখন রাত কত কে জানে। মণিময় যদি বুঝতে পারে, অতসী এখনো ঘুমোয়নি। অতসী কিছু সময় বসে থেকে শুয়ে পড়ল। মণিময়ের বিছানা। মণিময়ের মাথার নীচে অতসী অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। হঠাৎ মনে হল, মণিময় কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি তার মতো এখনো নিদ্রাহীন? অতসীর কয়েকটা হাই উঠল। কোয়ার্টারে থাকার সময় বিছানায় মেয়েকে পাশে নিয়েও কেমন এক-এক সময় ওর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হত। এই মুহূর্তে অতসী সেরকম এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশ মনে হচ্ছে মণিময় ওর শরীরের সঙ্গে চাদরের মধ্যে জড়িয়ে গেছে! না, মণিময় না, আমি ঘুমোই। অতসী বালিশে মুখ গুঁজে নিশ্বাস রুদ্ধ করে কখন ছেড়েছে, খেয়াল নেই।

কে ওপাশের শিকল নাড়ল? মণিময়? না, মণিময় আজ না, এখন না। কোনদিন না। আমকে ডাকছ মণিময়? অতসী উঠে বসল। বিছানা ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়াল। কাঁধ পিঠ থেকে সমস্ত কাপড় সরে গেছে। বুকের ওপর আঁচল

ধরে অতসী দু' চোখে অজস্র ঘুম নিয়েই কপাটের দিকে গেল। দেখল, দরজায় সেই যে খিল দিয়ে শুয়েছে, তা একভাবে আঁটা। অতসী দরজায় কান রাখল। ওপাশ থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা, ভীত অতসীর তা শোনার বড় লোভ হল। বাইরের দামাল বাতাসের হিস হিস শব্দ কানে আসছে। কেউ যেন দরজার শিকলটা ওপাশে বার বার ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোলাচ্ছে। অতসী খোলা বুক দরজায় চেপে ধরল। রঙ করা দরজার শীতলতা অতসীকে বড় আরাম দিচ্ছে। আহ, মণিময়! এখনি দরজা খুলতে বলো না। না, কিছুতেই না মণিময়। তুমি বৃষ্টির শব্দ শুনছ? আমার ওখানে চল, ফাঁকা মাঠের কাঁচা ঘাসে সেই বিজবিজ শব্দ শুনবে। ঘাসের মধ্যে ধুলোর গুঁড়োর মত হাল্কা পোকার লাফালাফি দেখবে। এসব তুমি তো ভালবাস। তাই না? আর কাউকে সেখানে তুমি দেখতে পাবে না, কোনদিন না। একটুও ভয় নেই তোমার। দরজার ওপর বুক চেপে অতসী বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে।

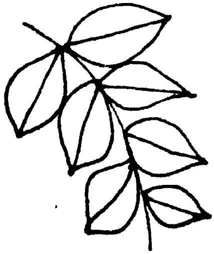
মণিময় ধড়ফড় করে উঠে বসল। কত রাত হয়েছে কে জানে। কখন ঘুমিয়েছে? কিছুতেই ঘুম তাড়াতাড়ি না আসায় আজ সবচেয়ে বেশী ঘুমের বড়ি খেয়েছে মণিময়। খাওয়ার সময় আলো জ্বালে নি, পাছে অতসী বুঝতে পারে। আবার কেন ঘুম ভাঙল? কেউ কি ডেকেছে? মণিময় উৎকর্ণ হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ যেন দরজায় মাথা ঠুকছে। কেউ যেন কাঁদছে। দরজার ফাঁকে কান্নার শব্দ! কে? অতসী? তুমি আমায় ডাকছ? না অতসী, আমি যাব না। তুমি ভয় পেয়েছ? আমি তো সবই ঠাট্টা করে বলেছি। মণিময়ের বুক দুরদুর করে উঠল। এখনি ঘুমনো দরকার। বালিশের নীচে ঘুমের বড়ি নেই। থাকবে কি করে? এটা অতসীর বিছানা! মনে পড়তেই মণিময় লাফিয়ে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। এপাশ-ওপাশ ইঁদুরের দ্রুত সরে যাওয়ার শব্দ কানে এল। মণিময়ের অপরিচিত ঘর। এঘরে বনশ্রী একবারও আসে নি। মণিময় অবাক হল, বিছানাটা যেন অতি-পরিচিতের মত আকর্ষণ করছে! অতসী কি কোন গন্ধ তেল মেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল? নরম বালিশে এত গন্ধ কিসের?

উহ্! মণিময় ভীষণ এক অস্বস্তি অনুভব করল সারা শরীরে। তন্দ্রার মধ্যেই কখন যেন গেঞ্জী খুলে ফেলেছে মণিময়। পুরনো টেবিল ফ্যান আবার বন্ধ হয়ে গেল কখন! অতসীর শীতল হাতের স্পর্শ মনে পড়ল। না, অতসী, ওভাবে ডেকো না। মণিময়ের এখনি আর একটা বড়ি দরকার। অথচ আলো জ্বালার

সাহস নেই। কাল সকালে এ নিয়ে অতসী ঠাট্টা করতে পারে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই মণিময় যেন জানালার স্পর্শ পেল। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হওয়ার শব্দ কানে এল। মণিময় জানালার একটা কপাট খুলে দিল। ঘরে এতটুকু আলো এলো না। ঘরের মধ্যেকার কঠিন পাথরের মত জমাট অন্ধকার শুধু ঠাণ্ডায় নরম হয়ে গেল।

মণিময় ঘুমের বড়ির জন্যে ওপাশে একটু এগোতেই দরজায় হাত লাগল। আরও ঘন হয়ে এলো দরজার কাছে। অতসী কি ঘুমিয়ে পড়েছে? অতসী, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? মণিময় বিড়বিড় করল। বাইরের বৃষ্টির শব্দ, ঠাণ্ডা হাওয়া মণিময়কে যেন এক পাহাড়-ঘেরা তৃণভূমির মধ্যে নিয়ে চলেছে। সবুজ ঘাসে-ঢাকা তৃণভূমি শান্ত, মসৃণ। অবিরাম বিজবিজ শব্দ উঠছে তার মধ্যে থেকে। ছোট ছোট জলের স্রোত ঘাসের গোড়া বেয়ে-বেয়ে চলেছে নিঃশব্দে। মণিময় যেন সেই শব্দও কানে পেল। আঃ কি আরাম! মণিময় এবার ঘুমোতে পারবে। আচমকা শিকলে হাত লাগল। মণিময় শক্ত মুঠিতে শিকল চেপে ধরল। ও শোবার সময় শিকল তুলে বন্ধ করেনি। একভাবে ঝুলে রয়েছে। থর থর করে কাঁপছে মণিময়। বুকের প্রতিটি শব্দে নতুন ভয় আর উত্তেজনা।

একসময়ে হঠাৎ শিকল থেকে সজোরে হাত সরাল। শিকলটা দ্রুত কয়েকবার এপাশ-ওপাশ দুলতে-দুলতে মন্থরগতি হল। খোলা জানালা দিয়ে প্রবল বাতাস ঈষৎ ভারী লোহার শিকলকে ক্রমাগত স্থিরভাবে দুলিয়ে চলেছে। মণিময় কাছে থেকে শিকলের নিয়মিত শব্দ শুনল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একভাবে টিক টিক শব্দ উঠছে কপাটের স্পর্শ লেগে। মণিময় বুকের মধ্যে হৃদয়ে শব্দের বেশী কয়েকটা শব্দ নিয়ে, অনেকটা সময় ধরে ওঘরের বড় ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দের মত শিকলের শব্দে সময়কে ধরতে চাইল। কপাটের ওপর মণিময়ের মাথা, উন্মুক্ত শরীরের ত্বক দরজার রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। মণিময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।





জলবিন্দু

সকালের বাজার নিয়ে অনাদি ঘরে পা দিতেই করুণা মুখিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার বল তো ? বাইরে বেরুলে তোমার হুঁশ থাকে না বাজারটা তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ?'

'চেঁচিও না, আস্তে কথা বল। পাশের ঘরে ললিত আছে। আস্তে কথা বলতে শেখ নি নাকি ?' থলে থেকে দুধের বোতলটা মেঝেয় রাখতে রাখতে অনাদি যেন নিজের মনেই গজ গজ করল, 'অকারণ চেঁচানো স্বভাব হয়ে গেছে !' বাজারের থলেটা একপাশে সারিয়ে রাখল।

বাইরে আসন্ন শরতের রোদ। সকাল থেকেই অসহ্য গরমে সদ্য আঁচ-ফেলে -দেওয়া উনুনের মত মনে হচ্ছে রোদটাকে।

করুণা ভাঙ্গা ঝরঝরে, দড়ি-বাঁধা কাঠের রেলিং-ছোঁয়া রোদ দেখল। গলা চড়িয়ে বলল, 'কেন চেঁচাব না ? তোমার ভয়ে ?' মেঝে মোছা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাতে ভিজে নোংরা ন্যাতা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কটা বেজেছে এখন, খেয়াল আছে ? এদিকে অফিসের ভাতটি তো ঠিক সময়েই চাই।'

'না, পারলে দেবে না, অফিসের ক্যানটিন আছে!' অনাদি ঘামে কাঁধ-পিঠ ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বলল।

'থাক, অনেক দেখেছি। মাসের শেষে এসব কথা বোলো না। যার মাসের এক তারিখেই ছেলেমেয়েদের ভাত দেবার পয়সা জোটে না, তার আবার বৌয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে ক্যানটিনে খাওয়া!' দপদপিয়ে পা ফেলে করুণা বারান্দায় এ কোণে এল। ন্যাতাটা সশব্দে ছুঁড়ে রাখল। বালতিতে তুলে রাখা জলে হাত ধুতে ধুতে বলল, 'উনুন জ্বলে যাক আমি আর রাঁধতে পারব না।

আমি তো আর কারোর মাইনে-করা দাসী-বাঁদী নই।' বারান্দার ও কোণে ছোট্ট ঘেরা অংশটা রান্নাঘরের মতন। ওখানে পিঁড়ি টেনে চুপ করে বসে রইল।

ভোরবেলা স্কুল যাবার সময় টুটুলটা ভয়ংকর বেয়াডাপনা করছিল। ক্রমশ ও যেন শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে। করুণা সারাদিনে ওকে সামলাতে পারে না। তার ওপর অনাদির তো কোন শাসনই নেই। বরং আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে। সকাল থেকে করুণার মেজাজ তাই ভাল নেই।

অনাদি ছেঁড়া, রান্নাঘরের কালি-ঝুল-লাগা হাতপাখাটি বেশ কয়েকবার জোরে জোরে নাড়তে লাগল। টুটুলের কথা মনে হল। একটুও বাতাস গায়ে লাগছে না দেখে পাখাটার দিকে একবার তাকাল। এক সময় রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়। বাইরে তাকাল। দেখল, করুণা গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। একটু দূরে উনুন জ্বলছে। গনগনে আঁচ। অনাদি কি ভেবে বাজারের থলেটা করুণার সামনে এসে উপুড় করল। মাসের শেষ। সামান্য কয়েকটা শুকনো আলু-পিয়াজ, কিছু শাকপাতা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। কাগজের ঠোঙাটি পড়তেই ভক্ করে জল-পচা চিংড়ির গন্ধ এল! 'নাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

করুণা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে রইল।

'বড় বিরক্ত করো তুমি।' অনাদি গলা চড়াল। 'তুমি কি মনে করো, আমি বাজারে গিয়ে আড্ডা মারি?'

'তা নয়তো কি?'

'অবুঝের মত কথা বোলো না।' অনাদি যেন শাসন করল। 'জানোই তো, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দিয়ে সেই মোড়ের ডিপো থেকে দুধ নিতে হয়। ওখান থেকে বাজার ঘুরে আসতে দেরী হবে না?'

'মিথ্যে বোলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজটা কি পরে পড়লে হয় না?'

'কাগজ পড়া আড্ডা দেওয়া নয়।'

'নিজের যখন কেনার পয়সা নেই, অন্যের কাগজ পড়ে নেওয়ার হ্যাংলামো কেন? লজ্জাও করে না?'

মাস যত শেষ হতে থাকে, অনাদির মাথা ভিতরে ভিতরে গরম হতে থাকে। করুণাও অকারণ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চীৎকার করে। অনাদি রাগ

প্রকাশ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃসঙ্গ অসহায়তা স্ত্রীর সামনে ওকে শান্ত নির্জীব করে তোলে। এসব সত্ত্বেও করুণা যখন পয়সার কথা তুলে খোঁচা মারে অনাদি নিজের মধ্যে ভীষণ এক অস্থিরতায় ছটফট করতে থাকে।

করুণার কথা শুনে ওর দিকে তাকাল অনাদি। ভিতরে রীতিমত কাঁপছে। করুণা বাজার গোছাতে বসলে অনাদি কি ভেবে ঘরে চলে এলো। জানালার সামনে চুপ করে বসে রইল।

বিয়ের বছর দুয়েক আগে অনাদি এ-বাড়ির নীচের তলায় ভাড়াটে হয়ে আসে। বিয়ের পর ওপরের ঘর দুখানা নেয়। নীচের দুটি ঘর, দালান, উঠোন, বাড়িওলার ব্যবসার কাঠকুটোয় ভর্তি। গরীব মধ্যবিত্ত কেরাণী অনাদি। টুটুল, সিন্তু আসার পর ওপরের দুটি ঘরের ভাড়া গুনতেও পারছে না। তাই মাস দুয়েক আগে অফিসের এক বন্ধুর দূর-সম্পর্কের প্রায় সমবয়সী ভাই ললিতকে ভাড়া দিয়েছে পাশের ঘরটা।

ললিত অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, এমন কি অনাদির ন'টায় অফিস বেরিয়ে যাবার পরেও। এখনও কি ঘুমোচ্ছে, না, করুণার অসভ্য চীৎকারে ঘুম-ভাঙা অবস্থায় শুয়ে আছে? অনাদি পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে বাইরে পেয়ারা গাছটায় দৃষ্টি ফেলল। দূরে খালের ধার দিয়ে ভারী কাঠ বোঝাই লরী যাবার শব্দ কানে এল। ভারী লরী গেলে এ বাড়িটা কাঁপে। অনাদির মাথা ধরেছে যেন।

করুণা ঘরে ঢুকল। সামনে সশব্দে হাতল ভাঙা চায়ের কাপ রেখে বলল, 'আজ কত পয়সার বাজার করেছ?'

'কেন?'

'ও বেলা খাবে কি?'

'কি করব, পয়সা নেই। দেখি অফিসে কারোর কাছে যদি ধার পাই। আজকের মত চালিয়ে নাও।' অনাদির কণ্ঠ শান্ত।

'কি করে চালাবো?' করুণা রেগে উঠল, 'আমার কাছে কি তুমি টাকার হুণ্ডি দিয়ে রেখেছ যে আমি চালাব?'

কথা বললেই কথা বাড়ে। অনাদি চুপ করে রইল।

'একটি পয়সা হাতে তুলে দাও না, তার ওপর কি করে বলো চালিয়ে নাও?' উবু হয়ে বসে করুণা ঘরের কোণে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'কেন পুরনো কথা তুলছ! রাগিয়ে দিও না, ভাল লাগছে না।'

'ভালো তো লাগবেই না—টাকার কথা বলছি যে! বিয়ে যখন করেছিলে

খেয়াল ছিল না? ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, বেশী উপায়ের কথা একবারও ভেবেছ? শুধু ওভার-টাইম খাটলেই হবে?'

'আর কি করতে বল?'

'ন্যাকার মত কথা বোলো না। অফিসের পর আড্ডা দিও, তা হলেই হবে।' করুণা গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ও ঘরে ললিত আছে, বাইরের লোক। এটা কি করুণা বোঝে না? অনাদির সামনে আধ-খাওয়া ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা পড়ে রইল। অনাদি কাঠ হয়ে বসে রইল।

মানিকতলা থেকে অনাদিকে যেতে হয় বেহালা পেরিয়ে আরো কিছুটা দূরে। অনাদি নটার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। করুণার সঙ্গে কথা কাটাকাটির জন্যেই আজ বেরুতে দেরী হয়ে যাবে অনাদির। তাই ভাত খেতে বসে আর কোন কথা বলল না।

'কটায় ফিরছ আজ?' করুণা উনুনে কয়লা দিতে দিতে বলল। করুণার কণ্ঠস্বর ঈষৎ শান্ত মনে হল।

মুখ-নীচু অনাদি নিরুত্তর।

'কি গো শুনতে পাচ্ছ না?'

'কটায় আবার? যেমন ফিরি।'

'আজও কি ওভারটাইম?'

'জানি না, গিয়ে জানতে পারব।'

'ওভারটাইম না থাকলেও তো এসে মিথ্যে কথা বলবে?'

অনাদি এবার যেন সত্যিই রেগে গেল। 'আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?'

'বলার আর কি আছে? আমি কি বুঝতে পারি না মনে কর? পাছে সন্ধেয় এসে ছেলেমেয়েদের দেখতে হয়, আমি যদি আবার সঙ্গে নিয়ে বেরুবার কথা বলি, তাই ওভারটাইম বানিয়ে নাও!'

অনাদি খাওয়া বন্ধ করে করুণাকে দেখতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে সেই অসহায়তাবোধ অনাদির মধ্যে একটুও কাজ করছে না। চোয়াল শক্ত হল অনাদির। 'মুখ সামলে কথা বলো করুণা! আমিও একটা মানুষ।' গলার স্বর চাপা, কঠিন শাসন মাখানো।

'কেন? মারবে নাকি?' করুণা গলা চড়াল।

অনাদির আবার মনে পড়ল, পাশের ঘরে ললিত আছে। 'শেষ পর্যন্ত তাও

হতে পারে।' শব্দগুলো অনাদির রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে যেন কেঁপে কেঁপে জড়িয়ে গেল। হাতের মুঠোয় মাখা ভাতের পিণ্ড। ভাতের পিণ্ড-মুঠো হাত কাঁপছে বুঝি।

অনাদি ওকে মারতে পারে, এই প্রথম করুণা অনাদির নিজের মুখ থেকে শুনল। গুম হয়ে কিছু সময় হেঁট-মাথা অনাদির দিকে তাকিয়ে থাকল। হঠাৎ ধরা গলায় বলল, 'আমাকে মারার আগে তোমার ছেলেমেয়েদের সামলাও। আমি পারব না। সারাদিন বাইরে থাকবে তুমি, আর বস্তী-বাড়ির মত ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে?'

'কেন তুমি তো আছ?'

'বলেছি তো আমি পারব না। খেতে পরতে দিতে যে পারে না, তার আবার বড় বড় কথা!' করুণা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'আমার মা-বাবা বেঁচে নেই, না হলে তাদের এনে দেখাতুম, কোথায় আমার বিয়ে দিয়েছে, আমি কি রকম আছি!' চাপা কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে করুণা অনাদির সামনে থেকে উঠে গেল।

অনাদি নিশ্চল, পাথর। ঠিক এই মুহূর্তে রাগ, ভয়, লজ্জা, অসহায়তা—যেন কোনটাই ওর মধ্যে নেই। কয়েক মুহূর্ত সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, নিথর। নিজের ওপর একজাতীয় ঘৃণায় আধখাওয়া ভাতের থালাটা হাতে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়!

এ ঘরে ললিত চমকে উঠল। অনেক আগে ঘুম ভেঙে গেছে ওর। ঘুমনোর ভান করে পড়েছিল বিছানায়। শরীরে অনেক দিনের দুরারোগ্য ক্ষতের যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তির মত অনাদি-করুণার ঝগড়া প্রায় প্রতিদিন লেগেই থাকে। কিন্তু আজ যেন রোগটা বেশী বেড়ে গেছে। ললিত চকিতে মাথা তুলে ওর দরজার সামনে তাকাল। ভাতের থালাটা গড়াতে গড়াতে ওর দরজার সামনে থেমেছে। ললিত তবু উঠল না। যদি ওরা বুঝতে পারে, ও জেগেছিল! একটু পরে অনাদি নিঃশব্দে অফিস বেরিয়ে গেল। ললিত আরও কিছু সময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে বাইরে এল।

যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে ললিত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে মুখ-হাত ধুলো। ওপরে এসে মুখ-হাত মুছলো। রাতের পরা বাসি পাজামার সঙ্গেই বুশসার্ট, চাপাল। সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে একবার করুণার দিকে তাকাল। একভাবে উনুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে করুণা।

ললিতের এখন বাইরে বেরিয়ে রেস্টুরেন্টে চা-টোস্ট খাওয়ার সময়। একটা

সিগারেট টানতে টানতে খবরের কাগজটাও পড়ে নেবে। তারপর বাড়ি ফিরে একটু পড়াশুনা করার কথা। আজ এ সপ্তাহে ওর ছুটির দিন। গত দু' সপ্তাহ ধরে দুপুরে ডিউটি পড়েছে। রাত্রে কলেজ করে অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে হয়। ললিত বোঝে, তিরিশের ওপর বয়সে নতুন করে পড়াশুনা করতে গেলে এভাবেই চলতে হবে।

ললিত করুণার কোমরের কাছে পিঠের দিকে ব্লাউজের অনাবৃত অংশটায় কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিল। এক পাশের ঈষৎ অবনত বুকে চকিতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। তার পরেই চিবুক, খোঁপা, গ্রীবা, মসৃণ হাত আর নরম পায়ের পাতা লক্ষ্য করল। এই ভঙ্গিতে দেখা ললিতের যেন প্রতিদিনের গোপন অভ্যেস। ললিত খুশী হল।

সিঁড়ির আর একটা ধাপে পা দিতেই জুতোর শব্দ হল। করুণা পিছন ফিরল। 'চা খেতে যাচ্ছ ঠাকুরপো? আমি তো চায়ের জল চাপিয়েছি!'

খুব সহজ শান্ত কণ্ঠে কথা বললে করুণার মধ্যে কোন মোহিনী শক্তি আছে বলে মনে হয় ললিতের। একটু আগের ওর চীৎকারের স্মৃতি মুহূর্তে ভুলে যায় ললিত। 'আবার কেন?'

'কাল যে চায়ের পাতা এনেছিলে, তার কিছুটা আছে। নষ্ট হবে?'

ললিত হাসল। 'তুমি চা-টা কর, আমি বরং কয়েকটা সিগারেট কিনে আনি।' ললিত একে একে সিঁড়ির ধাপে পা ফেলতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।' করুণা গলা একটু তুলল, 'চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

করুণার দেওয়া চা খেয়ে ললিত তক্তপোষের ওপর বসল। সামনে পড়ার বই খুলে রাখল। এই নিয়ে এ মাসে কতবার করুণার হাতে চা খাওয়া হল? ললিত ভাবনার খেলায় মাতল। চা ললিত বাইরেই খায়, দু-বেলার ভাতও। মাঝে মাঝে করুণার চা খেতে দেরী হলে অনাদির বেরিয়ে যাবার পর ললিতকে চা করে খাওয়ায়, নিজেও খায়। ললিত চায় না। খাওয়ালে বাইরে থেকে ললিত চা পাতা, বিস্কুট এনে দেয়। অনাদি এসব জানে।

ললিত নিভে-যাওয়া সিগারেটটায় পর পর কয়েকটা টান দিয়ে আবার উজ্জ্বল করল। বাইরে দরজার আড়াল থেকে একবার করুণাকে দেখল। এক মনে কাজ করে যাচ্ছে; করুণা ভীষণ গম্ভীর। ললিত হাসল। প্রথম যেদিন এসেছিল ললিত, করুণাকে মোহিনী মনে হয়েছিল।

'এই তোমার বৌদি, ললিত, এর কাছ থেকে সব বুঝে নাও।' অনাদি কথাগুলো বলে ওদের সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

ললিত কয়েক মুহূর্ত করুণাকে দেখেছিল। দুটি সন্তানের মা, দশ বছরের বিবাহিত কোন বাঙ্গালী মেয়ে এমন বর্ষায় ধোয়া প্রথম কদমফুলের মত সতেজ থাকতে পারে, ওর কল্পনাতেই ছিল না। পোড়া ইটের মত রং করুণার। নিটোল স্বাস্থ্য। আটপৌরে খাটো ময়লা একটা শাড়ীর আড়ালে ললিত যেন প্রথম দিনেই করুণার সমস্ত শরীরের ভিতরটা বুঝতে পেরেছিল। এমন নরম চিবুক, টান টান গ্রীবা, চওড়া পিঠ, নিটোল ভারী বুক আর নিতম্ব দেখে তেত্রিশ বছরের ললিত হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট, হতবাক হয়ে গিয়েছিল। দুচোখ টানা করুণার। ভুরুর চুল আর একটু বড় হলেই যেন নিষ্পাপ দুচোখের তারায় ছায়া পড়ত! দাঁত ঝকঝকে, আর হাসলে দুপাশের চিবুকে টোল পড়ে। ললিত, সত্যি কথা বলতে কি, এত সব নিখুঁত করে সেদিন দেখতে পারে নি, কিন্তু অনুভব করেছিল। করুণার সবচেয়ে যেটা অবাক করেছিল ললিতকে, তা ওর মুখ-চোখের নিষ্পাপ সারল্য।

ভাবতে ভাবতে ললিত কেমন শিহরিত হল। করুণার দিকে অবাক হয়ে সেদিন তাকিয়ে থাকাতে করুণা বলেছিল, 'কি দেখছ ঠাকুরপো, ভয় পাচ্ছ আমাকে?'

ললিত অপ্রস্তুত হয়েছিল। 'না, না। ভাবছি আমাকে আপনি না কোনদিন ভয় পান।'

'আপনি নয়, তুমি বলবে ভাই। তুমি পর হয়ে এলে এমন পাশের ঘরটা ছেড়ে দিতুম নাকি?' করুণা হাসল। 'আর পর হলেই তো ভয় পাবো ঠাকুরপো। তুমি কি তাই চাও?'

ললিত খুশী হয়েছিল। করুণার শান্ত মিষ্টি ঠাণ্ডা গলা ললিতকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল! ললিত বলেছিল, 'আমি ব্যাচিলার বৌদি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। দাদা বলছিল, ঘরটা তো নোংরা, দেয়াল ফেটে ভেঙে পড়ছে, তুমি সারিয়ে নিও নিজের পয়সায়। তা না হয় নিচ্ছি। কিন্তু আমার যে একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

'কি?' করুণা উৎসুক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ললিতের দিকে।

'আমার প্রতিদিনের খাওয়াটা যেন তোমার এখানেই হয়।'

করুণা স্পষ্ট করে নিয়েছিল কথাটা। 'মানে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চাইছ?'

'ওই হলো আর কি।' ললিত ঈষৎ লজ্জা পেয়েছিল।

'কিন্তু ভাই, ওর মধ্যে এসো না। আমরা খুব সাধারণ খাই। কোনদিন জোটে কোনদিন জোটে না। তুমি মাঝখানে জড়িয়ে কষ্ট পাবে কেন? তা

ছাড়া তোমার দাদার ভীষণ হাত টান আছে। মাসে মাসে বাঁধা টাকাটা দিলেও আরও চাইবে। তুমি সামলাতে পারবে না।'

'তাতে কি হয়েছে? দরকার হলে সকলেই নেয়।'

করুণা কিছুতেই রাজি হয়নি। পরে অনাদি করুণাকে বুঝিয়েছে, তাতেও কথা শোনে নি। বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবার পর করুণাকে ললিত নানাভাবে অনুরোধ জানিয়েছে, করুণা মেনে নেয় নি। অথচ এটা মেনে নিলে অনাদির সংসারের যথেষ্ট সাশ্রয় হয়। ললিত ঘুরিয়ে আরও অনেক সাহায্য করতে পারে করুণা কি তা বোঝে না? ললিত এই একটা জায়গায় করুণাকে বুঝতে পারে না!

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সামনের পেয়ারাগাছে শব্দ করে শালিখ ডাকছে। গরম হাওয়া গাছের পাতায় জড়িয়ে নিস্তব্ধতা আরও বাড়িয়ে দিল। অথচ এ-সময়ে ললিত করুণাকে চুপচাপ থাকতে দেয় না। টুটুল-সিতুর স্কুল থেকে ফিরতে এখানো দেরী। এই সময়টা করুণাকে নানাভাবে বিরক্ত করে হাসিয়ে, গল্প করে জমিয়ে রাখে ললিত।

বৌদি কি আজ সত্যি কথা বলবে না? ললিত বারান্দায় এসে একবার অনাদির ঘরে দৃষ্টি ফেলল। গম্ভীর মুখ, অন্যমনস্ক। মেঝেয় বসে আছে। ললিত কি ভেবে আবার নিজের ঘরে চলে এল। তক্তপোষে বসে নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল।

'কি হল বৌদি? এখনো আকাশ থমথমে কেন?' একদিন দুপুরে করুণাকে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে ঘরের মেঝেয় বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল ললিত।

করুণা চকিতে কোলের ওপর থেকে ছেঁড়া ব্রা-টা পিছনে লুকিয়ে ফেলল। মৃদু হাসল। 'শরীরটা খুব খারাপ ঠাকুরপো। সকাল থেকেই গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

'তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমাদের দাদা-বৌদি সমাচার যুক্ত!'

করুণা কোন উত্তর না দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিল। খুব ভোরে ওঠে বলে টুটুল-সিতু তখন দুপুরের ঘুমে নিঃসাড়। অনাদি অফিসে।

'সত্যি তোমার জ্বর হয়েছে? দেখি!' ললিত এগিয়ে এল। করুণার কপালে নরম করে হাত রাখল। একপাশের গালে হাত বোলালো। যেন আরামে বা শান্তিতে করুণার দু'টি চোখ বোজানো। 'ও কিছু না।' ললিত সেই মুহূর্তে নিজেকে কেন যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছিল। করুণার সামনে থেকে কয়েক পা সরে এসেছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'খুব মন খারাপ না হলে বৌদি তুমি তো এমন করে বসে থাকো না।'

করুণা মাথা নিচু করে মেঝেয় চোখ রাখল। 'একটা কথা বলব ঠাকুরপো ?'

করুণার বলার ভঙ্গিতে ললিত অবাক। 'কি কথা ?'

'আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দেবে ? সামনের মাসেই শোধ দিয়ে দেব !'

ললিত কিছুক্ষণ করুণার দিকে তাকিয়ে থেকে হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বলল, 'বাব্বা ! তার জন্যে এত লজ্জা, ভয় ! কত টাকা ?'

করুণা টুটুল সিতুর দিকে একবার তাকাল। ওদের কথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে। করুণা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, তোমার ঘরে গিয়ে বলছি।'

ললিতের ঘরে এসে করুণা তক্তপোষের ওপর বসল। 'আর বোলো না ঠাকুরপো তোমার দাদার কথা। ওভারটাইম ওর সবদিন হয় না। মাসে সামান্য কটা ওভারটাইম করে যা পায়, তাতে আর চলছে না। ছেলেমেয়ে দুটি এমনিতে কিছুই খেতে পায় না ! দুধটুকু ছাড়া একটু হরলিক্‌স্ খাওয়াই। সেটা ফুরিয়েছে। কাল আবার রেশন তুলতে হবে।' একটু থেমে বলল, 'তার ওপর আমারও দু-একটা জিনিস আর না কিনলে নয়। তোমার দাদা তো এসব দেখেই না। তোমার কাছে চাইতে খারাপ লাগছে ঠাকুরপো। কিন্তু আর যে পারছি না।' করুণার গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। দু'চোখ কেমন ছলছলে।

ললিত মন দিয়ে শুনছিল আর করুণার নিষ্পাপ অসহায় মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। কি রকম যেন দুঃখ হল ললিতের। 'কত চাই বল না ? আমার কাছে এত বলার কি আছে বৌদি ?'

'বেশী চাই না দশটা টাকা দাও। বেশী নিলে আমাকে তো আবার শুধতে হবে ?'

ললিত সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশ থেকে কুড়িটা টাকা বের করে হাতে দিয়ে বলল, 'বেশীই দিলাম বৌদি। দরকার হলে আরও নিও। শোধ দেবার কথা ভাবতে হবে না। আমার দরকার মনে হলে নিজেই চেয়ে নেব।'

করুণা ললিতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। চাপা আবেগে ললিতের হাতটা ধরে বলল, 'ঠাকুরপো, আমার আর একটা অনুরোধ রাখবে তো ?'

'বল।'

'দাদাকে কিন্তু এসব কথা কোনদিনও বলবে না বলো।'

করুণার উৎকণ্ঠিত ভঙ্গি দেখে ললিত হাসল।

'না, না, সত্যি ঠাকুরপো। ও যদি জানতে পারে, তুমি টাকা ধার দিচ্ছ

তাহলে আর তোমাকে রেহাই দেবে না। ছিঁড়ে খাবে যখন-তখন। তার ওপর শোধ দেবার নামটি করবে না।' হাত ছেড়ে দিল হঠাৎ করুণা। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমিও ভাই ধার পছন্দ করি না, একদম না। ধার করে সংসার চালালে নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। পরের উপায় করা টাকায় একমুহূর্তও বেঁচে থাকতে চাই না। কেমন ঘেন্না করে তখন নিজেরই ওপর।'

ললিত করুণার দিকে সোজা তাকিয়ে বলেছিল, 'আমাকে পর ভাবো?'

'না না।' অপ্রস্তুত হয়েছিল করুণা, 'তোমাকে আপন মনে করি বলেই তো এমনভাবে হাত পেতে টাকাটা নিলুম ঠাকুরপো?'

ললিতের ভাল লাগে করুণার এই অসহায় অপ্রস্তুত ভঙ্গিটা। এইভাবেই করুণা যেন ওর আপন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। বড় বড় দুটি চোখে কোথাও এতটুকু ক্লান্তি নেই। শুধু এক ধরনের ভীরু সমস্ত অসহায়তা সূক্ষ্ম কাজলের মত দু'চোখের দৃষ্টিতে মাখানো থাকে। প্রতিদিনের অভাবটুকু যেভাবে হোক মিটে গেলেই করুণা যেন শরীরে মনে শরতের কোন এক রোদে-মোড়া দিনের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, রোদ আর বাতাসে শুকানো রঙিন শাড়ির মত উচ্ছল হয়ে ওঠে, টুটুল সিতুর মত যেন শিশু হয়ে যায়।

ললিতের মনে পড়ে, সেদিনই বিকেলে টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে করুণা বাইরে বেরিয়েছিল। হরলিক্‌স্ কিনেছিল, আর নিজের জন্যে একটা সস্তা দামের ব্রা কিনেছিল। পরের দিন সকালে স্নানের ঘর থেকে শুকনো কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এলে ললিতের যেন মনে হয়েছিল, করুণা নতুন ব্রা কিনেছে। পরে আবার একদিন করুণা কিছু টাকা নিয়েছে। কোনটাই শোধ দেয় নি। করুণার কাছে টাকাগুলো থাক, ললিত তা-ই চায়।

মনে মনে ললিত হাসল। দুটো শালিক পেয়ারার ডালে পাখা ঝাপটাতেই বাইরে তাকাল। করুণা বারান্দার ও কোণে রান্নায় ব্যস্ত হয়েছে। টুটুল-সিতু এখনি ফিরবে। ওদের খাবার করায় ব্যস্ত বুঝি। ললিত করুণাকে দেখে আর অবাক হয়। সারাদিন খেটে যায়। বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, গুল দেওয়া থেকে কি না করে করুণা। সেই রাত হলে সকলকে খাইয়ে তবে করুণা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে।

'অথচ—' ললিত যেন মনে মনে বিড বিড করল, 'অথচ ভাল ঘরে পড়লে এই করুণাই আগুন হয়ে যেত! দিন-রাতে একটা আগুনের তাল হয়ে পুরুষদের সামনে ঘুরে বেড়াতে পারত! হোক না দুটি সন্তানের মা।' ললিত করুণাকে

আবার দেখল। অনাদির সঙ্গে যখন ঝগড়া করে, তখন করুণার এক রূপ, আর সমস্ত কাজ শেষে যখন একা থাকে বা ললিতের সঙ্গে কথা বলে, তখন করুণার অন্য রূপ। ললিতের খুব মজা লাগে করুণাকে দেখে।

একদিন দুপুরে করুণার হাল্কা মেজাজ দেখে ললিত অনাদির কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা বৌদি, দাদার সঙ্গে এত ঝগড়া কর কেন বলতো? তোমাকে একটুও মানায় না।'

'তুমি দেখেছ তো দাদার বাড়ি ফেরা?'

'বাইরে কাজ থাকে না?'

'কাজ না হাতী? আড্ডা মারে। এদিকে ছেলেমেয়ে কে দেখবে?'

'কেন, তুমি তো আছ?'

'টুটুলটা তো একেবারে বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা যা-তা বলে।' করুণা নিজের ঝোঁকে বলছিল, 'জান ঠাকুরপো, শুধু এই কথাটা মনে হলেই আমার যেন রাগ মাথায় উঠে যায়। কি রকম যেন ভয়ও হয়।'

'তুমিই সামলাও। দাদা না হয় দেরীতে ফিরল, তাতে আর কি?'

করুণা অন্যমনস্ক হল কয়েক মুহূর্ত। 'ঠাকুরপো, আমিও তো একটা মানুষ। বাড়িতে থাকি। সারাদিন দাসা-বাঁদার মত মুখগুঁজে খেটে যাই আমারও তো ইচ্ছে হয় ও তাড়াতাড়ি আসুক।' যেন গভীর দুঃখে করুণার বুক ভরে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল করুণা। বুঝিবা অনেক দূর থেকে বলল, 'এতদিনেও যখন বুঝলো না, আর কোনদিনও বুঝবে না।' অন্যদিকে মুখ ফেরালো করুণা।

সেই মুহূর্তে করুণার দুঃখ যেন ললিত বুঝেছিল। ললিতেরও কেমন কষ্ট হতেই প্রসঙ্গ বদলালো। 'থাক ওসব কথা বৌদি। তোমার গ্রামের কথা বলো।' খুব হাসিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই করুণাকে সহজ করে দিয়েছিল ললিত।

ললিতের নানা হাল্কা কথায় করুণাও একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। 'কোন কথা শুনবে?'

'সেই যে বিয়ের আগে গ্রামে কিভাবে কাটাতে?' ললিত অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করল।

গ্রামের কথায় করুণা খুশিতে ভরে ওঠে। পড়ন্ত দুপুরের নির্জন পরিবেশে করুণা ওর স্মৃতিটাকে কাপড় শুকোতে দেওয়ার মত ছড়িয়ে দিল। 'জান ঠাকুরপো, বাড়িতে আমাকে কুটিটি নাড়তে হত না। গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তুম, আম, জাম, খেজুর! বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত এইসব করে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

ললিত করুণার স্মৃতিতে নিবিষ্ট মুখ দেখতে দেখতে যেন এক আঠারো বছরের কুমারী মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে লাগল। করুণার দিকে তাকিয়ে রইল।

'রোদে ঘেমে কালি হয়ে আমরা পাড়ার ক'জন মেয়ে পুকুরে নামতুম। ঠিক দেড়টি ঘণ্টা কাটাতুম পুকুরে। উহ্‌, সে কি হুল্লোড়! পুকুরে পানা, শালুকফুলের ঝাড। চারপাশে বুনো গাছের ঝোপ। আমি তো ভয়ই পেতুম না। বাজি রেখে শালুকফুল তুলে আনতুম সেই পুকুরের মাঝখান থেকে। আমার সঙ্গে কেউ পারতো না!'

'তোমার ভয় করত না? যদি সাপ থাকতো? জলবড়া সাপ! আমার তো দেখলেই ঘেন্না করে।' ললিতের কণ্ঠস্বরে দুপুরটা যেন বেশী নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে।

ঝকঝকে দাঁতে করুণা হাসল। উত্তেজিত নিঃশ্বাসের ওঠা নামায় নাসারন্ধ্র মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে। 'তাহলে তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলি ঠাকুরপো। একদিন আমি একা নাইতে গেছি। সেদিন সারা পুকুরে একটা মাত্র লাল শালুক ফুটে আছে। তা-ও অনেক দূরে, একেবারে পাতা আর ডাঁটায় জড়িয়ে। আমার কেমন রোখ চেপে গেল, ওটা আজ তুলে আনবই। গেলুম। ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে আসছি, শালুক-ডাঁটায় জড়ানো পা দুটো অনেক কষ্টে ছাড়িয়েছি, হঠাৎ সামনে দেখি দুটো সাপ কিরকম করে যেন খেলছে! নৌকোর পাক-দেওয়া মোটা কাছি দেখেছ তো ঠাকুরপো—সেই কাছির মত দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে, আর জল থেকে জড়ানো অবস্থায় লাফিয়ে সোজা হয়ে উঠছে!' করুণা চাপা উত্তেজনায় থামল।

'তুমি কি তখনো এগিয়ে গেলে!'

'দূর, আমি এগিয়ে গেলেই তো ওরা পালাবে। আমার ওদের খেলাটা খুব ভাল লাগছিল। পুকুরের পাড়ে এসে চুপ করে বসে রইলুম। ভিজে কাপড়ে গা শিরশির করছে তখন। বলব কি, এমন একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলুম তখন। কিন্তু আমার হাতের শালুকফুলের নয়। কি রকম গন্ধ যেন! আমি তো ঘুমিয়েই পড়ছিলুম!'

'তারপর!'

'চারপাশ নির্জন। খেলার সাপ দুটো একটু দূরে রোদে চক্‌চক্‌ করছে আমার তখন ভয়ও করছে, আবার উঠে চলে আসতেও ইচ্ছে করছিল না। মা এসে হঠাৎ ডাকতেই তখন সত্যিকারের ভয় পেয়েছিলুম। জানো, মাকে সব যখন বললুম, মা আমাকে বকে বলল, 'ওসব দেখতে নেই।'

'কেন ?' ললিত করুণার কথা বলার উদাস ভঙ্গিতে আবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করল।

'কেন কে জানে! তারপরেই তো আমার বিয়ে হয়ে গেল। মা সেই থেকে কিছুতেই আমাকে একা চান করতে পাঠাতো না।'

পেয়ারাগাছে দুপুরের বাতাস জড়িয়ে জড়িয়ে হিসহিস শব্দ করল। ললিত মৃদু হাসল। 'কেন বারণ করেছিল, এখনো জান না বৌদি ?' ললিত করুণার চোখে চোখ রাখল।

করুণা হঠাৎ ললিতের হাসি দেখে যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'খুব ফাজিল যে ?' হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার দাদা পরে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।' বলেই করুণা যেন আবার সেই পুকুরের পাঁকের গন্ধ-মেশানো জল, জংলা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ফিরে গেল। দু'চোখে সেই আঠারো বছরের করুণার গাঢ় ঘন নিবিষ্টতা : 'যাই বল ঠাকুরপো, বেশ ছিলুম কিন্তু। এখনো আমার ভাল লাগে।'

'এইজন্যেই তো গ্রামের মেয়েদের শরীরের গড়ন ভাল, বেশ আঁট-আঁট শক্ত। তা ছাড়া সাঁতার কাটলে শরীরের আদলই পাল্টে যায়।'

'সব জায়গায় নয়। তোমাদের এই হেদোয় একদিন ভোরে টুটুলকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বড় বড় মেয়েরা টাইটজামা পরে সাঁতার কাটছে। আমাদের মত শাড়িতে গাছ-কোমর বেঁধে জলে ঝাঁপাতে না পারলে জলে শরীর খেলবে কি করে ? জলের পানা, গাছ-গাছালিরও অনেক কাজ আছে এতে।'

'সাঁতার নিয়ে ডাক্তারি করছ বৌদি ?' ললিত হাসল। 'তবে আমি কিন্তু গ্রামের মেয়ে পছন্দ করি ভীষণ।'

'সত্যি !' করুণার দু'চোখ ললিতের চোখে স্থির।

'সত্যি। তবে ঠিক তোমার মত মেয়ে হওয়া চাই।'

'এই বলে আমাকে চাইছ না তো ?' করুণা কথাটা বলেই হাসিতে ভেঙে পড়ল। 'দেখো, তোমার দাদাকে কষ্ট দিও না!'

ললিত কেমন বোকার মত করুণার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তবে আমার মত মেয়ে নিলে তোমার লাভ হবে না। কেবল তো ঝগড়া হবে!'

'কেন হবে! আমি কোন কষ্টই দেব না, কোন অভাব না থাকলেই তো হল!' ললিত পরিষ্কার করতে চাইল ওর বিষয়টা।

'তাই বুঝি! তাহলে তো তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে খুব ভুল করেছি! ইস্!' করুণা আবার হাসছে। প্রতিদিনের সংসারের সঙ্গে জড়ানো যে করুণা, এ

যেন সে নয়। ললিত করুণার সামনে বসে সেই পুকুরে ঝাঁপানো, ভীষণ দুরন্ত স্বভাবের এক আঠারো বছরের তরুণীর শরীরের বুনো গন্ধ পাচ্ছে। ললিত করুণার হাসিতে বাধা দিলো না। করুণার টোলপড়া চিবুকের দিকে তাকিয়ে ললিত বলল, 'মেয়ে জাতটা খুব সুন্দর। আর যদি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ওদের মনোমত করে কাছে রাখা যায় বৌদি, অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাই না?'

করুণা হাসি থামাল। ললিতের মুখ-চোখ দেখে তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তোমার দাদাকে আমি একথাগুলো বলব ঠাকুরপো! যা মজা হবে না!' বাইরে তাকাল। 'যাই, বেলা হল। তুমি দেখছি খুব শয়তান ঠাকুরপো, এমন আজেবাজে কথা বলে ধরে রাখো!' করুণা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

'দাদাকে কিন্তু বোলো না বৌদি, খুব খারাপ হবে।' ললিত চেঁচিয়ে বলল।

করুণা ততক্ষণে ওর ঘরে চলে এসেছে। হাই তুলল। 'কেন, এতেই ভয় পেয়ে গেলে!' শব্দ করে হাসল। বেলা গড়িয়ে এলেও টুটুলের পাশে শুয়ে পড়ল।

সেই করুণা, আর আজকের করুণার মধ্যে অনেক তফাৎ! ললিত এক নিঃসাড় অন্যমনস্কতায় যে কথা ভাবছিল, এখন করুণাকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করল। আজ করুণা তো একবারও নিজে থেকে এসে কথা বলছে না!

বাইরে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে করুণার পাশে দাঁড়াল ললিত। 'কি ব্যাপার? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার সঙ্গেও কথা বন্ধ নাকি?'

করুণা ললিতের দিকে ফিরে হাসল।

ললিতের মনে হল, করুণা যেন আজ আতিরিক্ত গম্ভীর। 'বৌদি, এরকম গোমড়া মুখে তোমাকে কিন্তু একটুও মানায় না।'

'অনেক কিছুই মানাতে হয় ঠাকুরপো।' রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'আমার কোন ক্ষমতাই নেই।' করুণার মুখ নীচু।

'ওঃ, কি সব বড় বড় কথা ভাবছ? দেখবে, মজা দেখাব?' করুণাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ললিত দুহাতে ওর বসার ভঙ্গিতেই ওকে তুলে ধরল। ধরে নিয়ে করুণার ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিল। করুণা ছেড়ে দেবার জন্যে চীৎকার করলেও শোনে নি। বাইরে বেরিয়ে দরজায় শিকল টেনে দিল ললিত। 'থাকো এখন। টুটুল-সিতু আসুক, মজা দেখবে?'

করুণা হাসতে হাসতে বলল, 'এই ঠাকুরপো, খুলে দাও, ওরা দেখলে যা-তা ভাববে। এখন কি আমার এরকম ঠাট্টার বয়স?'

'সেইজন্যেই তো মজাটা হবে!'

করুণা হাসতে লাগল। 'খোলো ঠাকুরপো। ওদের খাবার হয় নি।'

করুণাকে হাসতে দেখে দরজা খুলে দিল। করুণা বেরিয়ে উনুনের সামনে বসতে বসতে বলল, 'ওহ্, তোমার গায়ে কি জোর ঠাকুরপো!'

ললিত হাসতে হাসতে ওর ঘরের চৌকাঠে বসল। করুণাকে দেখতে লাগল।

করুণা কিছু সময় নীরব থেকে কাজ করতে করতে বলল, 'আমাকে কিছুদিনের জন্যে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পার ঠাকুরপো?'

'দাদার ওপর রাগ এখনো যায় নি!'

'না না, সত্যি বলছি। আমার যে ছাই কোন আত্মীয়-স্বজন এখানে নেই। থাকলে কবে পালাতুম।'

ললিত করুণার বলার ভঙ্গিতে একটু অবাক হল। 'সত্যি যাবে? কিছুদিনের জন্যে গেলে কিন্তু তোমাদের দুজনেরই মনে কিছুটা শান্তি আসবে!'

'আমি একটু শান্তি চাই। ছেলেমেয়ে দুটোকে তোমার দাদার কাছে রেখে যাব। দাদা তো রান্না-বান্না ভাল জানে। ক'দিন চালিয়ে নেবে।'

'কিন্তু দাদা যেতেই বা দেবে কেন? আবার তো একচোট ঝগড়া হবে?'

করুণা ললিতের দিকে তাকাল। 'বলে যাব কেন? একদিন অফিস বেরিয়ে গেলে চলে যাব। তুমি তো আমাকে রেখে এসে ফিরবে এখানে। তখন বলবে।'

ললিত অবাক হচ্ছিল। কি ভাবল। বলল, 'বৌদি, না বলে গেলে সত্যি খুব মজার ব্যাপার হবে! দাদাকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে! আমিও তোমাকে রেখে এসে প্রথমেই কিছু বলব না। দাদা কি করে, কি ভাবে, দেখে তবে বলব।' একধরনের মজার খেলার কথা ভেবে ললিত যেন ফুলে উঠছে ভিতরে। 'সত্যি, যাবে তো? সোদপুরে আমার এক দূর সম্পর্কের পিসিমা-পিসেমশাই থাকেন। ছেলেপুলে নেই, বাড়ি, বাগান, পুকুর সব আছে। আমাকে ওঁরা ছেলের মত ভালবাসেন। তোমাকে ওখানে গিয়ে রেখে আসব। প্রত্যেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব। দু-একটা সিনেমাও দেখাব। এখানে-ওখানে ঘুরতেও পারি দুজনে। দেখবে, মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে একদিন দাদাকে না হয় সব বলবে।'

করুণা ললিতকে দেখতে দেখতে ললিতের কথাগুলো ভেবে নিচ্ছিল। খুব ভাল যুক্তি দিয়েছে ললিত। ক'দিন খারাপ কাটবে না! ললিতটা যা হৈ-চৈ

করতে ভালবাসে, করুণার তো তাতে এক মুহূর্তেও খারাপ লাগবে না। 'এটা আমার দরকার' করুণা বিড়বিড় করল। ললিতের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখল। ললিত ছেলেমানুষ নয়। অনেককিছু বোঝে। কি ভেবে বলল, 'এতকথা দাদাকেই বা বলার দরকার কি?'

ললিত কেন যেন কথাটায় ভয় পেল। করুণার চওড়া পিঠ, সুগঠিত বুক, ভারী নিতম্ব চোখে পড়ল। পিঠের ওপর খোঁপা ভেঙে পড়েছে। সমস্ত মিলিয়ে করুণাকে বড় অসহায় মনে হল। সারা মুখমণ্ডলে এক শান্ত শীতলতা। এইটাই কি ললিতকে আকর্ষণ করে? তিরিশ বছর বয়সেও করুণার মুখের নিষ্পাপ সারল্য ললিতকে যেন পাগল করে দেয়।

ললিতকে চুপ করে থাকতে দেখে করুণা ওর দিকে তাকাল। ললিত যেন চমকে উঠল। 'সেই ভাল বৌদি, দাদাকে বলার দরকার নেই।' সহজ হয়ে গেল ললিত। 'সব বয়সেরই কোন না কোন খেলা আছে। আর, যে কোন খেলাই সুন্দর। সেখানে হার-জিতের প্রশ্ন না থাকলেই হল।' বলে ললিত থামল। 'দিনগুলো বোরিং না হলেই ভাল।'

করুণা হাসল। 'অত-শত বুঝি না ঠাকুরপো। তোমার দাদাকে ক'দিনের জন্যে একটু জব্দ করা দরকার। তাই সব কথা না বললে ক্ষতি কি?'

'ঠিক, ঠিক।' ললিত সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করল। সিঁড়িতে টুটুল-সিতুর পায়ের শব্দ শোনা গেল। ললিত বলল, 'আর কিছু বলতে হবে না, আমি তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলছি।' বলে ললিত নিজের ঘরে ঢুকল।

ছুটির দিনে ললিত দেরীতে স্নান করে। করুণা টুটুল-সিতুকে ঘুম পাড়িয়ে স্নানের ঘরে ঢোকে। আজও তাই করল। ললিত স্নান সেরে খেতে বেরুবে। ওপরে উঠে এলো তাড়াতাড়ি। করুণা বাথরুমে ঢুকল। ললিত নীচে নামছিল বাইরে খেতে যাবে বলে। করুণা বাথরুম থেকে ডাকল, 'ঠাকুরপো, আমার গামছাটা আনতে ভুলে গেছি। একবার দিয়ে যাওনা ভাই।'

ললিত ওপরে উঠে এল। গামছাটা নিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, তোমার তো এরকম ভুল হয় না? এত অন্যমনস্ক কেন? না, না, এ খুব খারাপ লক্ষণ!'

শরীরে জল ঢালছিল করুণা। জল-জড়ানো ঠোঁটে বলল, 'আহা, মোটেই না। তোমাকে একটু খাটিয়ে নিলুম। দেখলুম, তুমি সব কাজ পার কিনা! কই দাও!' বলে দরজা একটু ফাঁক করে করুণা হাত বাড়িয়ে দিল।

কনুই-এর ওপর পর্যন্ত ললিত করুণার উন্মুক্ত বাহুর ওপর দৃষ্টি রাখল। সাবান-ঘষা জলে-ধোয়া ফর্সা একখানি হাত। প্রতিদিনের সংসারের কোন কাজের ভার, ব্যস্ততার চিহ্ন হাতে নেই। জলে-সাবানে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। টিনের দরজায় আসন্ন শরতের মধ্যাহ্ন-সূর্যের আলো পড়েছে। হাতের ওপর জলবিন্দু সাজানো! রোদে মুক্তার মত বিন্দুগুলি চকচক করছে! কব্জির কাছে পাতলা শাঁখা খড়ির দাগের মত আটকে আছে! ধাক্কা লাগলে যে কোন সময় শাঁখাটা ভেঙে যেতে পারে। কোন কিছুর হাতছানি আছে নাকি এ হাতে?

'কি হচ্ছে? দাও।' পাতলা অন্ধকারে ঢাকা বাথরুমের মধ্যে থেকে কৃত্রিম ধমকের গলায় বলল করুণা। 'দুষ্টুমির আর সময় পেলে না বুঝি? নাকি গাঁয়ের মেয়ের হাত দেখেই মজে গেলে?'

চমকে উঠল ললিত। হেসে বলল, 'এই নাও।' নিজের মধ্যেই ভয় ঠেলে উঠতে গামছাটা করুণার হাতে ধরিয়ে দিল।

'যাও, লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে পড়ো তো এখন।' হাত টেনে নিয়ে টিনের দরজা ভাল করে বন্ধ করল করুণা। খিল খিল করে হেসে উঠল করুণা বাথরুমের ছায়া-ছায়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

ললিতের বুকের মধ্যে শব্দ দ্রুত হ'ল। নিঃশব্দ পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মধ্যরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ললিতের। একটা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখছিল! লতাপাতায় ভর্তি বিরাট এক দীঘির মধ্যে ললিত সাঁতার কাটতে কাটতে করুণাকে ধরতে যাচ্ছিল। করুণা ডুবসাঁতারে হঠাৎ একেবারে লাল শালুকের বনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! ললিত এত ক্লান্ত, কিছুতেই করুণার কাছে যেতে পারছে না। হঠাৎ ললিত দেখল, সেই জড়ানো দু'টি সাপের খেলা! করুণার সামনেই লাফিয়ে লাফিয়ে জড়ানো সাপদুটো উঠছে, আবার আছড়ে পড়ছে। করুণা ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করছে, ডাকছে ললিতকে। জড়ানো শালুকবন থেকে ও কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। জলের মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ করুণার। ঠিক বুকের ওপর একটা লাল শালুক ফুল। পাতা আর ডাঁটা, বুনো গাছ-গাছড়া করুণাকে জড়িয়ে রয়েছে। ললিত বারবার দুহাত দিয়ে জল টানলেও কিছুতেই ওর কাছে পৌছতে পারছে না। ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেছে।

ললিত ঘেমে গেছে! দুপুরে সামান্য ঘুমিয়েছিল বলে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি ওর। এখন রাত কত কে জানে? একটু আগে কতকগুলো কালো

মেঘ জড়ো হয়ে মুষলধারে বৃষ্টি ঢেলেছে। গাছের পাতায় জল পড়ার শব্দ। তার পরেই আকাশ পরিষ্কার। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় বাইরে বারান্দা ভরে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে ললিত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বৃষ্টি থামতে ঘুম ভেঙেছে। আবার অসহ্য গরম।

সিগারেট ধরিয়ে ললিত বিছানায় উঠে বসল। বাইরে বেরুবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আচমকা করুণাকে দেখল। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোন জামা নেই। পিঠ খোলা। এমন গভীর গোপন নির্জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে করুণা বুঝিবা আরাম ও বিলাসের সুখ ভোগ করে নিচ্ছে। যা গরম! ললিত করুণার জ্যোৎস্না-বিছানো বালিয়াড়ির মত উন্মুক্ত নরম পিঠের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ললিত মনে মনে হাসল। একটু আগে যে স্বপ্নটা দেখছিল এখনি বলবে নাকি? নিঃশব্দ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। 'চমকে দেব করুণাকে?' ভাবল ললিত। ডাকল,' করুণা!'

যেন ভূত দেখে চমকে উঠল করুণা। দ্রুত পিঠ, দু'দিকের বাহুর খাঁজ, অসতর্ক বুক কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। পিছন ফিরে ললিতকে দেখল।

এগিয়ে এসে করুণার থেকে সামান্য তফাতে রেলিং-এ গা ঘেঁসে দাঁড়াল ললিত। 'নাম ধরে ডাকতে ভয় পেয়ে গেলে বৌদি? রেগে গেলে তো? আসলে তোমাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যেই নাম ধরে ডাকলাম।' যেন ফিস ফিস করে বলল।

করুণার বুকের দ্রুত শব্দগুলি কিছুটা বিলম্বিত হতে বাইরে তাকাল। বুকের শব্দে অকারণ ভয় জড়িয়ে রয়েছে। সামনে পেয়ারা গাছের স্নিগ্ধ মনোরম ছায়া। দূরে জ্যোৎস্না-ধোয়া খালের জল নিস্তরঙ্গ। একটু আগে চারপাশের জ্যোৎস্নায় কোথায় যেন চলে গিয়েছিল করুণা। অনাদিন নাক ডাকছে, আরামে ঘুমোচ্ছে ও। টুটুল-সিতুর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। করুণা যেন চন্দনের মত এই শান্ত হিম জ্যোৎস্নাটুকু মেখে সারাদিনের শেষে এই আলো-ছায়ার নিস্তব্ধতায় স্নান করছিল। ললিতের ডাকে ভয় পেলেও স্বাভাবিকভাবেই বাইরে তাকিয়ে রইল।

ললিত অন্যমনস্ক করুণাকে দেখল। গরমে জামা গায়ে রাখে নি। রঙীন শাড়িটা পাতলা ঘুমের আলস্যে করুণার শরীরে যেন জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর একটা বাতাসে কাঁপা পাতার ছায়া যেন জ্যোৎস্নার ঝর্ণা বহিয়ে দিয়েছে। ললিতের মনে হ'ল, করুণার চিবুক, গ্রীবা, বুক, পিঠ, নিতম্ব—সমস্ত কিছু ভেদ করে যেন ফুলের উড়ন্ত রেণুর মত জ্যোৎস্না করুণাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে।

'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ছে বুঝি ?' ললিত নীচু গলায় বলল।

করুণা ললিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'হ্যাঁ। সারা বর্ষাটা বেশ ছিল। আবার ছাদটা ফেটেছে।'

'ওরা ভিজবে না !' অন্য কোন কথা না পেয়ে এমনি জিজ্ঞেস করল ললিত।

'না, আমার দিকটাতেই পড়ছে।' করুণা থামল। ভাগ্যিস সন্ধেবেলা বৃষ্টি হতে পারে ভেবে তোমার দাদাকে আমার জায়গায় শুতে দিয়েছি। না হলে ও আজ ঘুমোতেই পারতো না ! এই সময়ে আবার ঘুম ভাঙাতে হত। সারাদিন খেটেখুটে আসে, বল ঠাকুরপো, বাড়ি ফিরে একটু যদি ও শান্তিতে ঘুমোতে না পারে, তাহলে ওর অবস্থা কি হয় ভাবো !' একটু থামল করুণা। 'আবার কাল ওকে ছাদে উঠতে হবে। ওর দুর্ভোগের আর শেষ নেই।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল করুণা।

ললিত ভাবল, করুণাকে কি ওর ঘরে শুতে বলবে, আর ও বরং বাইরে বারান্দায় শোবে ! নাকি ছেলেমেয়েদের ওর ঘরে দিয়ে অনাদির কাছেই শুতে বলবে ! না, দুটোই খারাপ দেখায়। ললিত করুণাকে দেখতে দেখতে ভাবল। করুণার দিকে তাকাল।

'তুমি ঘুমোও নি কেন ?' ললিতের দু'চোখ দেখে করুণা একটু বা ভয় পেল।

'গরমে ঘুম ভেঙে গেল। তাছাড়া তোমাকে দেখেই তো এলাম ! একজন না ঘুমোলে তা দেখেও আর একজন কি ঘুমোতে পারে ?' খুক খুক করে হাসল ললিত। সিগারেট ধরাল।

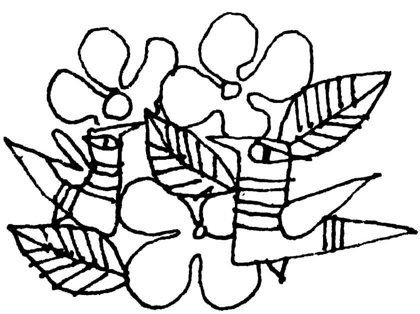
দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব। নীরবতা অনেক সময় বুঝি অনেক সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে ! একসময়ে দু'জনেই দু'জনের দিকে অকারণ বেশ কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করল। ঝির ঝির করে বাতাস বইল। জ্যোৎস্নার রেখা ছায়ায় কাঁপছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা শুরু হয়েছে কোথাও।

করুণা হঠাৎ বলে উঠল, 'শুতে যাও। রাত হয়েছে।' বলেই দরজার দিকে এগোল। কয়েক পা গিয়েই হঠাৎ পিছন ফিরল। 'ললিত, তোমাকে আসল ব্যাপারটাই বলা হয়নি !' করুণার মুখে ললিত নিজের নাম শুনে চমকে উঠলো। চমক কাটতে না কাটতেই করুণা ওর সামনে একেবারে বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

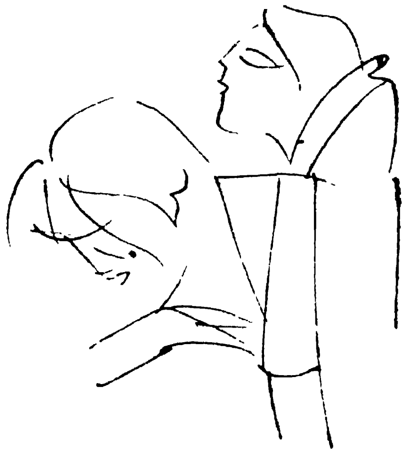
ললিত করুণার এত কাছে থেকে গাঢ় বিস্ময়-বিমূঢ়তায় যেন নিস্পন্দ হয়ে গেল। করুণার নিশ্বাসের শব্দ, শরীরের সেই গন্ধ পাচ্ছে যেন! শালুক ফুল-পাতা-ডাঁটার মিশ্রিত গন্ধ ললিতকে তীব্র আকর্ষণ করছে। ললিত চকিতে করুণার সারা শরীর দেখে নিল। চাপা নিশ্বাসে করুণার উন্নত বুক উঠছে-নামছে। ললিত যেন করুণার নিটোল নরম বাহুর ওপর সকালের সেই জলবিন্দু-গুলি মিহি জ্যোৎস্নায় মাখানো দেখল। ললিতের সারা শরীরে-মনে যেন মুহূর্তের মধুর অন্যমনস্কতা।

গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে করুণা বলল, 'তোমার দাদার নাক-ডাকা বন্ধ হয়েছে মনে হচ্ছে।' পিঠ থেকে আঁচল টেনে নিয়ে জড়ানো খুঁটটা খুলতে খুলতে বলল, 'আজ সন্ধে থেকে একবারও সুযোগ পাইনি। তোমায় দাদা তো এসব কিছু জানে না। মাটির দুটো ভাঁড় ভেঙে যা পেয়েছিলুম, আজ সন্ধেয় টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো সব নোট করে এনেছি।' আঁচলের গিঁট শক্ত হয়ে গেছে, খুলতে পারছে না। ঐ দিকে তাকিয়ে থেকে খুলতে খুলতে বলল, 'তোমার দাদার জ্বালায় কি ঘরের কোথাও রাখবার জো আছে! ঘরে আমার সব গোপন জায়গাগুলো ও চেনে। একবার যদি ও দেখতে পায় তো রক্ষে নেই। তাই সঙ্গে করে সব সময় রেখেছি ঠাকুরপো। এই নাও। তোমার দাদাকে কিন্তু কোনদিন যেন বোলো না!' ললিতের হাতের মুঠোয় রেখেই করুণা দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। খিল দেওয়ার সন্তর্পিত শব্দ হল।

ললিত যেন চাঁদের আলোভর্তি মুঠির মধ্যে রাখা নোটগুলির দিকে রক্তশূন্য মুখে তাকিয়ে রইল। কিছু সময় ললিত যেন ওর বুকের কোন শব্দ শুনল না।



হরিণী বলিছে—'শুন তুই হরিণারে।
এই বন ছাড়ি তুই চল্ বনান্তরে'॥
ত্বরাগামী মৃগ-ক্ষুর দেখা নাহি যায়।
[মণীন্দ্রমোহন বসু অনূদিত]



বনান্তরে

'কি ব্যাপার! তুমি এখানে!' দীর্ঘ দু'মাস পরে শাশ্বতীর সঙ্গে এমন হঠাৎ দেখা। তাই জয়ন্ত একটু বা অবাক হয়েই বলল।

জয়ন্তর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল শাশ্বতী। মুখে-চোখে হাসি উচ্ছল। জয়ন্তর চোখে চোখ রেখে বলল, 'এটাকে কি বলবেন? এ্যাক্সিডেণ্ট, না ইন্সিডেণ্ট?'

'মানে!' জয়ন্ত বিস্ময় আর কৌতুকে ভুরু ঈষৎ কোঁচকাল।

'বাঃ, আপনি একদিন বলেছিলেন না, পছন্দমত একটা মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়াটা অ্যাক্সিডেণ্ট? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!' শাশ্বতী মুখের ভাব চতুর করল।

জয়ন্ত হেসে উঠল। 'সব কিছু মনে রাখ দেখছি!'

'আপত্তি আছে?'

জয়ন্ত আর কথা বাড়াল না। কলেজে পড়তে ঢুকে শাশ্বতী নানাভাবে ঘুরিয়ে কথা বলতে শিখেছে। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'এমন সময় হাওড়া স্টেশনে!'

'মামা-মামীমা, মামাতো ভাইবোনদের সব সী অফ্ করতে এসেছি।'

'তা হলে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে? প্লাটফর্ম তো ওদিকে।'

'বেশ আপনি! আপনাকে দেখেই তো এলাম!' একটু থামল শাশ্বতী।

জয়ন্তকে দেখল। 'আজ অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছেন বুঝি? বৌদি কোথায়? অফিসে?'

'তা ছাড়া আর কোথায় যাবে।'

'আপনি কি রিপোর্টের সন্ধানে স্টেশনে? পেয়েছেন কিছু?'

'এইমাত্র পেলাম।'

'কি?'

'তোমাকে।'

'আমি কি রিপোর্ট?' শাশ্বতী একটু বেশী হাসতে লাগল।

'অত্যন্ত কন্‌ফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট।' জয়ন্ত অল্প হেসে শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

মুখ-চোখে সহজ উদাসীন ভাব এনে শাশ্বতী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। স্টেশনের মাইকে ট্রেন ছাড়ার ঘোষণা শুনল। হাতঘড়ির সঙ্গে স্টেশনের ঘড়ি মিলিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন স্টেশনের ভেতরে। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। খুব মজার হবে।'

'তুমি যাও। বলেছিতো, পরিচিত লোকজন আমার ভাল লাগে না।' জয়ন্ত ভিতরে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

'ওহ্, সেই পুরনো যুক্তি।' নিজের মধ্যেই যেন বিড়বিড় করে শব্দগুলি উচ্চারণ করল শাশ্বতী। 'বেশ, আপনি কিন্তু এখানেই অপেক্ষা করবেন। আমি ওদের তুলে দিয়েই আসছি।'

'দেরী হবে!' জয়ন্তর গলা নিরাসক্ত।

'ট্রেন ছাড়তে যতটুকু সময় লাগে।' শাশ্বতী আবার হাতঘড়ি দেখল।

'আমি একটু স্টেশনটা ঘুরতে পারি। এসে আমাকে না পেলে অপেক্ষা কোরো।'

'আমি কিন্তু ঠিক আসব। যাবেন না যেন!' বলেই জয়ন্তর দিকে পিছন করে প্লাটফর্মের মধ্যে যাবার গেটের দিকে এগোতে লাগল।

জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। পর পর কয়েকটা টান দিতে দিতে শাশ্বতীর চলে যাওয়া দেখল। ডান দিকের কাঁধে চকলেট রং-এর চামড়ার ব্যাগ ঝুলিয়েছে শাশ্বতী। হরিণের চামড়ার মত ছাপা শাড়ি আর রঙ-মেলানো জামা পরনে। অল্প-চুলের ঝোলানো বেণীটাকে দূর থেকে লম্বা দেখাচ্ছে। কোমরের কাছের অংশ অনাবৃত। কলেজে ঢুকে

শাশ্বতী অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে। স্টেশনের এত লোকের মধ্যে শাশ্বতীকে যতদূর দেখা যায়, দেখছে জয়ন্ত। মাঝে মাঝে দৃষ্টির আড়াল হতে হতে শাশ্বতী একসময়ে হারিয়ে গেল।

জয়ন্তর কাছে হঠাৎ চারপাশ শূন্য মনে হল। যেনবা শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা না হলে এরকম অনুভূতি মনের মধ্যে জমত না। কি ভেবে পিছনে থামের গায়ে গোল করে বসানো সিমেন্টের বেঞ্চটায় বসে পড়ল। হাতের সিগারেটের শেষ অংশ টান দিয়ে ফেলে দিল। চারপাশে চোখ বুলোল। গমগম করছে হাওড়া ষ্টেশন। এই ষ্টেশন, লোকজন, দেশ-বিদেশ—পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বিচ্ছিন্নতা মুছে দেয়। বিচিত্র এর লোকজন, বিচ্ছিন্ন এদের উদ্দেশ্য। জয়ন্তর মনে হল, সেই বিচিত্র বিচ্ছিন্নতাকে এই ষ্টেশন কি এক সেতু দিয়ে নষ্ট করে দেয়। জয়ন্তকেও? হয়ত তাই। তাইতো বিনা কারণে এখানে মাঝে মাঝে চলে আসে! ট্রেন আসা-যাওয়ার শব্দ, যাত্রীদের অন্তহীন যাতায়াত, ব্যস্ততা, কোলাহল, অপরিচিত ভিড় —সব কিছুর মধ্যে জয়ন্তর শূন্যতাবোধ বুঝিবা এক সেতুর সন্ধান করে। তাই সংসার, পরিচিত বন্ধু, লোকজন, নিজের কর্মব্যস্ততা সরিয়ে কখনো কখনো এখানে একা চলে আসে। রাস্তায় একা একা কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। বাইরে মেঘ করেছে; ষ্টেশনের ভিতরের আলোয় যেন সিমেন্টের রং মেশানো। জয়ন্ত কাফ কর্ণারের দিকে এগোল। শাশ্বতী নিশ্চয়ই এখানে আসবে না। মনের মধ্যে বিড়বিড় করল জয়ন্ত। সেই শাশ্বতী! ভাস্বতীর ফ্রক-পরা বোন। দুই বোন ছোটবেলা থেকে রক্ষণশীল মামার বাড়ি মানুষ। বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। এখনো মামার বাড়িতেই থাকে। ছাত্রজীবনের শেষ ধাপে ভাস্বতীর সঙ্গে প্রণয় ছিল জয়ন্তর; রক্ষণশীল বাড়ির কেউ তা জানত না। এমন কি জয়ন্ত মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গেলেও বুঝতে পারেনি, সন্দেহ করেনি। শাশ্বতী জানত। সেই শাশ্বতী! ভাস্বতীর একেবারে উল্টো—চেহারায়, স্বভাবে দুদিকেই! ভালোবাসার মধ্যে ভাস্বতী নিখুঁত করে অঙ্ক কষত, মনটাকে হিসেবের খাতা করেছিল। বিবাহিত জীবনে একটি মেয়ের আয়-ব্যয়ের হিসেব। এসবের মধ্যেই কবে থেকে যেন জয়ন্তর মধ্যে চাপা বিরক্তি, ক্লান্তি, একঘেয়েমি এক কঠিন বিচ্ছিন্নতা রচনা করেছিল।

ভাস্বতীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি। বাড়ির পছন্দ-করা বিয়েতে ভাস্বতী এখন কত সুখী! অঙ্ক মিলে গেছে তার। জয়ন্তরও বিয়ে হয়েছে। ভেবেছিল বাড়ির

পছন্দ-করা-মেয়ে রেবাকে বিয়ে করে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মুছে ফেলবে। পারেনি। বরং আরো ক্লান্ত, নির্জীব, জড় হয়ে উঠেছে জয়ন্ত ভিতরে-ভিতরে। রেবাও বুঝি অফিসের কাজে ব্যস্ত থেকে সংসার জীবনে একটিও সন্তান না চেয়ে, একা থাকার বিলাসে সেই বিচ্ছিন্নতা সহজ করে নিয়েছে। শুধু স্বামী তার থাকলেই হল। বিচ্ছিন্নতা সে বোঝে না। এরই মধ্যে হঠাৎ রাস্তায় শাশ্বতীর সঙ্গে একদিন দেখা। কলেজে বি. এস-সি পড়ছে। সঙ্গে রেবা ছিল সেদিন। ভাস্বতীর বোন, এই বলে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল জয়ন্ত। শাশ্বতী বড় চতুর। সে সমস্ত এড়িয়ে অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল রেবার সঙ্গে। রেবারও ভাল লেগেছিল শাশ্বতীকে।

সেই শাশ্বতী! জয়ন্ত কফি কর্নারের তারের জাল-দেওয়া বড় দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। এরই সামনে লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করতে করতে কথাগুলি ভাবছিল। শাশ্বতী এখন কত পরিচিত তাদের। রেবা দুপুরে অফিস বেরিয়ে যায়। সেই নিঃসঙ্গ দুপুরে শাশ্বতী কলেজ-ফেরত বা কলেজের ফাঁকে এসেছে। আপন হয়ে গেছে অনেক। সেই ফ্রক-পরা শাশ্বতী এখনো জানে না, কি ভয়ঙ্কর আকর্ষণে সে জয়ন্তকে ধরে রেখেছে এতদিন, ধরে রাখতে পারে! শাশ্বতীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে আজ। কি করবে এখন সে? ষ্টেশনে আসা তার উদ্দেশ্যহীন। এ সময়ে শাশ্বতীর সঙ্গে অফুরন্ত কথা বলে, ওর চলা, বলা, হাসির কাছাকাছি থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে কিছুক্ষণ। জয়ন্ত নিজের মনেই অসহায়ভাবে হাসল। ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন পাবলিক টেলিফোনগুলির কেবিনের সামনে এসে গেছে।

এখন কাউকে কি টেলিফোন করার আছে? মাঝে মাঝে শাশ্বতীকে টেলিফোন করে নিজের ফ্ল্যাট থেকে। এখনতো শাশ্বতী এখানে! তবে? পত্রিকা অফিসে করবে? হঠাৎ ইচ্ছে হল, অফিসে ফোন করে দিই, 'আজ আমি বৌবাজারের মিটিংটার রিপোর্ট আনতে পারব না। অন্য কাউকে যেন পাঠায়।' তাতে জয়ন্তর লাভ কি? শাশ্বতীকে নিয়ে ঘুরতে পারবে জয়ন্ত। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করতে পারবে। প্রতিদিন একটু একটু করে জয়ন্ত শীতল হয়ে পড়ছে। তেত্রিশ বছরের ক্লান্ত, শীতল জয়ন্ত কুড়ি বছরের এক কুমারীর আশ্রয়ে কিছু সময় কাটাতে চায়। কোন উত্তেজনার আগ্রহে নয়, নিষ্পাপ পবিত্র মেয়ের সান্নিধ্যে নিজের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতাকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে চায়।

কথাটা ফোনে একদিন শাশ্বতীকে বলেছিল। শাশ্বতী স্মিতভার মুখে হেসে

কুটি হয়ে গিয়েছিল। ফোনের সামনে হাসলে শাশ্বতীকে কি রকম দেখায়! জয়ন্ত কখন একটি ফোনের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজার কাচের মধ্য দিয়ে জয়ন্ত দেখল, একটি মেয়ে রিসিভার কানে ধরল। ঠোঁট নেড়ে বলল, 'হ্যালো।'…

'কে! শাশ্বতী?'

'হ্যাঁ, কি খবর আপনার? হঠাৎ ফোন করছেন কেন?'

'এমনি।'

'এমনি!' শাশ্বতী চুপ। 'বৌদি এখন ঘরে নেই বুঝি?' হাসছে শাশ্বতী।

'তোমার গলার স্বর ফোনে কিন্তু খুব ভাল আসে, জানতো?'

'বাঃ, আমি জানব কি করে! আমি তো নিজের গলা শুনছি না।'

জয়ন্ত চুপ করে থাকল। শাশ্বতী হাসছে। হাসুক। জয়ন্ত এ হাসিকে কোন কথা বলে বাধা দিতে চাইছে না।

'বারে, কথা বলুন!'

'সেদিন ট্যাক্সি করে দিগ্বিজয়ের পর কেমন আছ?'

'মোটেই ভাল না।'

'সেকি? অসুস্থ!'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'কালতো পরীক্ষা। সেদিন সন্ধে থেকে আজ পর্যন্ত পড়ায় মনই বসাতে পারছি না।'

জয়ন্তর ভাল লাগল কথাটা শুনতে। শাশ্বতীকে বড় আপন মনে হল। চুপ করে রইল।

'বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' খুক খুক করে হাসতে লাগল শাশ্বতী। 'আগেতো কতদিন একা একা ঘুরেছি আপনার সঙ্গে, বুঝতেই পারিনি অনেক কিছু। আমি তখন খুব বোকা ছিলাম, তাই না?' হেসে চলেছে শাশ্বতী, 'সেদিন কিন্তু কি যেন ধরতে পেরেছি! আচ্ছা, কি বলুন তো?' শাশ্বতীর কথাগুলো হাসিতে ভাসছে, ভাঙছে। 'আপনি কেমন যেন। আপনি কিছুই বলেননি, অথচ এমন একটা অস্বস্তিতে ফেলেছেন আমাকে। কি সব আজে-বাজে ভাবছি। আমি কোনদিন ভাবিইনি, আমি এরকম হবো। বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি কি

ভীষণ শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি! অথচ এখন কিছুই ভাবতে পারছি না। কি যে হয়েছে আমার!'

কি হয়েছে শাশ্বতীর? মুখের চেহারা এখন কিরকম? হাসছে শাশ্বতা। হাসতে থাকুক অবিরল। আরো, আরো। সাজানো বেল-ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতগুলো রিসিভারের মুখে ভাসছে, বড় বড় চোখের সেই পাপহীন শৈশব রিসিভারের চারপাশে জড়িয়ে আছে। শাশ্বতী কথা বলতে পারছ না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে নিজের মধ্যেই। রিসিভার বুকের ওপর উপুড় করা। জয়ন্ত শাশ্বতীর বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এবার। সমুদ্রের অজস্র ছোট ছোট ঢেউ-এর শব্দ। তীরে আছড়ে পড়া জলের নিঃশব্দে গড়িয়ে আসার শব্দ যেন শাশ্বতীর নিশ্বাসে। রিসিভার উপচে পড়ছে শাশ্বতীর হাসিতে। কিন্তু আশ্চর্য! জয়ন্তর মধ্যে কোন কোলাহল নেই! কি শান্ত কঠিন শীতলতায় সে শাশ্বতীর কণ্ঠস্বর, হাসি, শব্দরেখা গ্রহণ করে চলেছে!...

'আপনার লোক কি ফোন করছেন?'

'এ্যাঁ!' জয়ন্ত সচেতন হল। পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

'একটু বলুন না তাড়াতাড়ি সারতে।' ভদ্রলোকটি জয়ন্তর দিকে তাকালেন। জয়ন্ত অপ্রস্তুত হয়ে 'কেবিনের দিকে তাকাল। একটি মেয়ে রিসিভার মুখে ধরে হাসিতে গড়িয়ে পড়ছে।

'আপনিই বলুন।' জয়ন্ত আর দাঁড়াল না। ধীর পায়ে ফোনের কেবিনের কাছ থেকে সরে এল।

কি ভাবছিল সে? জয়ন্ত সিগারেট ধরাল। শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হলেই আজকাল কোথায় যেন জয়ন্তর সব ভুল হয়ে যেতে থাকে। কেউ জানে না তা। শাশ্বতীও না। জয়ন্তও বুঝি ভুলের কারণ খুঁজে পায় না। তবু বোঝে, আজকাল শাশ্বতীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে, ওকে পাশে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে জয়ন্তর মধ্যে সবকিছু যেন মৃদু ভূকম্পনের মত কাঁপতে থাকে। শাশ্বতা ওকে উত্তেজিত করে না, আশ্রয় দেয়। জয়ন্ত সত্যি কেমন ভীরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন বেঁচে থাকার সংসারজীবনে, রেবার কাছে, অফিসের কাজকর্মের মধ্যে, ভালবাসায়—সব জায়গায় সেই ভীতি। ভাস্বতী তাকে ভালবাসায় কিছু দেয়নি, রেবার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপনে সে কিছু পায় না। প্রতিটি মুহূর্তকে প্রেমহীনতা গ্রাস করে নিচ্ছে যেন। সংসার, জীবন, প্রেম, মানুষ, এমন কি নিজের কাছ থেকেও কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রেবা এখনি সন্তান চায় না। অফিসের

দায়িত্ব, একক জীবনের বিলাসের মোহ তার অনেক। সন্তান কি বিবাহিত জীবনের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দেয়? শাশ্বতীর অস্তিত্ব কি তার বিচ্ছিন্নতাকে মুছে দিতে পারে? জয়ন্ত এই মুহূর্তে জটিল ভাবনার এক বর্ণহীন শূন্যতায় ভাসতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে এদিকে বুকিং অফিসের সামনে এসে গেছে জয়ন্ত। থমকে দাঁড়াল। ওর চারপাশে ট্রেনযাত্রীর একটানা স্রোত। কেউ কারোর কথা কানে রাখছে না। এমন তালগোল পাকানো ভিড়ের প্রত্যেকটি মানুষকে একা নিঃসঙ্গ মনে হল হঠাৎ। জলের স্থির-গতি ঘূর্ণির মধ্যে পাক খাচ্ছে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন পাতা, খড়কুটো। কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারছে না। মাঝখানে জলের গর্ত—স্থির, শূন্য, অবধারিত। তার মধ্যে সবকিছু অসহায়ভাবে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোন অস্তিত্বের মিলন নেই। আবার বিচ্ছিন্নতা।

অন্যমনস্ক জয়ন্ত দু'দিকের যাত্রীর ধাক্কা খেতেই এপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠেস দিল দেয়ালে। একটানা সিগারেট টানল কিছুক্ষণ। একসময়ে হাতঘড়ি দেখল। এতক্ষণে শাশ্বতী এসে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। থাক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। জয়ন্তর জন্যে শাশ্বতী উৎকণ্ঠিত, ভীত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছে। কি রকম দেখায় সেই প্রতীক্ষার দৃশ্য—জয়ন্তর দেখতে ভাল লাগবে। দূর থেকে লুকিয়ে দেখবে জয়ন্ত। আস্তে আস্তে পা বাড়াল। সামান্য একটু দূরে একটি ছেলে একটি মেয়ে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছে। জয়ন্ত সেদিকে তাকিয়ে ধীর পায়ে এগোল। মেয়েটি কি যেন বলছে, আর হাসতে হাসতে ছেলেটার দিকে তাকাচ্ছে।

'কি দেখছ?' জয়ন্ত বলল।

'দেখছি, আমার পাশে থাকলে আপনাকে কিরকম দেখায়।'

'বাঃ শাশ্বতী, তোমার বুদ্ধি খুব ঝকঝকে হয়েছে!'

'তাতে কি?' শাশ্বতী চতুর চোখে তাকাল।

'তুমি খুব সুন্দর হয়ে উঠেছ।'

'যখন ফ্রক পরতাম, তখনকার থেকেও!' শাশ্বতী খিলখিল করে হেসে উঠল। শাশ্বতীকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পথে একটা আবছা অন্ধকার গলিতে ঢুকছে তখন।

'ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলে বড় জবুথবু মনে হত। এখন কত বড় হয়ে গেছ। চেহারায় কি স্মার্ট।'

'খুব কি সুন্দর!' ভুরু কুঁচকে শাশ্বতী বয়স্কের ভান মুখে-চোখে আনল।

আহ্ শাশ্বতী! কথা বললে তোমাকে কেন নিষ্পাপ মনে হয় বলতো! মনে মনে বলে জয়ন্ত। লাইটপোষ্টের টিমটিমে আলোয় শাশ্বতীর দিকে তাকাল। শাশ্বতী ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

জয়ন্ত শাশ্বতীকে এই মুহূর্তে আরো কিছু কথা বলতে চাইছে। স্মিত হেসে বলল, 'গলিটায় এখনি কোন লোক নেই, তাতে আবার আবছা অন্ধকার। বেশী সাহস দিও না।' ভিতরে জয়ন্ত উত্তেজনাহীন, ঠাণ্ডা।

শাশ্বতী গোল গোল চোখ পাকিয়ে তাকাল জয়ন্তর দিকে। নিচের পাতলা ঠোঁটে একটা চপল ভঙ্গি এনে হাত দিয়ে ছেলেমানুষের মতন জয়ন্তর পিঠে একটা কিল মারল।

• •

জয়ন্ত একটু বেশী হাসল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলছে না দুজনে। একটু পরে জয়ন্ত শুনল, শাশ্বতী নিজের মনের মত কি একটা গান গুনগুন করে গাইছে। জয়ন্ত কম্পিত আলোছায়া-মাখা শাশ্বতীকে মাঝে মাঝে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। শাশ্বতী ওর কাছে বড় সুন্দর এক খেলা, বড় মনোরম, প্রীতিকর। খেলায় শাশ্বতী মাঝে মাঝে ওকে হারিয়ে দেয়, আর তখনি জয়ন্ত নিজের মধ্যে জিতে যায়। এ ছাড়া এ খেলায় কোন হারজিত নেই। শুধু খেলা। শাশ্বতীকে শুধু দেখা, কথা-বলা, ওকে অনর্গল কথা বলার জন্যে বিরক্ত করা, হাসিয়ে দেওয়া। এ এক খেলা, প্রত্যক্ষ কোন হারজিত নেই। প্রতিদিনের সময়ের অস্তিত্বের একটা আশ্রয় তৈরী করা। প্রণয়ের স্মৃতিতে এ খেলা নেই, বিবাহিত জীবনে এ খেলা নেই, বন্ধুদের আড্ডায় এ খেলা নেই, প্রতিদিনের বাঁচার নিয়মে এ খেলা নেই। কোথাও নেই। এ এক অদ্ভুত খেলা। জয়ন্তকে সব সময়ে জাগিয়ে রাখে, উত্তেজিত করে না। নতুন করে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হতে দেয়ই না, বরং সমস্ত রকম বিচ্ছিন্নতার সুতোয় মাঝে মাঝে টান দেয়।

'কি ব্যাপার! এত ডাকছি শুনতেই পাচ্ছেন না যে!' সামনে শাশ্বতী।

জয়ন্তর অন্যমনস্কতা সরে গেল। শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হল।

'কি এত ভাবতে ভাবতে ঘুরছেন? ইস্, আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!'

জয়ন্ত সহজ হল। 'কোথায় যাবে বলো।'

'যেখানে নিয়ে যাবেন। তবে গা হাত একটু ধুতে হবে। এই গরমে সেই সকাল থেকে টানা প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস করতে হয়েছে।' দু' কাঁধ পিঠ ঈষৎ টান টান করে শাশ্বতী অস্বস্তি প্রকাশ করল।

'চল, একটু কফি খাওয়া যাক। তারপর যাওয়া যাবে।'

'কোথায়? আপনার ফ্ল্যাটে?'

শাশ্বতী খুব সহজেই বুঝতে পেরেছে তো! জয়ন্ত শাশ্বতীর চতুর চোখ দেখল। চোখের সরু কাজল অনেক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। 'আপত্তি আছে নাকি?'

'আপত্তি নয়, লোভ। আপনাকে পাশের ঘরে তাড়িয়ে আমি তাহলে টেনে একটা ঘুম দিতে পারি। এ সময়ে আমাদের বাড়ি কেউ নেই, ফিরতেও ভাল লাগছে না।' শাশ্বতী কফি কর্নারের দিকে পা বাড়াল।

জয়ন্ত শাশ্বতীর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

তারের জাল-ঢাকা ভাঁজ-করা দরজা টেনে খুলল জয়ন্ত। শাশ্বতী ভিতরে এসে নীচু গলায় বলল, 'বেশিক্ষণ বসব না কিন্তু। বরং বাইরে কিছুটা বেড়িয়ে ফেরা যাবে।'

জয়ন্ত শুনেও কোন উত্তর দিল না। চারপাশ চোখ বুলিয়ে নিল। কোন টেবিলই দুজনের বসার মতন খালি নেই দেখে শাশ্বতী হতাশ হয়ে জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্ত চোখের ইশারায় দূরে কোণের টেবিলটার কাছে যেতে বলল। এইমাত্র দুটি অবাঙালী খদ্দের চেয়ার ছেড়েছে। ওরা দুজন চেয়ারে বসল। তৃতীয় চেয়ারটিতে আর একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন। উঠে যেতেই শাশ্বতী বলল, 'আজ আপনার ঘাড় ভাঙব কিন্তু।'

জয়ন্ত বসেই একটা নতুন সিগারেট ধরাচ্ছিল। শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ক্ষিধে পেয়েছে তো? যা খাবে খাও। তবে দোহাই, আমাকে তোমার খাদ্য বাছতে বোলো না।'

আগের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়তেই দুজনে শব্দ করে হেসে উঠল।

শাশ্বতী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'বেয়ারা এখন ওদিকে ব্যস্ত! এর মধ্যে ব্যাগটা গুছিয়ে নি।' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা টেবিলে রেখে জোর করে রাখা বইখাতা বের করে ঠিক করতে বসল।

জয়ন্ত সিগারেট টানতে টানতে শাশ্বতীর মুখ, চেহারা দেখতে লাগল। বড় বড় গোল চোখ, মোটা টানা ভুরু, পাতলা ঠোঁট। গাল ঈষৎ ভেঙে যাওয়ায় শাশ্বতীর মুখশ্রী যেন সুন্দর হয়েছে আরো। কপাল বড় বলে সব সময়েই বড় করে টিপ পরে শাশ্বতী। সামনের দিকে গলার কাছে উঁচু হাড় দুটোর ঠিক মাঝখানে কণ্ঠনালীর ওপর সেই কালো তিলটা। বুকের পরিচ্ছন্ন চামড়ায় মধ্যে ওই ফাঁকে

তিলটা স্থির। জয়ন্তর কোন আসক্তি নেই। শুধু দেখার ভঙ্গিতেই শাশ্বতীকে দেখতে লাগল।

মাথায় একটা ভার অনুভব করল জয়ন্ত। আজকাল রাত্রে ঘুম হয় না জয়ন্তর। রেবা এসবের কিছুই জানে না, নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। আর জয়ন্তকে গভীর রাত্রে উঠে বালিশের তলা থেকে স্লিপিং পিল খেতে হয় সন্তর্পণে। কাল কয়েকটা বেশী খেয়েছিল। শেষ রাতে আসা ঘুম বেলায় ভাঙলেও সেই আড়ষ্টতার সবটা কাটেনি। ষ্টেশনে চলে এসেছিল নিজেকে অপরিচিত ভিড়ের মধ্যে সহজ করতে; এখন অনেকটা কেটে গেছে। তবু মাথার ভার যায়নি। শাশ্বতী সঙ্গে থাকলে কি যাবে? জয়ন্ত শাশ্বতীকে আরও স্পষ্ট করে দেখল। শাশ্বতী সঙ্গে থাকলে অনেক স্মৃতি তৈরী হয়, অনেক কথা অনেক দৃশ্য মাথার মধ্যে রচিত হতে থাকে। বুকের মধ্যে অকারণ শব্দ দ্রুত হয়। এ একটা অসুখ। শাশ্বতী ওকে কখনো চিঠি দিলে যে রকম শব্দ হয় বুকের, যেমন ভয় জমে ওঠে মনের মধ্যে, সে রকম এক নিথর অসুখ জয়ন্তর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে।

জয়ন্ত শাশ্বতীকে মাঝে মাঝেই চিঠি লিখতে বলে। দেয় না। যা অলস আর আত্মসুখী শাশ্বতী! তবু একদিন সন্ধ্যেয় ওর মামার বাড়ি থেকে ভাস্বতীর সামনেই অতি অলক্ষ্যে একটা শাদা কাগজের টুকরো হাতে দিয়েছিল। শাশ্বতীর চিঠি! কি লিখেছে, লিখতে পারে, কেমন করে সম্বোধন করছে এসব ভাবতে ভাবতেই তেত্রিশ বছরের ক্লান্ত জয়ন্ত, বিবাহিত জয়ন্ত, শীতল বিচ্ছিন্ন নিরাসক্ত জয়ন্ত কেমন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কেঁপেছিল। কিন্তু চিঠি হারিয়ে ফেলায় সে চিঠি পড়া হয়নি। হারিয়ে যেতে শাশ্বতী রেগে গিয়েছিল প্রথমে। পরে এখানে-ওখানে একসঙ্গে কয়েকবার বেড়াতে বেরিয়ে চিঠিতে কি লিখেছিল শাশ্বতী কিছু কিছু বলেছিল জয়ন্তকে। কখনো কখনো ঘরে একা থাকলে, সেই অস্বস্তির অসুখটা ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইলে জয়ন্ত সারা ঘরময় পুরনো চিঠিটা খুঁজে বেড়িয়েছে। কেন যেন মনে হয়েছে, সে চিঠির অনেক কথা শাশ্বতী গোপন করেছে বলতে চায়নি, বা হয়ত ভুলে গেছে, অথবা কি লিখেছে নিজেই জানে না।

সে চিঠির মত শাশ্বতী এখন রহস্যময়, আপন। কাছে থাকলে অনর্গল কথা বলে, হাসে, পোষাক সুন্দর করে পরে এসে জয়ন্তকে তৃপ্তি দেয়। শাশ্বতীর বয়স কত? নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তর। উনিশ-কুড়ি? শাশ্বতীকে দেখল। খাবারের অর্ডার দিচ্ছে বেয়ারাকে। অগোছালো বেণীটাকে বুকের ওপর ফেলেছে। হঠাৎ অনেক কম মনে হল ওর বয়স।

'এবার কথা বলুন।' শাশ্বতী জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্ত ওকে দেখছে বুঝতে পেরে দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন শাসনের ইঙ্গিত করে হেসে ফেলল।

শাশ্বতী হাসলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে যেন ভিতর থেকে জয়ন্তকে কঠিন শীতলতায় ধরে রাখে। বড় স্পৃহাহীন হয়ে পড়েছে জয়ন্ত। এ আর এক অসুখ। কবে থেকে এ অসুখ দেখা দিয়েছে? শাশ্বতীকে ভালবাসার পর থেকে? রেবাকে বিয়ে করে? নাকি সংসারে জড়িয়ে গিয়ে? এরা সব বুঝি বিষয়-সুখ?

'কি এত ভাবছেন?' শাশ্বতী টেবিলের ওপর রাখা ডান হাতের মুঠি নেড়ে বলল।

'কিছু না।' জয়ন্ত সোজা হয়ে বসল।

'আপনি যে কি বুঝি না। দাড়ি কামান নি কেন? চুল উস্কোখুস্কো। তার ওপর বাতাসে মাথাটাকে তো বনবাদাড় করে দিয়েছে। সঙ্গে একটা চিরুনী রাখবেন!' শাশ্বতী কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল।

জয়ন্ত ওর কথা বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। কতদিন পাশাপাশি হেঁটে গল্প করেছে, ট্যাক্সি করে ঘুরেছে, অবসর সময়ে ঘরে বসে ওকে দেখতে দেখতে ওর অফুরন্ত গল্প, কথা শুনেছে। এই জন্যেই তো এখন কফি কর্ণারে বসেছে জয়ন্ত। বড় ছেলেমানুষ শাশ্বতী। মুখে-চোখে চেহারায় স্বভাবে কি পাপহীন সারল্য, পবিত্রতা! আর এটাই জয়ন্তর কাছে ভয়ংকর মনে হয়। জয়ন্ত ভিতরে ভয় পায়।

'আহা! কি এত দেখবার আছে।' শাশ্বতী ঠোঁট ফোলাল হঠাৎ। জিভ বের করে সলজ্জ একটা ভঙ্গি করল।

'তুমি বড় পবিত্র শাশ্বতী। তার ওপর এত চতুরতা শিখেছ। ফ্রক ছেড়ে যখন সদ্য শাড়ি পরতে, কি রকম যেন আড়ষ্ট লাগত; কলেজে ঢুকে একেবারে নতুন হয়ে গেছ। আমি সেই নতুনকে দেখি।'

শাশ্বতী চোখ ছোট করল। 'বাজে কথা ছাড়ুনতো!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বেয়ারা সাজানো প্লেট নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই থেমে গেল।

কফি কর্ণার থেকে বেরিয়ে ওরা ষ্টেশনের গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। একটু আগে পর্যন্ত ওরা দুজন তেমন কোন কথা বলেনি। ভরপেট খেয়ে শাশ্বতী একধরনের আরামের ক্লান্তিবোধ করছিল। জয়ন্ত কিছু ভাবছে। অন্যমনস্ক

ভেবে ওর দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসেছে শাশ্বতী, কথা বলে ওর ভাবনায় বাধা দেয়নি।

কফি কর্নারের মধ্যে বসে থেকে একটুও বুঝতে পারেনি, এমন মেঘ করেছে। একটুবা ঝমঝমে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। অগোচরে চারপাশ সন্ধের মায়ায় ঢেকে গেছে। অথচ এখন ঠা ঠা দুপুরে দেড়টাও বাজেনি। চারপাশের ধূসর সিক্ত অন্ধকার ষ্টেশনের আলোগুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। শূন্যে কোন স্বচ্ছতা নেই। সারা আকাশটা একটু আগে যে কালো মেঘে মলিন ছিল, আগের বৃষ্টি তাকে কেচে যেন বিছানো শাদা ধবধবে চাদর করে দিয়েছে।

জয়ন্ত শাশ্বতীর পাশে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। শাশ্বতীর দিকে তাকাতেই ও জয়ন্তকে দেখল। শাশ্বতীর চোখে-মুখে হাসি, কেমন-মজা ভাব। জয়ন্ত শাশ্বতীর চোখের দিকে তাকাল। কালো তারার চারপাশের শাদা অংশটার সঙ্গে এখনকার আকাশের মিল আছে। বড পবিত্র, পরিষ্কার।

'আর তাকিয়ে কি হবে? ট্যাক্সি ধরুন।'

'চল।'

ট্যাক্সিতে আরাম করে বসেছে শাশ্বতী। হাওড়ার ব্রাজের মাঝখানে আসতেই শাশ্বতী বলল, 'আমি কিন্তু গিয়েই আগে গা ধুয়ে নেব।'

'ভালই তো।'

'এই দুপুরে জল পাওয়া যাবে তো?'

'কত গ্যালন?'

শাশ্বতী চোখ পাকাল।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। আকাশে আবার কিছু কালো মেঘ। ট্যাক্সি গঙ্গার ধার ধরে চলেছে। শাশ্বতী বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ জয়ন্তর দিকে ফিরে বলল, 'ইস, আপনাকে একটা মজার স্বপ্নের কথা বলা হয়নি!'

জয়ন্ত সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

'কদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কি?' জয়ন্ত কৌতুক বোধ করল। রাস্তা না পাওয়ায় হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। ঝাঁকানিতে শাশ্বতী যেন জয়ন্তর একটু কাছে সরে এল। কাঁধে কাঁধে লেগে আছে। বাইরে সূক্ষ্ম বৃষ্টির গুঁড়ো মেশানো হাওয়া বইছে জোরে। শাশ্বতীর শুকনো চুল জয়ন্তর মুখ-চোখ মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে।

শাশ্বতী সামনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে জয়ন্তকে দেখল। 'একদিন যেন আপনি আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনি শোবার ঘরের তক্তপোষে বসে। আমি ছোট মামার পাশে। আপনার গা ঘেঁষে বসে আছে ছোট ভাই শিবুটা। গল্প করছে আপনার সঙ্গে। আমি কথা বলছি মাঝে মাঝে।' বলতে বলতে থামল। হাসল। গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েছে।

'হাসছ কেন? বল।' জয়ন্ত শুনতে চাইছে। কথার খেলা বড় ভাল লাগছে জয়ন্তর। মাঝে মাঝে বড় ঝিমিয়ে পড়ে। একটা অসুখ ওকে চারদিকে থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আগে ভাস্বতী কাছে থাকলেও এমন অসুখে জড়িয়ে পড়ত। রেবার সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপনে সেই ঝিমোনো বেড়েছে। অনিদ্রা, অনিচ্ছা, ক্লান্তি, বিরক্তি—সব কিছু জড়িয়ে এক জটিল স্থবিরতা রচনা করেছে ওর মধ্যে। শাশ্বতী সেখানে এক অস্থিরতা আনে। সেই অস্থিরতাই হয়ত সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেতু রচনা করতে চায়। শাশ্বতীর মুখ, চোখ, চেহারা পাপহীন চতুরতায় বিশুদ্ধ। পৃথিবীর প্রথম আলো, প্রথম অন্ধকার, প্রথম বাতাস, প্রথম শব্দের মত এই পাপহীনতা ভয়ংকর। জয়ন্তর মধ্যে তা আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আগুনের আভায় বড় সুন্দর তুমি শাশ্বতী, বড় আপন।

'নাহ্ আমি বলব না। আপনি শুনছেন না!'

চমক ভাঙল জয়ন্তর। 'না, না, আমি শুনছি, তুমি বল।'

'কি বলেছি বলুন তো।'

'ওই তো মামাতো ভাইটি গল্প করছে তোমার সঙ্গে!'

'সত্যিই শোনেন নি তাহলে। যান, আমি কিছুতেই বলব না।'

'এবার শুনব। সত্যি বল।' শাশ্বতীর একটা হাতের মুঠি নিজের হাতে নিল।

শাশ্বতী জয়ন্তর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। 'ভাইটি আপনার গা ঘেঁষে আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আমার ইচ্ছে করছে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে আপনার খুব কাছে গিয়ে বসি, গল্প করি। আমি বারবার যেতে চাইছি, মামিমা কিছুতেই যেতে দেবেন না। আপনার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করছে, আবার ভীষণ ভয় করছে। মামিমা আমাকে যেই ধরছে, অমনি ভয়ে আমি যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি। এই ভয়ের মধ্যেই কখন যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল।'

'ভাল স্বপ্ন তো?'

শাশ্বতী স্বপ্ন বলার ঝোঁকে ছিল। বলল, 'জানেন, মামিমা না, সব সময়

শুধু উপদেশ দেবেন, কত সব বোঝাবেন, আর সাবধান করবেন। আমি যে বড় হয়েছি, আমার যে একটা ভাল লাগার ইচ্ছে আছে, বুঝবেনই না।'

জয়ন্ত কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল। ট্যাক্সি ড্রাইভার একবার আয়নার মধ্যে দিয়ে ওদের দেখল।

'আপনি হাসছেন? যান।' বলেই শাশ্বতী একটু ধারের দিকে সরে গেল। ডান হাতের মুঠি জয়ন্তর মুঠোর মধ্যে।

'হাসছি কেন জান?'

শাশ্বতী ওর দিকে তাকল।

'স্বপ্নে যাকে দেখেছ, সে আমি, না আর কেউ?'

শাশ্বতী চোখ পাকাল। কি ভেবে হেসে ফেলল। 'ওহ্, আর একটা ছেলের কথা আপনাকে বলা হয়নি বুঝি?'

'কই না তো!'

শাশ্বতীকে ছেলেমানুষের মতন নিজের কথা বলায় পেয়ে বসেছে। 'বড় মামিমার এক দূর-সম্পর্কের কি রকম আত্মীয় হয় যেন! তাদের বাড়ি গেলেই ছেলেটা কেবল আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমাকে কত কি খাওয়ায়, আমার কাজ করে দেয়। এমন রাগ ধরে!'

'তাতে কি?',

'একদিন আমাকে কি বলেছে জানেন?'

'কি?'

'তুমি কেবল নিতেই জান, দিতে জান না। আচ্ছা, কি বোকা বোকা কথা বলুন তো?'

'তোমার ন্যায্য দাম দিতে এবং নিতে চাইছে তা হলে।'

'কি জানি, আমি এসব বুঝি না।'

সত্যিই শশ্বতী এসব বোঝে না। জয়ন্ত শাশ্বতীর পোষাক-সমেত ওকে দেখল। হরিণীর উৎসুক স্বচ্ছ চোখে সত্যি কোথাও পাপ নেই। জয়ন্ত শয়তানের মত কথা বলল। 'এখন বোধহয় কিছু কিছু বোঝ। আমার সঙ্গে মিশছ তো!'

শাশ্বতী বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল।

বাইরে হাওয়া নেই। তবে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশের নরম ঘাসের বুকে সমবেত বৃষ্টির ফোঁটাগুলির পতনে বিজ-বিজ শব্দ। জয়ন্তর তরঙ্গস্নাত

পুরীর বালিঢাকা তীরভূমি মনে পড়ল। রেবাকে না বলে একাই একদিন পুরী গিয়েছিল। বালি সিক্ত করে ঢেউ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিক্ত বালির বুকে অদ্ভুত এক বিজ বিজ শব্দ শুনেছে জয়ন্ত। শাশ্বতী কাছে থাকলে সে রকম শব্দ বুঝি ওর বুক থেকে উঠতে থাকে। এখন সবুজ ঘাসে বৃষ্টির সেই শব্দ।

শাশ্বতী বাইরে বৃষ্টির মধ্যে হাত বাড়িয়ে দিল। পাকা ন্যাসপাতির মতন গায়ের রং শাশ্বতীর। হাতের মধ্যে নৃত্যের ভঙ্গিমা জড়িয়ে আছে। নাচ শিখলে ভাল করতে শাশ্বতী!

'ইস্ কি বৃষ্টি বলুনতো? আজ আর একটা দিগ্বিজয় করলে কেমন হয়?'

'দিগ্বিজয়' শব্দটা জয়ন্তই ব্যবহার করেছে। শাশ্বতীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে বা হাঁটাপথে দীর্ঘ সময় কাটালে শব্দটা মনে বাজতে থাকে। এখন শাশ্বতীর গলায় বড় ভাল লাগল। 'ভালতো, চল, গঙ্গার ধার দিয়ে যাবে?'

'তাই।'

গাড়ি রেড রোড ধরেছিল। জয়ন্ত ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল।

শাশ্বতীর ডান হাত এখনো জয়ন্তর হাতের মুঠোয়। অনেক কাছে শাশ্বতী, অথচ জয়ন্ত ভিতরে যেন কেঁপে উঠতে পারছে না! স্পৃহাহীন শরীরের এমন অসম্মান কবে থেকে যেন জয়ন্তকে কঠিন করে দিয়েছে। কেন? বিবাহ? রেবা? ভাস্বতী? নাকি শরীরের এই নিয়ম, বিষয়-সুখের এই পরিণতি? এমন ক্লান্ত, বিষণ্ণ, উত্তেজনাহীন নিরক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া! শাশ্বতীরও ক্ষমতা নেই? অথচ জয়ন্ত শাশ্বতীর মধ্যেই বেঁচে থাকার মন্ত্র খুঁজছে! শাশ্বতীও কি ভুল?

শাশ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে আসক্তিহীন দিগ্বিজয়-বাসনা কি তুমুল হয়ে উঠেছিল সেদিন।

'আজ আমাদের সত্যিই দিগ্বিজয় কিন্তু।'

'কেন?' শাশ্বতী বলেছিল।

'দেখলে না, সারা কলকাতায় আজ সন্ধে থেকে ট্যাক্সি ধর্মঘট। কেউ একটি ট্যাক্সি পাচ্ছে না। আর আমরা দুজনে কেমন একটানা ট্যাক্সিতে সারা কলকাতা ঘুরছি। আজ আমার বড় প্রয়োজন ছিল।' ভিক্ষুকের মত গলা জয়ন্তর।

'আজ যদি না বেরুতাম?'

'মদ খেতে হত।'

'মামাবাবু কিন্তু আজ সত্যি বারণ করেছিলেন বেরুতে। না বেরুলে বেশ জব্দ হতেন তো? বৌদির কাছে একজন মাতাল কেমন বকুনি খেত।'

'খুব কথা শিখেছ দেখছি!' জয়ন্ত হাতটা হাতের মধ্যে নিয়েছিল। 'তা ছাড়া তোমার বৌদি তো জানে, আমি মদ খাই।'

'ইস আপনার হাত কি ঠাণ্ডা!'

'ভয়ে।'

'কিসের ভয়।' বোকার মতন প্রশ্ন করেছিল শাশ্বতী।

'তোমার। তুমি কাছে থাকলে।'

'যান।'

'সত্যি। আমি শুধু তোমাকেই ভয় পাই।'

কি ভেবে শাশ্বতী সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে গিয়েছিল। হঠাৎ চুপ করে গেলে জয়ন্তর মনে হয়, শাশ্বতীর বুঝি গোপনে বয়স বাড়ছে। শাশ্বতী ওর সেই হৃদয়ের শব্দে বয়স বাড়ার ভার অনুভব করে হয়ত। জয়ন্ত নিশ্চুপ। শাশ্বতীর কপালের চুলে জয়ন্তর নাক, মুখ চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওর কাঁধ জয়ন্তর কাঁধে ধাক্কা খাচ্ছিল। শাশ্বতী হাত সরায়নি। এই হাত জয়ন্তর কাছে এক এক সময়ের আশ্রয় বুঝি। 'শাশ্বতী তোমার হাতে একটা চুমু খাব?' ফিস ফিস করে সেদিন ট্যাক্সির অন্ধকারের মধ্যে বলেছিল জয়ন্ত।

শাশ্বতী মৃদু হেসে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। জানালার ধারে সরে গিয়ে বসেছিল একসময়ে।

'দিগ্বিজয়' শব্দটা আবার উচ্চারণ করে জয়ন্ত শাশ্বতীর দিকে তাকাল। বৃষ্টির মধ্যে চোখ রেখে শাশ্বতী বুঝি দুচোখ স্বচ্ছ করছে। নীরব শাশ্বতী। ওর হাতের মুঠি থেকে কখন হাত সরিয়ে নিয়েছে। আরামে ঠেস দিয়েছে পিছনের গদিতে। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক। কণ্ঠনালীর খাঁজের মধ্যে সেই স্থির তিলটা চোখে পড়ল। বুকের কাপড় সরে গেছে শাশ্বতীর। জয়ন্ত পবিত্র চেহারার মধ্যে কিশোরী শাশ্বতীর সেই বুদ্ধিহীন, চাতুর্যহীন সরল রেখাগুলি দেখতে চাইল। সন্তর্পণে খুঁজতে লাগল। আর খুঁজতে খুঁজতে অনুভব করল, সে উত্তেজিত না হয়েও কখন যেন ভিতরে অসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। পাশে শাশ্বতী। কি ঝকঝকে শাশ্বতী।

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মত শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। জয়ন্ত যেন শাশ্বতীর শরীর থেকে সেই অদ্ভুত গন্ধটা পেল।

ট্যাক্সিতে, সিনেমায়, রাস্তায়—যখনি শাশ্বতী পাশে থেকেছে, এক রহস্যময় গন্ধে জয়ন্তর নিজেকে আচ্ছন্ন মনে হয়েছে। মৃগনাভির গন্ধের মত। শাশ্বতী কি সত্যি হরিণী? 'হরিণী বলিছে—শুন হরিণারে। এই বন ছাড়ি তুই চল বনান্তরে।' বিড় বিড় করল জয়ন্ত। কবে যেন প্রাচীন চর্যাগীতিতে পংক্তিটা পড়েছিল। 'অর্থনীতির এম. এ. জয়ন্ত চিরকালের কবিতা-প্রেমিক বলে কিছুই বাদ রাখনি? তাই না?' জয়ন্ত নিজেকে প্রশ্ন করেই হাসল। শাশ্বতীকে দেখল। বনান্তরে নিয়ে যাবে শাশ্বতী? ডাকছ? তোমার কথা শুনলে, তোমার দেখা পেলেই সেই ডাক শুনি শাশ্বতী। আর কি যেন মনে হয় তখন: আমার সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রেবাকে ভুলে যাই, ভাস্বতীর কথা প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হয়ে ওঠে। বিবাহ, প্রয়োজন, সন্তান, সংসার, আত্মীয়স্বজন—সব অতি অগোচরে যেন বিষয়সুখ হয়ে ওঠে, মিথ্যে অলীক হয়ে যায়। আমি শক্তিধর হই।

'বাবু কিধার যায়েগা?'

সম্বিৎ ফিরে এল জয়ন্তর। শাশ্বতীর দিকে আচমকা তাকাল। আকাশের কালো মেঘে চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে আরো। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে কখন।

জয়ন্ত আর একবার শাশ্বতীর দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'রেসকোর্সের চারপাশ একবার ঘুরিয়ে ভবানীপুর চলুন।'

ট্যাক্সির মধ্যে শেষের দিকে রাস্তাটুকু শাশ্বতী কেন যেন চুপ করে ছিল। জয়ন্তর ফ্ল্যাটে পা দিতেই প্রচুর কথায় মুখর হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে। রেবা এখন অফিসে। অফিস থেকে আজ আর ফিরবে না। সহকর্মীদের সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। ফ্ল্যাটে এখন থাকবার মধ্যে জয়ন্তর অল্পবয়সী চাকর তারক। এই ঠাণ্ডা বাতাসে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তারক। দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে তার ঘুম ভাঙাল জয়ন্ত।

'কি করে ঘুমোচ্ছিস?' জয়ন্ত ঈষৎ ধমক দিল।

চোখ কচলাচ্ছে তারক। ঘুম-জড়ানো চোখে তাকাল।

'দরজায় খিল দিয়ে দে।' বলে জয়ন্ত ওর ঘরে চলে এল। পিছনে পিছনে শাশ্বতী।

'বাথরুমে গা ধোয়ার জল আছে? সাবান-তোয়ালে সব গোছানো আছে তো?'

তারক সামনে এসে দাঁড়াল। ঘাড় নাড়ল। 'আছে।'

'যা, আর তোকে দরকার নেই। শুয়ে পড়।'

তারকের চলে-যাওয়া দেখে বোঝা গেল, সে শুধু এই কথাটুকু শোনার জন্যেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

শাশ্বতী অনেকক্ষণ ধরে গা ধুলো। সুগন্ধি সাবানের গন্ধ গায়ে মেখে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে যখন ঘরে ঢুকল, তখন জয়ন্ত জামা-কাপড় বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছে। ওর ঘরের মেঝেয় দাড়ি কামাতে বসেছে। 'দাড়িটা কামিয়ে নিলাম। সময় পেলাম যখন।'

'কি ভাগ্য!'

জয়ন্তর দাড়ি-কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। দাড়ি কামানোর বাক্সটা গুছোচ্ছিল। শাশ্বতীর কথায় মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল। অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত শাশ্বতীকে দেখল। এতক্ষণ পরে-থাকা শাড়ি-জামাই জড়িয়েছে গায়ে। কিন্তু জয়ন্তর মনে হল এমন পরিচ্ছন্ন শুভ্রতায়, পৃথিবীর প্রথম রৌদ্রের মত এত নির্মল আলোয় শাশ্বতীকে কোনদিন দেখেনি, আর দেখবেও না কোনদিন। মুখে-চোখে কোথাও এতটুকু মলিনতা নেই। সেই প্রথম আলো! দুর্গম অরণ্যের সেই নিষ্কলুষ হরিণী! এই হরিণী যেন সমস্ত অঘটন ঘটাতে পারে, ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। 'চল বনান্তরে।' জয়ন্ত নিজের মধ্যে কেঁপে উঠল।

শাশ্বতী দৃষ্টি দিয়ে ধমক দিল। 'আপনি ওভাবে দেখবেন না তো! আজ কি প্রথম দেখছেন আমাকে?' খিলখিল করে হেসে উঠল শাশ্বতী। আলমারীর লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অল্প প্রসাধন সেরে নিল দ্রুত হাতে। রেবার সঙ্গেও পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে বৌদির আত্মীয়তা পাতিয়েছে। তাই রেবার প্রসাধন দ্রব্যে সম্ভবত ও একটা অধিকার বোধ করে। কোথায় কি থাকে জানে।

'কাপড়টা অনেকক্ষণ পরে আছি। একটু সেন্ট লাগিয়ে নি, কি বলুন?' নিজে নিজেই বলে রেবার সেন্টের শিশিটা কোত্থেকে যেন বের করল। ছেলেমানুষের মত বুকের আঁচলে শিশির মুখ চেপে সেন্ট লাগাল। কাপড়ে গোলাকার ভিজে দাগ স্পষ্ট হল।

জয়ন্ত দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে শাশ্বতীর প্রসাধনচর্চা দেখছিল। সেন্ট লাগানোর চিহ্ন আর কণ্ঠনালীর সেই ছোট খাঁজের তিলটা একসঙ্গে চোখে পড়ল।

'এখন আপনি কি করবেন?'

'তুমি কি ঘুমোতে চাও ?'

'তা ছাড়া আর কি করার আছে ?'

'বেশ তো, আমি ওঘরে যাচ্ছি, তুমি একটু শুয়ে নাও। বিকেল হলে যাবে।' জয়ন্ত হাসল। ওর মুখে-চোখে সরলতা আস্বাদন করতে চাইল।

'বৌদি কখন ফিরছেন ?'

'বোধহয় আজ আসবে না। অফিসের নাটকের রিহার্সাল আছে।'

'আপনি বিকেলে কি করবেন ?'

'কি আবার। একটা মিটিং-এর রিপোর্ট দিতে হবে অফিসে।'

'বেশ আছেন।' শাশ্বতী এতক্ষণ দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার বিছানায় উঠে একটা কোণে বসল।

কি ভেবে কথাটা বলল, জয়ন্ত বুঝতে পারল না। জয়ন্ত একটু দূরে মেঝেয় পাতা ইজিচেয়ারটায় বসতে যাবে, থমকে দাঁড়াল। রেডিও থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিছানার গায়ে টেলিফোনটায় চোখ বুলোল। এঘর থেকে পাশের ঘরে যাবার মাঝখানের দরজার কাছে এগিয়ে এল। দরজা খুলে ওঘরে ঢুকল। এটা জয়ন্তর ঘর। সবকিছু তছনছ করা। রেবার নিপুণ হাতের গোছানো মুহূর্তে মুছে যায়। রেবা ভীষণ রাগ করে। সারা ঘরময় পোড়া সিগারেট ছড়ানো। চারপাশের দেয়াল ঘেঁষে বই-এর জঞ্জাল। দু'তিনটে অ্যাসট্রে উপুড় করা। জামা-কাপড় তক্তপোষের নীচে স্তূপ করা। অথচ আজ সকালে অফিস যাবার আগে রেবা কি নিখুঁত করে গুছিয়েছিল! জয়ন্ত হাসল। রেবার হিসেব মত এত সহজ হওয়া জয়ন্তর কেন যেন পোষায় না। এ ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। আবার শাশ্বতীর সামনে এল।

'একটু বরং গল্প করি। তারপর যখন ভাল লাগবে না, ঘুম পাবে, হাই উঠবে, তখনি না হয় একটু শুয়ে নেব।'

শাশ্বতী হাসল। 'তাই, আপনি বসুন।'

'আচ্ছা শাশ্বতী, রেবাকে তো 'তুমি' বলো। আমাকে বলতে পার না ?' জয়ন্ত হাসল। কিছু একটা বলা দরকার, বলে ফেলল হঠাৎ।

শাশ্বতী একটু অবাক হল। 'উহু, এই 'তুমি' বলা নিয়ে আর কথা তুলবেন না তো। বিষয়টাই কেমন বোকা বোকা লাগে!'

'মানে! বলতে চাইছ, আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা হতে চাইছি!' বলেই হো হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত। 'আমি কিন্তু এমনি বলতে চাইছিলাম।'

'প্রেমিক হতে বুঝি ভয় পান ?'

'তুমি খুব চালাক হয়েছ শাশ্বতী। কেমন নির্বিবাদে কথাগুলো বলছ আমাকে !'

'আচ্ছা বেশ, আর বলব না।' শাশ্বতী কৃত্রিম অভিমানের ভান করল।

জয়ন্ত নিখুঁতভাবে তা লক্ষ্য করল। শাশ্বতী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কেমন বড় হয়ে যায়। বয়স বাড়িয়ে ফেলে। 'অ্যাডাল্ট্।' কিন্তু বয়সের সঙ্গে ভিতরের স্বভাব আর মনের এমন অমিল রাখতে পারে কি করে ? বয়স হয়েছে, অথচ কথায় সেই কিশোরীর সারল্য, শিশুর পবিত্রতা, প্রথম যৌবনের নিষ্পাপ অধিকার চেতনা !

শাশ্বতী মাথা নীচু করে পায়ের নখে আঙুল বোলাচ্ছিল। জয়ন্তকে চুপ করে থাকতে দেখে আড়চোখে একবার দেখল। জয়ন্ত মুচকি হাসছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার জয়ন্তর দিকে তাকাল। এখনো হাসছে আর শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে আছে। জয়ন্তকে অনেক পরিষ্কার মনে হল শাশ্বতীর। 'কি দেখছেন ?'

'এমনি।' জয়ন্ত নিস্পৃহকণ্ঠে বলে সিগারেটটায় টান দিল।

'চোর কোথাকার !' মনে মনে বলল শাশ্বতী। হাসতে হাসতে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

জয়ন্ত বুঝতে পারল, শাশ্বতী নিজের মনে কিছু ভাবছে। ভাবুক। জয়ন্ত দেখতে চায়। শাশ্বতী কথা বললে, হাসলে, চুপ করে থাকলে, কখনো সুন্দর, কখনো গম্ভীর মনে হয়। চতুর স্বভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। জয়ন্ত মাঝে মাঝে ওকে আজেবাজে কথা বলে, ছেলেমানুষের মতন অকারণ বেশী কথা বলে শাশ্বতাকে দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়। এতে যদিবা ওর একাকীত্ব কাটে, রাত্রির অনিদ্রায় একটু আরামও হয়। বাঁচা বড় প্রয়োজন। সমস্ত একঘেয়েমি থেকে, ঝিমুনি থেকে বাঁচা। শাশ্বতী সেই বাঁচার মন্ত্র। সেই বেঁচে মরার বিচ্ছিন্নতায়, পৃথিবীর সবকিছু—সমাজ, বিবাহ, গতানুগতিক হয়ে ওঠার বিরক্তিতে হয়ত শাশ্বতী একটা সেতু, একটা পথ বা পথের পাশের সেই সুগন্ধ-গোলাপ। শাশ্বতী সেই হরিণী যে হরিণকে বনান্তরে নিয়ে যেতে চায়। বড় মনোরম সে বনান্তর। শাশ্বতীর মধ্যেই কি সেই বন, বনান্তর ? হয়ত তাই। অনেকক্ষণ বাদে আবার সেই সাবানের গন্ধ, একটু আগে বুকের আঁচলে নেওয়া সেন্টের গন্ধ, বুঝিবা মৃগনাভির গন্ধ নাকে এল। জয়ন্ত বনান্তরে যাবে। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে শাশ্বতী ?

'এভাবে চুপ করে বসে থাকার চেয়ে ঘুমোন ভাল।' শাশ্বতী হাসতে হাসতে বলল।

'নাহ্, তুমি ঘুমোও, আমি ও ঘরে যাই। দুচোখ বড় জ্বালা করছে।' জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। বাইরে এখন বৃষ্টি নেমেছে।

শাশ্বতী পাশেই ফোনের রিসিভারে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তাই যান।'

জয়ন্ত এ ঘরে চলে এল। মাঝের দরজা ভেজিয়ে দিল। বর্ষার দিনে এ ঘরটা একটু বেশী অন্ধকার থাকে। আলো না জেলে জয়ন্ত ওর চেয়ারে এসে বসল। দুপুরে কোনদিনই ঘুম হয় না জয়ন্তর। অনিদ্রা সারা-দিনরাত দুচোখ জড়িয়ে থাকে। স্লিপিং পিল খেয়ে ভোররাতে যা একটু ঘুম হয়! এখন মাথার মধ্যে বড যন্ত্রণা হচ্ছে যেন। কি এক অস্বস্তি। এখনি বোঝহয় স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোতে হবে ওকে।

জয়ন্ত সিগারেট ধরাল। ঠেস দিয়ে মাথাটা চেয়ারের ওপর রাখল। ঘাড থেকে ঈষৎ আরামের প্রবাহ মাথার মধ্যে বইতে শুরু করেছে যেন। তবু শাশ্বতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যে জটিল অস্বস্তি মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে, তা থামছে না। এ যন্ত্রণা যেন বহুদিন অনাস্বাদিত ছিল। শাশ্বতী তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আহ্ শাশ্বতী, তুমি কত ভাল, কত বুদ্ধিমতী, কি চতুর! ভালবাসা তোমার মনের মধ্যে গড়ে তুলেছ। ভালবাসা, প্রেম, প্রীতি। তোমার মধ্যে সেই কিশোর কাল থেকে নিজের মত করে ভালবাসা লালিত হতে দেখেছি। অনুভব করেছি তোমার মুখে চোখে। পর পর সাজানো বেলফুলের কুঁড়ির মত দাঁত, ঈষৎ ভাঙা গাল, গোল গোল চোখ, সোনার পাতের মত পাতলা ঠোঁট, সেই কণ্ঠনালার কাছে স্থির একটা তিল। আহ্ শাশ্বতী, একটা যদি চুমু খাই। যদি সেই চুমোতে তুমি সুন্দর হয়ে ওঠ, তুমি যদি হাসতে থাক অনবরত উডন্ত প্রজাপতির মত, ভাসমান মেঘের মত, বৃষ্টির শব্দের মত, তুমি যদি বর্ষার সুস্নাত পরিচ্ছন্ন তৃণ হয়ে যাও! আহ্ শাশ্বতী, তোমার ঠোঁটে কি প্রথম পতিত শিশিরের গন্ধ! আহ্ শাশ্বতী, তুমি হৃদয়ের প্রতিটি শব্দে তোমার লক্ষ্মীর মত পা ফেলে ফেলে ছুটতে থাকো, সেই মাজা সোনার মত পা, পায়ের ডিম—যা একটু আগে গা ধুয়ে এলে চোরের মতন দেখেছি, সেই পায়ে পায়ে যদি দামালপনা আমার বুক থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত গড়াতে থাকে…তাহলে…আহ্ শাশ্বতী, আমি তৃণ হয়ে যাব, শরতের মেঘ হবো, বৃষ্টির শব্দ হবো, আমি ভীষণ শক্তি পাব। যতদিকের

বিচ্ছিন্নতা আছে, সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে বিচ্ছিন্নতা শূন্যে মিলিয়ে দেব। আমি পবিত্র হবো—তোমার মত পবিত্র, বিশুদ্ধ, পাপহীন।

জয়ন্ত ভিতরের ঈষৎ নিদ্রার ঝিমুনির অস্বস্তিতে তীব্র ঝাঁকানি খেল। হাই উঠল পর পর দুবার। দু'চোখে অস্বস্তি। অনিদ্রা ছিল দু'চোখের পাতায়। এখন তন্দ্রার আড়ষ্টতা, অস্বস্তি। এ যেন জয়ন্তকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে। জয়ন্ত ক্রমশ চারপাশের বৃষ্টির শব্দ দূরাগত হতে শুনল। চারপাশ স্তব্ধ। সারা ঘর বুঝি অন্ধকার, কালো নিথর হয়ে গেল।···

খট্‌খট্‌ করে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের শব্দ হচ্ছে জয়ন্তর সামনে। চারপাশ লোকে লোকারণ্য। জয়ন্ত রেসকোর্সের সবচেয়ে সেরা এক নতুন ঘোড়ায় নতুন করে বাজি ধরেছে আজ। অনেকদিন পরে জয়ন্ত তার খেলায় নেমেছে। মদ খাওয়ার দরকার হয়নি। এতটুকু উত্তেজিত নয়। ঠাণ্ডা মাথায় জয়ন্ত ঐ শাদা তেজী ঘোড়াটায় বাজি ধরেছে। ঘোড়াটা অনেক ঘোড়ার মধ্যে ছুটছে জোরে। আরো জোরে, আরও আরও,···। চারপাশে হাততালি। প্রথম হয়ে গেল ঘোড়াটা আর সকলকে হারিয়ে। এবার ঘোড়াটা একা দৌড়চ্ছে। জেতা ঘোড়া জয়ন্ত নিজে ধরতে চায়, পারছে না। কিছুতেই না। হঠাৎ জয়ন্ত নিজেকে দেখল ওর ঘরের মধ্যে। ঘোড়াটা তার ঘরে। মাঝের দরজা দিয়ে কেবল এ-ঘর ও-ঘর দৌড়চ্ছে। কি হাঁফাচ্ছে ঘোড়াটা! হিস্‌ হিস্‌ শব্দ হচ্ছে চারপাশে। জয়ন্ত এবার ধরে ফেলবে। কি আশ্চর্য! ঘোড়াটা হঠাৎ হরিণ হয়ে গেল! জয়ন্ত এবার ভয় পেল। গহন অরণ্যের হরিণের চোখ বড় নিষ্পাপ, সপ্রতিভ, বড উৎসুক। জয়ন্তকে দেখেই হরিণটা তীব্রবেগে দৌড়তে আরম্ভ করল। খটা··· খট্‌, খটা....খট্‌···

তন্দ্রা ছুটে গেল জয়ন্তর। চকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হল। মাঝের দরজায় কেউ শিকলটা ঠক ঠক করে নাড়ছে।

'কে?'

'আমি। খুলুন।' শাশ্বতীর গলা।

'খোলা আছে।' বলে জয়ন্ত দরজার সামনে এসে কপাট খুলে দিল।

'সত্যি ঘুমোচ্ছেন নাকি?' শাশ্বতী হাসছে।

'নাহ্‌।' জয়ন্ত যেন লজ্জা পেল।

'আমি জানি আপনি কিছুতেই ঘুমোতে পারবেন না।'

'কেন?'

'এমনি।' একটু হাসল। 'ওঘরে বসে কি হবে? আসুন, তাস খেলি, সময় কাটবে ভাল।'

জয়ন্ত হাসল। 'তাস পাবে কোথায়?'

'আলমারীর মাথায় খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছি।' শাশ্বতী আর কোন কথা না বলে বিছানায় তাস ছড়িয়ে বসল।

জয়ন্ত এগিয়ে শাশ্বতীর সামনে মুখোমুখি বসে পড়ল। দেখল শাশ্বতীকে। বাইরে মেঘের গুম গুম শব্দ। চারপাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের ঝুমঝুমি। জয়ন্ত একটা সিগারেট ধরাল। শেষ কাঠিটা জ্বেলে খালি বাক্সটা দালানে ছুঁড়ল। একসময়ে কয়েকটা তাস হাতে নিল জয়ন্ত। ভিতরে বড় অস্বস্তি, অথচ এক কঠিন শীতলতা। জয়ন্ত এসব থেকে বাঁচতে চায়। শাশ্বতীকে মুখর করে তোলা যাক। জয়ন্ত ভাবল। বড় ঝিমুনি আসছে, বড ক্লান্তি, বড অবসন্নতা।

'কি খেলবে বল? ব্রিজ?,

'নাহ্।'

'ব্রে?

'ভাল লাগে না।'

'ফিস?'

'এখন ওটাও খেলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে ফ্ল্যাশ।'

'আমি জানিই না। তাছাড়া খেলাটা খুব খারাপ কিন্তু।'

জয়ন্ত হাসল। শাশ্বতার মুখে-চোখে নিহিত শৈশবের ভীতি ওকে বড় খুশি করছে। 'তাহলে তো টোয়েন্টি-নাইন খেলতে হয়।'

'সেই ভাল। দুজনে চার হাতের খেলা খেলব। কেমন মজার হবে না?' শাশ্বতা তাস গোছাতে বসল।

জয়ন্ত দমে গেল। শাশ্বতী খেলাটা মেনে নিতেই মুহূর্তে কেমন নিরুৎসাহ উত্তেজনাহীন হয়ে পডল। শাশ্বতীর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোমার ওই খেলা থাক। যে খেলায় রহস্য আছে, ভয়ংকর গোপনতা আছে, সেই খেলা খেলব এস।'

'সে আবার কি?' শাশ্বতীর চোখে-মুখে বিস্ময় উপচে পডছে।

'ফ্ল্যাশ। তিন তাসের খেলা। দারুণ ইন্টারেস্টিং।' জয়ন্তর কণ্ঠস্বর উল্লসিত।

'আমি জানি না যে!'

'ঐ জন্যেই তো এই খেলাটা দারুণ অ্যাট্রাকটিভ। যা তুমি জান না অথচ আমি জানি, আমি তোমাকে শেখাতে পারি।'

'যান, বাজে বকবেন না তো।'

শব্দ করে হেসে উঠল জয়ন্ত। সামনে তিনটে তাস উলটো পিঠ করে পাশপাশি রাখল। 'তিনটে তাসের পরিচয় ঠিক করে নিই আগে। ধর এটা তুমি, এটা আমি আর মাঝেরটা সময়।' আবার হাসতে লাগল। 'এই তিনটে তাস কি, আমরা কেউ জানি না। সময়ও না। কারণ সময়কেও উল্‌টো তাসে বসিয়েছি।'

মনোমত খেলার আনন্দে জয়ন্ত অনেক কথা বলছে। 'আমি, তুমি, সময়—আমরা কেউ কাউকে যেমন চিনি না, তেমনি নিজেরা নিজেদেরও চিনি না। অথচ দেখ, এই তিনটি তাস না থাকলে গোটা খেলাটা তৈরি হয় না। কি চমৎকার জড়ানো ব্যাপারটা, তাই না?' শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

শাশ্বতী অবাক হয়ে জয়ন্তকে দেখছে। জয়ন্তকে যেন নতুন মনে হচ্ছে। কিছু না বলে স্মিত হেসে আবার উপুড় করা তাসগুলোর দিকে তাকাল।

'আমার তো মনে হয়, কোন কিছু জটিল, গোপন হলে ভিতরটা কেমন ভয়ংকর নড়ে ওঠে। সবকিছু তুমুল হয়ে ওঠে।'

'আমি বুঝিই না। বাদ দিন।' বলেই শাশ্বতী উল্‌টো করে রাখা একটা তাসে হাত দিল।

'আহ্‌, সময়কে এভাবে স্পর্শ কোরো না। বড় বিরক্তিকর। এত বোরিং, মনটনাস।' জয়ন্ত হঠাৎ শাশ্বতীর হাতটা ধরল। 'আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি, বস। এমন গোপন রহস্য, ভাল লাগছে না? আমার তো রোমাঞ্চ লাগছে।' অনর্গল বলছে জয়ন্ত।

শাশ্বতী তবু হাত সরাতে কোন উৎসাহ দেখাল না। জয়ন্তকে দেখল। কৃত্রিম রাগের ভঙ্গিতে বলল, 'হাত ছাড়ুন।'

'কি করবে?'

'পালাব।'

'সত্যি!'

'সত্যি।'

'পালাও তো দেখি!' জয়ন্তর মধ্যে সেই দীর্ঘদিনের জমা শীতলতা শাশ্বতীকে যেন ছেড়ে দিতে বলল। ঈষৎ ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছেড়ে দিল।

মুহূর্তে ছিটকে সরে গেল শাশ্বতী জয়ন্ত কাছ থেকে। 'আমি কিন্তু খেলব না।'

'আমি তো তা-ই চাইছি। তুমি কিছুতেই খেলবে না। অথচ আমি খেলা চাই।' মনে মনে বিড় বিড় করল জয়ন্ত। শাশ্বতীর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল।

'দেখছেন কি?'

'তোমাকে।'

'বাব্বা! কতবার দেখবেন?' শাশ্বতী জড়ো-করা দু'হাটুর আড়ালে মুখ লুকিয়ে শাড়ির প্রান্তে পা ঢাকল।

'শাশ্বতী, তুমি হরিণী হয়ে গেছ।'

'যান, কাব্য করবেন না তো!'

জয়ন্ত হেসে উঠল। শাশ্বতীও। জয়ন্ত উঠে এগোবার মত নিষ্ফল ভঙ্গি করতেই শাশ্বতী তড়িতে খাটের উপর উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে সরে এল এ-কোণে। জয়ন্ত কৌতুক করার জন্যে সত্যি উঠে পড়ল। শাশ্বতী আবার এ-পাশে সরে এল।

'আমাকে নীচে নামতে দিন। আমি বাইরে চলে যাই।' হাসছে শাশ্বতী।

জয়ন্তর দেখতে বড় ভাল লাগছে শাশ্বতীকে। কথা বলার সময় শাশ্বতীর বুক ঈষৎ নামে। হাসলে শাশ্বতীর হৃদয়ের শব্দ বাড়ে, বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসের পতন দ্রুত হয়। আহ্ শাশ্বতী, তুমি হাসতে থাকো। সারা ঘরময় দৌড়ও। বাইরে বেরিও না। বড় প্রকাশ্য মনে হয় সেখানে। ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাক। এই দেখ আমি এগোচ্ছি।

এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল জয়ন্ত।

শাশ্বতী বাইরে যাবে ভেবে ছিটকে আলমারীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। জয়ন্ত বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে শাশ্বতীর পা ছুঁতে চাইল। শাশ্বতী প্রচুর হাসতে হাসতে মেঝেয় লাফিয়ে পড়ল। 'খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু!' বলতে বলতে শাশ্বতী ওপাশে সরে যেতে থাকল। ধাক্কা খেল মেঝেয় পাতা ইজিচেয়ারটায়। ডিঙিয়ে শাশ্বতী দূরে কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল।

শাশ্বতীকে দেখে জয়ন্ত একভাবে তাকিয়ে থাকল। ঘরের সব দরজা জানালা

বন্ধ করে একবার একটা চড়ুই পাখিকে সারা ঘরময় তাড়া দিয়েছিল জয়ন্ত। শাশ্বতী কাঁপছে। বুক উঠছে নামছে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে। দুচোখে ভয়, কৌতুক, খেলার কৌতুহল। জয়ন্তর বারবার চড়ুই পাখিটাকে মনে পড়ল। আর দৌড়লে শাশ্বতী যেন হরিণী হয়ে যায়। জয়ন্ত কি ভেবে দ্রুত কয়েক পা শাশ্বতীর দিকে এগিয়ে গেল। জয়ন্তর পাশ দিয়ে পালাতে গিয়ে জয়ন্তর স্পর্শের মধ্যে এসে গেল শাশ্বতী। শাশ্বতীর নীচের ঠোঁটে দ্রুত আঙুল ছুঁইয়ে সরিয়ে নিল। শাশ্বতী সরে এসে আবার খাটের উপর উঠল। অফুরন্ত হাসছে।

…আহ্ শাশ্বতী, এ তুমি কোথায় আমায় নিয়ে চলেছ? বনান্তরে? তুমি কি হরিণী? এই সময় তোমায় হরিণীর মতন মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করো শাশ্বতী, তুমি বিশ্বাস করো, সত্যি, বিশ্বাস করো

শাশ্বতী আবার পালাবার জন্য খাটের নীচে নেমে পড়ল। খাটের পায়ে ধাক্কা খেতেই 'উহ্' শব্দ করে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। 'আপনি সত্যি এগোবেন না কিন্তু!'

'আমি তোমাকে একবার শুধু স্পর্শ করব শাশ্বতী।' জয়ন্তর মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল। এগিয়ে এসে শাশ্বতীর মুখমণ্ডল ডান হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। শাশ্বতীর ঠোঁট শীতল সাপের দেহ মনে হল। ঠোঁটে আঙুল বুলোতেই শাশ্বতী খাটের ও-কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'দেখুন, কেমন পালিয়ে এলাম, ধরতে পারলেন না তো?'

জয়ন্ত তা-ই চাইছিল। শাশ্বতী পালিয়ে যাক। ধরলেই তো হেরে যাবে জয়ন্ত। খেলা শেষ হয়ে যাবে। 'আমি কিন্তু ধরতে পারি।'

'ইস, ধরুন তো?' হাঁপাচ্ছে শাশ্বতী। বুকের ওপর আঁচল নেই।

জয়ন্ত শাশ্বতীর সামনে এসে ওর হাত ধরল। শাশ্বতী আর খেলতে পারছে না। ক্লান্ত। অনর্গল হাসছে।…শাশ্বতী তোমাকে একটা চুমু খাব?

শাশ্বতী জয়ন্তর বুকের সামনে দাঁড়িয়ে। হাসতে হাসতে জয়ন্তর চওড়া বুকে মাথা রাখল। হাসি থেমে গেছে। সেই চড়ুই পাখিটার মত কাঁপছে শাশ্বতী। চারপাশ নিথর। বাইরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। শূন্যময় পরিবেশ সংখ্যাতীত বৃষ্টির শব্দে প্লাবিত। জয়ন্ত শাশ্বতীর মুখমণ্ডল দৃষ্টির সামনে ধরল! দু'চোখ নিদ্রিত শাশ্বতীর। কপালের ওপর চুলের সীমারেখা বরাবর চকচকে বালির মত স্বেদ। এমন শান্তির আশ্রয় জয়ন্ত অনেকদিন দেখেনি। জয়ন্ত এখনো ভিতরে এত শীতল কেন? তবে শীতলতা এই মুহূর্তে সেই

অস্বস্তিকে ঢাকতে পারছে না। জয়ন্তর অস্বস্তি তীব্র হতেই মাথার মধ্যে কি যেন ধাক্কা খেল। শাশ্বতীকে আদর করতে লাগল জয়ন্ত। নাক, চোখ, কপাল, ঈষৎ ভাঙা গাল, চিবুক, ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল। কণ্ঠনালীর খাঁজের সেই শান্ত স্থির তিলের ওপর মুখ লুকোল জয়ন্ত। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বুকের মধ্যে শাশ্বতীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটু পরেই সম্বিত ফিরে এল জয়ন্তর। জয়ন্তর বুকের মধ্যে শাশ্বতীর মুখমণ্ডল যেন নিদ্রিত। আলমারীর আয়নার দিকে শাশ্বতী পিছন-করা। জয়ন্ত আয়নার দিকে তাকাল। শাশ্বতীর অনাবৃত পিঠে আস্তে আস্তে হাত বোলাল। সিক্ত মিহি বালির মত নরম কাঁধ, পিঠ। আবরণহীন নিতম্ব, জানু, পায়ের পাতা চোখে পড়ল। সারা শরীর কি পবিত্র। জলোচ্ছ্বাসের মত নিয়ত পরিচ্ছন্ন। আহ্‌ শাশ্বতী, তুমি সত্যি বড় সুন্দর। শুধু মুখ নয়, তোমার সারা শরীর কত পবিত্র, নিষ্পাপ। জয়ন্ত শাশ্বতীর বসনহীন শরীরের দিকে চোখ ফেরাল। সাবানের গন্ধ, বুকের কাপড় ভেদ করে সেই সেন্টের গন্ধও বুঝি তাকে স্পর্শ করেছে। যেন বা মৃগনাভির গন্ধ চারপাশে। শাশ্বতী, তুমি হরিণী। সত্যি তুমি হরিণী। জয়ন্ত উৎকর্ণ হল। একটু আগে সশব্দ বৃষ্টির মধ্যে হরিণের পদশব্দ ছিল। 'ত্বরাগামী মৃগক্ষুর দেখা নাহি যায়।' আবার বিড়বিড় করল জয়ন্ত। শাশ্বতী বড় ক্লান্ত। জয়ন্ত শাশ্বতীকে বিছানায় সযত্নে রাখল।

কতক্ষণ পরে খেয়াল নেই, তন্দ্রার জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল জয়ন্ত। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পাশে শাশ্বতী নেই। কানে ফোনের রিং বাজার শব্দ আসছে। তাকিয়ে দেখল, শাশ্বতী কখন উঠে আলমারীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোষাকে পরিচ্ছন্ন হয়েছে। প্রসাধন শেষ করে এনেছে। তাকাচ্ছে না জয়ন্তর দিকে।

ক্রিং···ক্রিং. .. ক্রিং···ক্রিং···। নিয়মিত যতিপতনের মধ্যে ফোন বেজে চলেছে। শাশ্বতী প্রসাধন করতে করতে একবার দূরে ফোনের রিসিভারের দিকে, পরে জয়ন্তর দিকে তাকাল। জয়ন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দুজনেই স্মিত হাসল।

জয়ন্তর উঠতে ইচ্ছে করছে না। ফোন বেজে যাক।

'আমি কিন্তু ফোন করব।' অফিসে বেরুবার মুখে রেবা বলল।

'কখন?'

'দুপুর গড়িয়ে এলে।'

জয়ন্ত নীরব।

'তুমি থাকবে তো?'

'থাকলে ধরব।'

'ফোন করে আমি তোমায় জানিয়ে দেব করে ফিরব। তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

'না, এমন আর কি? তারক তো আছে।'

বেরিয়ে গিয়েও বলেছিল, 'ফোন ধোরো। আমি করব কিন্তু।'

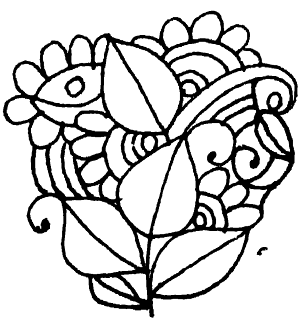
ফোন একভাবে বেজে চলেছে। রেবা জানে, জয়ন্তকে এইভাবে ফোন করতে হয়। ঘুমোলে জয়ন্তর জ্ঞান থাকে না। জয়ন্ত ফোনের দিকে তাকাল। শাশ্বতীকে দেখল।

'চলি।' শাশ্বতী নিচু গলায় বলল। একটু ঘষা কাগজের মত খস খস করল গলা। কাঁধে সেই পরিচিত ভঙ্গিতে ব্যাগ ঝুলিয়েছে।

বাইরে বেরুল শাশ্বতী। জুতোর শব্দ করতে করতে দালানে পা রাখছে শাশ্বতী। নির্বিকার উদাসীন ভঙ্গি। একটু আগে জয়ন্তর নিক্ষেপ করা খালি দেশলাই-এর বাক্সটা পায়ে ঠেলে ঠেলে কিছুটা নিয়ে গেল শাশ্বতী। জয়ন্ত কানে আসছে সে শব্দ।

ফোন এখনো বেজে চলেছে। জয়ন্ত চুপ করে পড়ে রইল বিছানায়। শাশ্বতীর জুতোর শব্দ, ফোনের রিং একসঙ্গে ভাসতে ভাসতে একসময়ে মিলিয়ে গেল।

চারপাশ নির্জন। ঘরে ছাই-রং অন্ধকার। জয়ন্ত চারকোণ-ঘরের সিক্ত অন্ধকারে এক শূন্যের মধ্যে ভাসতে লাগল।





খেলার ছলে

দরজা খুলে ভেতরে আসতে বলে অনুরাধা জিজ্ঞেস করল, 'ওহ্ এতদিনে তোমার আসার সময় হল ? আমি তো ভাবছিলাম, দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ সেদিন পার্কে দেখা. দীর্ঘদিনের জন্যে পার্কেই ঠিকানাটা ফেলে গেছ। যা অন্যমনস্ক তুমি !'

'কেন, অন্যমনস্কতার কি দেখলে ?' বাড়ির মধ্যে পা দিতে দিতে সুশোভন বলল। দরজার বাইরে অপেক্ষা করার সময় ধরানো সিগারেটটা দু' আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে।

'আমার ঠিকানা লিখে দেব বলে তোমার অমন দামী পেনটা দিলে সেদিন, তারপর নিয়েছিলে ? মনে করে দেখ তো ?'

সুশোভন হেসে ফেলল। 'তোমাকে ওটা দিয়ে দেব ভেবেই আর নিই নি।'

'থাক, অত দানধ্যানে দরকার নেই। এই বুড়ি বয়সে পেন নিয়ে আমি কি করব ? আচ্ছা যা হোক তুমি ! চল।'

বাইরের দরজা বন্ধ করে অনুরাধা সুশোভনকে নিয়ে ওপরে এল। বাইরের ঘরে নয়, একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ঘরের নিওন আলো জেলে

দিল। হাঁপাচ্ছে অনুরাধা। এই পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে বেশ ভারী আর মোটা হয়ে গেছে ও।

সুশোভন ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল। হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি কি নিজেকে খুব বুড়ি মনে করছ?'

ফাল্গুনের একেবারে প্রথম। পাতলা কাগজের আবরণের মত শীত এখনকার গরমের ওপর ঢেকে আছে। তবু বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে সুরু করেছে অনুরাধার কপালে। পাখাটা একেবারে কম স্পীডে খুলে কপালের ঘাম মুছল অনুরাধা। 'পঞ্চাশ চলছে। তোমার থেকে বছর দু'য়েকের ছোট হব আমি, তাই না?' থামল অনুরাধা। 'তুমি কিন্তু খুব সুন্দর রেখেছ চেহারাটা। অবশ্য গ্রামে যখন থাকতাম আমরা, তোমাকে দেখেছি তো, চেহারায় তুমি সকলকে হারিয়ে দিতে। আর দেখতেও কি সুন্দর ছিলে! এখন যেন আরও ভালো হয়ে গেছ! অনেক বয়স কমিয়ে ফেলেছ!'

সুশোভন রীতিমত শব্দ করে হেসে উঠল। 'এই বয়সেও ওই সব চোখে পড়ে তা হলে!' প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'সেদিন কথাই হয়নি তাড়াতাড়িতে। সঙ্গে তোমার ছোট ছেলেকে দেখেছিলাম। বাড়িতে আর কেউ থাকে না বুঝি?'

'ছোট ছেলে বিকেলে খেলতে বেরিয়েছে, এখনো আসেনি। মেয়ে আছে, বোধহয় তেতলার ঘরে পড়ছে, তুমি এসেছ টের পায়নি। পেলে সঙ্গে সঙ্গে একবার ঘুরে যেত।' সুশোভনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তো তিন ছেলে, এক মেয়ে শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ, দু'ছেলেই এখন বাইরে। একজন আমেরিকা, মেজ জার্মানী। দুজনেই বাইরে গিয়ে বিয়ে-থা করে আছে, আর ফিরবে না। ওদের পর মেয়ে মঞ্জরি। এখনো বিয়ে দিতে পারিনি। সুরমার তো সব সময়েই অসুখ। মায়ের সেবা নিয়েই আছে। ছোট ছেলেটা পার্ট ওয়ান দেবে।'

'মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

'বাড়ির মধ্যে মেয়েটাই যা দেখতে ভাল হয়নি। তার ওপর বেশ ময়লা। মায়ের ধাত পেয়েছে। কিছুদূর পড়াশুনা করে বাড়িতে বসে আছে।'

'একদিন তোমার মেয়েকে নিয়ে আসবে, দেখব।' বলতে বলতে অনুরাধা দরজার কাছে গেল। 'পর্ণা, পর্ণা। দেখবি আয় কে এসেছে।'

'তোমার মেয়ের নাম পর্ণা বুঝি?' হাতের সিগারেটটায় টান দিল।

'শ্রীপর্ণা। ওর বাবার দেওয়া নাম। আমি পর্ণা ডাকি।'

অনুরাধা ওর ঘরের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াতেই শুনল, তেতলার বারান্দায় পর্ণার দ্রুত পদশব্দ এগোচ্ছে। অনুরাধা বলল, 'এই, শোন, মেয়ের সামনে ওর বিয়ে-থার কথা একদম বলবে না। আমি মেয়েকে খুব শাসনে রাখি। যা চটপটে, আমার ভীষণ ভয় করে ওকে বাইরের কারোর সঙ্গে মিশতে দিতে, অসময়ে ওর সামনে বিয়ের কথা তুলতে। জান না তো যে বয়সেই হোক, মেয়েরা নিজেদের বিয়ের কথা শুনলে অন্যরকম হয়ে যায়—সে যত শিক্ষিত মেয়েই হোক না!'

'পড়াশুনা করে না?'

'কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছে। ওর বাবা ইংরিজি অনার্স ভালবাসত বলে তাতেই দিয়েছি। কলেজের বাসে যায়-আসে। তোমাদের কলকাতার রাস্তাঘাটকে আর বলো না। এর চেয়ে পাটনা ভাল ছিল। এখানে ওকে নিয়েই আমার দিন-রাত ভাবনা।' একটু থামল অনুরাধা। সিঁড়ি থেকে নেমে দোতলায় পা দেওয়ার মুখে মেয়ের পদশব্দ স্থির হয়ে গেছে।

'আমার মেয়ে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। ঠিক ওর বাবার মত। ওর সামনে বেশী প্রশংসা কোরো না যেন, ভীষণ গর্ব হবে। এমনিতেই মাটিতে পা পড়ে না, তার ওপর আরও। আমি মেয়েদের অহংকার পছন্দ করি না।'

'ইস্, তুমি তো ভীষণ শাসন কর মেয়েকে!' সুশোভন হেসে উঠল।

'মাম্মি, কোথায় তুমি?'

'এই ঘরে।' অনুরাধা গলা তুলে সাড়া দিল।

বারান্দায় দৌড়ানোর শব্দ। তার পরেই পর্ণা একদমক বাতাসের মত ঘরে ঢুকল। একেবারে মায়ের পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ঝকঝকে চেহারা পর্ণার। দু চোখ টানা। সদ্য প্রসাধনে আরও সুন্দর হয়েছে। একরাশি কৌতূহল চোখের তারায় মাখা। মুখ-চোখ যেন শিশির-ধোয়া কাঁচি কলাপাতা। দীর্ঘ চুলের বিনুনীটা বুকের ওপর নিয়ে খেলছে পর্ণা।

অনুরাধা মেয়ের দিকে তাকাল। 'এ কে জানিস? তোদের কাকাবাবু। গ্রামে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম ছোটবেলা থেকে।'

'এরা গ্রামে গেছে নাকি?' সুশোভন পর্ণাকে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বলল। হাতের সিগারেট নিভে গেছে, ধরেই থাকল।

'নাহ্ এরা আর যাবে কি করে? এর বাবা তো পাটনায় যাবার আগেই

বাড়ি, জমি-জমা সব বিক্রী করে গ্রামের সঙ্গে সব পাট চুকিয়ে দিয়েছিল। তখন এরা হয়নি।' মেয়ের দিকে তাকাল অনুরাধা, 'নে, প্রণাম কর্।'

পর্ণা সুশোভনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে মাকে দেখল। 'এখনো ভাল করে চিনলামই না, প্রণাম করব কি! আপনিই বলুন তো?' সুশোভনের দিকে তাকাল পর্ণা। 'বলুন, আপনি প্রণাম নেবেন? একটা কথায় আমাকে আপনি চিনে ফেলেছেন বুঝি?'

'ফের পাকা-পাকা কথা বলছিস!' অনুরাধা ধমক দিয়ে উঠল।

সুশোভন শব্দ করে হেসে উঠল। 'বাঃ, ঠিকই তো বলেছে! আমাকে চিনলে তবে তো প্রণাম করবে। প্রণাম তো আর মানুষটাকে করে না মানুষের স্বভাবকে করে। তাই না?' পর্ণার দিকে তাকাল সুশোভন।

'না, না, তুমি নাই দিও না সুশোভন। আমার মেয়ে একটু পরেই মাথায় উঠবে। ওর বাবাই তো একে এরকম করে গেছে।'

'তুমি খুব সেজেছ পর্ণা।' সুশোভন ছোট্ট মেয়েকে আদর করার গলায় বলল।

'ওই তো ওর কাজ।' অনুরাধা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল। কণ্ঠস্বরে চাপা মৃদু শাসন। 'তবে সাজগোজ নিয়ে থাকে বলে আমি রেহাই পাই। অন্য বায়না নেই।'

'বেশ নয়! কত বয়স হল?'

'তা হল। আঠারো শেষ হতে চলেছে। অথচ লম্বা দেখেছ? ঠিক ওর বাবা! লোকে বলবে কত বয়স।'

সুশোভন সামনের দেয়ালে পর্ণার বাবা-মার ফটোয় দৃষ্টি রাখল। 'নাহ্, এর মুখ-চোখ এত বয়স বোঝায় না। বরং আঠারোরও কম মনে করায়।'

'তাও আর বেশী দিন নয়, যা পাকা-পাকা কথা বলতে শুরু করেছে!' অনুরাধা পর্ণার দিকে তাকাল।

পর্ণা একভাবে দেখছে সুশোভনকে। হঠাৎ অনুরাধার পিঠের দিকে কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরা হাতের আঙুলে চিমটি কাটল।

'আহ্, আবার অসভ্যতা হচ্ছে। কার সামনে দুষ্টুমি করছ জান?' সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই শোন, তুমি এর সামনে খুব গম্ভীর থাকবে তো।'

পর্ণা মাকে ছেড়ে দৌড়ে বারান্দায় যেতেই অনুরাধা ডাকল, 'এই শোন্।'

পর্ণা দরজার আড়াল হয়ে গিয়েছিল। আবার দরজার সামনে ফিরে এল। 'কি?'

'সুশোভনকে নিয়ে তেতলায় যা। তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, কথা বল্, আমি যাচ্ছি।'

'তুমি এখন কি করবে?' সুশোভন জিজ্ঞেস করল।

'ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায় দুবেলা। আমি তো একা আর পারি না, ওকে একটু দেখিয়ে দি।'

'কেন, মেয়ে পারে না?' সুশোভন হাসতে হাসতে পর্ণাকে দেখতে লাগল।

'নাঃ, মেয়েকে কোন কাজ করতে দিই না। উনুনের কাছে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।'

'খুব খারাপ অভ্যেস করাচ্ছ!'

অনুরাধা পর্ণার দিকে তাকিয়ে যেন কৃত্রিম ধমক দিল, 'তা অবশ্য ঠিক, না করতে দিয়ে যা অভ্যেস হয়ে উঠেছে ওর! এবার ভাবছি কাজ করাব। কাজ শেখাও দরকার।'

পর্ণা সুশোভনকে আড়াল করে বুড়ো আঙুলে কলা দেখাল।

'শোন, তুমি এর সঙ্গে ওপরে ওর ঘরে যাও। ওর সঙ্গে কথা বল। আমি যাচ্ছি পরে।'

'সেই ভাল। চল পর্ণা।' সুশোভন উঠে দাঁড়াল।

তেতলায় পর্ণার ঘরে বসার আগে পর্যন্ত সুশোভন একটি কথাও বলেনি, পর্ণাও না। সুশোভন পর্ণার সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে একবার থমকে দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশ দেখল: ঘরের কোণে টেলিফোন। পর্ণা ইতিমধ্যে ওর পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে খোলা, উল্টে-রাখা ইংরিজি ডিটেকটিভ উপন্যাসটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে। দেয়ালে ঠেস-দেওয়া মুখ থমথমে।

সুশোভন পাশেই খালি ইজিচেয়ারের মত চেয়ারটা দেখে বসে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে পর্ণার দিকে তাকাল। সত্যি খুব সুন্দর দেখতে অনুরাধার মেয়ে। দীপ্ত মুখ-চোখ, চেহারায় দৃপ্ত ভঙ্গি। গায়ের রঙ আগুনের শিখার মত বুঝি শরীরের ত্বকে খেলে বেড়ায়। অনুরাধার রঙ মুখ চোখ কিছুই পায়নি। অবিকল ওর বাবার মত। সুশোভন পর্ণার টেবিলের সামনে ঝোলানো ওর বাবার ফটোটায় চোখ বুলোল।

পর্ণাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'এটা তোমার পড়ার ঘর?'

পর্ণা কোন উত্তর না দিয়ে একবার সুশোভনকে দেখে নিয়েই বই-এর পাতায় চোখ রাখল।

সুশোভনের মনে হল, পর্ণার কিছু একটা হয়েছে। বলল, 'তুমি কথা বলছ না কেন?' সদ্য-ধরানো সিগারেটটায় জোরে টান দিতে লাগল।

পর্ণা এবারেও কোন কথা বলল না।

'ভালই তো, বই পেলে তুমি খুব শান্ত হয়ে যাও। অথচ তোমার মা বলল—।'

'মায়ের কথা আপনাকে বলতে হবে না।' পর্ণা ধমক দিল। 'আপনিও তো অনেক কথা বলেছেন!'

পর্ণার কথা বলার ধরন, কৃত্রিম রাগ দেখে সুশোভন হেসে ফেলল। অবাক হয়ে বলল, 'আমি তোমায় তো কিছু বলিনি!'

'আমায় বলবেন কেন, মাকে বলেছেন।' পর্ণা দেয়ালের দিকে একটু ঘুরে বই পড়ার ভান করল।

'কি বলেছি!'

'বললেন না, আমাকে দিয়ে রান্না না করিয়ে খুব খারাপ অভ্যেস করাচ্ছ! জানেন, মা আপনার কথা শুনে আমাকে এবার মাঝে মাঝে রাঁধতে বলবে, তখন আপনি হেল্‌প করতে আসবেন?'

সুশোভন অবাক হয়ে পর্ণার বলার ভঙ্গি দেখছিল। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে বলল, 'মাকে তুমি ভীষণ ভয় কর বুঝি?'

'ভয় না কচু। হুঁঃ, মা-ই আমাকে ভয় করে। জানেন না তো, মা আমাকে কোথাও বেরুতে দেয় না, কারোর সঙ্গে যেতে দেয় না। সব সময় আগলে রাখে। তা হলে কে কাকে ভয় করে বলুন?'

'সত্যি তো!' সুশোভন আপন মনে হাসল। 'আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, তোমাকে শাসন করতে পারে এরকম কোন কথা অনুরাধাকে বলব না। হল তো? এবার কথা বল।'

পর্ণা সুশোভনকে দেখছিল। চোখ একটু ছোট করে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঠিক তো?'

'ঠিক।' সুশোভন কোন শিশুর কথা মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় একদিকে কাত করে হাসতে লাগল। হাতের সিগারেটটা জ্বলছে।

'আপনি কিন্তু এখন বেশী হাসবেন না। গম্ভীর হোন।'

'কেন !'

'বাহ্, মা আমার সামনে আপনাকে গম্ভীর থাকতে বলল না! আপনি এত তাড়াতাড়ি সব কথা ভুলে যান কেন?' সুশোভনের চোখে চোখ রেখে পর্ণা স্থির।

হঠাৎ দুজনেই হেসে উঠল।

সুশোভন বলল, 'অ্যাশ্‌ট্রে নেই? একটা দাও, না হলে সিগারেটের ছাই পড়ে তোমার এত সুন্দর ঘর নোংরা হয়ে যাবে।'

পর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'দাড়ান দিচ্ছি।' খাটের নীচে অ্যাশ্‌ট্রে খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'আপনি এত সিগারেট খান কেন? আমি একদম সহ্য করতে পারি না।'

'কেন!'

'গন্ধটা কি বিচ্ছিরি লাগে। যারা সিগারেট খায় তাদের একটুও ভাল লাগে না।'

'তা হলে তোমার মাকে বলি, তোমাদের বাড়ি আমার আসা চলবে না।'

পর্ণা অ্যাশ্‌ট্রেটা সুশোভনের সামনে ছোট টেবিলটায় রেখে নিজের চেয়ারে বসল।

'তোমার বাবাকে তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?'

'বাবাও আমাকে ভীষণ ভালবাসত। জানেন না তো, বাবা যদি থাকত মা আমার ওপর কোন কথাই বলতে পারত না। এভাবে আমাকে সব সময় ঘরে ধরে রাখা বের করে দিত। মা একটা সিনেমা পযন্ত দেখতে দেয় না, কলেজ থেকে বান্ধবীদের সঙ্গে কোথাও যেতে দেবে না। সবসময় বলবে, তুমি বড় হচ্ছ, তুমি বুঝবে না, কলকাতার রাস্তা খারাপ, মানুষগুলো অন্যরকম।'

সুশোভন মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'সেইজন্যে তোমার মায়ের ওপর এত রাগ!'

'রাগ হবে না কেন, বলুন?'

সুশোভনের কেমন দুঃখ হল। পর্ণাকে দেখল। আর যাই হোক, পর্ণা খুব একটা ছোট নেই। সদ্য ফুটে-ওঠা একটা রজনী-গন্ধার শীষকে এমনভাবে ফুলদানির জলে ফুটিয়ে তুললে ফুলটা তো তার ঘোলা জলের রঙ পাবে, গন্ধহীন হয়ে যাবে! কেমন যেন বিষন্ন হয়ে পড়বে না? 'আচ্ছা, আমি অনুরাধাকে বলে তোমার বাইরে একটু বেড়ানোর ব্যবস্থা করে দেব। হবে তো?'

'সত্যি করবেন!' পর্ণা যেন হঠাৎ কোন নতুন আলো-বাতাস পেয়ে কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই যেন নিভে গিয়ে বলল, 'নাহ্, আপনি পারবেন না। আমার দাদু-দিদিমাদের কথাই মা শোনে না। দাদু অত করে মাকে বলে!'

'বেশ তো, কথা দিচ্ছি। তোমার বেড়ানোর ব্যবস্থা যদি করি তুমি কি করবে?'

'তাহলে আপনাকে একটা প্রণাম করব।'

'প্রণাম!' অস্ফুট উচ্চারণ করেই বিস্মিত পর্ণার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ পর্ণার মৃদু হাসি দেখেই মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগের ওকে প্রণাম করা প্রসঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর জোরে হেসে উঠল সুশোভন। পর্ণাও হেসে ফেলল।

'কি, এরই মধ্যে পর্ণা খুব জমিয়ে নিয়েছে তোমার সঙ্গে!' বলতে বলতে অনুরাধা ঘরে ঢুকল। হাতে কিছু আলুভাজা আর গরম লুচি রাখা খাবারের প্লেট, জলের গ্লাস। সামনের ছোট টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে পর্ণাকে বলল, 'যা তো মা, রান্নাঘর থেকে তরকারির বাটি আর মিষ্টিটা নিয়ে আয়। সুব্রতটা সেই বিকেলে খেলতে বেরিয়েছে, এখনো ফেরার নাম নেই। থাকলে তবু কিছু কাজ করে।'

'তোমাকে এত কে করতে বলল অনুরাধা?'

'এ আর কি!' পর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা। সাবধানে আনিস। ফেলে দিসনি যেন। যা ছটপট করিস।'

পর্ণা প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল। অনুরাধা খাটের নীচে ঠেলে রাখা দামী মোড়াটা টেনে নিয়ে সুশোভনের সামনে বসল।

'আবার কি আনতে পাঠালে?'

'কি আর, ডিমের তরকারি আর সামান্য মিষ্টি।'

'সে কি! তুমি কি বাইরে থেকে নিয়ে এলে!'

'বাইরে থেকে আনার পাট রাখিনি। ফ্রিজ আছে। সব জমানো থাকে! ঐ এক-আধদিন বেরুই, বাজার করে রাখি। বাইরে থেকে আনার ব্যবস্থা করলে আরো কাজের লোক রাখতে হয়। সে আমি পছন্দ করি না। কলকাতায় বিশ্বাস করতে পারি না কাউকে।'

পর্ণা ঘরে ঢুকল। হাঁপাচ্ছে। সুশোভনের সামনে টেবিলে হাতের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখল।

'পর্ণাকে দাও।'

'ওরা খেয়েছে, নাও তো! তুমি তো আবার অফিস থেকে সোজা চলে এসেছ।'

পর্ণা দূরে চেয়ারে বসল। অনুরাধা সুশোভনের সামনে বসে রইল।

সুশোভন মা-মেয়ের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে প্লেটে হাত রাখল। খেতে খেতে বলল, 'এত বড় বাড়িটায় তোমরা তিনজন থাক। এটা কি ভাল?'

'ওই জন্যেই তো ওর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকায় একেবারে খালি বাড়ই কিনেছি। নীচেয় দোকান ভাড়া আছে। দোতলা-তেতলা কাউকে ভাড়া দিই নি। একা আছি, মেন-গেট বন্ধ করলে এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকবে না। তা ছাড়া ভাড়াটে দোকানীরা খুব ভদ্র। সবসময় লক্ষ্য রাখে। এণ্ট্রান্সটা ওদের সকলের চোখের সামনে পড়ে তো। কে আসছে-যাচ্ছে, ঠিক দেখতে পায়।'

'তা হলেও একা থাকা—।'

অনুরাধা কি যেন ভাবল। হঠাৎ বলল, 'সুশোভন, তোমার এখনো সেই বই মুখে বসে থাকার বাতিক আছে!'

'তা কি ছাড়তে পারি।'

'কখন পড়!'

'কেন? অফিসের পর বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে সোজা পড়ার ঘরে বসি। অন্য কোন কাজ থাকে না তখন। একটা দিকে নিশ্চিন্ত, সংসারে টাকা দিয়েই খালাস। আমাকে আর কিছু ভাবতেই হয় না।' একটু থামল। 'তাছাড়া সন্ধের দিকে বই নিয়ে না বসলে মেজাজ ভাল থাকে না।'

'তা হলে আমার একটা কথা রাখবে?'

'কি?'

'মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আমার বাড়ি এসো না। পর্ণাকে একটু দেখিয়ে দেবে। আমার তো প্রায়ই সন্ধের দিকে একটু বেরুতে হয়। খোকাকে নিয়ে বাইরে বেরুই। মেয়েটা একা থাকে। তুমি যদি আসতে পারো ও একটু সঙ্গী পায়!'

'কেন, তুমি তো ওকে নিয়েও একটু বেড়াতে যেতে পার। ও বেচারা একা থাকে।' পর্ণার দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল সুশোভন।

'না, তা হয় না। কলকাতার রাস্তায় সামলাতে পারব না। তুমি আমার মেয়েকে চেনো না তো!'

'কেন, আমি কি?' পর্ণা ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ মুখিয়ে উঠল।

সুশোভন হেসে উঠল। 'বেশ, আমি আসব এখন। আমার তো বিকেলের দিকে কাজই থাকে না।'

'তাই এসো তো। তুমি তো ইংরিজি ভাল জান। ওর পড়ার কাজও হবে।'

সুশোভনের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। হাত ধুয়ে রুমালে মুখ মুছে চেয়ারে ঠেস দিল। পাশের দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোয় চোখ পড়তে সুশোভন বলল, 'ওগুলো কার ছবি?'

অনুরাধা তাকাল। 'ওটা তো পর্ণার ছোটবেলার ছবি। দেখছ না, নিজেই পুতুলগুলো ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার হাতের মধ্যে না পেয়ে কাঁদছে। কি ভীষণ দুষ্টু ছিল তুমি জান না! আর পাশের ছবিটা দেখ, বড় হয়ে যাদের সঙ্গে খেলত তাদের অকারণ মারধোর করে নিজেই কাঁদতে বসত। তখন বাবা ছিল, সামলাতো। ওর সব খেলা ছিল অদ্ভুত। ওঃ, ওর খেলা তো নয়, রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ! আমি ভীষণ রেগে যেতাম, ওর বাবা কিছুতেই মারতে দিত না। ওর বাবার জন্যেই তো এমন হয়েছে।'

'এখন খেলে না?'

'এখন নিজেকে নিয়ে খেলে। তাতে আমি একটু শান্তি পেয়েছি। সাজ-গোজ করাও তো একটা আর্ট।' অনুরাধা হাসল। 'আমার ছোটবেলার অভ্যেসের মধ্যে ওইটাই যা ও পেয়েছে।' মেয়ের দিকে তাকাল।

'যাই বলো, তোমার মেয়ে কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্ট।' সুশোভন পর্ণার দিকে তাকাল।

'ইন্টেলিজেন্ট না ছাই! সব তো ওর ওই দুষ্টুমির মধ্যে! এর দুষ্টুমি তো দেখনি! যেটুকু শান্ত থাকে, আয়নার সামনে নিজেকে নিয়েই থাকে। সাজ-গোজের ঘটা দেখলে তুমি থ হয়ে যাবে।'

'মা, তুমি আজে-বাজে বকবে না তো!' পর্ণা চোখ পাকাল।

'ভাল তো! তোমার মেয়ে সাজলে তো একেবারে পরী! আর তাছাড়া তোমারও তো দোষ আছে। ওকে একটু বাইরে বেরুতে দাও। বড় হয়েছে, সিনেমা দেখুক, কলকাতায় কত কি দেখার আছে দেখুক!'

'তোমাকে এরই মধ্যে নালিশ করেছে বুঝি !'

'না না, আমাকে কিছু বলেই নি। আমি এমনি বলছি।'

'কিন্তু নিয়ে যাবে কে ?

'কেন, তুমিই নিয়ে যাবে !' একটু থামল সুশোভন। 'বেশ, আমি এবার আসছি, একদিন ভাল একটা সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে আসব। তুমিও যাবে অনুরাধা।'

'কবে যাবেন আগে বলে দিন।' পর্ণা যেন আবেগ-উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

'দেখলে তো! তুমি নাচাচ্ছ, কিন্তু একবার দেখালে আর সামলাতে পারবে না।'

সুশোভন হেসে ফেলল। 'সামলাতে পারি কিনা দেখ ! না পারলে আবার তোমার মেয়ে ঘরে বন্দী হবে। কি, তাই তো ?' পর্ণার দিকে তাকাল সুশোভন।

সুশোভনকে কিছু বলতে যাচ্ছিল পর্ণা, মায়ের কঠিন দৃষ্টি দেখে চুপ করে গেল।

'যাই, এবার চা-টা নিয়ে আসি। তোমার তো যাওয়ার তাড়া নেই।'

'তা না থাকলেও উঠব এবার। আটটা বেজে গেল। যেতে হবে সেই নথে।' সুশোভন সিগারেট বের করে মুখে ধরল।

'একদিন তোমার মেয়েকে নিয়ে এসো কিন্তু। পরে সুরমাকে আমি একদিন দেখতে যাবো এখন।' বলতে বলতে অনুরাধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চকিতে পর্ণা উঠে এসে সুশোভনের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। 'আপনি ভীষণ ভাল।'

'সত্যি বলছ ?' সুশোভন নতুন সিগারেট ধরিয়ে কণ্ঠস্বরে কৌতুক করল।

'তবে ঠিক ভীষণ নয়, এখন একটু কম ভাল !'

'কেন।' সুশোভন অবাক হল।

'আপনি সিগারেট খাওয়া বন্ধ করলে পুরো ভাল হবেন। এখন একটু কম ভাল।'

সুশোভন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়েছ।'

'উহ্, গন্ধ ভাল লাগছে না, পালাই। আপনার চা-টা বরং আমিই নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণে সিগারেটটা খেয়ে নিন।' বলতে বলতে পর্ণা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুশোভন ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে প্রায়। এবার চা খেয়েই উঠতে হবে। সুশোভন পর্ণার পড়ার বইগুলোয় শূন্য দৃষ্টি ফেলল।

পর পর কদিন আসতে আসতে সুশোভন অনুরাধাদের বাড়ির সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। কথামত একদিন সন্ধেয় অনুরাধা-পর্ণা-সুব্রতদের নিয়ে একটা বাংলা সিনেমা দেখে এল সুশোভন। পার্কস্ট্রিটের রেস্টুরেণ্টে খাওয়াল, গাড়ি করে ওদের পৌঁছে দিয়ে তার পরও কিছু সময় গল্প করে সুশোভন বাড়ি চলে গিয়েছিল।

আজ সুশোভনের আসার কথা ছিল না। তবু হঠাৎ সুশোভন এসে হাজির হল। ডোর-বেল টিপতেই সুব্রত দরজা খুলে দিল। সুশোভনের এ বাড়ি অতিপরিচিত হয়ে গেছে। সুব্রতকে দেখে বলল, 'তোমরা কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ?'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুব্রত বলল, 'হ্যাঁ, আমরা এখনি দাদুর বাড়ি যাবো। মা-আমি-দিদি।'

'মা কোথায় ?'

'দোতলার ঘরে। দিদি তিনতলায় তৈরী হচ্ছে।'

সুশোভন সোজা দোতলায় উঠে দাঁড়াতেই অনুরাধা বলল, 'তোমার তো আজ আসার কথা নয়। নাকি কথা ছিল !'

পর্ণা ততক্ষণে সুন্দর সেজে পরিচ্ছন্ন হয়ে দোতলায় নেমে এসেছে।

'এমনি এলাম। সন্ধেটা ভাল লাগছে না।'

'ভালই তো, আমি তা হলে যাবো না মা, তোমরা যাও।'

'সেকি ? তোকে তো যেতেই হবে ! বাবা-মা তোকে দেখতে চেয়েছে !'

'তাই যাও। আমি চলি।' সুশোভন বলল।

'দুর, দাদু-দিদিমার কাছে পরে গেলেও চলবে। আমি একটু পড়তে বসি বরং।'

সুশোভন অবাক হল। 'বল কি ? এমন সুন্দর সেজেগুজে পড়তে বসবে ?' হেসে উঠল।

'ওর কথা ছেড়ে দাও। ও তো সব সময়েই সেজে আছে।' কিছু সময় কি ভাবল অনুরাধা। বলল, 'একটু আগে পর্যন্ত দাদুর বাড়ি যাবে ভেবে লাফাচ্ছিল। এখন আবার পড়ার দিকে মন গেছে ! অথচ দাদুর বাড়ি যাবার আগে কি কান্নাই না কাঁদত।' অনুরাধা পর্ণাকে একেবার দেখে নিয়ে বলল, 'তা হলে তাই হোক।

ওকে তুমি পড়াও। পরে ও যাবে এখন। আমরা বরং ঘুরে আসি। তুমি বেশ কিছু সময় থাকবে তো?'

'তা থাকব। তুমি এলে না হয় যাব।'

'বা, যদি আগেই যাওয়ার দরকার হয়, পর্ণা, তুই ওখানে ফোন করে দিবি, চলে আসব।'

পর্ণা মাথা নাড়ল।

অনুরাধা-সুব্রত বেরিয়ে যেতে সুশোভন পর্ণার ঘরে এসে পর্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ তো, কি সুন্দর সেজেছ! দারুণ লাগছে তোমাকে। এ সময় কি পড়তে বসতে পার! বড বেরসিক তুমি! মায়ের সঙ্গে যেতে পারতে।'

'আমি তো বেরিয়ে ছিলাম, আপনি এলেন কেন?'

সুশোভন হাসতে হাসতে পর্ণাকে দেখতে লাগল। 'আমি চলে যেতে পারতাম, তুমি পড়ার কথা বললে কেন?'

'সত্যি সত্যি পড়বো নাকি? মাকে এমনি বললাম। আসলে আপনি আসুন আমি মনে মনে চাইছিলাম।'

'কেন বল তো!'

'এখনি একটা সিনেমায় যাবো—লাইটহাউসে দারুণ বই। ক্লাশের মেয়েরা বলছিল। ওরা সকলে দেখেছে। আপনি না থাকলে কার সঙ্গে যাই বলুন? মা-কি ইংরিজি বই দেখতে দেবে? তা ছাড়া বইটা আবার এ সপ্তাহেই উঠে যাবে।'

সুশোভন হাসল। 'কিন্তু এই সেদিন একটা দেখেছ। মা শুনলে—।'

'মা শুনলে আপনার সঙ্গে যাব কেন? তা ছাড়া সব কথা মাকে বলবেন কেন?'

সুশোভন হেসে উঠল। ঘড়ি দেখে বলল, 'চলো, আর দেরী করা যাবে না। অনুরাধা ফেরার আগেই ফিরতে হবে।'

পর্ণা-সুশোভন ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ট্যাক্সি করে ওরা যখন বাড়ি ফিরল, তখনো অনুরাধারা ফেরেনি। দোতলার ঘরে সুশোভন বসতেই ফোন বেজে উঠল।

পর্ণা বলল, 'নিশ্চয়ই দাদুর বাড়ি থেকে মা ফোন করছে।'

'বেশ তো, বলো আমরা আছি। তোমরা চলে এসো।'

'যদি আমরা না থাকার সময় মা ফোন করে থাকে?'

সুশোভন কি ভাবল। 'বেশ, আমিই ফোন ধরছি।' সুশোভন ফোন ধরে বলল, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে অনুরাধা বলল, 'কে, সুশোভন কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমরা কখন আসছ? আমি এবার যাব।'

'আগে দুবার ফোন করে সাড়াই পাইনি। কোথায় ছিলে?'

সুশোভন একটু থামল। পর্ণার দিকে তাকাল! পর্ণা তখন হাত নেড়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা বলতে বারণ করছে।

'আমরা একটু বাইরে গিয়েছিলাম। পর্ণার একটা বই দরকার পড়ল, কিনতে গিয়েছিলাম।'

'ও।' অনুরাধা নীরব হল। 'শোন, আমরা এখনি বেরুচ্ছি। তুমি কি এখনি যাবে,'

'তুমি এসো, তার পরে না হয় যাবো।'

'তাই যাচ্ছি।' বলে অনুরাধা ফোন রেখে দিল।

সুশোভন রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'দেখ, তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম।'

'ওই জন্যেই তো আপনাকে আমার ভাল লাগে। যাই বলুন, আপনি আছেন বলে তবু একটু ঘুরতে পারছি।' পর্ণা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে লাগল।

সুশোভন দেখতে লাগল পর্ণাকে। একসময় বলল, 'তুমি বুঝি সবুজটা ভালবাসো পর্ণা?'

'কেন বলুন তো?'

'তোমার পোষাক দেখে মনে হচ্ছে।'

'আপনি ভালবাসেন না? আমার তো শহরের মধ্যে থেকে থেকে চোখের অসুখ ধরে গেছে। সবুজ দেখতেই পাই না!

'পাটনায় বুঝি খুব গ্রাম-ট্রাম বেড়াতে?'

'ভাড়া বাড়ি হলেও বাবা বাড়ির সামনেই বিরাট বাগান করেছিল। কি সবুজ আপনি ভাবতে পারবেন না। তা ছাড়া বাবা প্রতি সপ্তাহে গ্রামের দিকে বেড়াতে যেত। মা পছন্দ করত না, আমি বাবা বেড়িয়ে আসতাম। সুব্রত তখন অনেক ছোট।' পর্ণা আয়নার সামনে নিজেকে পরিষ্কার চোখে দেখতে দেখতে কথাগুলো বলছিল।

'থাক, আর পোষাক বদলাতে হবে না। একটু আমার সামনে বোসো। খুব ভাল লাগছে তোমাকে দেখতে।'

পর্ণা হাসতে হাসতে সুশোভনের সামনে বসল। বলল, 'ইস আবার একটা সিগারেট ধরালেন! আপনাকে কতবার বারণ করেছি এত খাবেন না। যান্ আপনার সঙ্গে কথা বলব না।' পর্ণা উঠে দূরে সরে গেল। 'দেখবেন, এবার যদি সিগারেট খাওয়া না কম করেন, আর কোনদিন আপনার সামনে যাবো না।'

'নেশার জিনিস কি সহজে ছাড়া যায়!'

হঠাৎ পর্ণা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে সুশোভনের মুখ থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। 'নিন, এবার কথা বলুন। এইভাবে আপনার নেশা তাড়াতে হবে।'

সুশোভন হাসছে। একটু অন্যমনস্কের মতই বলল, 'কলকাতায় থেকে তোমার পক্ষে গ্রামে বেড়াতে যাওয়া আর কোনদিন হবে না।'

'কেন হবে না?' পর্ণা ঘুরে দাঁড়াল। 'কলকাতা থেকে একটু বাইরে বেরুলেই গ্রাম। যাবেন একদিন? চলুন না! আপনার তো অফিসের গাড়ি আছে!'

'সত্যি যাবে!' সুশোভন পর্ণার চোখে চোখ রাখল।

'যেদিন বলবেন, যাবো। শুধু মাকে বলবেন না। আহ্, গ্রামের মাঠ, পুকুর-পাড়, ছোট ছোট বনজঙ্গল পেলে আমার যা মজা লাগে না! জানেন, কত রকম পাখি যে ডাকে সেখানে। ঘাসের পোকাগুলোও কেমন চিক্‌চিক করে শব্দ করে। ভাল লাগে না আপনার?'

'চল একদিন। দিনের বেলায় তো যেতে হবে?'

'তাতে কি? এই তো সবে শীত শেষ হচ্ছে। দুপুরে বেরুলে রোদ খুব চড়া লাগবে না।'

'কলেজ আছে না?'

'থাকলেই বা। কত মেয়েই তো পালায়।'

'তাই বুঝি?'

'সত্যি!' পর্ণা বড় বড় নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে রইল।

সুশোভন হেসে ফেলল। 'বেশ চল, আমরাও একদিন পালাই।'

পর্ণা হাসল। 'সত্যি যাবেন, না মিছিমিছি বলছেন?'

'সত্যি। সামনের সপ্তাহে একদিন অনুরাধা তো কোন্ বন্ধুর বাড়ি সকালে তোমাকে কলেজ পাঠিয়ে দিয়ে থাকবে বলছিল! সেদিনই চল। তুমি কলেজ

থেকে বেরিয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে অফিসের গাড়িতে তুলে বেড়িয়ে নিয়ে আসব। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব। অনুরাধা জানতেই পারবে না?'

'বেশ তাই। আপনি তা হলে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন।'

'দেব।'

নীচে ডোর বেল বেজে উঠল। অনুরাধা সুব্রত ফিরল। পর্ণা বেরিয়ে গেল দরজা খোলার জন্যে। সুশোভন ওদের আসার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থেকে নতুন একটা সিগারেট ধরাল।

সামনের সপ্তাহের শেষ দিকে অফিসের কাজ-কর্মের মধ্যেই সুশোভন টেলিফোন করেছিল পর্ণাকে। দাঁড়াতে বলেছিল কলেজের গেট থেকে দূরে পার্কের নির্দিষ্ট গাছের নীচে। সেখান থেকে পর্ণাকে তুলে নিল গাড়িতে।

গাড়ির মধ্যে বসতে বসতে পর্ণা বলল, 'আপনি ড্রাইভার নিলেন না কেন?'

'দরকার কি! আমরা দুজনে বেড়ালে আরও লুকোনো হবে ব্যাপারটা। ড্রাইভার থাকলে ফ্রি হওয়া যায় না।'

'তা ঠিক।' পর্ণা সহজ হয়ে বলল।

'তুমি কতক্ষণ অপেক্ষা করছিলে?'

'অনেকক্ষণ। আপনি আসতে এত দেরী করলেন!'

'তোমার কলেজ বেরুবার আগেই মা চলে গিয়েছিলেন ওর বান্ধবার বাড়ি?'

'না, আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছি। খোকা স্কুলে গেলে আমি আর মা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। জানেন, মা বলেছে সেই সন্ধের পর ফিরবে। আমাদের তা হলে সন্ধের একটু আগে ফিরলেই চলবে।'

সুশোভন হাসল। 'বাইরে বেরুতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না, না?'

'সকলের সঙ্গে বেরুতে ভাল লাগে না। আপনি থাকলে ভীষণ মজা হয়।' একটু থামল পর্ণা। 'কলকাতার ভিড় থেকে বেরিয়ে গেলে খুব জোরে চালাবেন তো! দেখব কি রকম লাগে!'

সুশোভন কলকাতার উপকণ্ঠে এসে স্পীড বাড়িয়েছিল বেশ। এক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। সদ্য ফাল্গুনের রোদ চারপাশে। এমন দুপুরে হু হু করে বসন্তের হাওয়া বইছে, তবু হাওয়ায় শীতের শেষ ঠাণ্ডা আর চড়া রোদের ঝাঁঝ মেশানো। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে চকিতে গাছের মাথায় জ্বলতে থাকা পলাশ কৃষ্ণচূড়া দেখা দিয়েই

চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। কোথাও বা মাটিতে পড়ে-থাকা রাধাচূড়া ফুল। গাছের পাতা চাকার ঘর্ষণে উড়ে আসছে গাড়ির সামনে, মধ্যে। পর্ণা মুখে বুকে প্রবল বাতাসের ঢেউ নিয়ে চুপ করে বসে আছে।

'কি রকম লাগছে?' সুশোভন বলল।

'দারুণ! ইস্ কতদিন এমনভাবে গ্রাম দেখতে বেরোই নি।'

'আর কতদূর এগোবে?'

'এগিয়ে লাভ কি? এখন তো সবটাই গ্রাম। একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে বাগান-পুকুর আছে এরকম দেখে চলুন, সেখানে বসি।' বলতে বলতে পর্ণা যেন লাফিয়ে উঠল, 'এই তো, ডানদিকে একটা বাগান দেখা যাচ্ছে! যাবেন?'

সুশোভন হঠাৎ গাড়ির গতি মন্থর করল। ডান দিকে দূরে তাকাল। একটা পুকুর-ঘেরা বাগান। ঘন গাছপালায় ভর্তি। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনে ফাঁকা মাঠ। শীতের পাকা ধান কাটা হয়ে যেতে চারপাশ ধূসর। দুপুরের মাতাল হাওয়ায় চতুর্দিকে হু হু শব্দ। চারপাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো খেজুর গাছের মাথায় বাতাস লুটিয়ে পড়ছে। এখন ফাল্গুনের এক উজ্জ্বল বিকেলের মুখ।

কোন কথা না বলে সুশোভন গাড়ি ঘুরিয়ে বাগানের সামনে গেটের মুখে রাখল। গাড়িতে চাবি দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। নির্জন বাগান। এখানে-ওখানে পাখির ডাক। কোথাও বুঝি শালিক ডাকছে।

'তুমি কি করবে?'

'আমি বাগানটা একটু ঘুরি। দেখুন দেখুন, পুকুরের পাড়ে একটা বক কেমন চুপ করে বসে আছে।' পর্ণা এগিয়ে গেল।

'আমি এই গাছের নিচে একটু বসছি। তুমি ঘুরে এসো।'

'আচ্ছা।' পর্ণা দৌড়ল।

সুশোভন পর্ণার দৌড়ন দেখল। সবুজ প্রজাপতির মত পর্ণা বুঝি উড়ছে। মাতাল হাওয়ায় পর্ণা গায়ের কাপড় সামলাতে পারছে না। বেতের মত শক্ত ছিপছিপে চেহারা। মাথার বেণী পিঠের ওপর লাফাচ্ছে। পর্ণা সারা গায়ে আর শাড়ি-জামায় সবুজ মেখেছে। পর্ণা যেন সবুজ সতেজ একটি ছোট গাছ! বিকেলের হাওয়ায়-কাঁপা-রোদ গায়ে জড়াতে জড়াতে পর্ণা ঘন গাছের বনে হারিয়ে গেল।

চুপ করে বসে রইল সুশোভন। ডাহুক-ঘুঘু-কণ্ঠ কানে আসছে। কাঠঠোকরার

ঠক ঠক শব্দ বাতাসে ভেসে এল। কোন গাছে বুঝি কোকিল ডাকা সুরু হল। সুশোভন যেখানে বসেছে, সেখানে ছায়া। ঘন অন্ধকারের ছিটেফোঁটা সে ছায়ায় মেশানো নেই, আবার দুপুরের উত্তাপ মেশানো রোদ তাকে তেমন তরল করেনি। এক শান্ত নির্জনতা মেশানো ছায়া নিয়ে সুশোভন বসে রইল। মাথায় গায়ে শুকনো পাতা উড়ে পড়ছে।

এখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে সুশোভন। অফিসের ভয়ঙ্কর কাজের চাপের মধ্যে থেকেও এমন মনোরম নির্জনতায় চলে আসতে পারবে, সুশোভন কি কোনদিন ভেবেছিল? একদিনও অফিসে ছুটি নেয়নি। একদিনও সন্ধেয় ওর পড়ার ঘর থেকে বেরোয়নি। কে ওকে এমনভাবে এই আকাশের নীচে টেনে এনেছে! কে? পর্ণা? পর্ণা আঠারো বছর বয়সেও বুঝি এক নিষ্পাপ কিশোরী। পর্ণা তাকে কেন টানে? পর্ণার কাছে কি চায়? কেন প্রতিদিন বিকেলে পর্ণার সঙ্গে গল্প করতে ছুটে যায়! হঠাৎ খিক খিক করে কোন পাখি বা অন্য কোন জন্তু ডেকে উঠল। সুশোভন চমকে উঠল।

সুশোভন সিগারেট ধরাতে ভুলে গেছে। ভুলে গেছে ওর সঙ্গে পর্ণা বলে কোন দুরন্ত উচ্ছল মেয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে নতুন করে পর্ণাকে মনে পড়তে সচেতন হল। পর্ণা কোথায় গেল! এখনো সে এল না কেন!

চকিতে উঠে দাঁড়াল সুশোভন। 'পর্ণা।' ডাকল ধার কণ্ঠে। এগোতে লাগল। পায়ে পায়ে কিছু বুনো লতা জড়িয়ে গেল। জোরে ডাকল এবার, 'পর্ণা।' কোন সাড়াশব্দ নেই। পুকুরের জলে বড় কোন মাছ ঘাই দেওয়ার শব্দ। পর্ণা কোথায়? 'পর্ণা।' আর একবার ডাক দিয়েই সুশোভন দ্রুত এগিয়ে একটা ঘন পেয়ারা গাছের নীচে ছায়ায় দাঁড়াল। চারপাশে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ফেলল।

'পর্ণা।'

হঠাৎ মাথার ওপরে খিলখিল করে হেসে উঠল পর্ণা। সুশোভন চমকে ওপরে তাকাল। দেখল, পর্ণা ওর মাথা থেকে সামান্য উঁচু একটা পেয়ারা গাছের ডালে বসে আছে পা ঝুলিয়ে।

'একি! কি করে উঠলে! নেমে এস!'

পর্ণা হাসছে। 'নামতে পারছি না যে! ভয় করছে।'

সুশোভন দেখল, গাছে ওঠার সময় পর্ণা যে পরিশ্রম করেছে তাতে মুখ লাল হয়ে গেছে। দু'চোখ রক্তিম। 'যেভাবে উঠেছ সে ভাবেই নামো।'

'আমি পারছি না। আমাকে ধরুন তা হলে, লাফাচ্ছি।'

'নীচে পড়লে কিন্তু হাত পা ভাঙবে, গা ছড়ে যাবে।'

'যাবে না, আপনি নীচে আছেন তো!'

সুশোভন কি ভাবল। 'বেশ, আমি নীচে দাঁড়াচ্ছি, তুমি আগে ডাল ধরে ঝুলে পড়, তারপর হাত ছাড়।'

পর্ণা তাই করার জন্যে প্রস্তুত হল। ডাল ধরে ঝুলেই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল। সুশোভন শক্ত বলিষ্ঠ হাতে পর্ণাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তখনো পর্ণার পা মাটি ছোঁয়নি। পর্ণা ভয়ে সুশোভনকে জোরে জড়িয়ে ধরল। সুশোভনের কাঁধের মধ্যে মুখ লুকলো। ভীত বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সুশোভন। পর্ণার শরীরের গভীরে গোপনে যেন কোন শক্তি তাজা রক্তের মত খেলে বেড়াচ্ছে।

সুশোভন আস্তে আস্তে মাটিতে নামাল পর্ণাকে। 'তোমার গাছে ওঠা একদম উচিত হয়নি।' গলায় কঠিন শাসন। মুখ গম্ভীর।

'আমাকে আপনি বকছেন?' পর্ণা হাসতে হাসতে আরক্তিম সুশোভনের দিকে তাকাল। মাথার কিছু ছোট ছোট চুল ওর মুখে এসে পড়েছে। বুকের ওপর কাপড় সামলালো। কপালের সবুজ টিপে রূপোলি গুঁড়ো চকচক করছে।

সুশোভন পর্ণার এক ধরনের বেপরোয়া চেহারা দেখে কেমন স্থির হয়ে গেল। 'না, বকছি না, তবে গাছে সাপও তো থাকতে পারে।'

'থাকলেই বা, আপনিও তো আছেন?'

'আমি তো আর টেরই পেতাম না।'

দমকা বাতাস শরীরে জড়িয়ে যেতেই পর্ণা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। 'আপনার দৌড়তে ইচ্ছে করছে না?'

'কেন করবে না। তবে তোমার সঙ্গে পারব না।'

'ঠিক পারবেন। আপনি তো আর মায়ের মতন মোটা নন। কি সুন্দর চেহারা আপনার।'

'বলছ?' সুশোভন ক্রমশ ভিতরে সহজ হয়ে গেছে।

'সত্যি। আপনি খুব সুন্দর দেখতে। আর খুব স্মার্ট লাগে আপনাকে!' হঠাৎ কথাটা বলেই পর্ণা উচ্চকিত হাসির দমকে ভেঙে পড়ল। হাসির শব্দ বাতাসে জড়িয়ে গেল।

'তাতে কি হয়েছে!'

'কি আবার হবে! আমি দৌড়চ্ছি, আমাকে ধরুন দেখি! ঠিক দৌড়বেন কিন্তু!'

'বাড়ি ফিরতে হবে।'

'এখনো অনেক সময় আছে।'

'বেশ তুমি লুকোও, আমি তোমায় ঠিক খুঁজে বের করব।'

পর্ণা দৌড়ল। বৃক্ষের মোটা মোটা গুঁড়ি, ঝোপ, টগর ফুলের ঘন গাছ—সব পেরিয়ে পর্ণা হঠাৎ কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল। সুশোভন একটু দ্রুত এগোল। কিন্তু সামনা-সামনি কোথাও খুঁজে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশ থেকে বুনো গাছ-গাছালির গন্ধ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে কিছু বুনো ফুলের মিশ্রিত গন্ধ। বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হাওয়ায় ঝোপগুলো কাঁপছে। শিরশির করে শব্দ আসছে ঝরাপাতার। দমকা হাওয়ায় সুশোভনের গা-মাথা শুকনো ফুল-পাতায় ছেয়ে গেছে। পায়ে জড়িয়ে গেল শুকনো খড়, ধুলো।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে 'উঃ মাগো' বলে পর্ণা চীৎকার করে উঠল।

সুশোভন চমকে উঠল। সামনেই কোথাও আছে। দৌড়ে গেল শব্দ যে দিক থেকে আসছে সেদিকে। 'পর্ণা!'

পর্ণা একটা ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে সুশোভনের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। তাড়া-খাওয়া চড়ুই-এর বুক যেমন ভয়ে কাঁপে, পর্ণা কাঁপছে।

'কি হল?'

'সাপ। আমি চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা সাপ খস খস করে পিছন দিকে যাচ্ছে।'

'কই?'

'ওই তো ঐ দিকে।'

সুশোভন তাকাল। দুজনেই দেখল, একটা মিশকালো বেড়াল ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদিকে চলে গেল।

'উঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছ! চল। আর এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

পর্ণার হাত ধরে সুশোভন গাড়ির মধ্যে বসে পড়ল। 'তুমি এত দুরন্ত, মা ঠিকই করে তোমাকে কোথাও না নিয়ে গিয়ে।'

'আপনিও তা-ই বলবেন! যান, আপনার সঙ্গে কথা বলব না।' পর্ণা বাইরের দিকে মুখ ঘোরাল।

সুশোভন হাসল। গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। পর্ণা তখন বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে চুপ করে বসে আছে। পর্ণার শাড়ি, জামা, চুল, বিনুনী, গ্রীবা, পিঠ—সব কেমন বিস্রস্ত হয়ে এই পড়ন্ত বিকেলে এক অদ্ভুত রহস্য তৈরী করেছে। পর্ণা যেন বা সোনার শরীরে সবুজের রঙ-করা মূর্তি। রোদের ছোঁয়া লেগে লেগে পর্ণা ক্রমশ যেন গাড়ির গতির সঙ্গে অদ্ভুত স্থির উজ্জ্বল এক শক্তির মত বসে রইল। পর্ণার শরীর-শাড়ি-জামা থেকে বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির ভিতরের আয়নায় দৃষ্টি স্থির রেখে স্পীড অসম্ভব বাড়ালো।

বাড়ি ঢুকতেই ওরা দেখল, অনুরাধার মুখ গম্ভীর। অনুরাধাও অবাক হয়ে গেল পর্ণার সঙ্গে সুশোভনকে দেখে। কণ্ঠস্বর সহজ করে অনুরাধা বলল, 'তোমার সঙ্গে পর্ণার কোথায় দেখা হল সুশোভন?'

সুশোভন সহজ হয়ে বলল, 'অফিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে ছিলাম গাড়ি নিয়ে। দেখি, ও কলেজের সামনে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে। তাই তুলে নিলাম।'

'ঠিক জানো তুমি, ও কলেজে ছিল?'

'কলেজে ছিলাম না তো কোথায় যাব?' পর্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি থাম।' একটু থেমে বলল, 'আমার একটা কথার জবাব দাও। তুমি দুপুরে কলেজ থেকে বেরিয়ে কলেজের সামনে পার্কে একটা গাছের নীচে একা দাঁড়িয়ে ছিলে?'

সুশোভন দেখল, পর্ণা নিশ্চুপ, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পর্ণা কি উত্তর দেবে? সুশোভন কি এবার বলে দেবে—ওকে একটু বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতার বাইরে? নাকি, বললে অনুরাধা পরে পর্ণাকে শাসন করবে? পর্ণাও কি এই মুহূর্তে চায় সেদিনের সিনেমা দেখার মত এটাও একেবারে গোপন করি!

'ওকে তুমি দেখেছ বুঝি?' সুশোভন জিজ্ঞেস করল।

'আমি নয়, আমার বান্ধবীর মেয়ে। ওর কাছ থেকে শুনেই তো আগে চলে এসেছি। পর্ণা এভাবে কারোর জন্যে অপেক্ষা করবে, এটা আমি ভাবতেই পারছি না।'

সুশোভন হেসে উঠল। 'ও আমাকেও বলেছে আজ দুপুরে একবার কয়েকজন মেয়ে মিলে বেরিয়েছিল কি কিনতে। ওকে একা দাঁড় করিয়ে ওরা সামনে কোথায় গিয়েছিল। পরে সব এসে ওকে নিয়ে গেছে।'

'তোমায় বলেছে ও কথা! কি রে, তা-ই?' অনুরাধা কথাটা যাচাই করতে চাইল।

পর্ণা ঘাড় নাড়ল। 'কি করব, ওরা কিছুতেই ছাড়ল না, আমি তো বেরুতেই চাইনি।'

অনুরাধা একটু যেন শান্ত হল। 'কলেজ তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে। এত দেরী!'

সুশোভন হেসে ফেলল। 'তুমি এমন কর বলেই ও সহজ হতে পারে না। ওকে গাড়িতে তুলতেই ও বলল, একটু ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরব, চলুন। ও তো আমার সঙ্গেই ছিল।'

অনুরাধা কি ভাবল। মেয়েকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বলল, 'তুমি ওপরে গিয়ে বসো। অফিস থেকে আসছ, হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।'

'নাহ্, আজ থাক। আমি এবার ফিরব। আজ গাড়িটা সঙ্গে আছে, গ্যারেজ করতে হবে।'

'একটুও বসবে না?'

'না।' সুশোভন পর্ণার দিকে তাকাল। 'পর্ণাকে খেতে দাও। ও কিছু খায়নি এখনো। যাও পর্ণা, মুখ-হাত ধুয়ে নাও।'

সুশোভন আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল।

দিন দশেক বাদে বিকেলের দিকে হঠাৎ সুশোভন অনুরাধাদের বাড়ি এসে হাজির। আসবার কথা টেলিফোনেও বলেনি সুশোভন।

অবাক হয়ে অনুরাধা বলল, 'কি ব্যাপার তোমার! হঠাৎ একেবারে আসা বন্ধ করেছিলে!'

'এমনি।'

'আমি ভাবলাম সেদিন পর্ণার জন্যে একটু রাগারাগি করেছি বলে তুমি আসা বন্ধ করে দিলে।' একটু থামল অনুরাধা। 'পর্ণার কাছে যাও, দেখবে অভিমানে রাগে মেয়ে একেবারে ফুলে-ফেঁপে আছে।' অনুরাধা হাসল।

'তাই নাকি! কেন?'

'বাঃ, ওর পড়ার ব্যাপারে কি সব জানার ছিল। তোমার অফিসে তিন দিন পর পর ফোন করেছে, পায়নি। তুমি আসবে ভেবে পরে আমার সঙ্গে একদিনও

বিকেলে বেরোয়নি। শেষ পর্যন্ত আমায় বলেছে, তোমার সঙ্গে আর কোনদিন কথাই বলবে না।'

সুশোভন হাসল। 'ও কি ওপরে আছে?'

'দেখ, ওপরেই বোধহয়। নাকি বাথরুমে গেছে!'

'তুমি কোথাও বেরুবে নাকি!

'এখনি বেরুচ্ছি। তুমি এসে গেছ, ভালই হল। বাজার সব ফুরিয়েছে। ফ্রিজে কিছু নেই, আরও কিছু মার্কেটিং আছে। এখনি সুব্রতকে নিয়ে বেরুচ্ছি। ফিরতে একটু দেরী হবে। তুমি থাকবে তো?'

'থাকব।'

'তুমি ওপরে যাও। ফ্রিজে কিছু খাবার-দাবার আছে। আর পর্ণা তো চা করতে পারে, ওকে বোলো ও করে দেবে। আমি দাড়াচ্ছি না। ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।'

'বেশ যাও। আমি বরং ওপরেই যাচ্ছি।'

সুশোভন ওপরে উঠে এল। পর্ণা গা ধুতে যাবার আগে আয়নার সামনে বসে চুল ঠিক করছিল।

'পর্ণা, তুমি নাকি খুব রেগে গেছ?'

পর্ণা চুপ।

'জানি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না। কিন্তু জান, আমি একদিন এসে ফিরে গেছি।'

'মিথ্যে কথা বলবেন না।' চাপা রাগে পর্ণার কণ্ঠ যেন ভেঙে পড়ল।

'বিশ্বাস কর।' একটু থামল সুশোভন। 'সত্যি-সত্যি তুমি রেগে আছ!'

'কি করে বিশ্বাস করব? আমি প্রত্যেক দিন আপনার জন্যে বাড়িতে বসে। বেড়াতে যাবে বলে কোথাও যাইনি।'

'কিন্তু সত্যি যে আমি এসে ফিরে গেছি!'

'কি করে হয়!' পর্ণা অবাক হয়ে তাকাল সুশোভনের দিকে। 'আপনি ডেকেছিলেন! আমি তো একবারও বেল বাজতে শুনিনি!'

'না, তা অবশ্য করিনি। কিন্তু সত্যি তোমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেছিলাম।'

'ডাকবেন না যদি এসেছিলেন কেন?'

'এমনি!'

পর্ণা সুশোভনের গলার স্বরে রীতিমত অবাক হল। আর একবার সুশোভনকে দেখল। 'আমি কিন্তু অফিসে পর পর তিনদিন ফোন করেছি!'

'আমি যাইনি। অসুখ করেছিল।'

'তার পরেও তো আসতে পারতেন। আমার বিকেলটা যে কি খারাপভাবে কাটত, বলে বোঝাতে পারব না। এত একা লাগত! চোখ ফেটে জল আসত। আপনি একটা ফোন পর্যন্ত করেননি!' পর্ণার চোখ ছলছল করে উঠল।

'সত্যি!' সুশোভন পর্ণাকে দেখছে আর হাসছে।

'আমি আপনার মত মিথ্যে কথা বলি না।'

নীচে থেকে অনুরাধা ডাকল, 'পর্ণা, নীচের দরজায় খিল দিয়ে যা, আমরা বাইরে বেরুচ্ছি।'

'আপনি একটু বসুন, আমি খিল দিয়ে আসি। তারপর গা ধুয়ে বসে গল্প করব। মা বলে রেখেছে—আজ আমি চা করব, আপনাকে খাবার দেব।' বলতে বলতে হঠাৎ উচ্ছল পর্ণা বেরিয়ে গেল।

সুশোভন নীরব থেকে পর্ণার চলে যাওয়া দেখল।

বাথরুমের শাওয়ার খুলে পর্ণা দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ ইলেকট্রিক কারেন্ট চলে গেল। শুধু বাড়ি নয়, সারা পাড়া থেকে ইলেকট্রিক চলে গেছে। সারা বাড়ি অন্ধকার। বাথরুম থেকে পর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি, আলো নিভে গেল! কারেন্ট চলে গেল বুঝি!'

সুশোভন স্থির বসে রইল। এ-পাড়ায় এসে এরকম অবস্থায় কোনদিন পড়েনি। পর্ণার বাথরুমের বাইরে না আসা পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল। নতুন করে সিগারেট ধরাল।

পর্ণা একসময়ে অন্ধকারের মধ্যেই মায়ের ঘর থেকে কাপড় বদলে তেতলায় এল। হাতে একটা বাতি। ওর ঘরে এসে দেখল, সুশোভন চুপ করে বসে আছে। 'ইস, অন্ধকারে বসে আছেন তো?' একটু হেসে বলল, 'খুব ভাল হয়েছে, যেমন এতদিন আসেননি, তার শাস্তি।' বলেই পর্ণা খিল খিল করে হেসে উঠল।

পর্ণা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বাতি রেখে প্রসাধনে বসল। বাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় পর্ণাকে রহস্যময়ী লাগছে। বিনুনীর গোড়ায়, কানের লতিতে, চিবুকে জলের বিন্দু। পর্ণা দ্রুত অথচ পটু হাতে প্রসাধন শেষ করল। চমৎকার গন্ধ সারা ঘরে। পর্ণা আজ লাল শাড়ি পরেছে। বাতির আলোয়,

গায়ের রঙে, শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে যেন গোয়েন্দাকাহিনীর ভয় পাওয়ার রোমাঞ্চকর শিহরণ। সুশোভন এসব দেখছিল। প্রসাধন করতে করতে মাঝে মাঝে পর্ণা বসে-থাকা সুশোভনকে দেখছে। কাজল টানল, টিপ পরল পর্ণা। ঠোঁটে পাতলা করে লিপস্টিক ঘষল। পর্ণা নিখুঁত শিল্পীর মত সাজল।

'উহ্, আর কতক্ষণ সাজবে?' এবার আরও কয়েকটা বাতি জ্বালো পর্ণা। এত অন্ধকারে থাকা যাবে না।'

'কেন, অন্ধকার ভাল লাগছে না? আমার কিন্তু অন্ধকার মাঝে মাঝে খারাপ লাগে না! অন্ধকারটা একটা পোষাকের মত। বলুন, তাই না?' চাপা স্বরে অনাবিল হাসল পর্ণা। আর সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের দমকা হাওয়ায় বাতিটা দপ করে নিভে গেল।

'ইস, আবার এটাও যে নিভল!'

'নিভুক।' পর্ণা উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে সুশোভনের পিছনে একটু দূরত্ব নিয়ে দাঁড়াল। 'বলুন তো এবার, আমি কোথায়?'

'কেন? তুমি তো ঘরেই!'

'ঘরে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন্ দিকে?' হঠাৎ সুশোভনের কাঁধ আলতো স্পর্শ করেই সরে গেল।

তা কি করে বলব?'

'বললে বাতি জ্বালব।'

'ওরকম কোরো না পর্ণা। বাতি জ্বালো।'

'আমাকে ধরুন তো দেখি।' পর্ণা নিমেষের মধ্যে সুশোভনের ডান হাতের মুঠি ধরে ছেড়ে দিল। 'আমি কিন্তু আপনাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি!'

'আমি উঠলেই পড়ে যাব।'

'উঠতে হবে না, বসেই আমাকে ছুঁয়ে ফেলুন, দেখি। আমি আপনার কাছেই কোন এক জায়গায় আছি কিন্তু।'

'পারব না।'

'এই তো।' বলেই পর্ণা সুশোভনের চোখ দু' হাতের মুঠিতে ঢেকে দিল। 'আপনি এত তাড়াতাড়ি খেলা ভুলে গেছেন! আমার ছোটবেলার সব খেলা মনে আছে।'

'ছাড় ছাড় পর্ণা।' সুশোভন পর্ণার হাত ধরল। নরম হাতে প্রসাধনের গন্ধ হাতের-মুঠোয়-ভরা শিউলির মত ভাতি।

পর্ণা হাসিতে ভেঙে পড়ল, 'আপনি এত ভয় পান কেন? ইস্ হাত কি ঠাণ্ডা!'

সুশোভন হাত সরাল। সত্যি কি ওর হাত ঠাণ্ডা?

পর্ণা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বাতি জ্বালল। বাতি হাতে নিয়ে দূরে খাটের বাজুর ওপর মোম দিয়ে বসালো। পিছন ফিরে সুশোভনের দিকে ফিরতেই পর্ণা দেখল, সুশোভন নতুন একটা সিগারেট ধরাচ্ছে।

'একি, আপনি আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন?'

'তাতে কি? গুমোট গরমে আমার মাথা ধরেছে।'

'না, ধরাতে পারবেন না।' বলেই এগিয়ে এসে পর্ণা সুশোভনের হাতের জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা নিভিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে।

সুশোভন আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। আলোয় দেখল পর্ণাকে। পর্ণার কাপড়ের একটা কোণে যেন আগুন লেগেছে। আবার নিভিয়ে দিল পর্ণা। খিল খিল করে হেসে উঠল। পর্ণা যেন এতক্ষণে ওর মনোমত খেলাটি পেয়ে গেছে। সুশোভনও যেন কোন নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে এক ধরনের খেলা পেয়ে গেল। পর্ণার একটানা খিল খিল হাসির সঙ্গে দেশলাই কাঠি জ্বালার খেলা! একের পর এক জ্বালছে, পর্ণা নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ফুঁ দিয়ে। নীরব প্রস্তুতিহীন খেলা। এক-একটা কাঠির আলোয় সুশোভন শুধু দেখছে, পর্ণার শাড়ির ওপরের প্রান্ত থেকে আগুন কাঁধ, বুক, কোমর থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর সামনের অল্প-আলোকিত ড্রেসিং-টেবিলের কাচে তার প্রতিফলন। দেয়ালে পর্ণার ছায়া নাচছে। সুশোভনের মনে হচ্ছে—সারা ঘরে কখন যেন আগুন নিয়ে এক মনোরম খেলা শুরু হয়ে গেছে। কঠিন শীতের দিনের আগুন!

পর্ণা আগুন নেভানোর খেলায় যেন পাগল। আরও ঝুঁকে পড়েছে সুশোভনের মুখের দিকে। সুশোভনের খেয়াল নেই কখন যেন ওর মুখ থেকে সিগারেট পড়ে গেছে। অথচ ও জানে একটা সিগারেটের মুখে আগুন ধরাবার জন্যেই দেশলাই কাঠি জ্বেলে চলেছে অবিরাম। পর্ণা হাসিতে মাতাল। খেলায় ও একেবারে জিততে চায়। আরও ঝুঁকে দেশলাই কাঠি নেভানোর জন্যে একটানা ফুঁ দিয়ে চলেছে।

ফুঁ এক সময়ে সুশোভনের মুখে-চোখে লাগল। পর্ণা ফুঁ থামাচ্ছে না। শেষ কাঠিটা জ্বালাতেই সুশোভন দেখল পর্ণার সারা শরীরেই আগুন ধরে গেছে। পর্ণা যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড! পর্ণা শেষ কাঠিটা নেভাতে গিয়ে একেবারে ফুঁ

দিতে দিতে ঝুঁকে সুশোভনের মুখের কাছে মুখ এনে ফেলেছে। সে সুশোভনের সব-কিছু নিভিয়ে দিতে চায়। সুশোভন হঠাৎ ফুঁ দিল পর্ণার মুখের ওপর। সুশোভন যেন ফুঁ দিয়ে পর্ণার ওই ভয়ংকর চোখ-দুটো ঢেকে দিতে চায়। পর্ণাও যেন বেপরোয়া। আচমকা সুশোভনের মুখ বন্ধ করার জন্যে অফুরন্ত হাসির মধ্যে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে পর্ণা কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে ছেড়ে দিল। চকিতে উঠে দাঁড়াল। রীতিমত হাঁপাচ্ছে পর্ণা।

'হুঁ :, আপনি আমার সঙ্গে ফুঁতে পারবেন ?' হাসছে পর্ণা।

উঠে দাঁড়াল সুশোভন। সামনেই হাসির দমকে পর্ণার বুক উঠছে নামছে। বাতির আলোয় পর্ণার ছায়া কেমন লম্বা হয়ে গেছে। ছায়া যেন সুশোভনের ছায়ার গভীরে ডুবে গেছে। সুশোভন পর্ণার হাত ধরতে গেল। পর্ণা পাথর-ঢাকা কোন খুব ছোট গোপন ঝর্ণার শব্দে হাসতে হাসতে সরে গেল।

'বেশ, আমাকে ধরুন তো দেখি ?' মুহূর্তে নতুন আর একটা খেলায় ভেসে উঠল পর্ণা।

সুশোভন যেন হাসতে হাসতে অস্ফুটে বলল, 'যদি পারি ?'

'ধরুন !' পর্ণা দ্রুত পায়ে ঘরের একটা কোণে চলে গেল।

সুশোভন সেদিকে যেতেই পর্ণা হাসিতে ভাসতে ভাসতে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আর একদিকে সরে গেল। এবার সুশোভন ধরে ফেলল পর্ণার ডান হাত। পর্ণা পিছন দিকে একটু ঠেস দিতেই বাতিটা হঠাৎ ছিটকে নীচে পড়ে নিভে গেল। সুশোভন পর্ণার ডান হাত একভাবে ধরে আছে। পর্ণাও ওর বাঁ হাতের মুঠি দিয়ে সুশোভনের চেপে-ধরা হাত ধরেছে আলতো। সুশোভনের কঠিন মুঠি। পর্ণার হাতের নরম মাংস যেন ওর হাতের চাপে ক্রমশ কেটে বসে যাচ্ছে। কব্জি থেকে হাত বুঝি এখনি খসে যাবে। সুশোভনের হাত কাঁপছে থরথর করে। সুশোভন যেন অন্ধকারে বুঝতে পারল, ওর খুব সামনে পর্ণা দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। একটুকু হাসির শব্দ পাচ্ছে না। কোথাও কোন চাপল্য নেই। পর্ণা হঠাৎ ধীর শান্ত নিশ্চুপ। এ আবার পর্ণার কি ধরনের খেলা!

আচমকা সুশোভনের কি যেন হল। চকিতে হাত ছেড়ে দিয়ে ভিতরে কেঁপে উঠল। ঘরের খোলা দরজার দিকে ঈষৎ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

'এখন যাবেন না!' কে যেন ফিসফিস করল! পর্ণা!

'না, আমাকে যেতেই হবে।' সুশোভন যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বারান্দায় চলে এল। তারপর নীচে। তারপর দরজা খুলে রাস্তায় নামল।

কেউ যেন অদৃশ্য থেকে ওকে তাড়া করেছে। সুশোভন রাস্তায় বেরিয়ে দেখল—চতুর্দিক অন্ধকার। বোধ হয় কিছু সময় রাস্তার এমন অন্ধকারই ভাল। সুশোভন কেন যেন লুকোতে চাইছে। দ্রুত পা চালাল সুশোভন। এখনি একটা ট্যাক্সি ধরা দরকার।

বাড়ি ফিরেই সোজা নিজের পড়ার ঘরে চলে এল সুশোভন। মেয়ে ওকে দরজা খুলে দিয়েছে। ওর সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে এল মেয়ে মঞ্জুলা। 'বাবা, তোমার কি আজ শরীর খারাপ?'

'কেন মা?'

'কেমন যেন লাগছে তোমাকে!'

'তুই একটু বোস তো মা আমার কাছে। মাথাটা খুব ধরেছে মনে হচ্ছে!'

মঞ্জুলা বাবার কাছে ইজি-চেয়ারের হাতলে বসল। বাবার মাথায় হাত রাখল। দু'পাশের রগে আঙুল ছুঁয়ে কপালে আঙুলের চাপ দিল।

'তোর মা কোথায়?'

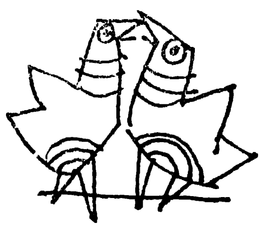
'মা ঘুমোচ্ছে। রবি ঘরে পড়ছে।'

'প্রবীর সুবীরের কোন চিঠি এসেছে?'

'কাল এসেছে। বৌদিরা সব ভাল আছে।'

সুশোভন সংসারের কোন খবরই রাখে না, রাখতে কোনদিনই অভ্যস্ত নয়। অথচ আজ যেন নতুন করে খবর শুনছে মেয়ের কাছে। মেয়ের দিকে তাকাল। মঞ্জুলার দু'চোখে বিস্ময় ছবির মত স্থির। 'মায়ের কাছে সব সময় বসে থাকতে তোর খুব কষ্ট হয়, না মা?' একটু থামল। মেয়েকে ঈষৎ বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এবার তোর ঠিক বিয়ে দেব মা, দেখিস।'

মঞ্জুলা যেন বা গভীর সুখে, অথবা আরামে, বা কোন গোপনতম দুঃখবোধেই সুশোভনের বুকে মাথা রাখল। সুশোভন চোখ বুজিয়ে একেবারে শূন্য মনে কিছু সময় নিথর পড়ে রইল।





বাবুই পাখির বাসা

বাইরের দরজার কড়া হঠাৎ একবার নড়ে থেমে গেল।

ঘরের মেঝেয় চিত হয়ে শুয়ে ভাঙা হাত-পাখা নাড়তে নাড়তে বীথি বই-এ চোখ রেখেছিল একটু আগেও। এখন হাত-পাখাটা মেঝেয় পড়ে আছে। ও শুধু পড়ায় গভীর মনোযোগী। এরই মধ্যে ও-ই বোধ হয় প্রথম শুনতে পেল, বাইরের দরজার কড়াটা কেউ যেন একবার নেড়ে দিয়ে থামল।

বড়দা কি আজ দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল ? কটা বাজল ? এলেও বড়দা এইভাবে তো কড়া নাড়ে না ! বই-এর দিকে দৃষ্টি রেখেও বীথি কথাগুলো ভাবল। একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়ালের তাকের দিকে তাকাল। বাবার কেনা বহু পুরনো ঘড়িটা যতবার বীথি দম দিয়ে মিলিয়ে সচল করেছে, ততবার কিছু সময় চলে বন্ধ হয়ে গেছে। এখনো তা-ই। এখন ঘড়িতে ন'টা একত্রিশ। বীথি হিসেব করে বুঝল, এখন ঠিক দেড়টা। বড়দার তো ফেরবার কথা নয় ! বোধ হয় বাতাসে কড়া নড়েছে। বীথি পাশ ফিরে শুয়ে বইটা মুখের অনেক সামনে নিয়ে এল।

বাইরের দরজার কড়া এবার জোরে নড়ল। আগের থেকে একটু বেশী সময় কড়া নড়ল যেন। কেউ কি ডাকছে ? বলাই, না ছোড়দা ? বীথির ঘামে-ভেজা পিঠ মেঝেয় চটচট করতেই হাত-পাখা বাঁ হাতে নিয়ে একটু বাতাস খেল। বইটা বুকের ওপর উপুড় করে রেখে পাশে সীমার দিকে তাকাল। সীমা মেজবৌদির মেজ মেয়ে, বীথির খুব ন্যাওটা। ইউনিভার্সিটির গরমের ছুটিতে সেই যে কলকাতার হস্টেল থেকে এই বাড়ি ঢুকেছে, তার পর সীমা বীথির সঙ্গ ছাড়েনি।

বীথিকে খুব ভালবাসে সীমা। কোনদিন দুপুরে মায়ের কাছে শোয় না, বীথির কাছেই ঘুমোয়।

বীথি সীমাকে দেখল। খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। গোটা গায়ে ঘামাচি বিজ-বিজ করছে। ওর ওপাশে রন্টু, বড়দার ছোট ছেলে। বীথির মা ভুবনময়ী দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। বীথি মাকে দেখল। কি ময়লা, ছেঁড়া কাপড় পরে আছে মা! বীথির চাপা কষ্টটা অতি পুরনো অম্বলের ব্যথা জেগে ওঠার মত বুকের মধ্যে বেজে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বীথি।

অসহ্য গরমে সীমা ছটপট করছে। বীথি সীমার গায়ে হাত রাখতেই শুনল, বাইরের দরজায় আবার কড়ার আওয়াজ হল। তা হলে সত্যি কেউ ডাকছে? বড়বৌদি, মেজবৌদিরা কি করছে এখন! ওরা কি শুনতে পাচ্ছে না? নতুন-বৌদিও তো এই একটু আগে খেয়ে উঠল! নাকি সব শুয়েই একেবারে অঘোর ঘুমে অচেতন!

বীথির উঠতে ইচ্ছে করছে না। সীমাকে গলা নামিয়ে ডাকল, 'এই সীমা, দেখে আয় তো, বাইরে কে কড়া নাড়ছে।'

সীমা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। বছর আট বয়স। বীথির খুব অনুগত। উঠে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। লম্বা দালান। বীথিদের ঘর বাদ দিয়ে পর পর চারখানা ঘর। ওপাশের কোণে রান্নাঘর, পাশেই একটু দূরে কলঘর, পায়খানা। বহু পুরনো একতলা বাড়ি। মেঝে আর ঘরের দেয়ালের কিছুটা ওপর পর্যন্ত সিমেণ্ট বাঁধানো। বাকিটা মাটির। ওপরের ছাদে কাঠের ফ্রেমে টিন বসানো। গরমের দিনে সারা বাড়ি যেন আঁচ-ফেলে-দেওয়া উনুনের মত চাপা থাকে। বাড়ির দু'পাশে নোংরা ড্রেন। কোনদিন তার গন্ধ বাড়ির চারপাশ থেকে সরে না।

বীথির মেজবৌদি অরুণা মাঝের ঘরের মেঝেয় শুয়ে মাস ছয়েকের শিশুকে স্তন দিচ্ছিল। বাইরে দালানে সীমাকে যেতে দেখে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'বাইরে কে কড়া নাড়ছে, ভাল পিসি দেখতে বলল!'

'তাড়াতাড়ি আসবি! এসে শুয়ে পড়বি।' অরুণার গলার স্বর একটু চড়া। যে কোনো কথা আস্তে বললেও জোরে শোনায়।

সীমা বড় জ্যাঠাইমার ঘর পাশে রেখে কাঠ-কুটো-কয়লা নোংরা ভাঙা টিন, গুল দেওয়ার মাটি, সারা বাড়ির ঝাঁটানো জঞ্জাল রাখার জায়গার কাছে এল। ওগুলো পেরিয়ে গেলেই দরজা। সীমা এগোতে যাবে, আবার কড়া নড়ল, আর

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় হাত দিয়ে মৃদু ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। সীমা খিল নামিয়ে দরজা খুলে দিল।

সামনে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। ঘর্মাক্ত। ঘন ঘন হাত-মুখ মুছছে রুমাল দিয়ে। যুবকটি সীমার দিকে তাকাল। 'এখানে বীথি চক্রবর্তী বলে কেউ থাকেন? কলকাতায় পড়াশুনা করেন!'

'ভালপিসির কথা বলছেন?' হ্যাঁ।' সীমা বড় করে ঘাড় নাড়ল। 'আসুন ভালপিসি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।'

'না। আগে তুমি গিয়ে বল, কলকাতা থেকে তরুণবাবু এসেছেন, তরুণ চৌধুরী।' গলা অনেক নামিয়ে বলল তরুণ, 'কি, নাম মনে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।' সীমা আবার বড় করে ঘাড় নাড়ল। একবার তরুণের চোখে চোখ রেখে প্রায় দৌড়নোর মত দালান ধরে হাঁটতে লাগল। বীথির বড়বৌদি নমিতা তিনটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ঘুমে অচেতন। দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলিকে অনেক কষ্টে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিজে ঘুমোতে পেরেছে এতক্ষণে। সীমার মা-ও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। বীথির নতুনবৌদি কণিকার এখনো বাচ্চা হয়নি। দরজায় খিল এঁটে রেডিও শুনছে। নমিতা ও অরুণা দুপুরে রেডিও বাজলে রেগে যায় বলে রেডিওর শব্দ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ওরা কেউ সীমার ফিরে আসার পায়ের শব্দ পায়নি।

সীমা বীথির কাছে এসে দাঁড়াল। হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকা বীথির সামনে ঝুঁকে বলল, 'ভালপিসি, তোমায় কে একজন ডাকছে।'

'আমায়!' শুয়ে থেকেই বীথি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এসেছে। খুব সুন্দর দেখতে!'

বীথি দ্রুত উঠে বসল। 'আমাকে ডাকতে আসবে কলকাতা থেকে। দুর পাগলি, ভুল শুনেছিস্।'

'হ্যাঁ গো, তোমাকেই ডাকছে। তোমার নাম বলার পর বলল, আমার নাম তরুণ চৌধুরী।'

···'হ্যাঁ, তরুণ চৌধুরী আমার নাম।' একটু থামল তরুণ। 'আপনি যদি বীথি চক্রবর্তী হন তা হলে আমার স্পেকুলেশন করেক্ট।'

'মানে?'

'আগে বলুন, আপনি বীথি চক্রবর্তী কিনা!'

'হ্যাঁ, তাতে কি!'

'সমস্ত মিলিয়ে মানে চেহারা, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি—সবেতেই আপনি কি রোমান্টিক! শোভনা, মানে আপনার রুমমেট অর্থাৎ আমার মাসতুতো বোন বলেছিল, দেখলেই দাদা, তোর এরকম মনে হবে।'

বীথি এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল তরুণকে। ওর কথায় মুখ লাল হয়ে উঠল। 'আপনি বসুন, আমি শোভনাকে ডেকে দিচ্ছি।'

'আমি এসেছি ও জানে।' তরুণ থামল। 'বলুন কবে গান শোনাবেন?'

'সে কি! আমি আবার গান শিখলাম কবে?'

'সুকণ্ঠ থাকলে বাথরুমও গান শেখায়।'

বীথি সত্যি লজ্জা পেল। কথা ঘোরাল, 'আচ্ছা, শোভনা কি আপনার নিজের মাসতুতো বোন?'

'না, দূরসম্পর্কের।'

'থাক, ঘটা করে পরিচয় দিতে হবে না। সম্পর্কে দূর হলেই বা, এখন তো কাছে আছি!' শোভনা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

হেসে উঠল বীথি। 'আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনি তো খুব ভাল গান গাইতে পারেন।'

'না শুনেই কম্প্লিমেন্টস দিচ্ছেন?'

'তা ছাড়া আর উপায় কি? এই হস্টেলের ভিজিটার্স রুমে বসে তো আর গান শোনা যায় না?'

'বেশ তো, এ্যারেঞ্জ করুন। আপনি তো বর্ধমানে থাকেন?'

'এই শোভনা, এরই মধ্যে সব বলে দিয়েছিস!'

'কেন, ভুল করেছে নাকি? বেশ, আপনাদের বাড়ি যাবো না, খাবো না, থাকতেও চাইব না। সুতরাং ভয়ের কি?'

'এই না!' বীথি যেন অপ্রস্তুত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তা বলছি না!' একটু থেমে বলল, 'বেশ তো, আসুন না আমাদের ওখানে। ভাল করে গান শুনব।'

'সত্যি যেতে বলছেন তো?'

'সত্যি নয়তো কি মিথ্যে? কাল থেকে তো হস্টেল বন্ধ হচ্ছে। গরমের ছুটিতেই বরং একদিন আসুন।'

'কি রে বীথু, আমাকে তো কোনদিন যেতে বলিস নি!' শোভনা বলল, 'তোর বাড়ির ব্যাপারটা তো মিস্ট্রি করেই রেখেছিস!'

তিনজনেই হেসে উঠল। বীথি ভিতরে চাপা সঙ্কোচ আর ভয়ে আড়ষ্ট।

'তোমরা একটু কথা বল, আমি আসছি।' শোভনা উঠে গেল।

তরুণ বলল, 'একটা সত্যি কথা বলি। আপনাকে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল। আসলে ব্যাপারটা হঠাৎ নয়, শোভনা অনেক কথা বলেছে তো, তাই।' একটু থেমে তরুণ গলা নামিয়ে বলল, 'এবার ঠিক একদিন যাবো, গিয়ে পরিচয়টা স্থায়ী করা যাবে। মানে বন্ধুত্বটা। আপত্তি নেই তো? বলুন!'······

'ভালো পিসি, ওঁকে এখানে আনব?'

চমকে উঠল বীথি। 'না, এখনি না!' বীথি হঠাৎ ভীষণ অসহায় বোধ করল। সত্যি তরুণই এসেছে। কিন্তু এভাবে মাত্র কদিনের পরিচয়ে ওদের বাড়ি চলে আসবে ভাবতেই পারে নি। নিশ্চয়ই শোভনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছে। এখন ও কি করবে! এ বাড়িতে বসাবে কোথায়? ঘর-দোরের যা চেহারা! তার ওপর মা-বৌদিরা কি ভাববে? দাদারা যদি শোনে! ভয়ে বীথির বুকের ভিতরটা ভারী শব্দে অসহ্য হয়ে উঠল।

সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বীথি সচেতন হল। 'শোন্, গিয়ে বল্, আপনি একটু দাঁড়ান, আসছে।' সীমা যাবে বলে পিছন ফিরতেই বীথি ওর ডান হাতটা আচমকা ধরে ফেলল। 'এই, তোর জামাটা গায়ে দিয়ে নে।' মেঝেয় পড়ে থাকা ওর জামাটা হাতে দিল।

সীমা জামাটা গায়ে গলাতে গলাতে বাইরে চলে গেল।

বীথি সামান্য কয়েক মুহূর্ত নিথর দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে চোখ বুলোল। হঠাৎ কি মনে হল, তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে এগিয়ে এল। মাকে ঠেলা দিয়ে ডাকল, 'মা।'

ঘুম ভেঙে গেল ভুবনময়ীর। 'কি?'

'তাড়াতাড়ি ওঠ, এক ভদ্রলোক এসেছেন কলকাতা থেকে।'

'কে?' সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন ভুবনময়ী।

'আমার সেই যে বান্ধবী শোভনার কথা গল্প করেছি তোমাকে! তার দাদা।'

নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থেকে ভুবনময়ী বললেন, 'কেন এসেছে?'

'কি জানি। বোধ হয় শোভনারই কোন দরকারে।'

'কই, এতদিন তো আসেনি! তা-ও এই দুপুরে! এখন কোথায় বসাবি?'

'তুমি তাড়াতাড়ি ওঠ না! নতুনবৌদির ঘরে যাও। এ ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নি তাড়াতাড়ি।'

ভুবনময়ী মেঝের ওপর উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি। রণ্টুকে তখনো ঘুমোতে দেখে ডেকে তুললেন। 'ওঠ্ তো বাবা, তোর মায়ের কাছে যা। কলকাতা থেকে লোক এসেছে, এঘরে বসবে।'

আচমকা ঘুম-ভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে রণ্টু ভুবনময়ীর সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বীথি এবার একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘামছে। ঘরটাকে কিভাবে একটু গুছিয়ে ফেলা যায় ভাবছে। সব পরিষ্কার করা যাবে না। অথচ এ ঘরে না বসালে বসাবে কোথায়? নতুন-বৌদির ঘরটাই যা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ছোট আর একটিমাত্র জানালা থাকায় ভীষণ গুমোট। মেজ-বৌদির ঘরে দাদারই অনেক জিনিসপত্তর। তার ওপর মেজবৌদি ভীষণ নোংরা। ঘরের ঝোলানো জামা-কাপড়ের দিকে তাকানো যায় না। বড়বৌদি পরিষ্কার হলে কি হবে, বাইরের কোন পুরুষ, বিশেষ করে বীথির কোন পুরুষ-বন্ধুকে কি ভাল মনে বসতে দেবে?

মুহূর্তে কথাগুলো ভেবে নিয়ে বীথি ভয়ঙ্কর এক অসহায়তায় কাঠ হয়ে গেল। হঠাৎ কি ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওদের ঘরের ভাঙা তক্তপোশটায় ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, কিছু তোষক দেওয়া বিছানা। ওপরের সেলাই করা চাদরটা ময়লা ছিল বলে আজই সকালে তুলে সাবান জলে দিয়েছে বীথি। দেরী না করে নতুন বৌদির ঘরে ঢুকল। ভুবনময়ী কণিকার সঙ্গে কথা বলছিলেন, চুপ করে গেলেন।

'বৌদি, তোমার একটা নতুন চাদর দেবে?'

'কেন, কে এসেছে?'

'পরে বলছি, দাও না, ভদ্রলোককে বসাতে পারছি না।'

কণিকা তালা-না-দেওয়া ট্রাঙ্কটা খুলে একটা কাচানো ইস্ত্রি-করা বেড শীট বের করে দিল।

বীথি আর একটুও দেরী না করে ওদের বিছানার ওপর চাদরটা পেতে দিল। বড় হওয়ায় তক্তপোষটাও ঢেকে গেল। আর একবার ঘরটায় চোখ বুলোতে গিয়ে একটা কোণে দৃষ্টি থেমে গেল। ছেঁড়া তেল-চিটচিটে বালিশ, বাতিল কাঁথাগুলোও দীর্ঘ-ছেঁড়া। চট-চাপা হয়ে ঘরের কোণটায় ডাঁই হয়ে রয়েছে অনেকদিন। 'ইস্, এগুলোকে নিয়ে এখন কি করি? কি চাপা দেব?' বিড়-বিড় করল বীথি।

কিছু ঢাকা দিলেও তো দেখা যাবে! তা ছাড়া ঢাকা দেবেই বা কি দিয়ে? বীথির নিজের দু'খানা শাড়িই ধোপাকে দিয়েছে কাচতে। একটা আলনায় ঝোলানো। ওটা দিয়ে চাপা দিলে তরুণবাবুই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। প্রথম পরিচয়ের দিন তরুণবাবুর সামনেই ওটা পরে তো গিয়েছিল!

কি করবে এখন? হঠাৎ কি ভেবে জড়ো করা নোংরা পুঁটলিটা দুহাতে তুলে নিল। বেশ কয়েকটা আরশুলা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে। কণিকার ঘরের সামনে এসে বলল, 'এটা একটু তোমার ঘরের কোণে ফেলে রাখব?'

'সে কি। আমার ঘরে জায়গা কোথা? একটু মেজদির ঘরে রাখ না।'

বীথি দ্রুত মেজবৌদির ঘরে চলে এল। মেজবৌদি অরুণা ততক্ষণে মেঝেয় উঠে বসেছে। 'কি ব্যাপার ঠাকুরঝি?'

'এটা একটু রাখবে বৌদি? এক ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে বসাতে হবে. এগুলো সামনে রাখতে বিচ্ছিরি লাগছে।'

'কিন্তু আমার ঘরে জায়গা কোথা? তা ছাড়া যা নোংরা! সমস্ত ছারপোকা আমার ঘরে ঢুকবে। তুমি দালানে রেখে দাও না।'

'দালান দিয়ে তো আসবেন।' বীথির কণ্ঠে অসহায়তা।

'তুমি ফেলে রাখ না। দেখবে না।'

বীথি রীতিমত ঘামছে। 'সেই ভাল। এই জানলার কাছে রাখলাম বৌদি।' পুঁটলিটা রেখে বীথি নানাভাবে ঢাকতে লাগল দ্রুত হাতে।

'কে এল?' অরুণা বীথির দিকে তাকিয়ে বলল।

'আমার এক বান্ধবীর দাদা।'

'হঠাৎ?'

'কি জানি। বোধ হয় শোভনা কোন দরকারে পাঠিয়েছে!'

'একা এসেছেন?'

'হ্যাঁ'।

'এই দুপুরে! কি ব্যাপার!'

বীথি অরুণার দিকে তাকাল। একটু হাসল। 'ব্যাপার আর কি? জরুরী কোন দরকার বলেই এসেছেন হয়ত।' বীথি চাপা গলায় কথা বলতে বলতে নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরের মেঝের আরশুলাগুলো সব লুকিয়েছে। ঘরটা এখন একটু ফাঁকা। দড়ি-ঝোলানো আলনা থেকে তাড়াতাড়ি জলে ধোয়া ময়লা ব্রা-টা সরিয়ে নিল

বীথি। কয়েকটা নোংরা জিনিসপত্তর তক্তপোষের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ঘরের ওপাশে দেয়াল-আলমারি-ঢাকা ময়লা ছেঁড়া-কাপড় দিয়ে তৈরি পর্দাটার আর কিছু করা যাবে না মনে হতেই বীথি বুঝতে পারল, তরুণবাবু অনেকটা সময় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার ডেকে আনতে হবে। নিজের পোষাক দেখল। কাপড়টা একেবারে আটপৌরে, ছেঁড়া। জামাটারও পিঠের দিকটায় একটু সেলাই করা। এই পরে কি ডাকতে যাবে? কিন্তু এখনি পরার মত কাপড একটাই আছে আলনায় কোঁচানো। বদলালে বৌদিরা কিছু বলবে না তো? নাকি, না বদলেই পরা কাপড়টাকে গুছিয়ে পরে নিয়ে ডাকতে যাবে? ভাবতে ভাবতে পরনের কাপড়টা সন্তর্পণে শরীরের ওপর পরিপাটি করে নিল। ছেড়া অংশগুলো আপাতত একটুও দেখা যাচ্ছে না। পিঠ-বুক ভাল করে ঢেকে নিল। গরমে ঘামে জামা ভিজে গেছে। দ্রুত ভাঙা আয়নায় মুখ দেখল। খোলা চুলে খোঁপা করে বীথি দালান ধরে বাইরের দরজার সামনে এল।

সীমা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তরুণকে একমনে দেখছে। বুড়ো আঙুলটা চুষছে একভাবে। বীথি সীমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন। আসতে আমার খুব দেরী হয়ে গেল। যা-তা ভাবছেন তো?'

তরুণ রোদে দাঁড়িয়ে রীতিমত ঘামছিল। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে। ঘন ঘন মুখ ঘাড় মুছছে রুমাল দিয়ে। বীথির কথায় একটু এগিয়ে এল। হাসল। 'আপনি বুঝি খুব ভাল?'

'কেন?'

'না হলে ভাসোপিসি হলেন কি করে?'

'ও।' বীথি সীমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসল। 'বাজে কথা ছাড়ুন, তাড়াতাড়ি ভেতরে আসুন। যা রোদ।'

ঘরের ভেতরে পা দিতে দিতে তরুণ বলল, 'খবর না দিয়ে, তার ওপর আবার দুপুরে এসেছি বলে খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন তো?'

'করলে আপনি বুঝতে পারবেন?'

'তার মানে অপ্রস্তুত হয়েছেন, এই তো?'

'না, না। এসে ভালই করেছেন। নিশ্চয়ই কোথাও কাজে এসেছেন এদিকে?'

'কেন, কাজ না থাকলে কি আসা যায় না?'

'তা আসবেন না কেন? সেটা সোজা আমার বাড়ি হবে এমন সৌভাগ্য আমার ধারণায় ছিল না।'

'তার মানে চলে যেতে বলছেন? বেশ চলি।' বলেই তরুণ বীথির ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আরে কি করছেন? আপনি একটা কথার এত মানে ধরেন! আপনাকে কোন কথাই বলা যায় না তা হলে!'

তরুণ হাসতে হাসতে জুতো বাইরে খুলে রেখে ঘরে ঢুকল। তক্তপোষের ওপর বসল। 'আপনাদের ইলেকট্রিক নেই বুঝি?' সিলিং-এর দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলল তরুণ।

'না। এখানে আর সব বাড়ি আছে, আমাদেরটায় আসেনি। মাটির বাড়ি তার ওপর বাড়িওলার ব্যাপার তো।' বীথি কথাগুলো বলে হাতপাখাটা সামনে ধরল। 'পাখাটা ভেঙে গেছে কিন্তু। বাচ্চাদের ব্যাপার বোঝেন তো! নিন।'

তরুণ পাখা হাতে নিয়ে বাতাস খেতে লাগল। বাঁ হাতে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছছে। 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়ান আগে। উঃ, আজ কিন্তু ট্রিমেণ্ডাস্ গরম!'

'আসছি, আপনি বসুন।' বীথি ঘরের বাইরে এল।

রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে, দীপেনকে ঘরে ঢুকতে দেখল। দীপেন বীথির সেজ-জ্যাঠামশাই-এর একমাত্র ছেলে। বছর তিরিশ বয়স। বাড়ির ছেলেদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ছোট। ওকে দেখে বীথি থমকে দাঁড়াল। 'ছোড়দা, তুমি আমাদের ঘরে একটু যাও না। কলকাতা থেকে একজন এসেছেন, কথা বলো আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি, কিন্তু কে?'

'আমার বান্ধবী শোভনার দাদা। তরুণ চৌধুরী।'

দীপেন সোজা বীথিদের ঘরে চলে এল। 'নমস্কার।'

'ও, নমস্কার।' তরুণ হাতের কাগজটা খুলে চোখ বুলোচ্ছিল। ঈষৎ চমকে তাকাল।

'আমি বীথুর ছোড়দা। আপনি বুঝি বীথুর সঙ্গে একসঙ্গে পড়েন?'

'না ঠিক তা নয়।' একটু হাসল তরুণ। কথা ঘোরাল, 'আচ্ছা, এটা তো আপনাদের নিজেদের বাড়ি নয়।'

'না, এটা ভাড়া বাড়ি। এই ধরুন, বছর আটেক আছি। তবে আমাদের নিজেদের বিরাট বাড়ি, কয়েক বিঘে পুকুর, জমি আছে আরও ইন্টি-রিয়ারে। সে দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। নেহাত চাকরীর খাতিরে

এই বাড়িতে পড়ে থাকতে হচ্ছে। এরকম ন্যাস্টি বাড়িতে থাকতে আমাদের ফ্যামিলির কেউই অভ্যস্ত নয়।'

'ও।' তরুণ থামল। 'আপনি কি করেন? চাকরী?'

'না, এখনো পাইনি, এবার পাবো।' একটু থেমে বলল, 'বীথুটা পাশ করলেই আমার চাকরী। মানে, আমার এক বন্ধুর দাদা এখানকার একটা আফিসের ডিপার্টমেন্টাল হেড। বীথুটা খুব ইন্টেলিজেন্ট। বন্ধুর দাদা ওকে দেখেছেন। স্টেনো রাখবেন কথা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমাকেও বসাবেন একটা কাজে। ভদ্রলোক ব্যাচিলার, হ্যাণ্ডসাম, তবে আপনার মত নয়।' হাসল দীপেন।

তরুণের মুখ সলজ্জ। 'মানে, চাকরীটা বীথুর বড কাজেও লাগতে পারে বলছেন?

'হলে মন্দ কি? ব্যাপারটা কি জানেন, মেয়েদের চাকরী করতে দেওয়াটা আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ চায় না। কিন্তু বীথুর দিক থেকে ওর উইডো মা মানে আমার কাকিমা ছাড়া কেউ নেই তো। এই সব ভেবেই আমি ব্যাপারটাতে ইণ্টারেস্ট নিয়েছি, এর সঙ্গে আমারটাও জড়িয়ে আছে। আজকাল চাকরী পাওয়া বোঝেন তো!'

বীথি ঘরে ঢুকল। 'কি বলছ ছোড়দা? তোমার চাকরী হল?' বলতে বলতে গ্লাসটা তরুণের সামনে ধরল।

'হবে এবার।' দীপেন তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আসি। আমাকে আবার এখনি যেতে হবে।'

'আচ্ছা, আসুন।' তরুণ হাত তুলে নমস্কার করল।

দীপেন বেরিয়ে যেতেই তরুণ জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের নিজেদের বাড়িটা কোন্ গ্রামে বলুন তো? আমাদেরও আদি বাড়ি কিন্তু বর্ধমানের এক গ্রামে!'

বীথি ভেতরে চমকে উঠল। ছোড়দা ওর সেই বানানো গল্পটা এরই মধ্যে শুনিয়ে গেছে! বীথি আড়ষ্ট বোধ করল। তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছাড়ুন তো। বললেই তো আবার সেখানে যাবেন?'

হো হো করে হেসে উঠল তরুণ। হাসির দমকের মধ্যেই গলা নামিয়ে বলল, 'তা ঠিক। তবে আপনার জন্যে যেতে কোন আপত্তি নেই। আপনার এ্যাট্রাক্‌শান কম নয়!'

'আপনি বসুন, আমি আসছি।' বীথি আরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অরুণা বড় জা নমিতার ঘরে ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে বীথিকে বাইরে আসতে দেখেই দরজার সন্তর্পিত ফাঁকটা বন্ধ করল আস্তে আস্তে। অরুণা বলল 'কি মনে হয়?'

নমিতা অরুণার চোখে চোখ রাখল। 'কি আবার? দু'জনে তো দুজনকে আপনি বলছে।'

'আজকাল এভাবেই হয়। আপনি কিছু জানেন না দিদিভাই।'

'ছেলেটির কিন্তু বয়স বেশী না। কত আর? বড় জোর তিরিশ। তবে বেশ লম্বা-চওড়া আছে!'

'আর দেখতে!' অরুণা চোখ বড় করল। 'বাগিয়েছে ভাল।'

'কি যে বল তুমি! একটুতেই যদি বাগানো হয়ে যায়, তা হলে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারত। ওর পাশে আমাদের ঠাকুরঝিকে কি রকম মানায় একবারও ভেবেছ?'

বীথিকে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখে ওরা দুজন উঠে দাঁড়াল।

বীথিকে দেখে ভুবনময়ী ঘরের মেঝেয় উঠে বসলেন। এতক্ষণ শুয়েছিলেন। 'হ্যাঁরে বাথু, ছেলেটা শোভনার কিরকম ভাই?'

'কি রকম আবার! যেমন ভাই হয়!'

'না, আমি বলছি আপন ভাই?'

'না। দূরসম্পর্কের ভাই।'

'তা তোর কাছে এসেছে কেন?'

'মা, আস্তে কথা বল! পাশের ঘরেই ভদ্রলোক বসে আছেন।'

ভুবনময়ী বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চাইছেন। বললেন, 'এ বাড়িতে এমন একজন বাইরের ছেলেকে হুট করে আসতে বলে ভাল করিসনি বীথু।'

'মা, তুমি ওসব পরে বলবে। এখন চুপ কর।'

'চুপ করব কেন? আমি এসব পছন্দ করি না। পাড়ার লোকে কি বলবে? আজ পর্যন্ত এ বাড়ির মেয়েদের কোন ছেলেবন্ধু ছিল দেখেছিস? আমার চার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ভাসুরদের কত বড় বড় মেয়েরা ছিল। কেউ ভেবেছিল এসব? কোথা থেকে কি হয় কে বলতে পারে? তখন সামলাবে কে?'

'মা!' বীথি চাপা রাগে চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনি এখন থামুন ছোটকাকিমা। বাড়িতে ভদ্রলোক আছেন। চলে

গেলে না হয় আপনারা কথা বলবেন।' কণিকা বলল। বীথির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'ভদ্রলোক খুব সুন্দর দেখতে ঠাকুরঝি, আর বয়সও কম, তাই বোধ হয় কাকিমা ভয় পাচ্ছেন!'

'মায়ের কথা ছেড়ে দাও।' একটু থামল বীথি। 'বৌদি, আমায় তোমার একটা কাপড় দেবে? এটা পরে কিছুতেই সামনে যেতে পারছি না, বসতে পারছি না। আমার শাড়িটা এমনভাবে আলনায় গোছানো, ওঁর সামনে নেওয়া যাচ্ছে না!'

কণিকা বীথির সমবয়সী, এ বাড়িতে বীথির অনেকটা বন্ধুর মতন। মৃদু হাসতে হাসতে কণিকা ওর একটা শাড়ি বীথিকে দিয়ে বলল, 'জামাটাও পাল্টে নাও।' বীথিকে টেনে ঘরের কোণে নিয়ে গেল। 'আমার জামাটা একটু বড় হতে পারে, তবু পর। তোমার অবস্থা যা, তাতে কাঁধের কাছে ব্রা-র ষ্ট্র্যাপে তো কখনই জামায় ঢাকা থাকে না! তোমার পরা ব্রা-টা একবার দেখ, ছেঁড়া আর ময়লা।'

'যাও, কি অসভ্য তুমি!' ফিসফিসিয়ে বলল বীথি। বীথির ফর্সা গাল, দু'কানের চারপাশ লাল হল মুহূর্তে।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে বীথিকে কাপড় পরতে দেখে নমিতা ঘরে ঢুকল। 'কে এসেছে ছোট্‌কাকিমা?' গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল নমিতা।

বীথি উত্তর দিল, 'আমার বান্ধবী শোভনা, তার দাদা। বর্ধমানে দরকারে এসেছেন, একবার আমাদের বাড়ি ঘুরে যাচ্ছেন।'

'তুমি আসতে বলেছ ঠাকুরঝি?'

'শোভনার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে এসেছেন।'

'তা কখনো হয়? তুমি নিজে না আসতে বললে আসবে কেন?'

বীথির কাপড় পরা হয়ে গেছে। বড়বৌদির দিকে একবার তাকাল। বড়বৌদিকে চেনে। কথা না বাড়িয়ে নীরব থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণা ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ দালানে দাঁড়িয়ে দরজার আড়াল দিয়ে তরুণকে দেখছিল। ঘরে ঢুকে কণিকার দিকে একবার তাকিয়ে ছোটকাকিমাকে দেখল। 'কাকিমা, আপনি জানতেন ছেলেটি আসবে?' অরুণার কণ্ঠস্বর চাপা হলেও জোর শোনাল।

'আমাকে আবার কি বলবে!'

'কিন্তু বড়ভাসুর বা তার মেজভাই শুনলে কি বলবেন একবারও ভেবেছেন ?' অরুণা ভুবনময়ীর সামনে দাঁড়াল।

নমিতা যেন বিড় বিড় করল, 'জানেন তো দেবদাসকে বলে রেখেছি, বীথু পাশ করলেই বিয়ের ব্যবস্থা হবে। দেবদাস পাত্র হিসেবে খারাপ নয়। হোক আগেকার ম্যাট্রিক পাশ বা একটু বয়স বেশী, কিন্তু খুব ভাল চাকরী করে। আর আপনারাই দেখে কথা দিয়েছেন ! এখন আমি কি করি !'

'তুমি এসব কি বলছ বড়বৌমা ?'

'ঠিকই বলছি। ছেলে কালো বলে অমত, তখনি বলতে পারতেন। আর মেয়ে নিজে পছন্দ করেছে, এটাই বা গোপন করার কি ছিল ?'

'আস্তে কথা বল বৌমা।' একটু থামলেন ভুবনময়ী। 'তুমি কেন ভাবছ ও অন্য কিছু করছে ?'

'কিন্তু এত সুন্দর দেখতে একটি ছেলে এমন ভরতপুরে অকারণ আসতে যাবে কেন ? এ তো নাটক-নভেলেই ঘটে ! কলকাতার হস্টেলে রেখে মামাবাবু না হয় পড়াশুনার সব খরচ দিচ্ছেন। তা বলে আপনাদের কি অন্য খোঁজখবর রাখা উচিত ছিল না ?'

ভুবনময়ী নীরব রইলেন। এমনিতে ভীষণ শান্তপ্রকৃতির। তার ওপর বছর পাঁচেক আগে স্বামীর হঠাৎ-মৃত্যুর পর থেকে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। একান্নবর্তী সংসারে অভাবটাও ভীষণভাবে আঘাত করে, কাঁপিয়ে দেয়। মনে মনে বিড় বিড় করলেন, 'বীথু কি সত্যি নিজে কিছু ভেবেছে ? কিন্তু আমার কোন মেয়েই তো এরকম নয় ! বীথুকেও তো এসব ব্যাপারে ভাবাই যায় না !'

'ছেলেটিকে ভাল করে দেখেছেন ? বিরাট বড়লোক বলে মনে হল। এ তো আগুন। বীথুর পুড়তে কতক্ষণ ?' নমিতার কণ্ঠে ক্ষোভ স্পষ্ট। 'আমি এখন দেবদাসকে কি বলব, তাই ভাবছি।'

'আপনি অকারণ ভাবছেন দিদিভাই।' কণিকা এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। বেশ কয়েক মাস নমিতার সঙ্গে কথা বন্ধ। এই মুহূর্তে কথা না বলে পারল না। 'এসব কিছু না-ও হতে পারে তো ! এমনি হয়ত ভদ্রলোক এদিকে এসেছেন, ঘুরে যাচ্ছেন। ঠাকুরঝিকে দেখে যা মনে হল, ও তো এসব কিছুই জানে না ! একেবারে অপ্রস্তুতে পড়েছে ! একটা মেয়ে সত্যি কিছু করলে এত অপ্রস্তুত হবে কেন ! কলেজে পড়া মেয়ে !'

'তুমি থাম কণিকা। বালিগঞ্জের মেয়ে তো তুমি ! নেহাৎ বাবা জোর করে

এরকম বাড়িতে বিয়ে দিয়ে ফেলেছে বলে গলা নামিয়ে কথা বলছ। তুমিই তো সব শেখাও?'

কণিকা চুপ করে গেল।

অরুণা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বীথি ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে নীচু গলায়, কখনো বা ফিসফিস করার মত কথা হচ্ছিল বলে বুঝতে পারেনি। ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন। বৌদি, তোমাদের সঙ্গেও।' বীথি সকলের দিকে একবার দৃষ্টি ঘোরাল।

'আমি কি করে যাব? আমি বেরুতেই পারব না।' ভুবনময়ী বললেন, 'লোকের সামনে পরে বেরুবার মত একটা কাপড় দিয়েছিস?'

অরুণা নমিতা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করল।

'কিন্তু তরুণবাবু বারবার বলছেন যে।' বীথি যে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে, কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল। 'যত বোঝাচ্ছি, মা আসতে পারবে না, একটু অসুস্থ আজ, বলছেন, তা হলে আমি নিজে গিয়ে দেখা করছি। পাশের ঘরে আছেন তো? এখন বল আমি কি করি?'

অরুণা-নমিতা উঠে দাঁড়াতেই বীথি বলল, 'বড়বৌদি, তুমি চল। আলাপ করিয়ে দি। তুমিও এসো মেজবৌদি। একবার শুধু পরিচয় হলেই হল।' বলে কণিকার দিকে চোখ ঘোরাল।

'চল।' কণিকা হঠাৎ বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগোল। অরুণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন না মেজদিভাই, এতে ক্ষতি কি?'

তিন বৌদি বীথিদের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বীথি ওদের আগেই ঘরে ঢুকেছে। তরুণ ছোটদের একটা পড়ার বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। হাতে ভাঙা হাতপাখাটা। একটু ঘামছে তরুণ। ঘরের মেঝেয় সীমা মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল নিয়ে একভাবে তরুণকে দেখছে। এর মধ্যে নমিতার দুই ছেলে, অরুণার এক ছেলে আর এক মেয়ে এসে সীমার কাছে বসেছে। অরুণার ছোট ছেলেটি নাক খুঁটছে বসে বসে। কণিকার তা চোখে পড়তেই বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে তরুণকে দেখল।

'এই দেখুন, আমার বড়বৌদি, ইনি মেজবৌদি, এ ছোটবৌদি।'

'ও, আচ্ছা, নমস্কার, নমস্কার।'

'এঁর নাম তরুণ চৌধুরী। শোভনার দাদা, ভীষণ ভাল গান জানেন।'

'গানে ইনিও কম নন।' বীথিকে দেখিয়ে তরুণ হাসতে হাসতে বলল, 'আপনাদের শুনিয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি খুব ভাল গলা।'

'তাই বুঝি ?' কণিকা হাসল। 'আমরা এতদিনেও যা শুনিনি, আপনি শুনলেন কোত্থেকে ?'

'শোভনা, মানে আমার বোনের কাছ থেকে!'

হেসে উঠল কণিকা। বীথিও।

অরুণার ঘরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠতেই অরুণা বলল, 'আমি একটু আসছি, আমার আবার ছেলে কাঁদছে।'

'নিশ্চয়ই আসুন। এমন দুপুরে সকলের ঘুম ভাঙিয়েছি, পাপটা তো আমারই!' হাসতে লাগল তরুণ।

অরুণা-নমিতা দুজনেই অল্প হাসল। নমিতা একদৃষ্টে তরুণকে দেখছিল। অরুণা সরে আসতেই নমিতাও পিছু পিছু চলে এল। কণিকাও থাকল না। 'আসি, আপনি বসুন।' তরুণ হাসছে। কণিকা নিজের ঘরে চলে এল।

'কই, আপনার মাকে তো দেখলাম না!'

'আসছে।' বীথি কণিকার ঘরে এল।

'মা, একবার চল তো!' বলেই মায়ের দিকে তাকাল। নোংরা ছেঁড়া কাপড় আর মায়ের মুখের কঠিন অথচ অসহায় রেখাগুলি দেখে ঝিমিয়ে গেল।

'এ অবস্থায় যাবেন কি করে ?' কণিকার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অসহায়তা।

'দাদার কোন ধুতি নেই ?' কণিকার চোখে চোখ রাখল বীথি।

'দাদা তো প্যান্ট পরে বীথু। যাও-বা দুখানা ধুতি আছে, সেগুলো লাল পাড়। মা তো পরবেন না!' কণিকা বলল।

'দীপুকে বললি না কেন ?' ভুবনময়ী দীপেনের কথা বলল। 'তার চেয়ে বড়বৌমার কাছে একবার খোঁজ কর।'

বীথি বুঝল, মা বড়বৌদিকে একবার জিজ্ঞেস করতে বলছে। কিছু না বললে বড়বৌদি রেগে যাবে, মা জানে। কিন্তু বীথির ভীষণ খারাপ লাগছে। মায়ের একটিও কাপড় নেই যখনি ভাবে তখনি মন খারাপ হয়ে যায়। কলকাতা থেকে আসার সময় ভেবেছিল কিনবে, কিন্তু পয়সায় কুলোয়নি। মামাবাবু যে কটি টাকা হস্টেলে থাকা, পড়ার খরচ ইত্যাদির জন্যে দেন, তাতে চলে না। তার ওপর মামাবাবুকেও চাপ দেওয়া যায় না। তাই একটা টিউশনি করে চালাতে হয়। মামাবাবু জানেন না, বাড়ির কেউ না।

বীথি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বড়বৌদির কাছ থেকে চাইতেও খারাপ লাগে। কখন কোন্ অর্থে কি কথা নেবে, বলবে, বীথি বুঝতে পারে না বলে বৌদিদের সামনে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। শুধু আজকের অসহায় অবস্থাটা ভেবে বীথি একবার বড়বৌদির ঘরে এল।

'বৌদি, দাদার কোন কালো পাড় ধুতি আছে দেবে ?'

নমিতার ভিতরে চাপা রাগ ছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার দাদা তো জানই, একটা সামান্য কাপড়ের দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান। কটা টাকা মাইনে পায় যে চার-পাঁচখানা কাপড় জমানো থাকবে ?' নমিতা মিথ্যেটা অবলীলায় বানিয়ে ফেলল।

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন বৌদি ?' বীথি মাথা নীচু করে শান্ত গলায় বলল।

'না, এমনি বলছি। তা ছাড়া ছেঁড়া কাপড় ছিল, বাচ্চাদের কাঁথা করে ফেলেছি।'

'আচ্ছা।' বীথি ঘরের সামনে থেকে সরে এলে। বুকের মধ্যেটা টনটন করছে বীথির। এখনি বোধহয় দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়বে। দালানে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবল। দীপেনের কথা মনে পড়ল। ছোড়দা অনেকটা বন্ধুর মতন। ওর কালো পাড়ের কাপড় আছে। কি ভেবে ছোড়দার ঘরের দিকে এগোল। ছোড়দাকে কিছু না বলে কাপড় নিলেও আপত্তি করে না। ও বীথিকে একটু ভাল চোখে দেখে। বীথি ধীর পায়ে ওর ঘরে চলে এল।

নমিতা অরুণার ঘরে ঢুকল। অরুণা ছেলের মুখে স্তন দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। নমিতা সামনে বসে বলল, 'বল তো, আমার কাছে কাকিমার জন্যে একটা কাপড় চাইতে এসেছিল ঠাকুরঝি, আমি দি কোত্থেকে ?'

'তাই বুঝি ?' অরুণা শুয়ে থেকেই নমিতার দিকে তাকাল। 'না দিতে রেগে গেছে !'

'কি জানি ! আমার কি ? নেই, সত্যি কথা বলেছি।' নমিতা চুপ করল। অন্যমনস্ক।

অরুণা ছেলের পিঠে হাত বোলাতে লাগল একভাবে। কোন কথা বলছে না।

'ছেলেটিকে তোমার কিরকম মনে হল ?' নমিতা বলল।

'কি জানি, আমার তো সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে !'

'কেন ?'

'ছেলেটিকে দেখতে কিন্তু খুব ভাল ! সত্যি জামাই করার মত ?'

'তোমার বড় মেয়ে এখন স্কুলে। থাকলে ভাল হত বলছ ? ক্লাশ ইলেভেনে পড়ছে যখন, আলাপ করিয়ে দিয়ে চেষ্টা করতে নাকি ?'

'না, এতোটা ভাবছি না। আমার অন্য ভয় হচ্ছে।'

'কিসের ভয় ?'

'আপনার তো বড় বলতে সবই ছেলে দিদিভাই। আমার বড়-মেয়ের পরেও দুই মেয়ে। বিয়ে দেব কি করে ?'

'কেন ? বাথু কিছু বলে গেল তোমাকে ?'

'ভাবছি, ও যদি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে, সে তো একটা কেচ্ছা ! তার পরেও কি আমাদের বাড়ির অন্য মেয়েদের বিয়ে হবে ?'

'তা ঠিক। এটা তো আমি ভাবিনি !' নমিতার কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

'আবার জাতটা কি হতে পারে ভেবে দেখেছেন দিদিভাই ? চৌধুরী বলতে তো অনেক জাতই হয়। অনেক মুসলমানও তো চৌধুরী আছে। আবার পোড়া বাংলাদেশ হয়েছে এখন, সব মুসলমানেরা এদিকে আসছে। ছেলেটির যে রকম লম্বা-চওড়া চেহারা, এ যদি সত্যি তা-ই হয় !'

'আমিও ছেলেটাকে দেখার পর তা-ই ভাবছি ভাই।' নমিতা অন্যমনস্ক হল।

'অথচ দেখুন, এ বাড়ির ছেলেরা যা করার সাহস করেনি, সামান্য একটা মেয়ে কি করতে যাচ্ছে !'

'করতে যাচ্ছে কি, করেছে !' একটু থামল নমিতা। 'দেখলে, গান পর্যন্ত শুনিয়েছে ! মেয়ে কলকাতায় গানও শেখে লুকিয়ে লুকিয়ে ! ছিঃ ছিঃ, আমি কোথায় টাকা-পয়সা খরচ করতে পারবে না বলে আমার ইঞ্জিনীয়ার মামাতো ভাই-এর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিলাম ! এখন কেলেঙ্কারির বাকি থাকল কি ?'

অরুণা কি বলতে যাচ্ছিল, বাথি ঢুকল অরুণার ঘরে। 'মেজবৌদি, মা বলল তোমার কাছে একটা টাকা হবে ?'

'কেন ?'

'মিষ্টি আনতে দেবে। মায়ের কাছে তো কিছু নেই।'

'আমার হাতে তো ও কিছু রাখে না ভাই, কোত্থেকে দেব ? ছোটকাকিমা তো জানেন। সে নিয়ে কত ঝগড়া যে ওর সঙ্গে। জেনেশুনেও চাইছেন কেন ?' একবার আগের দেওয়া টাকা ফেরত পায়নি, এখনি মনে পড়ল অরুণার।

বীথি একটুকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কণিকার ঘরে এসে বলল, 'নতুনবৌদি, তুমিই দাও না ঐ একটা টাকা। তোমার তো কাল সকালে লাগবে? জানি মাসের শেষ, আমি বরং ছোড়দার কাছ থেকে চেয়ে তোমায় দিয়ে দেব আজ সন্ধেতেই!'

'মেজদিভাই দিলেন না?'

বীথি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মাসের শেষ, কি যে করি! কলকাতা থেকে আসার পর আমার যা ছিল, সব মা নিয়ে নিয়েছে আগেই।'

'কিন্তু আমার এক টাকায় হবে তো?'

'তা-ও তো হবে না। চা, চিনি, দুধ নেই। যা আছে, তাতে তো বাড়িরই বিকেলের চা হবে না!'

কণিকা অসহায়ভাবে বীথির দিকে তাকিয়ে ছিল, বলাই ঢুকল ঘরে। বড়দার বড় ছেলে। বছর-সতেরো বয়স হবে। পড়াশুনা করে না। পাড়ার মাস্তানদের সঙ্গে ঘোরে। বড়দা একটা কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। 'কাকিমা, ও ঘরে সুন্দর মত ভদ্রলোক কে? দিদার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'পিসির পরিচিত। খুব ভাল গান জানেন।'

'সত্যি! তাহলে তো কথা বলতে হয়! নিশ্চয়ই হিন্দী গান ভাল জানেন।'

বীথি হঠাৎ বলল, 'বলাই, আস্তে কথা বল্। এই শোন্, এক টাকার খাবার এনে দিবি?'

'হ্যাঁ দাও।'

'একটু বাইরে শোন!' বীথি বলাইকে নিয়ে বাইরে এলো। 'তোর তো দোকান চেনা আছে, ধারে চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ আনতে পারবি?'

নমিতা সামনে এসে দাঁড়াল। 'ঠাকুরঝি, আবার ওকে ধারে জিনিসপত্তর আনতে দিচ্ছ! এ নিয়ে কিন্তু আগে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল।'

'কিসসু হবে না, আমি ঠিক আনব।' বলেই বলাই দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বীথি নমিতার অনেক কাছে সরে এল। 'বৌদি, তুমি কিছু ভেবো না, আমি আজই রাত্রে দিয়ে দেবো। ছোড়দা আসুক। ও হঠাৎ বেরিয়ে গেল, তখন খেয়াল হয়নি।'

নমিতার মুখে চাপা বিরক্তি। বীথিকে একবার দেখে নিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

বলাই খাবার, চা, চিনি, দুধ নিয়ে এলে বীথি মাকে ডাকল, 'মা, একবার এসো।'

'কোন খাবার টাবার আনবেন না যেন!' তরুণ বলল।

'বসো বাবা, তা কখনো হয় নাকি, এত দূর থেকে এসেছ! কিছু মিষ্টিমুখ করতে হবে!' বলতে বলতে ভুবনময়ী বেরিয়ে এলেন। বলাই তরুণের কাছে চলে গেল।

কণিকার ঘরে ঢুকতেই বীথি বলল 'মা, কিসে খেতে দেবে?'

'কেন? কাপ-ডিস তো আছে!'

'সব ভাঙা। কোনটার চটা-ওঠা, কোনটার ডাঁপ ভাঙা।'

'আমরা যেগুলোয় খাই সেগুলোর কথা বলছি না। বৌমাদের কাছে গ্যাখ্ না।'

'বৌদিদের কাছে আমি চাইতে পারব না।' বীথির মুখ গম্ভীর।

ভুবনময়ী বুঝতে পারলেন। 'নতুনবৌমা, তোমার কাছেও কি নেই?'

'থাকবে কি করে? যা ছিল সব ভেঙে গেছে। আর কিনছে কই?'

বীথি কি ভেবে বলল, 'আমি একটু আসছি মা। পম্পাদের আছে।' দ্রুতপায়ে দরজার সামনে থেকে সরে গেল বীথি। পাশের ঘর থেকে বলাই-এর সঙ্গে তরুণের কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে।

বীথি চলে যেতে কণিকা জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটিকে কিরকম মনে হল?'

'খুব ভাল বৌমা, জামাই করার মত।' ফিসফিস করে বললেন, 'খুব ভাল! আমার পায়ে হাত দিয়ে কেমন সুন্দর প্রণাম করল! অতো বড়লোকের ছেলে তো! আর কথাবার্তা কি সুন্দর বলে!'

'বীথুর পাশে মানাবে না?'

'সে ভাগ্য কি আর হবে? বীথু আমার দেখতে কি সুন্দর। ওর বাবার কত আশা ছিল।' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

'ছোট্‌কাকীমা, আপনাকে ও একবার ডাকছে। এখনি দোকানে বেরিয়ে যাবে, একবার আসুন।' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নমিতা বলল।

'যাচ্ছি বৌমা।' বলেই ভুবনময়ী কণিকার দিকে তাকালেন। 'বীথু বোধ হয় প্লেট আনতে গেছে। এলে তুমি সাজিয়ে দাও বৌমা, আমি আসছি।' নমিতার ঘরে এসে বললেন, 'কি বলছিস প্রমথ?'

'বীথুর নাকি কোন্ ছেলেবন্ধু এসেছে?'

'বীথুর নয়। ওর এক বন্ধুর ভাই। এদিকে এসেছে, কি দরকারে ঘুরে যাচ্ছে।'

'এটা কি ভাল? হঠাৎ একটা ছেলেবন্ধুকে বাড়িতে আসতে বলে কোন্ সাহসে? যা-তা রটতে পারে, তখন?'

ভুবনময়ী নীরব রইলেন।

'তাছাড়া দেবদাসের সঙ্গে বিয়ের কথা তো ঠিক। এখন এভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশলে আমাদের মুখ থাকে কোথায়?'

'এতসব ভাবছ কেন?'

'ভাবতে হয় ছোট্কাকীমা।' অরুণা এগিয়ে এল। 'আপনার নাতনীদের তো বিয়ে-থা দিতে হবে? ওর এমন টাকা নেই যে সব কিছু চাপা দিয়ে বিয়ে দেবে?'

'আস্তে কথা বল বৌমা। বাইরের লোকটা এখনো আছে।'

'তাছাড়া বাইরের লোককে বাড়িতে আনা আমাদের মত লোকের পক্ষে বিলাস। আমাদের বাজে খরচ করার পয়সা কোথায়? কারোর কাছে পয়সা, কারোর কাছে কাপড় ভিক্ষে করছে! এসব কী? আমরা যেমন সেইভাবেই থাকা ঠিক নয় কি?' প্রমথ শেখানো বুলির মত একটানা বলে থামল। 'আমি চলি, দোকানে অনেক খদ্দের। বীথুকে একটু সাবধানে রাখবেন।' প্রমথ বেরিয়ে গেল।

ভুবনময়ী আর কোন কথা না বলে কণিকার ঘরে চলে এলেন। ওঁর মুখ নীচু।

পম্পাদের বাড়িটা দুটো সরু লম্বা গলি পেরিয়ে পড়ে। যদিও পম্পার ঘরের জানালা থেকে ওদের বাইরের দরজা দেখা যায়, তবু পম্পাদের বাড়ি পৌঁছতে ঘোরাপথে আসতে হয়। বীথি পম্পার ঘরের এপাশের জানালায় টোকা দিয়ে ডাকল, 'এই পম্পা, একবার খোল।'

জানালা খুলল পম্পা। 'কি রে!'

'তোদের একজোড়া কাপ-ডিস আর একটা বড় প্লেট একবার দিবি? এখুনি দরকার।'

'একজন খুব সুন্দর দেখতে ছেলে তোদের বাড়ি এসেছে, না রে?'

'তুই দেখেছিস?'

'জানলা দিয়ে দেখেছি। কিন্তু মনে হল তোদের বাড়ি যাচ্ছে না। তাহলে তোদেরই লোক?'

'হ্যাঁ, আমার বান্ধবীর দাদা।'

'আর তোর?' পম্পা চকিতে একটা চোখ ছোট করল। পম্পা স্থানীয় কলেজে পড়ে। দুবার বি-এ ফেল করায় বীথির থেকে জুনিয়ার হয়ে গেছে। বিরাট বড়লোকের মেয়ে।

'বাজে কথা ছাড় তো। তাড়াতাড়ি দে।'

পম্পার ঘরে পাখা ঘুরছে। ঘর চমৎকার সাজানো। সুন্দর একটা গন্ধ ঘরে।

নিওন আলোয় একতলার ঘরটাই কেমন ঝকঝকে। পম্পা এই দুপুরেই খুব সেজেগুজে বই পড়ছে। বিছানার ওপর একটা মোটা যৌন পত্রিকা। বীথি হাসল। পম্পা কাপ-ডিস আনতে গেলে ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

'এই নে, শোন্, খুব সাবধানে রাখবি। মা আবার এসব দেয়া একদম পছন্দ করে না। তোদের বাড়িকে তো আরও ভয়।'

'কেন ?'

'মা বলে, তোদের যা হাঘরে বাড়ি। অবশ্য তোর জানার কথা নয়, তুই তো কলকাতায় ছিলি! কি একটা নিয়ে নাকি তোর ভাইপো আর দেয় নি। আমি ওসব বুঝি না বাবা।'

বীথির ভীষণ খারাপ লাগল। 'তাহলে থাক রে। আমি নেব না।'

'না না, নিয়ে যা, আমি তো দিচ্ছি। ব্যাপার কি জানিস, বাড়িতে না থাকলে এরকম হয়। যাদের নেই, থাকে না, তাদের তো দিতে হবেই। নাহলে তারাই বা বাঁচবে কি করে ? এখনকার বাজার যা পড়েছে!'

বীথির হাতে কাচের কাপ-ডিস ধরা। দু'চোখে যেন জল আসছে। মুখ যেন কালি বীথির। 'আচ্ছা আসি রে। মাকে বলবি, আমি এখনি দিয়ে যাচ্ছি।' দ্রুত পায়ে পম্পাদের কাছ থেকে সরে এল।

খাবার সাজিয়ে কণিকা জলের গ্লাস আর প্লেটটা ও ঘরে নিয়ে গেল। বীথি এরই মধ্যে চায়ের কাপ রেখে এসেছে তরুণের সামনে। বীথিকে এ ঘরে একা পেয়ে ভুবনময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, ছেলেটা খুব বড়লোক বুঝি ?'

বীথির মুখ বিষণ্ণ, গম্ভীর। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন ?'

'দেখলুম তো ?' একটু থামলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'কি জাত ওরা ? আমাদের স্বজাত ?'

'আঃ, তুমি থামো তো মা।'

'ছেলেটা কিন্তু ভাল রে বীথু। এম-এ পাশ। ও নাকি প্রফেসার হবে ?'

কণিকা এ ঘরে এল। 'ঠাকুরঝি, তুমি একবার এসো। উনি খাচ্ছেন না।' বীথিকে নিয়ে কণিকা তরুণের কাছে এল।

'ওকি! ওদের দিচ্ছেন কেন, আপনি খান!' বীথি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'পাগল হয়েছেন ? আমি এত খাবো!' তরুণ হাসল। 'ওরা বাচ্চা, খাক না।'

কণিকা দেখল, বড়জা, মেজজার ছেলেমেয়েরা তরুণের প্লেটের সামনে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বলাই একটু আগে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। এখন ওরা কাউকে

ভয় করছে না। খালি গায়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে অরুণার মেয়েটা হাত পাতছে খাবারের জন্যে।

কণিকা হঠাৎ বেরিয়ে এল। অরুণার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'মেজদিভাই, ছেলে-মেয়েগুলোকে একটু ডাকুন না, হা-ঘরের মত খাবারের সামনে বসে আছে। এত করে বললাম, উঠলই না!'

'কি যা-তা বলছ?' অরুণা চেঁচিয়ে উঠল যেন।

'যা-তা আপনারাই বলছেন, ভাবছেন। স্বার্থে লেগেছে তো, তাই অন্য কোনদিকে হুঁস নেই।'

'আমার একার ছেলে-মেয়ে যায়নি, আরও অনেকের আছে!'

'আস্তে কথা বলুন।'

'ঠিক আছে, আমি এর ব্যবস্থা করছি।'

কণিকা চাপা রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে চলে এল। মেঝেয় ভুবনময়ী বসে আছেন।

'কি হল আবার?' ভুবনময়ী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন।

'কি আবার হবে। আমাদের বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের তো শিক্ষা দেয় না। বলতে গেলেই দোষ।'

'আঃ, তুমি আবার ঝগড়া করতে গেলে কেন? বাড়িতে এখনো লোক আছে বৌমা!'

'কিছু হবে না, আপনি থামুন তো। সহ্যেরও একটা সীমা আছে।' বলতে বলতে কণিকা বীথির ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল, তরুণ উঠে দাঁড়িয়েছে যাবে বলে। ঠাণ্ডা চা এক চুমুকে শেষ করেছে।

'আপনি একটু বসুন। ঠাকুরঝি, একটু এদিকে শোন।' কণিকা ডাকল।

বীথি কণিকার সামনে এল। বীথিকে ফিসফিস করে কিছু বলল। কণ্ঠস্বর অতি সন্তর্পিত। বীথি অরুণা, নমিতার ঘরের দিকে তাকাল বারকয়েক। বীথির মুখ গম্ভীর। হঠাৎ কণিকা শুনল, অরুণার ঘরে খিল পড়ল।

'আসুন। বৌদিদের সঙ্গে দেখা হবে না। জানেন না তো ছেলেমেয়ে নিয়ে কি রকম ব্যস্ত থাকেন ওঁরা!' কণিকা তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বলল।

'চলুন।' তরুণ দালান ধরে নিঃশব্দ পায়ে বাইরের দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। পিছন পিছন কণিকা, বীথি দরজা পর্যন্ত এল। বাচ্চাগুলোর কেউ

আসে নি। বীথিদের ঘরে তরুণের ফেলে-রাখা ভাঙা সিঙাড়া, রসগোল্লার রস মাখানো প্লেটে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

'চলি!' বীথি-কণিকার দিকে দৃষ্টি রেখে থমকে দাঁড়িয়ে তরুণ বলল।

'আবার আসবেন।' কণিকা মাথায় কাপড় তুলতে তুলতে বলল।

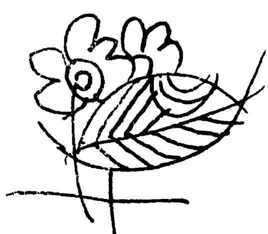
বীথির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তরুণ বলল, 'কই, উনি তো বলছেন না!'

বীথি এতক্ষণ তরুণকে দেখছিল। ভিতরে ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তি, ভয়, অপমানবোধ, সমস্ত কিছু মেশানো জটিল এক ভাব ওকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। তারই মধ্যে বলল, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

'আসব।' একটু থেমে ঘড়ি দেখে বলল, 'আর দাঁড়াচ্ছি না, কাছাকাছি একটা ট্রেন আছে, ধরব।'

তরুণ পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছে। কণিকা-বীথি-ভুবনময়ী কণিকাদের ঘরে রাস্তার দিকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে তরুণ যাচ্ছে। পম্পাদের খিড়কির জানালা খোলা। পম্পা দেখছে তরুণকে। কণিকা বীথির দিকে হঠাৎ তাকাল। বীথির চোখে জল যেন। 'আমাকেও একজন বলে গিয়েছিল, আসব, আর কোনদিন আসেনি।' মনের মধ্যে হঠাৎ কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল কণিকা। বীথি কি শুনতে পেল?

বীথির কোনদিকে হুঁস নেই। মেজবৌদির ঘর থেকে একটানা গজগজ করার স্বর কানে আসছে। বীথির ঘরে খাবার নিয়ে বাচ্চাগুলো মারামারি স্বরু করেছে বুঝি। কেউ একজন হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠল। বীথি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মুখে স্থির দাঁড়িয়ে রইল মায়ের পিছনে। তরুণকে আর দেখা যাচ্ছে না।





রঙিন বেলুন

পুরনো শাড়ি সেলাই করতে বসেছে বন্দনা। অল্প-ছেঁড়া অংশগুলো সেলাই করার পর বড়-ছেঁড়া অংশটা ছুঁচসুতোয় কিছুতেই বাগ মানাতে পারছে না। এদিক সামলায় তো ওদিকটায় টান পড়ে। ভিতরে চাপা বিরক্তি। এই সময় মহীতোষ কাজ থেকে বাড়ি ফিরল।

'কি ব্যাপার? এত রাত কেন?' মেঝেয় বসে থেকে বন্দনা মহীতোষের দিকে তাকাল।

'রাত আবার কোথায়? এই তো সবে দশটা বাজল!' মহীতোষ খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

'দশটা রাত নয়? তার ওপর দিনকাল খুব খারাপ। আজ এ পাড়ায় যে কোন সময় পুরনো একটা গোলমাল নতুন করে শুরু হতে পারে।'

মহীতোষ আর কোন কথা বলল না। অতি সাবধানে ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে লাগল। অসাবধান হলেই পিঠের সেলাই-করা জায়গাটা ছিঁড়ে যেতে পারে।

'তুমি বাসে আসোনি?' সেলাই বন্ধ রেখে মহীতোষকে দেখছে বন্দনা।

'কেন!'

'আমি বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'সে কি! এত রাতে! আচ্ছা পাগল তো তুমি!' মহীতোষ এতক্ষণে জামাটা খুলে ফেলল।

'তা তো বলবেই।' বন্দনা থামল। 'এই মাত্র যে বাসটা গেল তা থেকে তুমি তো নামলে না!'

'তুমি কি বাসস্টপ থেকে এইমাত্র বাড়ি এলে ?' মহীতোষ হ্যাঙারে জামাটা ঝুলিয়ে দেয়ালের পেরেকে আটকে দিল। বন্দনার দিকে ফিরে তাকাল। ওর চোখে কিছু ধরার চেষ্টা করছে মহীতোষ।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় তুমি আমায় মিথ্যে কথা বল। তুমি কোনদিন বাসে আসো না।'

মহীতোষ এবার একটানে গেঞ্জীটা খুলে মেঝেয় দেয়ালের গায়ে জড়ো করল। ঘামে গেঞ্জী চটচট করছে। বসতে বসতে বলল, 'না, আজ আমার সময় একজনের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'পয়সা নেই, সকালে বেরুবার সময় বলতে পারতে!' বন্দনা যেন গজগজ করল। 'একটু বোসো, এটা শেষ করে খেতে দিচ্ছি।' মহীতোষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেলাই-এ মন দিল।

মহীতোষ দেয়ালে হেলান দিল। রাত বাড়লে গুমোট গরম যেন দমচাপা হতে থাকে। হাতপাখাটা তুলে নিয়ে কয়েকবার বেশ জোরে জোরে নাড়ল মহীতোষ। বড়বাজারের ছোট দোকানটায় একটু সময় থাকলেই ক্লান্তি ঘিরে ধরে। কিন্তু মহীতোষ তখন তা বুঝতে পারে না। বাড়ি ফিরে এখন বুঝতে পারছে। তার ওপর খালি পেটে সামান্য কয়েকটা বিড়ি টানতে টানতে এতটা হেঁটে আসা! মাথা ঝিম ঝিম করছে। এখনি গা ধুতে ইচ্ছে করছে না। মহীতোষ দেয়ালে মাথা রেখে বন্দনাকে দেখল। বন্দনা ন'টা বাজলেই চওড়া করে মেঝেয় বিছানা পেতে ফেলে। আজও তাই করেছে। দেয়ালের গায়ে রিন্টু, সিন্টু, রুমিকে শুইয়েছে। ওরা ঘুমে অচেতন। সারাদিনে বন্দনাও বুঝি এই সময় একেবারে নিজের কাজটুকু করার অবসর পায়! বাড়িতে ভদ্রভাবে পরার মত একটিও শাড়ি নেই ওর! মহীতোষ চাপা দার্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। হাতপাখাটা বার কয়েক নেড়ে মেঝেয় রাখল। বন্দনার পিঠের ভেঙে-পড়া খোঁপা, পরনের ময়লা জামা, কাপড় সেলাই-করার ভঙ্গি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হল মহীতোষ।

…'এই, এদিকে এসো।'

'কোথায় ?' বন্দনা হাসছে।

'ওই শাড়ির দোকানটায়। শাড়িগুলো একটু দেখি।'

'যাঃ, পুরুষরা আবার রাস্তায় শাড়ি দেখে বেড়ায় নাকি ?'

'দেখে গো দেখে, সঙ্গে বউ থাকলে দেখে।'

'আমি এখনো তোমার বউ হইনি।' ফিস ফিস করে বন্দনা বলল। ওরা দুজনে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

'বাঃ, কি সুন্দর শাড়িগুলো!' মহীতোষের দৃষ্টি যেন একসঙ্গে এত শাড়ির রঙে অভিভূত।

'তাতে কি?'

'তোমাকে যদি সব একসঙ্গে কিনে দি?'

'আমি নেব কেন?'

মহীতোষ দৃষ্টি দিয়ে শাড়ি বাছছিল। 'এই, এসো, এই দু'টো কিনব।' মহীতোষ দোকানের মধ্যে যাবার জন্যে ঝুঁকল।

বন্দনা মহীতোষের হাত টেনে ধরল। 'পাগল হলে নাকি?'

'না, না, সত্যি বলছি।' মহীতোষ বুক-পকেটের ওপর হাত ঘষল। দোকানের ক্যাশের বেশ কিছু টাকা সঙ্গে আছে। মাইনে থেকে দিয়ে দিলে চলবে।

'পাগলামি কোরো না মহী।' একটু থেমে ফিসফিস করে বলল, 'বিয়ে হোক না, তারপর কত শাড়ি দাও দেখব।'

'তখন তো তোমায় শাড়িতে ঢেকে দেব।' বলতে বলতে মহীতোষ কি ভেবে দোকানের সামনে থেকে সরে এলো। 'তোমাকে সব রঙই মানায়, তাই না? আর তুমিই বলো, তখনো কি দোকানের সেল্‌স্‌ম্যান্‌ই থাকব?'

'নিশ্চয়ই না। আর কি জানো, তুমি তখন যা দেবে, আমি ভেবে রেখেছি, এক এক করে সব প'রে দারুণ সাজব। ঠিক তুমি যেমনটি চাও। তাই তো?'

'আমি কিন্তু ছেঁড়া কাপড়-জামা তোমায় পরতেই দেব না। মনে রেখো, এটা আমার শপথ।'

'কেনই বা পরতে যাব? আমার বর কি গরীব?'......

চমকে উঠল মহীতোষ। মুহূর্তে সম্বিত ফিরে এল। রুমি অসহ্য গরমে, মশার কামড়ে ছটফট করতে করতে উঠে বসেছে।

'তুমি তো পা ধুতে যাবে? ওকে একটু শুইয়ে বাতাস কর না। আমার এখনি হয়ে যাচ্ছে।' বন্দনা দৃষ্টি স্থির রেখে সেলাই করতে করতে বলল।

মহীতোষ কয়েক মুহূর্ত অপলক বন্দনাকে দেখল।

রুমিকে শুইয়ে দিয়ে হাত-পাখা টেনে জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল মহীতোষ। আজ ভয়ঙ্কর গুমোট। মহীতোষেরও অসহ্য লাগছে। শুকনো

গরম ঘামে গায়ের চামড়া দপদপ করছে। রিণ্টু সিণ্টু একেবারে দেয়াল ঘেঁষে শুয়েছে। প্রত্যেক দিন রাতে ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় এ পাশে সরিয়ে দেয়ালের গায়ে মহীতোষকে শুতে হয়। ওদের পাশে রুমিকে বুকের মধ্যে নিয়ে বিছানার একেবারে ওধারে শোয় বন্দনা। মহীতোষ বিছানায় চোখ বুলোতে বুলোতে ছেলেমেয়েদের দেখল। রুমি চার-এ পড়েছে, সিণ্টু ছয়, রিণ্টু ন'এ পা দিল। রিণ্টু কি রকম বড় হয়ে যাচ্ছে! মহীতোষ ঘুমন্ত রিণ্টুর মুখ দেখল। ডান হাতটা ওপর দিকে সোজা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। এমনভাবে ঘুমের মধ্যে বেঁকে গেছে, যেন মহীতোষের মনে হল, ওকে ডাকছে।

…'বাপি। তুমি কোথায় যাচ্ছ?' প্রতিদিনের মত হাত টেনে ধরল রিণ্টু। কাজে বেরুবার আগে রিণ্টু-সিণ্টুর এই এক প্রশ্ন থাকে।

'দোকান।'

'আমাদের জন্যে বেলুন আনবে?'

'অনেক তো এনে দিয়েছি বাবা।'

'হুঁঃ, সেই কবে এনেছিলে!' রিণ্টু হাত ছাড়ল। 'আজকাল তুমি কিচ্ছু আনো না বাপি।'

'ভুলে যাই বাবা। আচ্ছা, এবার ঠিক আনব।'

'ঠিক!'

'ঠিক। যাও, বাইরে বেরিও না। মায়ের কাছে যাও। পড়তে বসো। স্কুল আছে না?'

রুমি কাঁদছে। বেরুবার সময় একটানা কেঁদে যায় ও। সিণ্টুও মাঝে মাঝে কাঁদে। ও আবার মহীতোষের হাঁটা-চলা, বসে-থাকা, হাসি, বিড়ি ধরানো—সব নকল করে। কখনও একা, কখনও বা মহীতোষ-বন্দনার সামনেই। এ নিয়ে ওরা দুজন কম হেসেছে নাকি! রিণ্টু একটু বড় হয়েছে। ও শুধু বড় বড় চোখে তাকায়। রাস্তায় বেরিয়ে দরজার আড়াল হবার আগে মহীতোষ রিণ্টুর গলা শুনবে, 'ঠিক বেলুন আনবে বাপি। না আনলে তোমার সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলব না, দেখো।'…

হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে মহীতোষের। বুকের মধ্যে অনেক দিনের চাপা অম্বলের মত ব্যথা ঠেলে উঠল। অন্যমনস্ক দৃষ্টির সামনে বন্দনার ছায়া উঠে দাঁড়াতেই মহীতোষ সচেতন হল। একটু ঝুঁকে রিণ্টুর ঘাড়, গলা, কপাল মুছে দিল। রিণ্টু বেশ রোগা হয়ে গেছে!

'যাও, গা ধুয়ে এসো।' বন্দনা শাড়িটাকে দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় ফেলে রাখা গেঞ্জিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মহীতোষ। হ্যাঙারে ঝোলানো জামার ডান দিকের পকেটে হাতের মুঠি মুড়ে ঘষল। সন্ধের কেনা বেলুনগুলো হাতের মধ্যে কচকচ করল। শিশু সন্তানকে সামলানোর মত বেশ কয়েকবার আজ মহীতোষ বেলুন কিনে পকেটে রাখার পর পকেট হাতড়েছে।

খুব অসুবিধেয় না পড়লে কাজে বেরিয়ে কোনদিন বাসে যাওয়া-আসা করেনি। যা দিনকাল! তবু দুটো পয়সা বাঁচে। মহীতোষ বিষণ্ণ হাসল। আগে পয়সা বাঁচিয়ে বেলুন, মাঝে মাঝে খেলনা, বিস্কুট-লজেন্স আনত। বন্দনা এভাবে পয়সা নষ্ট করতে বারণ করেছে। আবার এনেছে দেখলে রেগে যাবে ভীষণ। রিণ্টু ও সিণ্টুরাও ভয়ে সিঁটকে যাবে। মহীতোষ বেলুন রাখা পকেটটা দেয়ালের দিকে আড়াল করে সরিয়ে রাখল। বন্দনা পকেটে কোনদিন হাত দেয় না। মহীতোষ যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজ ভাল করে স্নান করবে মহীতোষ।

মহীতোষের ভোরে ওঠা অভ্যেস। বন্দনারও তাই। বিরাট পুরনো বাড়িটার ভাড়াটেদের জল, কল, পায়খানা নীচেই। মেয়েরা ভোর থেকে নীচের উঠোনটায় ভিড় করে: বন্দনাও। মহীতোষ এই ফাঁকে সরকারী দুধ-আনা, বাজার-দোকান সারে। ততক্ষণে বন্দনা রান্নাঘরে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সকালে মহীতোষ আর ছেলেমেয়েদের চা-জলখাবার, অফিস-স্কুলের ভাত—এসবের জন্যে আর কোনদিকে হুঁশ থাকে না ওর।

অন্যদিন সকালে মহীতোষ একা রাস্তার ওপর দরজাটার রকে বসে। আজ চা খেয়ে নীচে নামার আগে একবার ঘরে উঁকি দিল। বন্দনার ভয়ে রিণ্টু সিণ্টু পড়তে বসেছে। রুমি পুতুল খেলায় ব্যস্ত।

'এই, আমার সঙ্গে একবার নীচে আয় তো।' মহীতোষ গলা নামিয়ে ডাকল।

'মা বকবে বাপি!' রিণ্টু বলল।

'কিছু বলবে না, আমি তো ডাকছি।'

রিণ্টু-সিণ্টুদের নিয়ে মহীতোষ একতলার ভিড় থেকে সরে এল। পুরনো বাড়িটায় ঢুকতে বড় রাস্তার গায়ে অন্ধকার গহ্বরের মুখের মত ভাঙা দরজা। ভিতরে অনেকটা প্যাসেজ দিনেও ঘন অন্ধকারে ঢাকা। দুপাশের দেয়াল নোনা-ধরা। দেয়ালে মুখ হাঁ করে থাকার মত গর্ত। মহীতোষ ওদের নিয়ে ভিতর দিকে ভাঙা রকটার ওপর বসল।

'কটা করে বেলুন নিবি বল ?' মহীতোষ তুজনের দিকে তাকাল।

'ওঃ, এই জন্যে ডেকেছ ? ত্যাৎ।' রিণ্টু যেন বিরক্ত হল। 'তুমি ভীষণ মিথ্যে কথা বল বাপি, আনবে না শুধু শুধু বলবে।' যেন তাচ্ছিল্য করে রিণ্টু মহীতোষের কাছ থেকে সরে গেল। বড় রাস্তায় গাড়ি, লোকজন, মাথার ওপরে আকাশ দেখতে লাগল।

মহীতোষের হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল। কেমন যেন দমে গেল। রিণ্টুর থেকে ও এখন কত দূরে! রিণ্টু ওর দিকে পিছন-ফেরা।

'বাপি আমাকে দাও।' সিণ্টু হাত পাতল।

মহীতোষ পকেট থেকে বেলুনগুলো বের করল। লাল, নীল, বেগুনি— নানা রঙের বেলুন। সিণ্টুর হাতে কয়েকটা দিল। সিণ্টু সত্যি সত্যি বেলুন পেয়ে অবাক, আনন্দে অভিভূত। জোরে ডাকল, 'এই দাদা. সত্যি রে বেলুন।'

রিণ্টু দূর থেকে তাকাল। সিণ্টুর হাতে, মহীতোষের হাতের মুঠোয় বেলুন দেখেই দৌড়ে চলে এল। 'সত্যি এনেছ বাপি! দাও।' রিণ্টু হাত পাতল। মহীতোষ ওর হাতে কয়েকটা দিতেই যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'শোন, বেলুন দিয়েছি মাকে এখনি বলবি না।' মহীতোষের গলায় প্রচ্ছন্ন শাসন মেশানো সতর্ক গোপনতা। 'পরে বলবি, আমি দোকানে বেরিয়ে গেলে, বুঝলি ?'

বেলুন ফোলাতে ফোলাতে তুজনেই ঘাড় নাড়ল। মহীতোষ একটা বিড়ি ধরাল। আরামে টানতে টানতে ওদের দেখতে লাগল। বেলুনগুলো মোটা, বড়, একটু বেশী দামের। ওদের ফুঁতে সহজে ফুলছে না। তাই ওদের খেলাটা বেশ জমছে। মহীতোষের দেখতে ভাল লাগছে। সত্ত-ধরানো বিড়িতে সুখ-টান দেওয়ার মত খুশির মেজাজে ওদের খেলা দেখতে লাগল।

বেলুন একটু ফুলিয়ে হঠাৎ কি একটা কথা মনে হতেই সিণ্টু এগিয়ে এল মহীতোষের দিকে। মহীতোষ তখন রিণ্টুর বেলুন ফোলানো দেখছে। 'বাপি, শোন!' বলেই সিণ্টু মহীতোষের আধ-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত রেখেই সরিয়ে নিল। 'ওপরের রামু-শামুরা বেলুন চেনে না, কি সব বলে, এত বোকা!'

'হ্যা গো বাপি! ওরা বেলুনকে বলে ফুগ্গা। বাপি, সত্যি তাই ?' রিণ্টু ওর হাতের অল্প ফোলানো বেলুনটার ছবিগুলোয় চোখ বুলিয়ে চলল।

মহীতোষ হেসে ঘাড় নাড়ল। রিণ্টুর উৎসুক মুখ-চোখ দেখল। ও ঠিক

মহীতোষের মত দেখতে। মুখ-চোখ, চেহারায় মহীতোষ এই বয়সে ঠিক রিণ্টুর মত ছিল। ছোটবেলার ফটোয় নিজেকে দেখেছে মহীতোষ। মহীতোষের মা-ও একথা বার বার বলত। এই রকম ছটফটে ছিল ও। রিণ্টু ছেঁড়া প্যান্ট পরে আছে। কোমরের বেল্ট আলগা। যেন প্যান্ট এখনি খুলে যাবে। গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি। রিণ্টু বড় রোগা হয়ে গেছে।

…'তোর ছেলেটা খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে ভবতোষ!' বাবার বন্ধু হরিকাকা মাঝে মাঝে বলতেন।

'খাওয়া-দাওয়া জুটছে না রে, সামান্য মাইনে।' বাবা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন। 'কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারলে কাজে লাগিয়ে দি।'

'বড় হলে ঠিক তোর মত লম্বা-চওড়া হবে।'

'ছেলেটা দিন-দিন বড় হচ্ছে, কিছু দিতে পারছি না। কষ্ট হয়।'

'ভাল একটা চাকরীতে বসিয়ে দে। নিজের পায়ে দাঁড়াক।'

'পারবে পারবে। মহীটার বুদ্ধি আছে।…'

মহীতোষের আকস্মিক অন্যমনস্কতা সরে গেল। রিণ্টু ওকে ডাকছে। 'বাপি, দেখ, কত বড় করেছি! জান বাপি, ওপরের রামু-শামু একটুও ফোলাতে পারে না।' রিণ্টু ফোলানো বেলুনটা মহীতোষের সামনে ধরল। ওর ফর্সা মুখ আরক্ত। ফুঁ দিতে গিয়ে দু-চোখে জল এনে ফেলেছে। দূরে সরে গিয়ে সিণ্টু একটা বেলুন নিয়ে হিমসিম।

'বাঃ, অনেকটা বড় হয়েছে তো!' মহীতোষ হাসল।

'বাপি, এই ছবিগুলো দেখ।' রিণ্টু ফোলানো বেলুনের ওপর স্পষ্ট হয়ে আসা ছবিগুলো দেখাল। 'এই ছেলেটা কত ছোট ছিল, কেমন বড় হয়ে গেছে না?' নিজেই দেখতে লাগল রিণ্টু। কি ভাবল, বলল, 'আমাকে ঠিক এরকম জামা-প্যান্ট এনে দেবে বাপি? ওপরের রামু-শামুরা এরকম পরে। জামার ওপর কেমন ছবি আঁকা! আমার খুব ভাল লাগে। দেবে বাপি?'

মহীতোষ রিণ্টুকে দেখতে লাগল। রিণ্টু বাবার চোখে কিছু খুঁজছে। ওর নিষ্পাপ দৃষ্টি, চোখ জ্বল জ্বল করছে। 'আনব বাবা, পুজোর সময় দেব।' একটু থামল মহীতোষ। 'বড় হলে এর থেকে অনেক ভাল ভাল জামা-প্যান্ট পরবে।' রিণ্টুর শুকনো মুখ দেখতে দেখতে মহীতোষের হঠাৎ যেন কষ্ট হল। দ্রুত প্রসঙ্গ বদলাল, 'আচ্ছা, আমার সামনে বেলুনটা আরো ফোলাও তো দেখি।' মহীতোষ যেন খেলা পেয়ে গেল।

'এটা খুব ভাল বেলুন বাপি! রামু-শামুদের তো একটুতেই ফেটে যায়। আমারটা ফাটবে না। দেখবে, আরো কতটা ফোলাবো?'

মহীতোষ নতুন একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে দেখল, রিন্টু একটু দূরে সরে গিয়ে ফুঁ দিতে লাগল বেলুনটায়। রিন্টুর মুখ-চোখ আস্তে আস্তে আরক্ত হচ্ছে। গলা-ঘাড়ের চারপাশে শিরা ফুলে উঠছে। হাওয়া একটু বেরিয়ে গেলে আবার নতুন উদ্যমে ফুঁ দিচ্ছে রিন্টু। দাঁড়ানো, মুখভঙ্গি কেমন দৃঢ়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মহীতোষ বিড়িতে পর পর কয়েকটা টান দিল। কড়া ধোঁয়ায় চারপাশে চাপা অন্ধকার। মহীতোষকে একটু পরেই দোকানে বেরুবার জন্যে তৈরী হতে হবে। আজ সকাল থেকেই অসহ্য গুমোট গরম। এই গরমের মধ্যে বড়বাজারের মালপত্তরে ঠাসা ছোট দোকানটায় গিয়ে বসতে হবে। মনোহারি হলেও সব রকম জিনিস চারপাশে সাজানো। দোকানে সুন্দর গন্ধ। ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় অন্ধকার একটুও নেই। দোকানে বসে মালিক নারায়ণপ্রসাদ আর সেল্‌স্‌ম্যান্‌ মহীতোষ। নিতাইটা বাইরের ফাইফরমাশ খাটে। মাথার ওপরের ছোট সিলিং ফ্যানটা দুজনের জমা গরম নিঃশ্বাসকে সারাদিন ধরে কাটতে থাকে। কিন্তু সে নিঃশ্বাস যেন মহীতোষের দম বন্ধ করে দেয়। সাবান, স্নো, তেল, খেলনা, ছেলেদের স্কুলের খাতাপত্তর, পেন্সিল, পেন, প্যাণ্ট, শার্ট, ফ্রক, দাড়ি কামাবার ব্লেড, গেঞ্জী, ইমিটেশনের গহনা—সব চারপাশে সাজানো। মহীতোষ কবে থেকে কত রকম স্বপ্ন দেখেছে এর মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! সকাল সাড়ে ন'টা থেকে রাত আটটা, দোকান বন্ধ হবার পর কোন কোনদিন আরো দু'ঘণ্টার মত! এক এক সময় মহীতোষের বুকে কষ্ট হয়, হাঁপ ধরে। দোকান যেন কত ছোট হয়ে আসে। কি গরম! এর মধ্যে মহীতোষ যেন কত ছোট! চারপাশে এতসব রঙিন জিনিস মহীতোষকে ঢেকে দিতে চাইছে! মহীতোষ ভীষণ হাঁপাচ্ছে। একদিন সমস্ত কিছুর মধ্যে মহীতোষ যদি চাপা পড়ে যায়! যা দিনকাল, যদি কেউ বোমা রেখে দেয় ভিতরে! বলা যায় না, মহীতোষই ভুল করে একটা বোমা রাখতে পারে! মালিক নারায়ণপ্রসাদটা যা কসাই! নিতাইটা একদিন ফিস ফিস করে বলছিল! মহীতোষ ঘামছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। দু'চোখে ভয়ঙ্কর জ্বালা। দোকানটা এত ছোট, এত অন্ধকার! ওই আমার পৃথিবী, আমার সারা জীবনের সব! চারপাশে কি গোলমাল! মহীতোষ যেনবা চাপা পড়ে গেছে! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে। উহ্‌, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা···

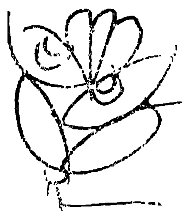
'বাপি, বাপি, দেখ কি বড় করেছি! দেখ! যাও, তুমি কিছু দেখছ না।'

ফুলিয়ে লাল সুন্দর বেলুনটা রিন্টু মহীতোষের সামনে ধরল। যেন রিন্টুর থেকেও লাল বেলুনটা বড় হয়ে গেছে!

'বাঃ, বেশ বড় হয়েছে তো!' মহীতোষ হাতের আধ-পোড়া নিভে-যাওয়া বিড়িটা ফেলে দিল। হঠাৎ পেটে অম্বলের ব্যথাটা বেড়ে গেছে।

রিন্টু মহীতোষকে একবার দেখে নিয়েই রাস্তার দিকে যেতে যেতে বলল, 'এটা আমি ঘরে ঝুলিয়ে রাখব বাপি। অনেক দিন থাকবে, কি মজা।' রিন্টু বাইরের আলোয় আড়াল হয়ে গেল।

মহীতোষ ভীষণ ঘামছে। এবার উঠবে ও। অন্ধকার প্যাসেজে দৃষ্টি রাখল। বিড়ি খুঁজল। সব ফুরিয়ে গেছে। মাটির ওপর পড়ে থাকা আধ-পোড়া নিভে যাওয়া বিড়িটায় দৃষ্টি বুলিয়ে সামনে তাকাল। সামনের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে ভাঙা-চোরা পুরনো কয়েকটা অন্ধকার গর্ত। মহীতোষ সেদিকে নির্বিকার অন্যমনস্ক দৃষ্টি রেখে কিছু সময় চুপ করে বসে রইল।





সুখের মুখ

শনিবারটা সত্যেশ্বরের অফিসের হঠাৎ একটা বিশেষ ছুটির দিন হয়ে গেছে।

এমন ছুটির দিনে প্রীতিলতা রান্নাঘরে তাড়াহুড়ো করেন না। এখন আনাজ কুটে সামনে ছড়ানো থালা-বাটিতে গুছিয়ে রাখছেন একমনে। অর্চনা ভাতের হাঁড়ির মুখে হুমড়ি খেয়ে ভাত দেখছে।

বাইরে থেকে সত্যেশ্বর সবেমাত্র ফিরে বড় ঘরের মেঝেয় দাঁড়ালেন। 'কই গো, একবার এ-ঘরে এসো।'

'কেন!' প্রীতিলতা বসে থেকেই সাড়া দিলেন।

'কথা আছে।' এতক্ষণে সত্যেশ্বরের জামা খোলা হয়ে গেল। ভিতরের ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি টেনে খোলার আগে ঘরের মাঝখানে এপাশ-ওপাশ টানা দড়ির আলনায় জামাটা ঝুলিয়ে দিলেন।

পাশের ঘর থেকে তরুণ, কল্পনা উঠে এল। 'বাবা।' কল্পনা বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'শোন্, এবার সব এক এক করে গোছাতে থাক্। সামনের মঙ্গলবার চলে যাব।'

'সত্যি!' তরুণ, কল্পনা দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আর দুদিন পরেই।'

'কোথায় যাব বাবা?' তরুণের মুখ উজ্জ্বল।

'নিউ আলিপুরে যেটা তোরা দু'বার দেখে এলি—সেইটা।'

তরুণ কল্পনা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। দৌড়ে ও ঘরে গেল। মেজদা অরুণ বই মুখে ও-ঘরে বসে ছিল। সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। তরুণ অরুণকে কি বলল, তার পরেই নীচের তলা থেকে দুজনে উধাও।

'কি, বল ?' প্রীতিলতা সত্যেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। জল-হাত মুছছেন।

সত্যেশ্বর একগাল হাসি হেসে বললেন, 'যাই বল প্রীতি, এতদিনে সত্যি সত্যি সুখের মুখ দেখার সময় এল। হঠাৎ এত টাকা একসঙ্গে, তার ওপর—'

'আঃ, চুপ করতো!' প্রীতিলতা যেন চাপা ধমক দিলেন দৃষ্টি আর স্বর মিশিয়ে। 'আজ আবার কি বার যেন! তোমার সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে নাকি? বলার আর কথা পেলে না?' বলতে বলতে পাশের ভাড়াটে রমাদের দালানের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এসে জানালা দুটো ভেজিয়ে দিলেন। তাকালেন স্বামীর দিকে, 'তোমার সব ব্যাপারটাই অনাসৃষ্টি। গলাটা কি নামিয়ে কথা বলতে পার না? জান তো, চারপাশে শত্রু নিয়ে বাস আমাদের!'

সত্যেশ্বর স্ত্রীর কথায় একটু দমে গেলেন। অপরাধীর মত মুখ করে আমতা-আমতা করলেন, 'না, না, এতে আর এমন কি হবে, ও এমন কিছু নয়—'

'থাক, আজে-বাজে বকতে হবে না। কাজের কি হল বল?'

'নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটটাই ঠিক করে এলাম। গ্যারেজ তো দরকার নেই। শুধু ফ্ল্যাটটাই ছ'শোয় রাজি হতে হল। কি করি! একমাস দিলে হত, আমি তিন মাসের এ্যাডভান্স দিয়ে এসেছি। দিতে যখন হবেই। ভদ্রলোকও বুঝলেন আমরা সজ্জন। অবশ্য বাড়িওলা খুব ভার্ল, আফ্‌টার অল্ বাঙালী তো! বলে এসেছি, সকালের খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা সেরে সামনের মঙ্গলবার দুপুরেই চলে যাব।'

'সত্যি বলছ! এত তাড়াতাড়ি যাব!' প্রীতিলতার চোখ বড়, সারা মুখে-চোখে চাপা খুশি, সমস্ত শরীর বেয়ে আহ্লাদ গড়িয়ে পড়ছে। 'তবে, ভাড়াটা একটু কমলে ভাল হত।'

'কিন্তু যাই বল প্রীতি, ওসব এলাকায় আমাদের ভাড়াটাই সবচেয়ে কম বোধ হয়। এও এক দৈব-যোগাযোগ বলতে পার।' সত্যেশ্বর ঝোলানো জামার পকেট থেকে এ্যাডভান্স পেমেণ্টের কাগজটা বের করে প্রীতিলতার হাতে দিলেন। 'জানো, যাবার সময় ঠাকুরমশাই-এর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলাম। উনিই তো বললেন, সামনের মঙ্গলবারটা সবচেয়ে মঙ্গলের দিন।'

'তোমার ঠাকুরমশাই-এর কথা আর বোলো না। সব কথা কিন্তু মেলে না। আমার তো সবসময় ভয় লেগে থাকে।' কৃত্রিম অভিমানে প্রীতিলতা এত বয়সেও মুখে ঈষৎ অল্পবয়সী রমণীর ভঙ্গি করলেন।

'ও কথা বোলো না।' গলা নামিয়ে সত্যেশ্বর বললেন, 'উনি না বললে কি লটারির টিকিটটা কিনতাম চুপিচুপি? তাছাড়া নতুন ব্র্যাঞ্চে ট্রান্সফার্ড হয়ে ডিপার্ট'মেণ্টাল হেড হওয়া, মাইনেয় এমন একটা বড় জাম্প—তাও তো উনিই বলেছিলেন!' একটু থামলেন সত্যেশ্বর, 'আমরা উঠে যাচ্ছি এবার তুমি বলতে পার সকলকে!'

'তবু লটারির টাকার কথা কাউকে যেন বলে ফেল না! তোমার তো, বলতে আরম্ভ করলে মুখের আগল থাকে না! বললেই নতুন নতুন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব গজাবে, সাহায্য করো, ধার দাও। কতরকম ঈর্ষা করবে। বাবা, সেও তো এক অভিশাপ! দরকার কি?' একটু থামলেন প্রীতিলতা, 'তবে এটা বোলো, তুমি এতদিন ধরে দিনরাত খেটে অফিসে ভাল কাজ দেখিয়ে ওদিকের এক ব্র্যাঞ্চের হেড হয়েছ। অফিসের কাজকর্মের সুবিধে তাই বাড়ি বদলাচ্ছি ওদিকে।'

'তাহলে খুশি হয়েছ তো?' সত্যেশ্বর স্ত্রীর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হবো না! কি বল? সেই বিয়ে করে এই একতলার ড্যাম্প ঘরে আমায় এনে তুলেছিলে! আজ পঁচিশটা বছর এই আঁস্তাকুড়ে দম বন্ধ করে কাটিয়েছি! আনন্দ হবে না! তোমার হচ্ছে না?'

সত্যেশ্বর নিঃশব্দে মৃদু হাসলেন। কি ভেবে তক্তপোশের ওপর বসে দেয়ালে হেলান দিলেন। হাতপাখাটা তুলে নিলেন।

'তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ। বেচারারা লোকের কাছে বলতে পারে না বাড়ির কথা। কত বড় বড় লোক সব বন্ধু আছে বড়খোকার, অরুণের। একদিনের জন্যেও বাড়িতে এনে বসাতে পারেনি ওদের। বরুণ অরুণ কত গজগজ করে।' একটু দম নিলেন প্রীতিলতা, 'অচ না হয় অত-শত ভাবে না, কপাটার এত ছোট থেকেই কত দুঃখ বল তো? জন্ম থেকে একদিনও সুখের মুখ দেখল না!' প্রীতিলতা গলা নামালেন, 'শোন, এবার ওখানে গিয়েই অচর খুব ভাল করে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।'

'সে আর বলবে কি? আমি তো আগে থেকেই ভাবছি। বড় মেয়ে হয়ে

সংসারটার জন্যে কম করেছে! অথচ একটি কথাও কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি।'

স্বামীর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থকে কি ভেবে প্রীতিলতা বললেন, 'আর এক কাপ চা খাবে?'

'এখন কি চা হচ্ছে?'

'আমাদের তো হচ্ছে, খাও না।' প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে স্নেহ একটু বাড়ল হঠাৎ।

'দিলে একটু তাড়াতাড়ি দাও। এখুনি বেরুবো। লরির ব্যবস্থা করতে হবে, আরও অনেক ঝামেলা আছে।'

প্রীতিলতা বেরিয়ে গেলে অরুণ বাবার কাছে এল। গায়ে বুশশার্ট গলাচ্ছে, এখনি বেরুবে। 'বাবা, স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, সোমবারই তোর আর তরুণের ঠিক করে নে। বছরের প্রথম দিক, ওদিকের স্কুলে ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। বরুণ বড় হয়ে গেছে, ওর কলেজ পরে পাল্টালেও চলবে।'

অরুণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরল। 'বাবা, আমি আর তরুণ কিন্তু সেই গাছটার সোজাসুজি ঘরটা নেব। দাদাকে একেবারে ধারের ঘর দিও।'

'আচ্ছা আচ্ছা, হবে।' সত্যেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে সেখানে যাই, তারপরে তো?'

রান্নাঘরে বসে অর্চনা এসব মন দিয়ে শুনছিল আর চা করছিল। প্রীতিলতা ঢুকেই বললেন, 'অচ, বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আয় তো মা তাড়াতাড়ি।'

অর্চনা এক কাপ চা নিয়ে বাবার কাছে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

'আর শোন্, তোকে রান্নাঘরে এখন আসতে হবে না, আমিই সব করে নিচ্ছি। তুই বরং ঘরদোর গুছিয়ে নে। সামনের মঙ্গলবার তো যেতে হবে, মাঝে আর মাত্র দু'দিন। আজ থেকেই কিছু কিছু করে গোছাতে থাক।'

অর্চনা মাকে একবার দেখে নিয়ে বাবার কাছে এল।

'এনেছিস্! দে মা!' চা-এ চুমুক দিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে, 'কি রে, খুশি হয়েছিস তো।'

অর্চনা হাসতে হাসতে ঘাড় কাৎ করল।

'সবাই দুবার করে দেখে এল, তুই তো একবারও দেখতে গেলি না মা!' একটু থেমে আবার চায়ে চুমুক দিলেন সত্যেশ্বর, 'তোর আর কপার জন্যে একটা আলাদা

ঘর রেখেছি। কপাও তো আর ছোটটি নয়, এই চোদ্দ শেষ হতে চলেছে। বেশ বড় হয়ে গেছে, না ?' মেয়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন, 'অনেক কষ্ট করেছিস মা, এবার একটু সুখী হবি।' সত্যেশ্বরের গলা যেন শুধু চায়ে নয়, আরও কিছুতে ভিজে ভারী হয়ে গেল হঠাৎ। দু'চোখের জমির ওপর দিয়ে যেন পাতলা দু'টুকরো কুয়াশার আস্তরণ ভেসে সরে গেল।

অর্চনা বলল, 'মঙ্গলবার তো যাচ্ছি, একেবারে গিয়ে নতুন দেখব।'

ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাকি চা-টা এক চুমুকে শেষ করে সত্যেশ্বর ঘড়ি দেখলেন, 'ইস্ দেরী হয়ে গেল। এখুনি বেরুতে হবে।' উঠে দাঁড়ালেন।

সকালের দিকে বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। প্রীতিলতা রান্নাঘরে। বাড়ি বদলানোর খুশি আর আনন্দে অরুণ-তরুণ-কপা বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে চলে গেছে। অর্চনার যেন কোন কাজ নেই আর। এঁটো বাসনপত্তর, কাপ-ডিস কলতলায় নামিয়ে আবার এঘরে এল।

এ-বছর ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকেই গ্রীষ্মের গুমোট গরম চারপাশ ঢাকতে শুরু করেছে। অর্চনাদের এই ঘরটাও যেন সকাল থেকে আঁচ-ফেলে-দেওয়া উনুন হয়ে উঠছে। তক্তপোষে বসে ঘরটায় চোখ বুলোল। ঘরের দেয়াল কোথাও চুণ-বালি-খসা, কোথাও বা ময়লা তেল-চিটচিটে। সাদা অংশটুকুও মরা আরশোলার রক্তে হিজিবিজি। সিমেণ্টের মেঝে চটা উঠে, ফাটায়, গর্তে বিশ্রী হয়ে আছে। কতদিনের পুরনো ইলেকট্রিক লাইন ঝুলে আছে দেয়াল থেকে; ছেঁড়া কাপড়ের পাড় এপাশ-ওপাশ করে টেনে ভারী সুইচ-বোর্ডটা দেয়ালের সঙ্গে আটকে দিয়েছে অর্চনা। সিলিং বেয়ে ছোট ছোট বাদুড় ঝোলার মত গোছা-গোছা ঝুলে থিক থিক করছে। দেয়ালের কোণে কোণে উই-এর বাসা লম্বা রেখায় নেমে আসছে।

এই ঘর ছেড়ে দেবে ওরা। অর্চনার কেন যেন দম বন্ধ হয়ে এল। এঘরে মা, অরুণ, তরুণ, কপাকে নিয়ে অর্চনা মেঝেয় শোয়। মুখের কাছে এর-ওর নিঃশ্বাস, ভাই-বোনদের স্পর্শ, মায়ের শাসন, সুখ-দুঃখ—সবকিছু জড়িয়ে অর্চনারা সকলেই কখন যেন অভাব-অস্বস্তির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত! বাবা তক্তপোষে শোয়। ওপাশে ছোট ঘরে বই, জিনিস-পত্তর ঠাসা বলে বরুণ একা শোয়। সমস্ত বিছানাপত্তর ডাঁই করা আছে তক্তপোষের ওপর। মেঝেয় দেয়ালের গা ঘেঁষে পুরনো মরচে-ধরা ট্রাঙ্ক, বাসনপত্তর—কত যে জিনিস! সবকিছু অর্চনারই যত্ন করে গুছিয়ে রাখা।

এবার সব বদলে যাবে। অর্চনা নিজের মনেই হাসতে হাসতে জানালার সামনে এল! পাশের বাড়ি খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল। জানালার পাশেই খুব সরু গলি। লোকজন যেতে পারে না, কারণ লম্বা গলির দু'মুখে নোংরা ছাই ময়লা ফেলে রাখে পাশাপাশি বাসিন্দাদের ঝি-রা। এমনিতেই সব সময় গলির ভিতরটাও নোংরায় ভর্তি থাকে। গন্ধে মাঝে মাঝে মাথা ঝিমঝিম করে অর্চনার।

'বৌদি।' অর্চনা ডাকল।

'কে, অচ?' প্রতিমা জানালার ভাঙা কাঠের গরাদে বুকে চেপে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার? রান্নার শেষ?'

অর্চনা হাসল। 'আমরা মঙ্গলবার সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'এই সামনের মঙ্গলবার! সেকি! কোথায়?'

'নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।' অর্চনার কণ্ঠস্বর কেমন বিষণ্ণ শোনাল।

'না না, দেখা হবে না কেন!' প্রতিমা থামল। 'কিন্তু আমি যে খুব অসুবিধেয় পড়লাম।'

'কি?' অর্চনা অবাক।

'তুমি যে খুব সুন্দর রাঁধতে পার—মাংস, চাটনি—সব, এমন কি পুডিংও তৈরী করতে পার, আমি কিন্তু সেদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, আমার মাকে সব বলেছি। ঠিক করেছিলাম, ছোট বোনের পাকা দেখার দিন তোমায় নেমন্তন্ন করব তোমার নিজেরই রান্না খাওয়ার জন্যে। মাসিমাকে তো কত আগে থেকে বলে রেখেছি। এখন কি হবে বল তো ভাই?'

'ওসব ভুলে যান।' হাসতে হাসতে বলল অর্চনা।

'বাঃ, ভুললেই হল আর কি? ইস্, কি ভাল রাঁধ তুমি! এই সেদিন শান্তার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে তুমি রাঁধলে না! তাছাড়া তোমাদের দোতলার ঘোষ-গিন্নীর বড় ছেলের বউ-এর সাধেও তো তুমি ভাই কম করনি! আমার তো ভীষণ ঈর্ষা হয়।'

'তাতে কি?' চাপা লজ্জায় অর্চনার কথা আটকে গেল। 'তুমি আমার রান্না তো খেয়েছ!'

প্রতিমা হেসে উঠল। 'আহা, তা কি ভুলতে পারি! মনে করে দেখ তো, এই জানলা দিয়ে কত কি তুমি খাইয়েছ আমাকে, ঠাকুরঝিকে। আমার ছোট মেয়ে রুমনি তো তুমি চলে গেলে খাওয়া-ঘুম বন্ধ করবে।'

'বৌদি, আমি কিন্তু একা খাওয়াইনি, তুমিও তো কত কি দিয়েছ?'

'সত্যি, আমার খুব মন খারাপ লাগছে অচ। তোমরা কত বছর কি কষ্টে এখানে কাটালে! কিন্তু তোমাদের পাশে পেয়ে আমরা তো নির্ভয় হতুম। আর এখন!' প্রতিমা চুপ করল কয়েক মুহূর্ত। 'যাই বল, আমরা কিন্তু তোমাদের কিছুতেই ভুলতে পারব না।'

অর্চনা প্রতিমাবৌদির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ যেন অর্চনার সারা মুখে কিসের ছায়া নেমে এল। টাকরা, নাক, দু'চোখের ভিতরটা টনটন করে উঠল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'শম্পা কোথায় বৌদি?'

'ঠাকুরঝি? ও একটু বেরিয়েছে। ও এলেই পাঠিয়ে দেব তোমাদের ওখানে।' একটু থামল প্রতিমা। 'অচ, রান্নাঘরটা একটু দেখে আসি ভাই। তুমি তো আসছ? অনেক কথা হবে, এখন যাই।'

অর্চনা ছলছলে চোখে হাসল। প্রতিমা আড়াল হয়ে গেল।

অর্চনার যেন এখন ঘর গোছানোর কোন কাজেই গা নেই। মা রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। নীচের তলাটা গুমোট গরম বাতাসে চাপা। সারা বাড়ি শূন্য। ওপাশের অন্ধকার ঘর দুটোয় রমাদিরা থাকে। ওদের সঙ্গে মায়ের জল-কল-পায়খানা নিয়ে প্রায় দিনই ঝগড়া চলে। কথা বন্ধ হয়ে যায়। রমাদির ছোট ছেলেটা অর্চনার ভীষণ নেওটা বলে অর্চনার সঙ্গে এতটা দূরত্ব হয় না, তবু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কোন এক নিঃশব্দতায় অর্চনার সঙ্গেও কথা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আবার কখন যেন ঝগড়া ভুলে মা-রমাদি এক হয়ে ওঠে। অর্চনার তখন অবাক লাগে, হাসিও পায়। এখন কদিন হল, কথা বন্ধ আছে।

রমাদির ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দোতলা-তেতলা-ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোল অর্চনা। সামনে এক চিলতে উঠোন। সিঁড়ির মুখটা ওদের ঘর থেকে একটু আড়াল পড়ে যায়। ওপর থেকে নেমে-আসা পদশব্দে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল অর্চনা। তাকিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল। তেতলার প্রভাতদা নামছেন। ওদের সঙ্গে অর্চনাদের মাখামাখি আছে বেশ, তবে অর্চনার সঙ্গে প্রভাতদার তেমন খুব বেশী কথাবার্তা নেই। সামনে পড়লে বা চোখাচোখি হলে কখনো নিঃশব্দ মৃদু সলজ্জ হাসি-বিনিময়, কখনো বা বড় জোর 'ভাল তো!'—এইটুকু কথার আদান-প্রদান হয়েছে। তা-ও মূলত প্রভাতদার তরফ থেকেই।

'আরে! এই তো আপনি! নমস্কার। কি ব্যাপার বলুন তো? আপনারা

নাকি চলে যাচ্ছেন নিউ আলিপুরে ?' ডান হাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

হঠাৎ এমন উচ্ছ্বসিত কথা বলতে দেখে অর্চনা ভিতরে কেমন এক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে গেল। প্রভাতের দিকে সোজা তাকিয়ে সলজ্জ হাসল।

'কপা একটু আগে আমার মাকে, বোনকে বলে এসেছে। সত্যি ?'

'মিথ্যে বলেনি।' অর্চনা সহজ হল। চাপা ঠোঁটে হাসি জড়িয়ে আছে এখনো।

'কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। আপনারা চলে যাবেন, এ ভাবতেই পারছি না। আপনারা এত ভাল!'

'আপনারাও।' একটু থামল অর্চনা। 'আমার ছোট ভাই-এর সেই ভারী অসুখের সময় আপনার দাদা যা করেছেন!'

'ও ডাক্তার হলেই করতে হয়। তা ছাড়া ডাক্তারদের প্র্যাকটিক্যাল মানবতাবোধ একটু বেশী।' বলেই একটু বেশীই হাসল প্রভাত। 'ঠাট্টা নয়, দেখুন, এই ফ্ল্যাটে যখন প্রথম আসি, আপনারা আমাদের জন্যে কম করেন নি! পাম্পে জল ওঠেনি, স্নান-রান্না-খাওয়া হয়নি। আপনি আর আপনার মা খাবার পাঠিয়ে কি কাণ্ডই না করেছিলেন!'

'যাক, চলে যাচ্ছি, যাবেন তো ?' অর্চনা হঠাৎ কথা ঘোরাল।

'ওহ্, সিওরলি! পার্টিকুলারলি আপনার কথায় তো মা, বাবা, বোনেরা একেবারে পঞ্চমুখ! বিশেষ করে মা তো—'

'তাই বুঝি ?' একটু বেশী হেসে উঠল অর্চনা। 'অথচ দেখবেন, আপনারাই আমাদের আগে ভুলে যাবেন!'

'নিউ আলিপুরের যেখানে যাচ্ছেন, ওটা কিন্তু ভয়ঙ্কররকম হাইব্রাউ এ্যারিস্টোক্রাটদের পাড়া!'

'ঠকছেন ?'

'না, এমনি ভাবছিলাম।' প্রভাত সিগারেট মুখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত একভাবে অর্চনার দিকে তাকিয়ে রইল।

'জানেন, আমারও ভয় হয়, আমরা হয়ত সকলেই সকলকে ভুলে যাবো।' অর্চনার গলার স্বর হঠাৎ শান্ত, ভারী, বিষণ্ণ।

কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক থেকে প্রভাত সশব্দে হেসে উঠল। 'পার্টিকুলারলি আমি কিন্তু আপনাদের ভুলতেই দেব না। দেখবেন, গিয়ে কি রকম জ্বালাতন করি। ভাবছেন, দূরে পালিয়ে গিয়ে পার পাবেন।'

'সত্যি !'

রান্নাঘর থেকে প্রীতিলতা ডাকলেন, 'অচ, কার সঙ্গে কথা বলছিস ?'

'প্রভাতদা।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, 'একবার এদিকে আয়, ঘর থেকে দুধের বাটিটা দিয়ে যা।'

'আচ্ছা চলি, একবার যাবেন ওপরে।' বলেই প্রভাত সিগারেট মুখে ধরে মৃদু হাসতে হাসতে বাইরের দরজার দিকে এগোল।

অর্চনা দেখল প্রভাতকে। খুব স্মার্ট চেহারা, ফর্সা, বেশ ভাল দেখতে। বি-কম পাশ করে ব্যাঙ্কে চাকরী করছে। চমৎকার কথা বলে, এখন বুঝল আলাপীও বেশ। দামী সিগারেট খায়। আর সিগারেটের গন্ধ অর্চনার মন্দ লাগে না। প্রভাত দৃষ্টির আড়াল হতেই চকিতে অর্চনার মনে হল, প্রভাতদার বয়স কতই বা হবে ? তিরিশের কাছাকাছি। অন্যমনস্ক অর্চনা যেন অকারণ বিড়বিড় করল, ওরও তো এই বাইশ চলছে ! নিজের মনেই হাসল। প্রভাতদার মা ওকে খুব ভালবাসে ! পরে একবার তেতলায় যাবে। ওদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বিকেলে দোতলার লীলাময়ীর ঘরে বসে প্রীতিলতা বললেন, 'চলে তো যাচ্ছি ! মাঝে মাঝে আসবেন ভাই, না হলে ভীষণ মন খারাপ লাগবে।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্চনা। বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা, যেতেই হবে কিন্তু। আমি তো ভাবতেই পারছি না, সামনের বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনাদের দেখতে পাব না। আমার তো যেতেই ইচ্ছে করছে না।'

'না না ভুলতে পারি তোমাদের ?' লীলাময়ী বলতে বলতে একবার থামলেন। 'তা ভাই, আপনাদের ভাড়া লাগছে কত ?'

প্রীতিলতা একটু থামলেন। 'ভাড়া ? তা চারখানা ঘর, বাথরুম, পায়খানা নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, তার ওপর ওই পাড়া ! লাগছে আপনার সাড়ে আটশোর মত। অবিশ্যি নীচের একটা গ্যারেজও আমরা নিয়েছি ! অফিসের গাড়িটা গিয়েই একেবারে নিজেদের মত করে পেয়ে যাবো তো !'

অর্চনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। এত ভাড়া তো নয় ! আর গাড়ি পাওয়ার এখনো কোন ঠিকই নেই।

'আপনার খরচও বেশ বাড়ল, বলুন ?' লীলাময়ী তাকিয়ে রইলেন প্রীতিলতার দিকে।

'খরচ বাড়ছে বইকি! তবে কি জানেন, ওর অফিস থেকে তো বাড়িভাড়া দেয়। সেটা ছাড়ি কেন? আর বাড়িও তো করে ফেলব শীগগির। যাই বলুন, একটা ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি করে উঠে যাওয়ায় যে আনন্দ, সে আনন্দ কি এতে পাব?'

'এরই মধ্যে বাড়ি করবেন! কোথায়?'

'ওই নিউ আলিপুরেই, আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই। চার কাঠার মত জমি কেনা আছে বছর পাঁচেক হল। এবার গিয়ে বাড়ি আরম্ভ করে দেব, তাই তো জমির কাছাকাছি গেলাম। আর ওঁরও অফিসের সুবিধে হল।' লীলাময়ীকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রীতিলতা বললেন, 'আপনাদের এতদিন বলিনি, কারণ সামান্য জমি, বলার মত তো নয়, লজ্জা করে।'

অর্চনা মায়ের কথায় ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছে। মা যেন কী! এত মিথ্যে বলারই বা দরকার কি? বিশেষ করে লীলামাসিদের কাছে! ওঁরা ভাল, কত-দিনের পরিচিতি! অর্চনা হঠাৎ বলল, 'মা, একটু ছাদে যাচ্ছি।'

'আমিও উঠছি।' বলেই উঠতে উঠতে লীলাময়ীকে বললেন, 'চলি ভাই, অচর বাবা আবার নীচে অপেক্ষা করছেন। আমি গেলে বেরুবেন। উনি তো এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাচ্ছেন না। বাড়ি বদলানো যে কি ঝামেলা ভাই, আমারই এখন বিরক্তি লাগছে।'

'তা ঠিক। দশ বছর আগে পাতিপুকুর থেকে আমরা যখন এখানে আসি, তখনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।' লীলাময়ী হাসলেন। 'আবার আসবেন ভাই, এখনো তো তুদিন সময় আছে। সেই তো মঙ্গলবার যাবেন। আর, শুনুন, জিনিসপত্তর বাঁধা-ছাঁদা, বা ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দরকার পড়লে বলবেন, আমার ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দেব। সবই তো আপনা-আপনির মধ্যে!'

'তবে দরকার হবে না, হলে বলব।' প্রীতিলতা হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

ছাদে এসে অর্চনা দেখল, সামনে তিন বাড়ির ছাদ পেরিয়ে বিশুদের ছাদে বিশুর দিদি শান্তা দাঁড়িয়ে। 'এই অচদি!' চেঁচাল শান্তা, 'তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ?'

'কে বলল?' অর্চনা হাসতে হাসতে ছাদের আলসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'অরুণ এসেছিল বিশুর কাছে।' একটু থামল শান্তা। 'আমাদের বাড়ি এসো না, কথা বলব। এতদূর থেকে বলা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না।'

'যাচ্ছি।' অর্চনা নীচে নেমে সরু ছোট ছোট হিজিবিজি কয়েকটা গলি পেরিয়ে শান্তাদের বাড়ি ঢুকল। নীচের ঘরের বৈঠকখানায় শান্তার বাবা বসে-ছিলেন। অর্চনাকে দেখেই বললেন, 'কি মা অচ, তোমরা চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ কাকাবাবু।' প্রণাম করল অর্চনা পায়ে হাত দিয়ে।

'থাক, থাক, বস।' অর্চনা বসলে বললেন, 'বাবার অফিসের গাড়িটা তো এবার তোমাদেরই হয়ে গেছে। তবে ওটা নাকি নতুন কি একটা মডেলের—তোমরা যে গ্যারেজ ভাড়া করেছিলে তাতে নাকি কুলোচ্ছে না?'

'গাড়ি!' অস্ফুটে উচ্চারণ করে অর্চনা ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ, যেটা তোমার বাবা অফিস থেকে পেয়েছেন। অরুণ বলে গেল, ওটা করেই তোমরা মঙ্গলবার যাচ্ছ। ভালই হবে। এতটা রাস্তা।'

অর্চনার আড়ষ্টতা কাটেনি। অরুণ কি বলে গেছে আন্দাজ করল: 'অফিসের গাড়ির কথা বলছেন?'

'তা ছাড়া আর কি?' শিবনাথবাবু হাসলেন। একটু থেমে বললেন, 'খুব ভাল হল। তোমরা এতদিন যে কষ্টে কাটালে এখানে। তোমার বাবাকে তো দেখেছি কি পরিশ্রম করেছেন। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যেতেন, রাত দশটায় ফিরতেন! নিজের চেষ্টায় এতটা বড় হওয়া কম কথা নাকি?'

'কাকাবাবু, আপনিও তো কম করেননি আমাদের জন্যে! আমি সব জানি।'

'তুমি বাবার বড় মেয়ে, তুমি জানবে না? তবে ওসব কথা থাক মা। বিপদে পড়লে কে না করে?' থেমে বললেন, 'বাই দি বাই, মনে পড়ে গেল। তোমাদের ফোন নম্বরটা দিয়ে যাও তো। অরুণ তো দিতে পারল না, ভুলে গেছে। অবশ্য ভোলাই স্বাভাবিক, নতুন তো! মনে আছে তোমার?'

অর্চনা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল এবার। 'কাকাবাবু, বাবা তো আপনার কাছে আসবেন।'

শান্তা ঢুকল ঘরে। 'অর্চনাদি, এসো, বড়দি তোমায় ডাকছে।'

'যাও যাও, সব দেখা করে এসো। আবার কবে এদিকে আসবে দেখা হবে না—দেখা করে এসো।'

'আপনি আমাদের ওখানে যাবেন কিন্তু।'

'যাবো, যাবো। তবে রিটায়ার করার পর এখন বাতে যা অবস্থা হয়েছে আমার! তবু সুযোগ পেলেই যাবো নিশ্চয়ই যাবো—।'

শান্তার সঙ্গে অর্চনা বেরিয়ে এল। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও। শিবুকাকা

ওদের চরম অভাবের সময় অনেক টাকা ধার দিয়ে উপকার করেছেন কতবার! খুব ভাল মানুষ। অরুণ সেখানেও মিথ্যে কথা বলে গেছে! ওদের জন্যে অর্চনা সকলের কাছে কেমন আড়ষ্ট, একা, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে! অর্চনার ভিতরে যেন চাপা অস্বস্তি অশান্তি গোপনতম অসুখের মত নিশ্চুপ থিতিয়ে যাচ্ছে। অর্চনা এসব ভাবতে ভাবতে নীরবে শান্তার পাশে থেকে ওপরে উঠতে লাগল।

রাত্রে অরুণ বলল, 'দিদি, ওই সব ছেঁড়াজুতো, পুরনো টিনের বাক্সগুলো, পায়খানা আর চান করার ডিবেগুলো সঙ্গে নিও না যেন। বিচ্ছিরি, দেখলে লোকে যা-তা ভাববে।'

'তা বলে সব রেখে যাব!'

'কেন, ঝি-জমাদার ওদের দিয়ে দাও, ওরা তো চাইছিল।'

প্রীতিলতা বললেন, 'সত্যি অচ, ওসব নিস না। তবে কাউকে দিতে হবে না, আমি ওসব পুরনো জিনিস যারা কিনতে আসে, তাদের দিয়ে দেব, তবু দুটো পয়সা হবে।'

বড় ভাই বরুণ বাবাকে বলল, 'বাবা, ওখানে তো রান্নাঘরে গ্যাসের কানেকশান আছে। ছোট আর বড় মিলিয়ে দুটো প্রেসার কুকার কেনো, রান্নার অন্য ঝামেলা না রাখাই ভাল। অচটা সারাদিন কেবল রান্নাঘরে পড়ে থাকে, ভাল্লাগে না। রান্নার ব্যাপারটাও ভীষণ আনস্মার্ট।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল।' প্রীতিলতা সায় দিলেন, 'মেয়েটাকে অনেক কম খাটতে হয় তা হলে।'

বরুণ বলল 'তুমি কালই আমাকে টাকা দাও মা, আমি খাট-বিছানা, কোচ-কুশন, বাসনপত্তর সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেব। মঙ্গলবার সকালেই সব পৌঁছে যাবে ওখানে।'

অরুণ দাদার কথাটা লুফে নিল। 'আর দাদা, বাথ টাওয়েল, ডোর বেল—এসব নিতে ভুলো যেওনা যেন। ওই বাইরে থেকে নাম ধরে চীৎকার করে ডাকা—ন্যাষ্টি।' থেমে দিদির দিকে তাকাল। 'বিছানাপত্তরের ব্যাপারটা আগে কর। দিদি, এইসব ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা তেলচিটে বালিশ বাঁধবে ঠিক করেছে।' বলতে বলতে মেঝেয় এপাশে রাতের বিছানা পাতার জন্যে মোড়া, কাঁথা-কাপড় ছেঁড়া বালিশ-জড়ানো পুটুলিটায় জোরে লাথি মারল হাসতে হাসতে। 'দুত্তোর, আমার তো এসব নিয়ে যেতেই লজ্জা করছে।'

কল্পনা বলল, 'আমাকে বাবা ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করাবে বলেছে।'

'আমাকেও।' তরুণ বলল, 'তাই না বাবা ?'

সত্যেশ্বর এতক্ষণ তক্তপোষের ওপর ডাঁই করা বিছানা বালিশের গায়ে আরামে হেলান দিয়ে বসে ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল মুখ-চোখ দেখছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে লা-মার্তেনিয়ারে কণা পড়বে—সব ব্যবস্থা করেছি। তরুণকেও একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াব। গোড়া থেকে ইংরিজিটা ভাল করে শেখা দরকার। এখনকার এম-এ পাশ ছেলেরাও এক কলম ইংরিজি লিখতে পারে না। আপিসের এ্যাপ্‌লিকেশন তো সব দেখতে হয়। বরুণ, কি বলিস ?'

'তা ঠিক। আমিও ভাবছি বাবা, স্পোক্‌ন্ ইংলিশটা কোন সাহেবের কোচিং-এ শিখে নেব। তুমি তো বলছিলে বিলেত পাঠাবে ?'

সত্যেশ্বর সব শুনতে শুনতে এক সময় বললেন, 'অচ, তুই আর বরুণ বসে লিষ্ট করে ফ্যাল—এখানেই কি কি জিনিষ এখনি কিনে নিয়ে যেতে হবে, বা যাবার আগেই ওখানে পাঠাতে হবে। কাল থেকেই কিনতে আরম্ভ করা দরকার।'

কি একটা কথা মনে পড়ে যেতে অর্চনা বলল, 'বাবা, তুমি একবার শিবুকাকার বাড়ি মনে করে যেও। কাকাবাবু দেখা করতে বলেছেন।'

'ও, যাবো এখন। তবে নতুন বাড়ি যাওয়ার আগে বোধ হয় দেখা হবে না।'

'সেকি! আমি বলে এসেছি যে, তুমি যাবে।'

'থাক মা, ওরকম অনেকেই এখন বলবে। সম্ভব নয়। পরে সময়-টময় হলে আসব এখন।'

'কেন, তোমার তো প্রতিদিন যাওয়া-আসার পথেই পড়ে ওদের বাড়ি!' বলতে বলতে অর্চনা বাবার দিকে স্থির তাকাল। বাবার নিরাসক্ত মুখ দেখে হঠাৎ কেমন চাপা বিস্ময়ে কষ্টে চুপ করে গেল।

যাবার দিন সকালে একটা লরি দূরের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালে তরুণ হঠাৎ বলল, 'দিদি নোংরা বিছানাটা রাস্তার মোড়ের ভিখিরিটাকে দিয়ে আসব ?'

অরুণ বলল, 'ভালই তো, তবু ভিখিরিটা ছেলেমেয়ে নিয়ে শুতে পারবে। যা, ওকে দিয়ে আয় তো।'

তরুণ বলল, 'আমার পুরনো প্যান্ট-জামাগুলোও দিয়ে আসি। কি হবে আর। বাবা তো ফুলপ্যান্ট-বুশশার্ট কিনে দিয়েছে। এসব আর পরবো না। বিচ্ছিরি দেখাবে।'

অর্চনা দুই ভাইকে দেখল। বলল, 'থাক না অরুণ, ওখানে একটা ছেলেকে তো কাজের জন্যে রাখতেই হবে। তাকে শুতে দিতে হবে না?'

'ইস্, তুমি কি বলছ দিদি! তা বলে চাকর-বাকরদের জন্যে তুমি বিছানা বয়ে নিয়ে যাবে—তা-ও এই! তোমার কোন প্রেস্টিজ নেই। বিউটি সেন্স তোমার এত কম!'

'অসময়ের দরকারটাই আগে অরুণ?'

'যখন দরকার হবে কিনে দেবে এখন। এগুলো ঘরে থাকলেই গা ঘিনঘিন করবে।'

প্রীতিলতা ছেলের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছে অরুণ। অচ, ও-বিছানাটা ফেলে দে, বা দিয়ে দে।'

অর্চনা মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তরুণ বিছানাটা তুলল। কয়েকটা আরশোলা, ছোট ছোট পোকামাকড় বিছানা থেকে বেরিয়ে ছিটকে নীচে পড়ে এপাশ-ওপাশ লুকোল। ডাস্টবিনের কোন নোংরা ছুঁয়ে ফেলার ভঙ্গিতে তরুণ গোটানো বিছানাটি নিয়ে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অর্চনা এক সময় মনে মনে হিসেব করল। দু'মাসের ওপর হয়ে গেল, ওরা এসেছে। মোট চারখানা ঘর অর্চনাদের। একেবারে নতুন বাড়ি। বাড়িটার প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট বসানো। ঘরের দেয়াল, মেঝে ঝকঝকে। রান্নাঘরে গ্যাস এনে ফেলেছে। বাথরুমে শাওয়ার, দেয়ালে দামী আয়না বেসিন। পায়খানা পরিষ্কার, তকতকে, দেয়ালে বসানো ছোট্ট ডিবে থেকে মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে। ডাইনিং স্পেসে খাবার টেবিল, মুখ ধোয়ার বেসিন। বারান্দার কোণেও বেসিন, সামনে আয়না। ফ্ল্যাটের একপ্রান্তে বাবা-মার ঘর, আর একপ্রান্তে বরুণের ঘর—ওটাই সোফা-কাম বেড বসিয়ে বৈঠকখানা। বাবা-মার ঘরের পাশেই অর্চনা-কল্পনার ঘর, তার পাশে ছোট দুই ভাই থাকে। প্রত্যেকের সিঙ্গল বেডে আলাদা বিছানা।

অর্চনা যেন মনে মনে এসবও হিসেব করল। ওর কোন কাজ নেই। ঠিকে ঝি বাসন মাজে, রাঁধুনি রেঁধে দেয়। ঘনশ্যাম আছে ফাইফরমাস খাটার জন্যে। সব কিছু যেন ভুলতে বসেছে অর্চনা। কি রকম যেন ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা ওকে চাপা অসুখের মধ্যে ঘিরে ধরেছে। অসুখটা বুঝি ওখান থেকেই ধরেছিল। অর্চনার বুকে যেন হাঁফ ধরল। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। বরুণকে তো

বাড়িতেই পাওয়া যায় না। অরুণ বেশ কিছু নতুন বন্ধু করেছে। তরুণও তাই। কপা নাচের স্কুল, গানের স্কুল আর পড়াশুনার স্কুল করে বাড়ি থাকেও কম। বাবা ফিরবে সন্ধ্যেয়। একমাত্র মা আর সে ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। ঘনশ্যাম নিজের মনে সব সময়ে ঘর বারান্দা, রেলিঙ, জানালার শার্সি তকতকে রাখার কাজ করে যায়।

কারোর সঙ্গে অর্চনা কথা বলতে পারে না। এখানে অর্চনার কেউই যেন আপন হল না। হবেই বা কি করে? পাশের বাড়িগুলোই বা কত দূরে দূরে। এখানে রক নেই, কোন আড্ডা নেই। ছাদে কেউ তেমন আসে না। সব কোথায় যায়? গাড়ি করে লেকে? সিনেমায়? পার্কে? বাবার অফিসের গাড়ি করে কপা, তরুণ, অরুণ কতবার লেক ঘুরে এসেছে। অর্চনা যায়নি!

অর্চনা সামনে তাকাল। হু-হু হাওয়ার শব্দ নির্জন রাস্তায় দুপাশ সাজানো গাছের পাতা কাঁপিয়ে বয়ে চলেছে। দুপাশের নিথর নিশ্চুপ বাড়িগুলোর দেয়ালে ধাক্কা লেগে পরিচ্ছন্ন পিচের রাস্তায় পাক খাচ্ছে বাতাস। হিসহিস শব্দ হচ্ছে চারপাশে। কি রকম একা লাগল অর্চনার। নিজের ঘরে এল। ওর জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে সামনে তাকাল। দূরে পাশের বাড়ির সেই ভদ্রমহিলা জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চেহারায় অনেকটা প্রতিমাবৌদির আদল। তবে প্রতিমা বৌদি যেমন নোংরা কাপড়-জামা পরে থাকতেন বিকেলেও, ইনি তা নন। ওঁর সঙ্গে কতবার কথা বলতে চেষ্টা করেছে অর্চনা, পারেনি।

অর্চনা একভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। যদি চোখাচোখি হয় কথা বলবে।…'আপনারা কবে এলেন?' 'কাল।' 'কোথা থেকে আসছেন?' 'পাতিপুকুর থেকে।' 'পাতিপুকুরে আমার মামারা থাকতেন।' 'পাতিপুকুরে আমার বাপের বাড়ি। বিয়ের পর ওখানেই ছিলাম। ঘর পেয়ে এখানে এসেছি।' 'আমাদের বাড়ি একদিন আসবেন।' 'যাব। আপনিও আসুন।' 'আমাকে আপনি বলবেন না।'…প্রথম আলাপ হয়েছিল প্রতিমাবৌদির সঙ্গে এই ভাবেই। দূরের ভদ্রমহিলা একবার তাকালেন।

অর্চনার চোখে চোখ পড়তেই হাসল অর্চনা। ভদ্রমহিলা কিছু সময় গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। অর্চনার মনে হল, ভদ্রমহিলা ওকে দেখতে পাননি। আবার তাকিয়ে থাকল। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রমহিলার চোখ পড়ল অর্চনার ওপর। অর্চনা হেসে কিছু যেন বলতে যাবে, ভদ্রমহিলা বিরক্ত

হয়ে ঘরে ঢুকেই সশব্দে জানালার পর্দা টেনে দিলেন, একটু পরে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

হঠাৎ অর্চনা যেন ধাক্কা খেল। কিরকম যেন অপমান বোধ হল। মুহূর্তে চাপা অপমানে, অস্বস্তিতে জানালা থেকে সরে এল।

প্রীতিলতা নিজের ঘরে বসে নতুন কেনা গহনাগুলো ছড়িয়ে দেখছিলেন। অর্চনা বলল, 'মা, আমি একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

'যা, তোর বাবা এলে নেমে আসবি।'

অর্চনা দরজা খুলে ছাদের সিঁড়িতে পা দিতে যাবে, ওপর থেকে কারোর নামার শব্দ শুনল। চারতলার মিঃ সেনগুপ্তদের ছেলেমেয়ে। নীচে লেটার বক্সে ওদের নাম দেখেছে অর্চনা। ছেলেটি অনেকটা প্রভাতদার দাদার মতন। প্রায়ই সামনাসামনি পড়ে যায় অর্চনা, কখনও একা, কখনো বা ওঁর মা, ভাই-বোনেদের সঙ্গে নিয়ে বেরুবার সময়। কিন্তু কোনদিন কথা বলেননি ওঁরা। অথচ অর্চনা কথা বলতে চায়। ভদ্রলোকের মা ঠিক যেন শান্তার মা!

সেনগুপ্ত নীচে নামছেন। পাশে বোন—বব্-করা চুল, শ্ল্যাক্স্ পরে আছে। মুখখানা খুব মিষ্টি। অর্চনা তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। দু'মাস ধরে একভাবে দেখতে দেখতে কত পরিচিত ওঁরা। ওঁরা দুজন ওর দিকে একবার তাকাল। অর্চনা হাসল দুজনের দিকে তাকিয়ে। ওর সামনের ধাপে পা দিয়েই ওরা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অর্চনা যেন এক অস্পষ্ট ছায়ায় ঢেকে নিথর দাঁড়িয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে ছাদে উঠে এল।

…'এই অর্চাদি, আমাদের বাড়ি এসোনা, অনেক কথা বলব। কতদিন আসনি তুমি?' ··ছাদে পা দিয়ে দূরের ছাদের মেয়েটি চোখে পড়তেই অর্চনার হঠাৎ শান্তার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই হেসে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সামনের ছাদে ওরই বয়সী দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওরা দুজনেই একটু দূরে সরে গেল।

'এই যে, শুনুন, আপনারা কি নতুন এলেন?' অর্চনা হঠাৎ কি ভেবে ডেকে বসল। মুখে সলজ্জ হাসি।

মেয়ে দুটি অর্চনার দিকে কিছু সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে আরও দূরে সরে গেল। মাঝে মাঝে ফিসফিস কথা বলছে ওরা, হাসছে আর অর্চনাকে আড়চোখে দেখছে।

অর্চনার হঠাৎ নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল। মেয়ে দুটি একসময়ে

নীচে নেমে যেতেই অর্চনার বুকের মধ্যে যেন অনেক দিনের চাপা জ্বালা গোপন কোন ব্যথার মত নড়ে উঠল। আলস্যেয় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার মধ্যে এক সময় ছায়া-ছায়া অন্ধকার নেমে এলে ও নীচে চলে এল। আগে সন্ধে হলেই কপা, তরুণ, অরুণ—সবাই পড়তে বসত ঘর ভর্তি করে। সারাদিনের শেষে সকলের মাঝখানে অর্চনার নিজেকে ভীষণ ভাল লাগত। আর এখানে সারা বাড়ি কেমন নীরব, নিস্তব্ধ। মা আহ্নিকে বসেছে। বাকি কাজ করছে ঘনশ্যাম। অর্চনার নিজের কিছু করার নেই।

অরুণের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। দরজায় খিল আঁটা, বারান্দার দিকে জানালাগুলোও বন্ধ। অর্চনা দরজায় ধাক্কা দিল, 'ঘরে কে? অরুণ?'

একটু পরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হঁ্যা, দিদি, আমি।'

'আর কে আছে?'

'অরিজিৎ। আমরা একটু ব্যস্ত আছি, এখন খুলছি না।'

…'এর নাম কি?'…'অরিজিৎ রায়।'…প্রথম এ-বাড়িতে এলে অরুণ অর্চনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। গায়ে রংচং-এ ছবি-আঁকা দামী ছিটের বুশশার্ট চুল শ্যাম্পুতে ফোলানো, দামী প্যাণ্ট পরে আছে। গলায় টাই-আঁটা। একটু লালচে রং, মোটা চেহারা। অরুণ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জান দিদি, অরিজিতের বাবা ওর বড় জামাইবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে মদ খায় প্রত্যেকদিন সন্ধেয়' জামাইবাবু তো স্টেট্‌স্‌ম্যানের সাব-এডিটার। এক পাড়াতেই থাকে। দিদির সঙ্গে লাভ ম্যারেজ তো।' অরিজিৎ হেসেছিল তখন।…'একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন দিদি ....'

'তুই আবার বেরুবি নাকি?' অর্চনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'এক ঘণ্টা পরে।' ঘরের ভেতর থেকেই অরুণ জবাব দিল।

অর্চনা দরজার সামনে আর দাঁড়াল না। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মেশানো বিচিত্র এক গন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে নাকে এল অর্চনার। এ গন্ধ ওর পরিচিত নয়। বাবার ঘরে ঢুকতে যাবে, টেলিফোন বেজে উঠল। মা আহ্নিকে বসেছে বলে অর্চনা টেলিফোন ধরল। 'হ্যালো।'

'আপনি কি কল্পনার দিদি ধরেছেন?'

'হঁ্যা, আপনি কে?'

'আমি দীপ্তেন্দু।'

'কে দীপ্তেন্দু!'

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ কানে এল। 'আপনার ছোট বোন কল্পনার বান্ধবী অনিন্দিতার নাম শুনেছেন তো? আমি তার দাদা।'

'ও! তা কি ব্যাপার?'

'কল্পনা গানের স্কুল থেকে অনির সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছে। ওর যেতে বেশ একটু দেরী হবে। আমাদের বাড়ি একটা ছোটখাটো ফাংশান আছে। আপনারা যেন ভাববেন না।'

'আপনি কি করেন?' হঠাৎ অর্চনা প্রশ্ন করল।

'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি এই ফার্স্ট ইয়ারে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকেছি। আপনার বোনের থেকে বড়জোর বছর চারেক বড়।'

'তা কল্পনা নিজে ফোন করল না কেন?'

কোন শব্দ নেই প্রথমে। কি কথায় ফোনের মধ্যে সমবেত হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপরেই বলল, 'ওর ভয় করছিল, তাই।'

অর্চনা বিষণ্ণ হাসল।

'দিদি আপনি ভাববেন না কিন্তু। আমিই আমাদের গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি পাঠাবেন।' বলেই রিসিভার রেখে দিল। কপার বয়স কত হল? চোদ্দ। একটু অন্যমনস্ক হল অর্চনা। ওখানে কি ভয় করত কপা, অরুণ, তরুণ ওকে। তারও বেশী ভালবাসত ওরা। একদিনও দিদিকে না বলে কোথাও যেত না, 'না' বললে কোথাও যেতও না। অর্চনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘরের লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়াল। হঠাৎ নিজেকে নিয়ে চাপা কৌতুকে নিজেই হেসে ফেলল। আয়নার ভিতরে আর বাইরে দুই অর্চনাই কেমন নিঃসঙ্গ —ওর কাছে মজার মনে হল।

রাত্রে কল্পনা না খেয়েই শুয়ে পড়ল। তরুণও কোন বন্ধুর সঙ্গে বাইরে খেয়েছে। আগেভাগে বিছানা নিল। বরুণ ফেরেনি তখনো। প্রীতিলতা বাদে সত্যেশ্বর, অরুণ, অর্চনা খাওয়া শেষ করে বৈঠকখানায় এসে বসল।

এক সময় অর্চনা বলল, 'বাবা, কাল একবার আগের বাড়ির ওখানে বেড়াতে যাব।'

'কেন, এখানে ভাল লাগছে না?' হাসলেন সত্যেশ্বর।

'না, তা ঠিক নয়। তবে কতদিন ওখান থেকে এসেছি। একবার ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে। প্রতিমাবৌদি, লীলামাসি—ওরা আছেন তো।'

'আর গিয়ে কি হবে দিদি? আমার তো আর অত দূরে যেতে ভাল্লাগে না। তাছাড়া এখন ওখানে যেতে কি রকম যেন লাগে!'

'চল্না আমায় নিয়ে। বিকেলবেলা তো। না হয় তরুণও সঙ্গে যাবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেখানে যাবার যাবি। তরুণের সঙ্গে চলে আসব।'

'তা হয় না।' সত্যেশ্বর কি ভেবে বললেন, 'তবে সত্যি সত্যি যেতে হলে আমার গাড়িতে যাও!'

'হ্যাঁ, গাড়ি ওখানে ঢুকবে নাকি? বাবা, মনে করে দেখতো, বড় রাস্তা থেকে কতগুলো ঘিঞ্জি নোংরা গলি পেরিয়ে যেতে হত!' অরুণ বলল।

প্রীতিলতা বললেন, 'সত্যিই তো। গাড়িই বা ঢুকবে কোথায়? আর গাড়ি করে ছাড়া অচকে তো ছাড়া যাবে না। খারাপ দেখায়।'

অর্চনা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। সত্যেশ্বর দাঁত খুঁটছিলেন। বললেন, 'এখানে তো বেশ আছিস মা, কি দরকার ওখানে গিয়ে! এমন কিছু নেই ওখানে।'

'আমিও তো তাই বলি।' প্রীতিলতা বললেন, 'গেলেই তো আবার সব আসতে চাইবে ওদের সেই বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। যা হাঘরে সব। এতদিন তো দেখে এলাম! বলবে, তোমাদের গাড়ি চড়াও, খাওয়াও। তখন সামলাতে পারবে না।'

'তুমি ঠিক বলেছ।' সত্যেশ্বর দামী তামাকের গুঁড়ো সিগারেটের পাতায় পাকাতে পাকাতে বললেন, 'লক্ষ্য করেছ, এন্ভায়রনমেণ্টটা বাইরে ভেতরে পুরো একটা বস্তির। বিশেষ করে ওদিকের সব জায়গাগুলোই। তাই না? ওহ্ পালিয়ে বেঁচেছি।' সত্যেশ্বর লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালেন।

অর্চনার বুকের গভীরে কোথাও বুঝি সবুজ বৃক্ষের মত কিছুর রস শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছু বুঝি মরে যাবে! মৃতের মত শীতল, শব্দহীন, নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে ওকে ওর ভিতর থেকে! এ একটা অসুখ বুঝি! অর্চনা যেন ভয় পেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে থাক মা। তোমরা যখন চাইছ না—'অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে বলতে অর্চনা বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল। বেডসুইচ টিপে ডিম-লাইট জ্বালল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে।

বহুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকেও অর্চনা ঘুমোতে পারল না। চাপা, অতি গোপন এক অস্বস্তি, জ্বালার মত অর্চনার ভিতরটা ওকে অস্থির করে তুলছে।

বিদ্যুৎ চমক যেমন গভীরতম অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ, নিঃসঙ্গ করে দেয়, অর্চনার এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো ওকে তেমন এক জায়গায় নিয়ে চলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকের জানালার সামনে এল। রাস্তায় কোন লোক নেই। শুধু শুকনো বাতাস দু'পাশের নিপাট পরিচ্ছন্ন দেয়াল, সাজানো গাছের সারি ঘন পাতা ছুঁতে ছুঁতে কালো পীচের রাস্তায় পাক খাচ্ছে। কারো-কারো বাড়ির সামনে গাড়ি গ্যারেজ করার শব্দ। কোন কোলাহল, বিন্দুমাত্র কোন শব্দ কানে আসছে না।

অর্চনার অনেক আগের কত গভীর রাতের কথা মনে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা সারারাত জেগে দেয়ালে লিখত ভোটের সময়। দু'দলে মাঝে মাঝে ঝগড়া-মারামারি হলেও ওরা অর্চনাদের কাছে চা খেতে চাইত। কখনো গভীর রাতে, কখন ভোরবেলা। উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলে সব। অর্চনার ভীষণ ভাল লাগত। অবাক হয়ে দেখত ওদের। সেখানে ও নিজের মধ্যে কি গভীর গোপন হয়ে বেঁচে থাকত। এখানে সেই তরুণদের বুকের যন্ত্রণায় কালি হয়ে ওঠা কোন দেয়াল লিখন নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের বিছানায় এল। নরম বিছানা। ওদিকে তাকিয়ে দেখল, চোদ্দ বছরের কিশোরী কল্পনা গভীর ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখতে ও। নিষ্পাপ। বাবা-মা, অরুণ, তরুণ, কল্পনাও এখন এখানে ওর থেকে কত দূরে। অথচ ওখানে কত কাছে থাকত ওরা। পুরনো বাড়ির মেঝের শান্ত শীতলতা সকলের মধ্যে অর্চনাকে সহজেই ঘুম পাড়িয়ে দিত।

হঠাৎ কষ্ট হতেই অর্চনা ডিম-লাইট নিভিয়ে দিল। চাপা রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে বাইরের বাতাসের শব্দ আর ঘরের পাখার শব্দে মিশ্রিত অনুভূতি, অস্তিত্ব কানে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কত রাত কে জানে। প্রীতিলতা স্বামীকে ঠেলে ডাকলেন, 'শুনছ ?'

'কি ?' ঘুম ভেঙে গেছে সত্যেশ্বরের। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

'অচটা বোধ হয় কাঁদছে, শোন।'

'কেন, কাঁদবে কেন? এত বড় মেয়ে।' সত্যেশ্বরের কথা জড়িয়ে গেল।

'বোধ হয় তুমি ওখানে যেতে দিলে না, তাই! ধাড়ি মেয়ের অভিমান।'

'যত্তো সব। এত পেয়েও যদি কাঁদে—' পাশ ফিরে শুলেন সত্যেশ্বর।

'এই মেয়েটাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা।' একটু থামলেন, 'মনে নেই তোমার, ছেলেবেলায় যে-কোন অসুখে পড়লে বা ভারি কোন অসুখ থেকে সেরে

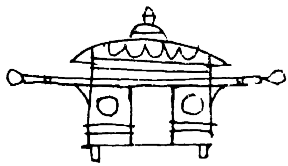
ওঠার সময় কেমন ঘুমের মধ্যে কাঁদত! জিজ্ঞেস করলে বলত না, ও কিরকম ভীষণ একা বলে ওর ভয় করে? তাই কাঁদত!'

'কিন্তু এখন ওর আবার অসুখ কোথায়?'

'এখানে আসা থেকে দেখছি, ওর মনটা খুব খারাপ।' উৎকর্ণ হলেন প্রীতিলতা, 'এখন তো মনে হচ্ছে জেগেই কাঁদছে। বেচারা।'

'কাঁদুক, কাঁদতে দাও।' দাঁতে দাঁত চাপলেন সত্যেশ্বর, 'স্বভাব কোনদিনও যাবে না।' বলতে বলতে গভীর আরামের ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন।

অর্চনার ঘর থেকে যেন বা চাপা অস্বস্তি আর দীর্ঘশ্বাস জড়ানো গোঙানির মত শব্দ একটানা ভেসে আসছে এখনো।





অসময়

এমন দুপুরেও বিশাল ষ্টেশনের মধ্যে বিশেষ করে কাউণ্টারগুলোর চারপাশে অবিরল জনস্রোত। খুঁটে-খাওয়া এক রাশি পিঁপড়ের মত যেন অনুসন্ধানী তৎপরতা ষ্টেশনের ব্যস্ত মানুষগুলোর।

সুমিত এরই মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে বোর্ডের লেখাগুলো দেখছে। অপরিচিত ষ্টেশনগুলোর নাম অকারণ পড়ে যাওয়ার খেলা পেয়েছে যেন। ফুলেশ্বর! বাহ্ চমৎকার নাম তো! একটু বেশী ঝুঁকে স্থির দৃষ্টি রাখল ষ্টেশনের নামটার ওপর। হাওড়া ষ্টেশন থেকে কতদূর? গুনে দেখল। মাত্র দশটা ষ্টেশন পরেই!

এতক্ষণ অলস হয়ে সারা ষ্টেশনটা ঘুরেছে সুমিত। এই মুহূর্তে হঠাৎ-ব্যস্ততায় সামনের ভিড়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখল। ফুলেশ্বর ষ্টেশনের একটা টিকিট কাটলে কেমন হয়! কোন্ দিকে জানে না সুমিত, তবু এমনি একা-একা ঘুরে এলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু টিকিট কাটবে কি করে?

এত ভিড়! সুমিত অসহায় দৃষ্টিতে কাউণ্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু দূরে চায়ের হুইলার ষ্টলের এদিকে দেয়াল ঘেঁষে একটি মেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে। হাতে ঝোলানো ব্যাগ আর লাল সোয়েটার। উৎসুক চোখে ভিড় দেখছে। কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে বুঝি!

হঠাৎ সুমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ষ্টেশনটায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরার সময় এই মেয়েটাই কয়েকবার চোখে পড়েছিল না সুমিতের? সুমিত অনেকক্ষণ ধরে স্টেশনটা ঘুরেছে। মেয়েটা এতক্ষণ কার জন্যে অপেক্ষা করছে? এখনি কি ওকে দিয়ে একটা ফুলেশ্বরের টিকিট কাটা যায় না? কিছু কি ভাববে?

'এই যে শুনুন।'

মালতীর বুকের ভিতর হঠাৎ কেঁপে উঠল। তাকাল স্মিতের দিকে। মুখের ভাবে চাপা ভয়, আতঙ্ক। মালতীর দু-চোখ আয়ত, বিষণ্ণ। নরম চিবুক, পুরু ঠোঁট, গ্রীবা-কাঁধ-বাহু শক্ত-বাঁধুনি শরীরের সঙ্গে বেশ মানানসই। সাধারণ ঝকঝকে ছাপা শাড়ি কুঁচিয়ে পরেছে বলেই মালতীকে সদ্য-ফুলধরা সবুজ লতার মত মনোরম লাগছে।

'আমায় বলছেন?' মালতী গলায় ঢোক গিলল।

'একটা টিকিট কেটে দেবেন?' স্মিত সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ-চোখ নির্বিকার।

'টিকিট!' মালতী অস্ফুটে উচ্চারণ করল।

'ফুলেশ্বরের টিকিট। যা ভিড়, কিছুতেই তাড়াতাড়ি কাটা সম্ভব নয়। যদি লেডিস কাউন্টার থেকে একটা কেটে দেন।'

মালতী কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল স্মিতের দিকে।

'আপনার কি কেউ আসবেন এখনি?'

'না।' একটু থামল মালতী, 'আমি যে লেডিস কাউন্টার চিনি না।' কণ্ঠস্বর হঠাৎ সহজ হয়ে গেছে ওর!

'ও।' একটা অস্ফুট শব্দ হল স্মিতের কণ্ঠে, 'অবশ্য আমিও না।' একটু থামল স্মিত, 'আপনি তো কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন না। তা হলে চলুন না, কাউন্টারই খুঁজি! পেলেই আপনি কেটে দিয়ে চলে আসবেন।'

আড়ষ্ট কণ্ঠে মালতী বলল, 'চলুন তা হলে।' স্মিতের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল মালতী। 'খুঁজে কাউন্টার বের করে টিকিট কাটতে গেলে দেরী হবে না?'

'নাহ, আমার কোন তাড়া নেই। একা আছি, যে কোন ট্রেন পেলেই চলে যাব।'

মালতী নিশ্চুপ মাথা নীচু করে হাঁটছে।

'আপনি কি কোথাও যাবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন?'

মালতী মুখ তুলে স্মিতকে মুহূর্তে দেখে নিয়েই দৃষ্টি ঘোরাল। যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'যাব, আপনার দিকেই!'

স্মিত স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে কথাটা। অবাক চোখে মালতীর দিকে তাকিয়ে রইল। 'তা হলে তো ভালই, আসুন আমার সঙ্গে।'

'আপনি কোন্ ষ্টেশনে যেন নামবেন বললেন!'

'ফুলেশ্বরে।' একটু থামল সুমিত, 'আপনিও কি—'

'ওইখানেই।' মালতী বলল, 'আমি অবশ্য আজই ফিরব।'

'আশ্চর্য!' সুমিত শব্দ করে হেসে উঠল, 'আমিও তো আজই ফিরব!' সুমিতের গতি মন্থর হয়ে আসছিল। 'তা হলে চলুন আমার সঙ্গে।'

মালতী হাসল। লেডিস কাউন্টারের সামনে এসে গেছে ওরা। 'নিন, কাটুন দুটো।' বলেই সুমিত মালতীর হাতে টাকা গুঁজে দিল।

'আমারটা আপনি কাটবেন কেন?'

'কাটুন না। একই জায়গায় তো নামব! নেমে ভাগাভাগি করা যাবে।' সুমিত হঠাৎ যেন কোন পরিচিত মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলছে—এইভাবে হেসে উঠল।

মালতী টিকিট কেটে সুমিতের হাতে দিল। 'সোয়েটারটা আমায় দিন, আমার সাইড-ব্যাগে রাখি। ট্রেনে ভিড়, কখন হারিয়ে যাবে।' বলেই প্রায় কেড়ে নেবার মত মালতীর হাত থেকে সোয়েটারটা নিয়ে ব্যাগে রেখে দিল। 'আসুন, যে ট্রেন পাবো, সেই ট্রেনেই উঠে বসব।'

দ্রুত পা চালিয়ে ওরা দুজনে নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল। এমন দুপুরেও প্লাটফর্ম যাত্রীতে গিজগিজ করছে। ট্রেনের বগিগুলো হয়তো উপচে পড়বে একটু পরেই।

'আমি বরং লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ি। এই তো লেডিস কম্পার্টমেন্ট!' মালতী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুমিত চেঁচিয়ে উঠল। 'না, না, আমার সঙ্গে আসুন না, আপনাকে ঠিকমত তুলে বসিয়ে তবে আমি উঠব।'

'নাকি, টাকাটা না দিয়ে পালিয়ে যাব ভাবছেন!' মালতী হাসছে।

সুমিত হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে মালতীকে দেখল। কি ভেবে শব্দ করে হেসে উঠল, 'লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠলেই পালাতে পারবেন না।'

'কেন!' মালতীর চোখে-মুখে বিস্ময়।

'ভুলে গেছেন বোধ হয় টিকিটটা আমার কাছে! এ লাইনে চেকাররা বার বার আসে।' সুমিত মালতীর মুখ-চোখের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। মালতী ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে মৃদু হাসছে। গলা নামিয়ে বলল, 'দুজনেরই এই দুপুরে কোন কাজ নেই তো। কারোরই পালাতে না-পারার আর একটা কারণও তা-ই।'

মালতীর চিবুক লাল হল মুহূর্তের জন্য। সামনে একটা কামরায় গেটের যাত্রীদের ঠেলে ভেদ করে মালতী ঢুকে পড়ল ভিতরে। বসে-থাকা এক বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখনি গাড়ি ছাড়বে। সুমিত গেটের মুখে ভিড়ের চাপের মধ্যে আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

ইলেকট্রিক ট্রেন, লোকাল প্যাসেঞ্জার গাড়ি। মিনিট-চল্লিশের মধ্যেই ফুলেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। গেটের মুখে, ভিতরেও অনেকটা ভিড় হয়ে গেছে। সুমিত জানে না, প্রস্তুতও ছিল না ঠিক কখন ষ্টেশনটা আসবে। ষ্টেশনের নাম চোখে পড়তেই চমকে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। জানালা দিয়ে মালতীকে ডাকল, 'কই! নেমে আসুন তাড়াতাড়ি! এসে গেছি!'

মালতী অপ্রস্তুত বোধ করে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল। ভিতরে যেন হাঁপাচ্ছে। চারপাশের চলমান ভিড়ে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল ওরা দুজন। গাড়ি বেরিয়ে গেল ষ্টেশন থেকে।

সুমিত তাকাল মালতীর দিকে। 'ইস, একটু আগে বেশ ভয় পেয়েছিলাম, যদি না ঠিক সময়ে নামতেন!'

'টিকিটের ভাড়াটা পেতেন না তো?'

'বার বার কথাটা বলছেন কেন বলুন তো? মনে হচ্ছে ভাড়াটা সত্যি সত্যি দেবেন না!' বলেই নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠল সুমিত।

মালতী একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল সুমিতের কথায়। হাসতে হাসতে বলল, 'বলা যায় না, তা-ও হতে পারে!'

সুমিত হাসল। 'আপনি কোথায় যাবেন বলছিলেন যে? কোন্ দিকে?'

মালতী দূরে রেললাইনের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'থাক, আজ আর যাব না, গেলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।'

'তা হলে?'

'আপনার সঙ্গে ঘুরেই বরং ফিরব।'

'বাড়িতে কি বলবেন? মিথ্যে কথা?'

বাড়ির কথা বলতেই মালতী যেন শামুকের মত কোথাও গুটিয়ে যেতে লাগল। একটা চাপা অসহায় বিষণ্ণতা মালতীকে মুহূর্তে ঘিরে ধরল। সুমিতের দিকে তাকাল। 'ও একটা কিছু বলা যাবে।' কণ্ঠস্বর, ভঙ্গি অদ্ভুত নির্বিকার।

সুমিত বলল, 'চলুন, ওই দিকে যাই।'

'কোন দিকে!' মালতীর কণ্ঠে বিস্ময়। 'ওদিকে তো শুধু গাছপালা, বনজঙ্গল!'

'হোক না, ওগুলো পার হলেই একটা নদী আছে। ট্রেনে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল। গাড়িতেও এক ভদ্রলোক বললেন। নদীর ধারে মন্দ লাগবে না।' স্বমিত আর দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে আরম্ভ করল। 'আস্থন।'

'দেখছেন, মেঘ জড়ো হচ্ছে কিন্তু।'

'বৃষ্টি হতে পারে বলছেন?'

'বলা যায় না, একে এমন দুপুরে ঠাণ্ডা, তার ওপর যদি বৃষ্টি হয়!'

'মেয়েরা ভীষণ গোছানো জানি, বাইরে বেরিয়েও এত অংক কষলে ভাল লাগে না।' স্বমিত এগোচ্ছে। মালতীর সঙ্গে চোখা-চোখি হতে দুজনেই হেসে উঠল।

ওরা দুজন রেললাইন ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে ডানদিকে ঝোপঝাড়ের মাঝের সরু ঢালু রাস্তা ধরে নেমে পড়ল। কয়েকটা বড় বড় গাছ পিছনে ফেলে আসার পরেই রাস্তাটা একটু চওড়া হয়ে গেছে। দুপাশে জঙ্গল। একদিকে ঘন বাঁশবন বাতাসে শব্দময়। আর একদিকে রাংচিতা, ঘেঁটু, আসশ্যাওড়ার ঝোপ। এখানে-ওখানে কিছু পাখি একই ভাবে ডেকে চলেছে। নির্জন, শান্ত ছায়া-ঢাকা শীতল চারপাশ। কাছাকাছি কোথাও বসতি নেই মনে হচ্ছে।

কি ভাবতে ভাবতে মালতী একটু এগিয়ে গেছে। চারপাশে গাছপালার সবুজ ছায়া যেন মালতী সন্তর্পিত নিঃশ্বাসে অন্যমনস্কভাবে গ্রহণ করছে। স্বমিত কিছুটা পিছনে। রেললাইন, ফেলে-আসা ষ্টেশন আর দেখা যাচ্ছে না। যুবক-যুবতীদের স্বভাবই এই। যখন তারা অকারণ কথা বন্ধ করে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তখনি বুঝি ওদের চারপাশে ভয়ংকর কিছু ঘটবার মত পরিবেশ গড়ে ওঠে ওদেরই অজ্ঞাতে। অন্তত এই মুহূর্তে স্বমিতের কণ্ঠস্বর, অস্ফুট শব্দ শুনে পিছন ফিরেই মালতী যেন নিজের মধ্যেই সেরকম পরিবেশের স্পর্শ পেল।

থমকে দাঁড়াল মালতী। দূরে স্বমিতের দিকে তাকিয়েই পিছনের কাপড়, বুকের আবরণ সন্তর্পণে টানল। 'আমায় ডাকলেন?'

'একটু দাঁড়ান।' স্বমিত হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

মালতীর শীত শীত করছে সারা শরীর। অপলক তাকিয়ে আছে স্বমিতের দিকে।

স্বমিত ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মালতীর দু'চোখে দৃষ্টি রেখে হাসছে

সুমিত। মালতীর গলার মধ্যে যেন এই মুহূর্তে শুকনো কাগজ আঁটা। চারপাশের পাখির কণ্ঠ আর বাঁশবনের কম্পনের শব্দ ছাড়া কিছু কানে আসছে না। মালতীর এমন গভীর অলৌকিক ভয়ের অভিজ্ঞতা কোনদিন হয়নি।

'আপনার মাথার চুল, কানের লতির কাছটা পাখিতে নোংরা করে দিয়েছে। তার ওপর একটা শুকনো বাঁশপাতা অ'টকে!' সুমিত সহজভাবে বলল।

'তাই বুঝি? ইস, আপনি এমনভাবে সামনে এসে দাঁড়ালেন, যা ভয় করছিল!'

'ভয়!' শব্দ করে হেসে উঠল সুমিত। 'একটু দাঁড়ান স্থির হয়ে, পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' বলতে বলতে কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে মালতীর মাথার চুল, লতির কাছটা যত্ন করে মুছে দিল। 'এবার এগোন। বলুন তো কিসের ভয়?'

'ভয় আবার কি? ঠাট্টাও বোঝেন না?' মালতী সামলে নিল। সুমিতের পাশাপাশি হাঁটতে হ'াটতে হঠাৎ কি ভেবে বলল, 'আচ্ছা, এখানে কোনো হোটেল নেই?'

'হোটেল!' সুমিত যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'বলছেন কি? এই বনবাদাড়ে ভর্তি গেঁয়ো জায়গায় হোটেল!' শব্দ করে হেসে উঠল সুমিত, 'আপনি কি ভাবছেন বলুন তো? চা খাবেন?'

মালতী লজ্জা পেয়ে গেছে। 'না না, কিছু খাব না।'

'কিছু না খেলে হয় নাকি? দেখছেন বিকেল গড়িয়ে আসছে। ফেরার পথে বরং ষ্টেশনের কোন দোকানে চা খেয়ে নেব।'

মালতী যেন সুমিতের কোন কথাই শুনছে না। চারপাশে চোখ বুলোতে বুলোতে হাঁটছে সুমিতের পাশাপাশি। সুমিত নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল।

'আপনার ভাল লাগছে না?'

'ভীষণ!' মালতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধ। 'চারপাশে এমন সবুজ কতদিন দেখিনি।'

'আমিও না।' সুমিত সামনের ঘনঝোপে দৃষ্টি বোলাল, 'আপনি তো কোন গাছেরই নাম জানেন না!' গলায় হাসির শব্দ হল, 'দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রথম বোধ হয় একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনার মা ছাড়লেন?'

মালতীর পা যেন কেউ টেনে ধরেছে মুহূর্তে। ভয় দ্বিধা সংকোচ অসহায়তায় মালতীর শরীর ভারী। সুমিতের দিকে তাকাল। এ কি বুঝতে পেরেছে,

মালতী একা-একাই লক্ষ্যহীনভাবে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে? বাইরে বেরিয়ে ঘুরছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে? মুহূর্তের অন্যমনস্কতা ছুটে গেল মালতীর।

'ওই দেখুন, ওটা পাকুড় গাছ, ওটা গাব! ওর নীচেই ছোট ডোবাটার গা ঘেঁষে আসশ্যাওড়া। দূরে একটা বাগান দেখছেন? বাগানের ওই কোণে বাতাবিলেবু কৎবেলের গাছ পাশাপাশি। দেখছেন?' সুস্মিত নিজের খেয়ালে বলে মালতীর দিকে তাকাল।

মালতী নিঃশব্দে সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছে।

চারপাশে বাতাসের শব্দ। গাছের নীচে শুকনো পাতা ইতস্তত পড়ে থাকার মত আকাশের বুকে থমকে থাকা মেঘ। এখানে-ওখানে শালিক ডাকছে। কোথাও বা ঘুঘু-কণ্ঠ, চিলের চীৎকার। কয়েকটা পাখির অদ্ভুত ধরনের কিচমিচ শব্দে কান রেখে মালতী অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

'কোথায় আপনার নদী?' মালতী হঠাৎ গলায় ঠাট্টার শব্দ করে জিজ্ঞেস করল।

'চলুন না, আর একটু এগোলেই পড়বে।'

'শর্টকাট করুন, গ্রামের রাস্তা তো!'

কথা বলতে বলতেই একটা ঝোপের আড়াল পেরিয়ে নদী দেখতে পেল ওরা। এদিকটায় নদীর ধারে কোন চর পড়েনি। ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে লেগে এঁটেল মাটির পাড় ক্ষয়ে ভাঙছে আস্তে আস্তে। চারপাশে ঘন গাছপালা, আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে সূর্য ঢাকছে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালে সদ্য-ছানা-কাটা দুধের মত মনে হয় আকাশটাকে। নদীর ধার থেকে সামান্য দূরে ছাদহীন মেটে পোড়ো বাড়ির ভাঙ্গা দেয়াল। সামনা সামনি কোন বসতি নেই।

'এখানেই বসি, আসুন!' সুস্মিত সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। কাঁধের ঝোলা-ব্যাগটা ঘাসের ওপরে শুইয়ে রাখল পাশে।

'আপনি বসুন, আমি একটু ওদিক থেকে ঘুরে আসি। দেখছেন না, কি চমৎকার বুনো ফুল ফুটেছে!' মালতী দূরে ঝোপের কাছে সরে গেল।

সুস্মিত কোন কথা না বলে দূরে তাকিয়ে থেকে একটা নতুন সিগারেট ধরাল। উতল ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। দূরে নদীর পাড়ে কাশবন ছিল বোঝা যায়। এখন সব ফুল ঝরে পড়ার দলে। মাথার ওপর বকুল-ডাল সাজানো, ফুল নেই। সাজানো বাগানটা একটু দূরে। অসময়ে শ্বেতকরবী ফুটেছে। কোথাও বা একরাশ মল্লিকার খেলা। মোটা মোটা গুঁড়ি-ঝোপের ফাঁক দিয়ে সুস্মিত সবুজ

ধানের একটুকরো মাঠ দেখতে পেল। ভয়ংকর চাপা বিরক্তি নিয়ে আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে সুমিত। এখন যেন এমন পরিবেশে সেই বিরক্তি এতটুকুও নেই।

হঠাৎ তীব্র চীৎকারে চকিত হয়ে সুমিত পিছন ফিরল। মালতী ভয়ংকর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। 'কি হল?' কোন উত্তর নেই। 'এই যে, এদিকে সরে আসুন!' সুমিত চেঁচিয়ে ডাকল। তখনো মালতী স্থির দাঁড়িয়ে। কিছু একটার দিকে স্থির তাকিয়ে আছে ও, মনে হল সুমিতের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মালতীকে ডাকতে যাবে, কিন্তু কি নামে ডাকবে? সুমিত তো ওর নাম জানে না!

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে মালতীর ঠিক পিছনেই দাড়াল। 'কি হল আপনার?' সুমিত মালতীর নিরাভরণ কব্জি ধরে টানল। মালতীর হাতের মুঠোয় কিছু বুনো ফুল গুচ্ছ করে ধরা।

মালতী তাকাল সুমিতের দিকে। দু' চোখ ফোলা, পাতলা ঠোঁট ভয়ে কাঁপছে। 'ওই দেখুন!'

সুমিত তাকাল। একটা কালো সাধারণ সাপ বড় ব্যাঙ মুখের মধ্যে ধরেছে, গিলতে পারছে না। ব্যাঙটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে লেজের প্রান্ত নাড়ছে আস্তে আস্তে, আর যেন স্থির তাকিয়ে আছে মালতীর দিকেই।

'সরে আসুন।' সুমিত টানল মালতীকে। মালতী ঝোপের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এল।

'শুধু এই দেখে এমন চীৎকার করলেন!'

'ইস, কি বিশ্রী না! একটু আগে এলে দেখতে পেতেন একটা কি বিচ্ছিরি দেখতে অনেক বড় কাঠবিড়ালীর মত বুকে হেঁটে সাপটার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।'

মালতীর বলার ধরণ দেখে হেসে উঠল সুমিত। 'এরা এখানেই থাকে।' বলেই মালতীকে সম্পূর্ণ দেখল। 'আপনাকে কি ভেবে যে বাবা-মা ছেড়ে দিয়েছেন একা, বুঝি না। এত সাহস আপনার!'

'থাক।' মালতী সলজ্জ ভঙ্গি করল। 'আপনিও হঠাৎ দেখলে এরকম করতেন।'

'তাই বলে এমন চীৎকার! আমি তো রীতিমত নার্ভাস হয়ে গেছি!' সুমিতের মুখে-চোখে কপট কৌতুক।

'দেখে একটুও বোঝা যাচ্ছে না।' কথা বলতে বলতে ওরা সুমিতের আগের

বসার জায়গাটায় এসে গেছে। সুমিতের ব্যাগটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে। মালতী ওর সামনেই বসে পড়ল। সামান্য ব্যবধানে মুখোমুখি বসল সুমিত।

'ফুলগুলো তুলতেই বা গেলেন কেন? সাধ করে বিপদ ডেকে আনা।'

মালতী তাকালো সুমিতের দিকে। 'নিন।'

'এই বুনো ফুল!' হাসল সুমিত।

'যেমন জায়গায় নিয়ে এসেছেন!'

'কে কাকে নিয়ে আসে!'

'আপনিই কিন্তু আগে বেছেছেন এদিকটা! এমন বনবাদাড়! ভয় করবে না?'

'ভেবেছিলাম আপনার সাহস আছে।' সিগারেট টানতে টানতে নদীর বুকে দৃষ্টি রেখে সুমিত বলল।

'সাহস!' শব্দটা বিড় বিড় করল মালতী। সুমিতকে দেখতে দেখতে ভাবল, সাহস তো আছেই, তা না হলে এমন করে আপনার সঙ্গে এতদূরে চলে এলাম কি করে? এমন একা একা! আবার বিড় বিড় করল মালতী। হঠাৎ যেন বেশী শীত-শীত করল। কার্তিকের শেষ দুপুর। আসন্ন শীতের ঠাণ্ডা ক্রমশ জমতে শুরু করেছে গাছ, পাতা, মাটি, বাতাস আবৃত করে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেন বেশী ভয় পেল মালতী। লোকটাকে কি ভয় পাচ্ছে? নাকি, এমন হঠাৎ ঠাণ্ডায় কাঁপছে ভিতরে? আকাশ দেখল।

'বৃষ্টি আসতে পারে কিন্তু!'

'বাতাস জোরে বইছে, মেঘ কেটে যাবে।'

'যদি না কাটে! এমন অসময়ের বৃষ্টি কিন্তু বাতাসে এলোমেলো হতে পারে!'

'বৃষ্টিতে তো আর হারিয়ে যাবেন না!' সুমিত তাকাল। হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ মনে হতেই হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। বলল, 'একটা ব্যাপার দেখেছেন, আমরা দুজনে কেউ কারো নামটা এখনো জানি না!'

'মানে?' মালতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। 'আমি আমার নাম জানি তো!'

শব্দ করে হেসে উঠল সুমিত। 'ঠাট্টা করছেন?'

মালতী হেসে উঠল। 'নাম জেনে কি হবে?'

'একটু আগে যখন ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন, ডাকতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়ে গেছি। নামটা বলে ফেলুন তো।'

'মালতী সেন।' মুহূর্তে মালতী নিজের ঠিক নাম বলে ফেলেই ভাবল, ঠিক নামটা বলা কি ভাল হল? ওতো বেরুবার সময়েই অন্য একটা নাম তৈরী করে নিয়েছিল। কেন বলল না? সুমিতের দিকে তাকাল। নাহ্ লোকটাকে বিশ্বাস্য মনে হয়। এখনো পর্যন্ত ওর কাছ থেকে কোন অশোভন, সন্দেহ করার মত কথা বা ব্যবহার মালতী পায়নি। লম্বা-চওড়া চেহারায়, হাঁটায়, কথা বলায় কেমন অন্যমনস্ক, কিন্তু ভদ্র বলেই মনে হয়।

'কি দেখছেন?' হঠাৎ সুমিত বলল, 'আমার নাম জানতে চান তো? সুমিত সান্যাল।' এমন বন্ধুত্বের সূচনায় সুমিত সহাস্য।

আচমকা সশব্দে বৃষ্টি নামল।

'দেখলেন তো? এবার?' চকিতে দুজনে উঠে দাঁড়াল। মালতী বলল, 'এখন কি করবেন? ওহ্, এমন ঠাণ্ডার দিনে বৃষ্টি, এক ফোঁটাও সহ্য করা যাচ্ছে না।'

'তার ওপর দমকা হাওয়া!' সুমিত এদিক ওদিক তাকাল। 'চলুন, আপাতত ওই ঘন ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াই।'

'ভিজে যাবো যে একেবারে!'

'আসুন।' বলেই সুমিত মালতীর ডান হাতের মুঠি চেপে ধরে দৌড়তে লাগল. এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে, কনকনে ঠাণ্ডায় দুজনে দুজনের মধ্যে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। সুমিত যেন মালতীকে আড়াল করার জন্যে ওকে বুকের আড়ালে নিয়ে দৌড়চ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওরা ঝোপটার নীচে এসে গেল। গায়ে তেমন জল লাগছে না, কিন্তু ঝাপটায় স্থির দাঁড়িয়ে ওরা দুজনেই কাঁপছে। চারপাশ ঘন বর্ষণে সাদা, ঝড়ে নদার বুক উত্তাল। এমন বৃষ্টির মধ্যে ওরা দুজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়—পাশাপাশি।

'একটু বৃষ্টি কমলেই আমরা বরং ওই দূরে পোড়ো বাড়িটায় দেয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াব।'

মালতী তাকাল। 'এখুনি চলুন না, এখানে আর কিছু সময় থাকলে একেবারে ভিজে যাব।'

'যেতে আপত্তি নেই, আপনি দৌড়তে পারবেন তো?'

'পারব।'

সুমিত দৌড়ল, পিছনে মালতী। প্রায় ভিজেই দুজনে পোড়ো বাড়িটায়

চলে এল। ছাদ নেই, মাটির দেয়ালে জানালা বসানো নেই। কয়েক মুহূর্ত কোথায় দাঁড়াবে ঠিক করতে না পেরে এক সময়ে দুই দেয়ালের মধ্যেকার কোণে দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। এখন আর বৃষ্টি একটুও লাগছে না। শুধু ঝোড়ো হাওয়া দুজনকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সুমিত নতুন সিগারেট ধরালো। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একেবারে ভিজে গেছেন, মাথাটা অন্তত মুছে নিন।'

মালতী ঠক ঠক করে কাঁপছে। বড় বড় চোখে সুমিতকে দেখে নিয়ে কি ভেবে আঁচল দিয়ে মাথা মুছল। বাইরে প্রবল বর্ষণ। বাতাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। শিশুকালে স্কুলে একসঙ্গে ধারাপাত সমস্বরে উচ্চারণ করে চলার মত শব্দ। সুমিত বৃষ্টির মধ্যে তাকিয়ে থেকে একটানা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।

মালতী ঘাড় গলা মুছতে গিয়ে হঠাৎ নিজের বুকের ওপর দৃষ্টি রাখল। আঁচল ভিজে সপসপ করছে। আজই নতুন কেনা ব্রা-টা পরে এসেছে মালতী। ভিজে কাপড়ের ওপর স্তন, স্তনবৃন্ত স্পষ্ট। দ্রুত আঁচল দিয়ে ঢাকতে চাইল। কিছুই ঢাকা যাচ্ছে না। মালতী চকিতে সুমিতের দিকে তাকাল। সুমিত অন্যদিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মনে হল, এ লোকটা যদি কিছু করে! নাকি সে রকম নয়? খোঁপা ভেঙে পড়েছে পিঠে। বেণীটাকে বুকের ওপর টানল। যতটুকু ঢাকা যায়।

'এই যে শুনুন, আমার সোয়েটারটা দিন। আপনার ব্যাগে আছে না? মালতী সুমিতের দিকে একটু পিছন ফিরে দাঁড়াল।

সুমিত দেখল এবার মালতীকে। 'নিন।' সাইড-ব্যাগ থেকে লাল রঙের সোয়েটারটা বের করে দিল।

দ্রুত পরে ফেলল সোয়েটারটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল। সুমিতকে দেখল একবার।

'দারুণ শীত করছে, তাই না?' সুমিত তাকাল মালতীর দিকে।

'আপনার করছে না?' মালতী অনেকটা সহজ এখন।

সুমিত তাকিয়ে হাসল। মালতীকে লাল সোয়েটারে রহস্যময় লাগছে। যেন একটু আগের সেই মালতী নয়!

'আপনার আর কি? একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলেছেন!' হাসল মালতী। ওর ঠোঁটদুটো ঠাণ্ডায় কাঁপছে।

'তা সত্যি, সিগারেটের ধোঁয়াই এখন বাঁচিয়েছে।' সুমিত শব্দ করে হাসল।

'দেখবেন, আপনারও কিন্তু আরাম হবে এই ধোঁয়ায়।' বলেই এক-মুখ ধোঁয়া মালতীর মুখের ওপর ছড়িয়ে দিল। 'কি? তাই না?'

খুক খুক করে কাশতে কাশতে হাসল মালতী। 'দুধের স্বাদ ঘোলে?'

'খাবেন? খান না!' সুমিত পকেটে হাত দিতে গেল।

'থাক।' মালতী নরম করে তাকাল। 'আপনি খান, এই ধোঁয়ায় বরং কিছুটা গরম হতে পারব।'

সুমিত তাকাল মালতীর দিকে। 'আমি সিগারেট টানছি জোরে, সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরে আপনি আগুনটা ঠোঁটের কাছে ধরুন, দেখবেন আরাম পাবেন!'

'না, থাক।'

'দেখুন না।' সুমিত জোরে সিগারেট টেনে ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিজেই মালতীর ঠোঁটের কাছে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় মালতীর মুখ ভাসছে।

'ওহ্, হয়েছে, সরান সিগারেটটা।' মালতী চেঁচিয়ে উঠল।

সুমিত আবার ধরল। জোরে টানতে টানতে নিজের ঠোঁট থেকে না সরিয়েই ঝুঁকে মালতীর ঠোঁটের সামনে সিগারেটের আগুনটা ধরে থাকল। ধোঁয়ায় মালতীর চোখ জলছে, সুমিতেরও। 'কি? এবার? সত্যি বলুনতো আরাম লাগছে না?'

অদ্ভুত খেলায় দুজনে হাসছে। ওপর থেকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়তেই সুমিতের সিগারেট ভিজে গেল। আগুনটা এক ফোঁটাতেই নিভে গেল। মুখ থেকে খসে নীচে পড়ে গেল সিগারেটটা।

'ইস, পড়ে গেল যে!' যেন দুজনেই কখন বলে উঠল কথাটা। হাসছে দুজনেই। মালতী অনেক বেশী। 'ভাল হল।'

হাসির দমকে মালতী এমন মাতাল কেন? মালতীর লাল সোয়েটারে বোতাম নেই। ভিজে কাপড়ের গভীরে দুই স্তনে বুঝি সোয়েটারের লাল রং চুইয়ে চুইয়ে লেপ্টে গেছে কখন! মালতী মুহূর্তের খেলায় এমন জয়ীর মত হাসছে? সুমিত হঠাৎ চাপা ঠাণ্ডায় শিহরিত হল। চকিতে মালতীর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। দেয়ালে হেলান-দেওয়া মালতীর ক্ষীণ কটি সুমিতের বাঁ হাতের আকর্ষণে ঝুলছে। মালতী শক্ত হাতে ধরেছে সুমিতের চওড়া পিঠ। দম বন্ধ হয়ে আসছে মালতীর। মালতীর যেন মনে হল, তা হোক। সঙ্গে সঙ্গে একটু আগে দেখা ব্যাঙ-ধরা সাপটাকে যেন মনে পড়ল। স্থির নুয়ে থেকে সাপটা যেমন করে খুব আস্তে আস্তে লেজ নাড়ছিল, মালতী জানে না কখন ওর বুকের

ওপর পড়ে থাকা বেণীটাকে সুমিত ডান হাতে ধরে ওদের ভয়ংকর শক্ত হয়ে লেগে থাকা দুই ঠোঁটের মাঝখানে জড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা বুঝি চারপাশের বৃষ্টির অফুরন্ত শব্দে ঢাকা কোন কঠিন দ্বীপে আদিমকাল থেকে দাঁড়িয়ে থাকা একজনই!

বৃষ্টি থামতেই ওরা ফুলেশ্বর ষ্টেশনের কাছে এসে চা খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পেয়েই হাওড়া ষ্টেশনে যখন নামল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ। হাওড়া ষ্টেশন আলো আর লোকজনের অবিরাম কলরবে ভাসছে। উজ্জ্বল আলোয় স্নান করতে করতে ওরা হাঁটছে। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই দাঁড়াল সুমিত।

'দাঁড়ালেন কেন? তাছাড়া এখানে তো বাস নেই, সব ট্যাক্সি যে!' মালতী ধীর স্বরে বলল।

'আপনি তো বলেছেন গড়িয়ার দিকে যাবেন?'

'তাই। আপনি?'

'আমি অত দূরে নয়, ভবানীপুর পেরিয়ে একটু দূরে। একদিকেই যাবো তো, চলুন ট্যাক্সি করি।'

'খারাপ লাগছে, আপনি এত খরচ করলেন।'

'তাতে কি!' সুমিত সামনেই ট্যাক্সিতে উঠে বসল। পিছু পিছু মালতীও। ট্যাক্সিতে চুপ করে বসে রইল সুমিত। সীটের ও কোণে বাইরে তাকিয়ে বসে আছে মালতী। ট্যাক্সি ব্রীজের ওপর উঠল।

সুমিত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এখনি ও বাড়ির মধ্যে ঢুকবে! তারপর? সেই সকালের মত......

সকালে এগারোটায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতেই বাবা চীৎকার করে উঠলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি খোকা?'

'সকালে তো টিউশানিতে যেতে হয় বাবা, তুমি ভুলে গেলে।' শান্ত গলা সুমিতের।

'মাইনে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে টাকাটা তো আগে দিয়ে সকালের আড্ডায় যেতে পারতিস? জানিস রেশন আনলে তবে ভাত চাপবে, এখন কি হবে? রেশন দোকান বন্ধ।'

সুমিত চুপ করে থাকল।

'বড় ছেলে হয়েছ, একটা কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হল না তোমার। তুমি আবার মা-বাবা ভাই-বোনদের দেবে? হুঁঃ।' বাবার গলায় তাচ্ছিল্য।

'উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে টাকা আনতে পাঠালে এই রকমই হয়।' হঠাৎ উত্তেজিত হল সুমিত। 'আমারও কিছু দরকার থাকতে পারে বাইরে।'

'আবার কথা বলছ? বাইরে তোমার কি এমন দরকার থাকে? বি-এ পাশ করে এতদিনেও একটা চাকরী জোটাতে পারলে না। এমন অপদার্থ তুমি। আবার কথা বলছ?'

'আহ্ চুপ করতো। চাকরী না করলেও তোমার সংসারে টাকা তো দিচ্ছে যা হোক করে!' মা বাধা দিলেন।

'তুমি চুপ কর!' হাঁপাচ্ছেন বাবা। 'টিউশানি করে কি মাথা কিনেছে! নাকি আমাদের রাজা করে দিয়েছে? দায়িত্বজ্ঞান যাদের নেই তারা মানুষ নয়।'

সুমিতের মনে হল, বলে, 'যার সংসার টানার মত ক্ষমতা নেই তার এত ছেলেমেয়েই বা হয় কি করে? দায়িত্ববোধ শিখব কোত্থেকে!' বলে নি। শুধু চুপ করে থেকে মায়ের কথায় স্নান সেরে সামান্য খেয়ে নিয়ে, কি ভেবে, মাকে টিউশানি থেকে সামান্য কটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দুপুরে।...

হঠাৎ সচেতন হল। একবার মালতীকে দেখেই নিজের মধ্যে ডুবে গেল। সংসারের নানান অভাব। অসুখে অসুখে বাবা খিটখিটে। মা শতচ্ছিন্ন শাড়ি এ-পাশ ও-পাশ টেনে সেলাই করে জোড়ার মত অসহায়। ভাই-বোনেরা উঠতে বসতে হাত পাতে সব দিক সামলাবার মত আশ্রয়ের আশায়। হাঁপিয়ে উঠেছিল সুমিত, তাই বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। যেখানে দুচোখ যায়! একটু ঘুরে-বেড়িয়ে নিজের কিছুটা মুক্তি চেয়েছিল। এখনি আবার সেই বাড়ি-ফেরা, সেই দমবন্ধ বোবা অবস্থা! মুক্তি কি পেয়েছে সুমিত?

চমকে মালতী দিকে তাকাল। অদ্ভুত সরল নিষ্পাপ মেয়ে মালতী। এ কে? কোথায় থাকে? কেন এভাবে জড়িয়ে গেল সুমিতের সঙ্গে? দুপুরের সেই ঘটনার পর ভাল করে কথা বলতে পারে নি মেয়েটির সঙ্গে। ও-ও তো চোখ তুলে ভাল করে তাকায়নি সুমিতের দিকে। তবু মালতী কি ওকে মুক্তি দিয়েছে? মালতী একভাবে কি যেন ভাবছে। মালতী ওর দিকে তাকাতেই দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে রাখল। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন একটা ধরাল।

মালতী দুপুরের ভয়ঙ্কর ঘটনার পর এই প্রথম স্পষ্ট করে সুমিতকে দেখল। একে কি চেনে মালতী? কিন্তু কেমন স্পষ্ট, সহজ পরিচিতের মত পাশে নিয়ে মালতী বাড়ি ফিরছে! মালতীর বাড়ি! এই লোকটা জানে না, জানবেও না।

মাঝপথে নেমে যাবে। মালতী ট্যাক্সি থেকে নেমে গড়িয়ার বাসে চাপবে। একা বাসের শেষ স্টপে নেমে মালতী এমন শীত-শীত সন্ধের অন্ধকারে মাটির পথে হাঁটবে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি! সেই বাড়ি—যাকে আজ দুপুরে একটা ভয়ঙ্কর ঝোঁকের মাথায় পিছনে রেখে এমন করে বেরিয়ে পড়েছিল!......

পা দুটো সরু কাঠির মতন হয়ে গেছে বাবার। জানালা দিয়ে দেখতে পেল মালতী। 'মা, বাবা কেমন আছে আজ?'

মা বিরক্তিতে ভেংচিয়ে উঠল যেন। 'কেমন আছে গিয়ে ত্যাখ। রোজ রোজ তোর খবরদারি ভাল লাগে না।'

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল মালতী। সকাল হতে না হতেই টাকা ধার করতে গিয়েছিল কলোনীতে। গিয়ে একটা পয়সাও পায়নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বাবার কাছে এল। 'বাবা, কেমন আছ?'

'তুই সকালেই কখন বেরিয়ে গেলি দেখলাম না। আমার তো আর একটাও ওষুধ নেই। এবার তো কিনতেই হবে। নতুন ওষুধটা চারদিন ধরে পড়ছেই না পেটে।'

'আমি জানি বাবা। দেখছি।'

'দেখছি আবার কি?' মা চেঁচিয়ে উঠল। 'ওষুধের জন্যে দেখতে হবে না। ও থাক, এখন রান্না-বান্নার ব্যবস্থা কর। এতগুলো পেট চলবে কি করে?'

'গিয়েছিলাম তো মা!'

'কোথায় গিয়েছিলি তা কি জানি না? কলেজে তো যেতে পারছিস না, তাই প্রাইভেট পরীক্ষা দিবি তার ব্যবস্থা করতে!'

'কে বলল!' মালতী অবাক।

'কেন, শিবানী বলে গেল। ও তো কত করে বলে গেল তোকে ওর সঙ্গে বেরুতে। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে কোথায় হাতের কাজ আছে, বেশ কিছু টাকা হবে। গেলি না কেন? তুই নাকি টিউশানি করে টাকা জমিয়ে পরীক্ষা দিবি!'

'না মা, ভুল কথা।' ঠাণ্ডা গলা মালতীর।

'তা হলে শিবানীর সঙ্গে যা! ও কত টাকা আনে! একাই সংসারটা কি রকম চালাচ্ছে!'

মা জানে না শিবানী কি করে! মালতী ভিতরে আঁতকে উঠল।

'যা না মা, চাকরী কর, নাইটে পড়বি, প্রাইভেটে দিবি। ভাই বোনদের একটু ত্মাখ মা। আমি তো আর পারলাম না!' মায়ের স্বর ভিজে গেল মুহূর্তে।

'বাবা!'

অঘোরবাবু তাকালেন মেয়ের দিকে।

'শিবানীর সঙ্গে যেতে বোলো না আমাকে, তোমরা আর ফিরে পাবে না।' প্রায় ফিসফিস করে বলে ঘর থেকে উঠে এল মালতী। বাইরে এসে দাঁড়াল। ত্নচোখ জলে ভর্তি। সকালেই টাকা ধার করে বাজার নিয়ে আসার কথা। বাড়ির বড় মেয়ের দায়িত্ব অনেক। বাজার নেই। আজ রান্না হবে না। এরকম মাঝে মাঝেই হয়। আজও। মালতী চুপ করে বারান্দায় বসে রইল।

'বসলি কেন? একবার যা শিবানীর কাছে!'

'একটু ভাবতে দাও মা। দেখি যদি শিবানীর কাছেই কিছু টাকা পাওয়া যায়।' কিছু সময় বসে থেকে মালতী শিবানীর কাছে চলে গেল।

'কি রে! যাবি?' শিবানীর মুখ উজ্জ্বল।

'আমাকে কয়েকটা টাকা দে।'

'তা না হয় দিচ্ছি, চল। ত্মাখ, কোন ভয় নেই। ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়াব, লোক আছে, চিনে নেবে।'

মালতী হঠাৎ কঠিন চোখে তাকাল শিবানীর দিকে। 'তারপর?'

'বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে কসবা মেন রোড গেছে। ওটা ধরে একটু ভেতর দিকে গেলেই আর কেউ বুঝতে পারবে না। খালি কুঠি অনেক পড়ে আছে। শুধু একবার ঘুরে আসা!'

'তুই যাস?'

'ডেলি!' শিবানী থামল। 'তোর চেহারা বেশ ভাল মাইরি! বেশী পয়সার হোটেলেও যেতে পারবি। একদিন গিয়ে ত্মাখনা! মাসিমা-মেসোমশাইদের কি কষ্ট বল তো?'

মালতী স্থির তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি অন্যমনস্ক, সুদূর। ত্নপাশের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

'কি! যাবি?'

'তুই আমায় কয়েকটা টাকা দে।' মালতী তখনো অন্যমনস্ক।

'নিয়ে যা। আমার সঙ্গে যাবি তো তাড়াতাড়ি আয়!'

'তুই চলে যাস। বালিগঞ্জ ষ্টেশন তো? আমি চিনি?'

টাকা নিয়ে মালতী চলে এসেছিল। তারপর? দুপুরে সামান্য কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বালিগঞ্জ যায় নি। ভয়? লজ্জা? মালতী চলে এসেছে নিজেদের পাড়া ছেড়ে হাওড়া ষ্টেশনে। এই প্রথম একা একা সে এতদূর বেরিয়েছে। প্রথম সে এমন একজন পুরুষের সংগে ঘুরছে! কিন্তু বাড়ি ফিরে কি হবে? মা যে টাকা চাইবে! শিবানীর কটা টাকা তো সকালেই শেষ! এখন গিয়ে কি বলবে? তাকাল সুমিতের দিকে। শিবানী আগে যা সব কথা বলেছে লোকটা তো একটুও সে রকম নয়! কেমন এক গভীর মায়ায় আকর্ষণ করে সুমিত ওকে! কি ভদ্র বুদ্ধিমান লোকটা। এর কাছ থেকে টাকা চাইবে কি করে? বরং আমার জন্যে কত খরচ করল? কি পেল ও? শিবানী যে বলে……

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মালতী।

'কি হল?' চকিতে ফিরে তাকাল সুমিত।

মালতী নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল সুমিতের দিকে। বাড়ি ফিরবে ফাঁকা হাতে। মায়ের সামনে? দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে মালতীর। দু'চোখের অশ্রু স্বতঃস্ফূর্ত।

'কাঁদছেন কেন?' সুমিত অবাক।

'আমার মানি ব্যাগটা কোথায় পড়ে গেছে!'

'কখন!'

'ওখানে নদীর ধারে। একটা পয়সাও যে নেই!'

সুমিত তাকিয়ে থাকল মালতীর দিকে। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি কিছু, নিয়ে যান। কত ছিল?'

'পঞ্চাশ টাকার মত।'

'তা হবে।' সুমিত পকেট থেকে টিউশনির পড়ে-থাকা বাকি টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে মালতীর সামনে ধরল।

'না না দেবেন না! আপনার টাকা—'

'বেশ তো, একসময়ে ফেরত দেবেন। পরে দেখা হবে তো।'

মালতী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কেমন সরল নির্বিকার মনে হল সুমিতকে। 'বাঃ, কি করে ফেরত দেব! ঠিকানা দিন!'

হাসছে সুমিত। এক টুকরো কাগজে ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখে বলল, 'নিন।

তবে ব্যস্ত হবেন না। পুরো টাকাটা তো আপনাকেই বাড়িতে ফেরত দিতে হবে! সময় হলে দেবেন।'

মালতী ভয়-মেশানো অভিভূতের মধ্যে টাকা ক'টা হাতে নিল। সেই ঠিকানাটা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে যত্ন করে রাখল। 'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে ব্যাপারটা।'

'ওসব কথা ছাড়ুন তো। এমনি দেখা করছেন কবে, বলুন?'

মালতী এই মুহূর্তে কোন উত্তর দিতে পারছে না। স্মিতকে অপলক দেখছে। শিবানী যাদের কথা বলে এ তো সে নয়।

'কি দেখছেন? বলুন, দেখা হবে তো?'

'আসব।' বলেই মালতী মাথা নোয়ালো। শব্দটা স্বরে জড়িয়ে অস্ফুট হল।

ভবানীপুর থেকে বাসে করে ফিরল মালতী। রাত হয়েছে। বেশ কিছুটা মাটির রাস্তা পেরিয়ে অন্ধকার গলি। নোংরা জল-কাদায় গলি পিছল। চারপাশে পচা জঞ্জাল-এর দুর্গন্ধ। ওদের ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল। টালির চালা ঘর। আলকাতরা বোলানো দরমার দেয়াল। বাইরের দরজার সামনে জল। একটু আগের বৃষ্টিতে আরও জল ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। হয়ত ঘরের মধ্যেও!

মালতী কড়া নাড়ল।

'কে, খুকি এলি?'

'হ্যাঁ।'

ডিবের মুখ ফুটো করে ছেঁড়া কাপড়ের সলতে-জ্বালা কেরোসিনের লণ্ঠন হাতে মা দাঁড়ালেন 'এত রাত করলি কেন? অবশ্য শিবানীও ফেরেনি।'

'তুমি কি ওর বাড়ি খুঁজতে গিয়েছিলে?' মালতীর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত।

'না, বুলানকে পাঠিয়েছিলাম।' মা থামলেন। 'টাকা পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ মা।' মালতী মাটির দালানে এল। 'বাবা কেমন আছেন?'

'ভাল। এই ঘুমিয়েছে। তোর কথা বার বার জিজ্ঞেস করছিল'রে।' মায়ের স্বর গভীর স্নেহে, স্বস্তিতে সিক্ত।

মালতী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকা বের করে মায়ের হাতে দিল। 'নাও।'

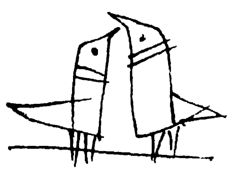
'পঞ্চাশ!' মা খুলেই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। লণ্ঠনে তেল নেই, তবু সলতেটা বাড়িয়ে দিলেন। এখন অনেক আলো। উজ্জ্বল আলোয় মায়ের

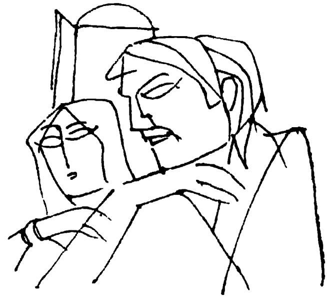
মুখের পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির হাসি চোখে পড়ল। 'এই তো ত্থাখ, তুই শিবানীকে যা তা ভাবিস। ত্থাখ তো, ওর জন্যেই তো হল! ও ফিরেছে? একবার খোঁজ নিয়ে আসতে পারতিস!'

মালতী আর কোন কথা বলল না। ধীর পায়ে পাশের ঘরে চলে এল। দরমার দেয়ালের পার্টিশানে মাটি লেপা। বাবার ঘরে ভাই-বোনেরা শুয়ে আছে। মালতী তক্তপোষের ওপর বিছানায় বসল। বড় ক্লান্ত ও। মাকে টাকা ক'টা দেবার সময় সুমিতের ঠিকানা লিখে-দেওয়া কাগজটা বেরিয়ে পড়েছিল। চিরকুটটা হাতে নিল। পাশের ঘরে মা খুশীতে বাবাকে ডাকছেন। কানে আসছে কথা।

মালতী চিরকুটটা সামনে মেলে ধরল। পড়তে চাইছে···একবার···দুবার··· তিন···বার। কিন্তু কিছুই দেখতে পাঁচ্ছে না। দুচোখের তারায় কখন মোটা অশ্রুর আস্তরণ। সব সাদা। তবু মালতী কি যেন খুঁজছে! কি যেন দেখতে চায়! কি? একসময়ে কয়েক ফোঁটা জল কাগজের ওপর পড়ল। অসহায় মালতী সামনের নোংরা বালিশে মুখ ঢাকল।

কান্না-কাঁপা হাতের মুঠোয় সুমিতের দেওয়া ভিজে চিরকুটটা এবার একেবারে দলা পাকিয়ে কুচি কুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেয়।





হিসেব নিকেশ

কাশতে কাশতে বারত্নরেক বমি করার পর হঠাৎ হেঁচকি তুলে তারাপ্রসন্ন মারা গেলেন।

কনকনে ঘন শীতের সন্ধে। একটু আগেই লোডশেডিং-এ কারেন্ট চলে গেছে। অন্ধকারের মধ্যেই একটা বাতি কোনরকমে এপাশ-ওপাশ হাতড়ে বের করে জ্বেলে বাবার বিষন্ন মুখ দেখছিল বিনয়। এরই মধ্যে কাশি-বমি—সব শেষ!

কষ্ট থেকে আরাম দেওয়ার জন্য বিনয়ের ডান হাত বাবার বুকের ওপর ধরা ছিল। এই মুহূর্তে ঝুঁকল বিনয়। বাবা কি সত্যি বেঁচে নেই! হাতের কনুই, কপাল ছুঁলো বিনয়। তারপর গলা বুক। সব ঠাণ্ডা। বাতির টিমটিমে আলোয় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিনয়ের দিকেই ঈষৎ এক পাশ হয়ে গেছে বাবার মুখ। বাতির আলোতেও বিনয়ের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বাবার মুখ হলদে। নাকের ডগা যেন বেঁকে গেছে। শীতল ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক। চোখের পাতা সম্পূর্ণ বোজেনি।

বিনয় বাবার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ, নিঃসাড় বসে রইল।

এই মুহূর্তে বিনয়ের চারপাশে কেউ নেই। গত বছর মা মারা গেছে। ভোরে রান্না-বাড়া শেষ করে বিনয় যখন ফ্যাক্টরীতে বেরুবার জন্য তৈরী হতে থাকে, তারই মধ্যে দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি আসেন। ওভারটাইম খেটে সন্ধের একটু আগে ফিরলে পিসি চলে যান। বাবার অসুস্থ হয়ে বিছানা নেওয়া থেকে এটাই এখন প্রতিদিনের নিয়ম হয়ে গেছে।

আজও বিকেল তখন সন্ধের গায়ে লাগতে শুরু করছিল, বিনয় ফিরেছে।

পিসিকে বাড়ি পাঠিয়ে বিনয় গা ধুয়েছে। তখনো কারেণ্ট চলে যায় নি। স্টোভ জেলে বিনয় চা করতে বসবে ভাবছিল, হঠাৎ বাবা ডাকল, 'খোকা, একবার আমার কাছে এসে বোস তো, কথা আছে।' গলায় চাপা কাশির ঘড়ঘড় শব্দ।

বাবার কথায় বিনয় সামনে এসে বসেছিল।

বাবা একভাবে বিনয়ের মুখে দৃষ্টি রেখে কি যেন দেখছিল। অপলক, নির্বাক।

'বাবা, কিছু বলবে?'

বাবার দু' চোখে জল। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারেণ্ট চলে গেল। বিনয় বুঝতে পারছিল, বাবা ওকে কিছু বলতে চায়। বাবার হাতটা বিনয়ের হাত ছুঁয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি। কারেণ্ট চলে যেতে বিনয় বাতি খুঁজে জেলেছে। ততক্ষণে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিদ্রিত পিতাকে দেখছিল বিনয়। তখন আর ঘুম ভাঙাতে চায়নি। হঠাৎ বাবা জেগে উঠে বিনয়কে কিছু বলতে যাচ্ছে, ভয়ংকর এক কাশি বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে। বাবা উঠে বসেছিল মুহূর্তের মধ্যে। বিনয় বাবার বুকে হাত রাখে। তারপরেই সব শেষ।

মৃত পিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিনয় কথাগুলো ভাবছিল। বিনয়ের হঠাৎ মনে হল, বাবার মুখ কত তৃষ্ণার্ত! বাবা কি একটু আগে জল চাইছিল? নাকি বাবার কোন কষ্টের কথা জানাতে চেয়েছিল? মুমূর্ষু মানুষের মুখে গঙ্গাজল দিতে হয়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হয়—'গঙ্গা নারায়ণঃ ব্রহ্মঃ'। ওর খুব ছোটবেলায় এক জ্যাঠামশাই মারা যাবার সময় বাবা শিখিয়ে দিয়েছিল এসব।

বিনয় হঠাৎ ভিতরে কেঁপে উঠল। পিসি নিজের জন্য একটু গঙ্গাজল এনে রেখেছে ঘরে। এখন কি একটু গঙ্গাজল দেবে বাবার মুখে? মন্ত্রটা কি কানের কাছে একবার বলে নেবে? বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় অদ্ভুত এক অসহায়তা বোধ করল। জল খাবে কে? বাবার মন্ত্র শোনারই বা শক্তি কোথায়? সমস্ত শরীর এখন রুদ্ধ, স্তব্ধ। বাবা কত একা!

বিনয়ও তো একা! হঠাৎ কথাটা মনে হতেই বিনয় ভিতরে চমকে উঠল। বাতির আলো থেকে চোখ সরিয়ে অন্ধকারে ছড়িয়ে দিল। এত অন্ধকার ও বোধহয় কোনদিন দেখেনি। এমন অপরিচিত অন্ধকার বিনয়কে হঠাৎ ভয়

দেখাল। ছোটবেলায় বাবার কাছে ভয়ের গল্প শোনার সময় যেমন শুনতে শুনতে কখন যেন বাবার কোলের কাছে ডুবে যেত, সেইভাবে বিনয় বাবার অনেক কাছে চলে এল। বাবার শরীর ছুঁয়ে থাকল।

মা বলত, 'কখনো মরা মানুষের শয্যা ছেড়ে উঠতে নেই রে খোকা। সব সময় ছুঁয়ে বসে থাকতে হয়। উঠলে লোহার কিছু জিনিস ছুঁইয়ে রাখতে হয়।' মায়ের মড়া ছুঁয়ে থেকেছিল বিনয় শ্মশানে চিতায় তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। ছুঁয়ে থাকতে কেমন কান্না পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, মায়ের স্নেহ বুঝি এই রকম!

বাবাও কি সেইভাবে কাছে ডাকছে! বাবাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে মনে হাসল বিনয়। মরা মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই! বিনয় যেন ভূতে বিশ্বাস করে ফেলছে!

একটু নড়ে বসল বিনয়। চাপা শীতে ভিতরটা কাঁপল একবার। সিগারেট খায় ও। কিন্তু এখনি সব যেন বিস্বাদ। বাবার বিছানার ধারে হাত ঘষল। আজই সব বদলে নতুন পোষাক পরিয়েছিলেন পিসি বাবাকে। বাবা অনেকটা সুস্থ ছিল। তাই জামা. কাপড়, বিছানার চাদর, মাথার আর পায়ের বালিশের ওয়াড়—সব বদলে দিয়েছেন। কম্বলটাও কাচা। অফিস থেকে ফিরে বাবাকে দেখে খুব ভাল লাগছিল বিনয়ের। ছোট বোন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাবাকে একদিন এরকমই দেখে গেছে। বড় বোন ভিলাই-এ থাকে। চিঠিপত্রে সব খবর রাখে। শেষ চিঠিতে জানিয়েছে—সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে কদিন ছুটি নিয়ে এসে এখানে থাকবে। বিনয় তাই নিশ্চিন্ত হচ্ছিল।

কিন্তু আজ! বিনয় দিদিদের কথা ভাবতে ভাবতে কেন যেন স্থির তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল বিনয়ের, কোন গভীর স্নেহ-ভালবাসায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখ ঠিক এইরকম! কিছুদিন আগেও তা দেখেছে!……

'খোকা!' কাজে বেরুবার মুখেই বাবা ডাকল বিনয়কে। 'তোর খুব তাড়া আছে?'

'কেন?' বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় বলল।

'আমার কাছে একটু বস না।'

পিসি তখন বাবার জামা-কাপড় কাচতে বসেছিলেন কলঘরে। বিনয় দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'কেন, তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?'

বাবা হেসে উঠল। 'না রে না, দেখছিস না, কি ভীষণ ইমপ্রুভ করেছি আমি। ডাক্তারও তাই বলে গেলেন।'

'তবে!'

বাবা কয়েক মুহূর্ত বিনয়কে দেখল। বলল, 'তুই একটা কাজ কর তো। ওই ওপরের তাকে কুষ্ঠিটা আছে, একবার দে তো বাবা।'

'কোথায়?'

'ওই যে, গ্যাখ না। ওখানটা ঝুলে-নোংরায় ভর্তি হয়ে আছে।' বাবা আঙুল দিয়ে দেখাল, 'আমার কুষ্ঠির পাশেই তোরটা আছে। ওটা থাক।'

'এটা দিয়ে কি করবে?' কুষ্ঠি খুঁজতে খুঁজতে বিনয় জিজ্ঞেস করল।

'এমনি দেখব। উঁহু, ওটা নয়। আমারটা তো গাছকুষ্ঠি—বেশ বড। হাত দিলেই বুঝতে পারবি।'

বাবা মাসে মাসে গণনা-করা কুষ্ঠিকে বলত গাছ-কুষ্ঠি। বিনয় কুষ্ঠি বের করে বাবার হাতে দিতে দিতে বলল, 'তুমি শুধু শুধু আজেবাজে কথা ভাব। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করে।'

'ভয়!' বাবা হাসল। খোলা কুষ্ঠির দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'খাতার সব পাতা শেষ হয়ে গেলে কি আর ভয় থাকে?' হঠাৎ খোলা অংশটা বন্ধ করে বিনয়কে বলল, 'থাক, এখন দেখব না। তোর তো অফিসের তাড়া আছে, যা, এটা তোকে আর তুলে রাখতে হবে না। আমার মাথার বালিশের নীচেয় থাকবে।' বিনয় ভিতরের ভীত আড়ষ্টতায় অফিস যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে বাবা গভীর স্নেহে বলল, 'সাবধানে যাবি। খুব সাবধানে কাজ করবি বাবা। সময় বরাবর মানুষের ভাল যায় না।'……

সেদিন সেই হলদে পাকানো লম্বা কাগজটার শেষ পাতায় কি এই লেখা ছিল? অকারণে সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। বাবার মাথার দিকে ঝুঁকে বালিশের নীচে হাত ঢোকাল। পেয়ে গেল পাকানো কাগজটা। কি আছে এতে! কিছুটা খুলে বাতির আলোয় মেলে ধরল। বিনয় অবাক হয়ে গেল। হলদে কাগজটার শেষের খানিকটা অংশ বাবা নিজেই কবে যেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে! কেন? শেষটায় কি ভুল ছিল? শেষটা সম্পূর্ণ মিথ্যে, নাকি মেলাতে পারেনি বলে বাবা রাগ, অভিমান, আফশোষে ছিঁড়ে ফেলেছে? কার অক্ষমতা? বাবার নিজের, না এই হলুদ রঙের নানান চিত্র-বিচিত্র করা রহস্যময় কাগজটার?

বিনয় হাতের খোলা কাগজটা মেঝেয় রাখতেই মুড়ে গুটিয়ে গেল। অদ্ভুত শূন্য মনে কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে দেয়ালের ওপরের তাকের কোণে হাত রাখল।

…'এই খোকা, নিজের কুষ্ঠি কখনো দেখবি না। বারবার দেখা খুব খারাপ।' মা প্রায়ই বলত। এই মুহূর্তে মনে হল, পাশের ঘর থেকেই মা যেন চীৎকার করে ওকে বারণ করল!

কিন্তু কেন দেখবে না! বড় হবার পর মা একবার দেখিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। তখন কিছুই বোঝেনি বিনয়। বোঝার এতটুকু চেষ্টাও করেনি। এখন দেখায় ক্ষতি কি?

বিনয় একসময়ে বাতির আলোয় ওর কুষ্ঠিটা মেলে ধরল। বাবার কুষ্ঠির মত বড় নয়। হাত-চারেক লম্বা হবে। হলদে কাগজের ওপর লাল কালির সরু লাইন টানা! লাইনগুলোর মাঝখানে কালো কালির কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে লেখা বিচিত্র রহস্যময় কথা। বিনয়ের এখন বয়স কত? পঁয়তিরিশ! শেষ থেকে খুলতে খুলতে চোখ বুলোচ্ছে বিনয়। বাতির অস্থির আলোয় লেখাগুলো জটিল দুর্বোধ্য ঠেকছে। কিন্তু পঁয়তিরিশ বছরটা চোখে পড়তেই বিনয়ের দৃষ্টি থেমে গেল! কি ভেবে চমকে উঠল। সারা শরীরে কয়েক মুহূর্ত জমাট ঠাণ্ডার মত তীব্রতম শিহরণ। সব রক্ত বুঝি জমে গেছে। হঠাৎ বিনয়ের হাত থেকে কাগজটা মুড়ে পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। যেন দম-বন্ধ-করা ভয় ওর বুক-গলা চেপে ধরল। বিনয় ভয়ে কাঠ! কি এক অস্বস্তি, অসহায়তা ঘরের চারপাশের অন্ধকার থেকে চুঁইয়ে বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে ওকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে! এমন ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে কেঁপে ওঠা!

বিনয় বাবার দিকে তাকাল। বাবার মুখ দেখে মনেই হচ্ছে না বাবা বেঁচে নেই। ভয়ংকর যুদ্ধ করেছে বাবা বাঁচার জন্য, পারেনি। মানুষ পারে না। পারে না বলেই মানুষ ছটফট করে, কাঁদে, সারা জীবন সীমাহীন অস্থিরতার মধ্যে কাটায়। বাবার মৃত্যুতে বিনয় কাঁদছে না। সহজে কান্না আসে না ওর। বড়দি ছোড়দি থাকলে কাঁদত। কিন্তু এখন বিনয়ের নিজের মধ্যেই কান্নার মত কিছু যেন ঠেলে উঠছে। নিজের অসহায়তার জন্য? এত নিঃসঙ্গ কেন? আবার বাবার মৃত মুখ চোখে পড়ল। ও কি পাগল হয়ে যাবে?

দ্রুত উঠে দাঁড়াল বিনয়। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়াতে জড়াতে প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। রীতিমত

হাঁপাচ্ছে ও। এ-সি কারেন্ট থাকায় সামনের পার্কের, রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্ট, এদিকে-ওদিকে দু-একটা দোকানের আলো নেভেনি। সন্ধের ধোঁয়া-মেশানো কুয়াশায় ঢাকা চারদিক। বিনয় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। একটা সিগারেট ধরাবে ভেবে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, সঙ্গে কিছুই আনেনি। লাইট-পোস্টটায় হেলান দিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল কিছু সময়।

চারপাশে চীৎকার, হুল্লোড়, সারাদিনের কাজ থেকে ফেরা জনতার স্রোত। ট্রাম-বাসের শব্দ, রেস্টুরেন্টের টেবিলগুলোয় খদ্দেরদের উচ্চহাসির কলরোল, পথচারীদের আলাপ—এসবের মধ্যে বিনয় যেন ডুবে গেল। রাস্তার ওপাশে পার্কের অন্ধকার রেলিং ছুঁয়ে এখানে-ওখানে কয়েকটা বেশ্যা দাঁড়িয়ে। কাছেই স্তূপীকৃত আবর্জনা। একটু দূরে পেচ্ছাবখানা। কুয়াশা-ঢাকা বেশ্যাদের জরি-শাড়িতে অন্ধকার চকচক করছে। ওদের শাড়িজামায় অঢেল সুখের ভান। অন্ধকারে ওদের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কয়েকজন পথচারী মানুষ সন্তপিত ব্যস্ত প্রেমিকের মত মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ দূরে মোড়ের মুখে শবযাত্রার ধ্বনি-'রাম নাম সত্য হ্যায়।'

বিনয় পার্কের অন্ধকার-ঢাকা পামগাছগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশ দেখল। শীতের আকাশ নক্ষত্রে ঠাসা। সামনেই একটি ট্রাম বিকট শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই বিনয় ওদিকে দৃষ্টি রাখল। অফিস যাত্রীরা ফিরছে। 'একি! মিনতি না!' ট্রাম থেকে নামা একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই বিনয় বিড় বিড় করল। সোজা হয়ে দাঁড়াল বিনয়। মেয়েটি এদিকে না এসে ক্লান্ত পায়ে ওদিকে এগোতেই বিনয়ের ভুল ভাঙল।

কিন্তু মিনতি আজই তো আসবে বলেছিল! বিড় বিড় করল বিনয়। আজই এখনি মিনতি আসতে পারে। কথাটা মনে হতেই বিনয় ঘরে ফিরে এল। বাবার মৃতদেহের সামনে নিশ্চুপ বসল। বাবার মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একসময়ে আধবোজা চোখের পাতা দুটি হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল বিনয়। বুকের ওপর থেকে কম্বলটা টেনে মুখ-মাথা ঢেকে দিল। বাতিটার দিকে তাকাল। মোটা একটা বাতি জ্বেলেছে, এখনি শেষ হবে না।

বিনয় নিঃসাড় বসে থেকে ভাবল, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ডেথ-সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে এখনি। আলো জ্বললে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসের একেবারে শেষের দিক। হাতে এখনি যাবতীয় খরচ করার মত এত টাকা নেই। আরও অনেক কাজ। ও একা কি করবে?

মিনতির কথা মনে হল। ও যদি আসে অনেক সাহস পাবে বিনয়! মিনতি কি আজ আসবে?

আসবে নিশ্চয়ই। বিনয় মনে মনে বলল। কদিন আসেনি ও। দিন-পাঁচেক আগে শেষ দেখা হয়েছিল ওদের অফিসের সামনে ছোট পার্কটায়।...

মিনতি কাছে এসে দাঁড়াতেই বিনয় বলল, 'আজ তোমাকে একটা কথা বলব মিনু।'

অফিস-ক্লান্ত মিনতি বিনয়ের দিকে তাকাল। মুখে শান্ত হাসির ছায়া।

'এবার একদিন সন্ধের পর আমাদের বাড়ি এসো। দুজনে খুব কাছাকাছি বসে গল্প করা যাবে। কতদিন আমরা একা হইনি, হিসেব আছে?' মিনতিকে নীরব থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'কি, একা একা আমার কাছে আসার ইচ্ছে নেই বুঝি?'

'বাবা কেমন আছেন?' মিনতি প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল।

'ভীষণ ভাল। বাবা তো উঠে বসছে এখন। পিসি বলল, একা একা উঠে বাথরুম পর্যন্ত গেছে দু-তিনবার। বাবা তো খুব তাড়াতাড়ি ইম্প্রুভ করছে। ডাক্তারবাবুরও তাই মত।'

'তাহলে তো ভালই।' মিনতির মুখ উজ্জ্বল। 'আজ তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথাটা তাহলে সেরে নেব।'

'তোমার তো মাঝে মাঝেই জরুরী ব্যাপারটা দেখা দেয়।' বিনয় শব্দ করে হাসল।

'না, সত্যি!' মিনতির মুখ ঈষৎ গম্ভীর, বিষণ্ণ।

'বেশ বল।'

'এখানে নয়, চল একটু হাঁটি। অফিসে একভাবে বসে টাইপ করতে করতে কোমর ধরে গেছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বিনয় বলল, 'আমাদের ফ্যাক্টরীর খবরটা আগে দি। এখনো কিন্তু কোম্পানি ট্রাইবুন্যালের রায় মানছে না। আবার বোধ হয় গোলমাল হবে।'

'তাতে কি?' মিনতি সোজা তাকাল বিনয়ের দিকে। একটু থেমে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের ব্যবস্থা করো। যত তাড়াতাড়ি পারো। আর টানতে পারছি না।'

'কি? চাকরী, না সংসার?'

'যদি বলি দুই-ই।' মিনতি বিনয়কে দেখতে দেখতে বলল।

'আমি যদি বলি ও ছাড়াও অন্য কিছু তুমি চাইছ?' বিনয়ের কণ্ঠস্বর একটু লঘু।

'কি?'

'সুখ।'

'তা কি খুব অন্যায় হবে? নাকি চাইলে স্বার্থপর বলবে আমাকে!' মিনতি স্থির তাকিয়ে আছে বিনয়ের দিকে। 'জীবনটার কত বছর চলে গেল বল? আর একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'আগে তো বলতে, ছেড়ে আসতে পারবে না! এখন?'

'তোমার কাছে থেকেও সকলকে দেখতে পারি, দেখার মত মন আমার আছে।' হঠাৎ থামল কিছু সময়। বলল, 'তোমার বুঝি এখনো সময় হয় নি? এত কথা বলছ কেন?' ঈষৎ রুক্ষ হয়ে গেল মিনতির গলা।

অবাক হয়ে বিনয় বলল, 'বয়স আমারও হয়েছে মিনু। কিন্তু একসঙ্গে থাকার দায়িত্ব অনেক। আর একটু ভাবতে দাও, সময় দাও।'

'এখনো সময়?' মিনতি অবাক হয়ে তাকাল বিনয়ের দিকে। কি ভেবে বলল, 'ভুলে যেও না, কোন কিছুর শেষ যখন আসে, তাড়াতাড়িই আসে। তখন আর সময় থাকে না কিছুরই।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ?'

'রাগ নয় বিনয়।' মিনতি হঠাৎ নীরব হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই বলল, 'সব কিছু সামলে নিয়ে এগোতে গেলে সামলানোই হবে, এগোনো হবে না। অগোছালো জীবন নিয়ে চলতে গেলে দেখবে চলতে চলতেই কখন জীবন বেশ কিছুটা গোছানো হয়ে গেছে। আমি সেই ভাবেই তোমাকে চাইছি।'

চুপ করে দুজনে হাঁটল কিছু সময়।

'তা হলে, আমাকে আরও একটু ভাবতে দাও।'

হঠাৎ একটা বাস সামনে এসে দাঁড়াতেই মিনতির চলা থেমে গেল। কি ভেবে কয়েক পা এগিয়ে গেল বাসের দিকে। 'চলি।'

'সে কি। এখনি!'

'ভাল লাগছে না।'

'কবে আবার দেখা হবে?'

মিনতির এগিয়ে যাওয়া মন্থর হল। 'বাবা তো ভাল আছেন। কদিন যাচ্ছি না। দিন-পাঁচেক পরে দেখতে যাব।' বাসে উঠে পড়ল মিনতি।

'শুক্রবার তো?' বিনয় বাসে-বসা মিনতিকে দেখছে।

মিনতি মাথা হেঁট করল। মুখে পরিচিত বিষণ্ণতার ছায়া।...

আজ শুক্রবার। অফিস থেকে সোজা আসবে হয়ত। বিনয়ের মনে পড়ল, সেদিন চাপা অভিমান নিয়ে চলে গেছে মিনতি। বাবার অসুখ, ফ্যাক্টরির কাজ—সব কিছুর ঝামেলায় অভিমান ভাঙাতে যেতে পারেনি বিনয়।

বিনয় মাঝে মাঝে অনুভব করে, মিনতির মধ্যে ভয়ঙ্কর এক চাপা অভিমান কাজ করে। ষোল বছর বয়স থেকে চাকরীর খোঁজে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছে। সরকারী দুধের ডিপো, প্রাইভেট টিউশানি, লিভ-ভেক্যান্সিতে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারী থেকে সুরু করে শেষে এক মার্চেন্ট অফিসের টাইপিষ্ট হয়েছে মিনতি। বিধবা মায়ের সংসারে ছোট ছোট চার ভাই-বোনকে বড় করে, মানুষ করতে করতে তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এখন সুখ চায়। এ সুখ বুঝি আশ্রয়, ভিক্ষের চাল! চারপাশে মিনতির ভাই-বোন-মায়ের মধ্যেও মিনতি একা, নিঃসঙ্গ। বিনয় যে ওর থেকেও একা! এই মুহূর্তে ওর কেউ নেই! কোথায় ওর আশ্রয়?

বিনয় বাবার কম্বলে ঢাকা শরীরের দিকে তাকাল। বাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় গভীর অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুলোল। মিনতির কথা ভাবতে ভাবতে এই মুহূর্তে কোন ভয়, শিহরণ নেই ওর, কিন্তু এক শূন্য, অসহায় নিঃসঙ্গতা ওর বুকের চাপা নিঃশ্বাসকে যেন শব্দময় করল।

'বিনয়।' বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে ডাকল মিনতি।

'কে!' বিনয়ের যেন সম্বিৎ ফিরে এল।

'আমি।' মিনতি বলল। 'আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না, একটু আলোটা দেখাও তো!'

বিনয় অন্ধকারের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে মিনতির সামনে এসে দাঁড়াল।

'দেখ, এই রাস্তা, ঘর এত পরিচিত, তবু অন্ধকারে একটুও ঠাহর করতে পারছি না!' মিনতির কণ্ঠস্বরে চাপা উচ্ছলতা। 'তুমি কি? একটা বাতিও সঙ্গে আনতে পারলে না!' বিনয়কে স্থির, নীরব থাকতে দেখে বলল, 'নাও, তোমার দেশলাই জ্বালো, দেখি। নাকি, সিগারেট-খোরের দেশলাই-এরও অভাব!' মিনতি গলায় হাসির ছোট ছোট শব্দ করতে করতে সামনে একপা বাড়াল।

বিনয় হাত ধরল মিনতির। 'এসো।'

'ইস্। তোমার গলার স্বর যেমন, হাতও তেমনি ঠাণ্ডা।' একটু থেমে বলল, 'এভাবে কথা বলছ কেন? দুর, আমার একটুও ভাল লাগছে না।' মিনতি যেন দাঁড়িয়ে থেকেই ছটফট করল।

'বাবা একটু আগেই মারা গেলেন।'

'সে কি!' এতক্ষণের উচ্ছল মিনতি আকস্মিক ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশে কঠিন স্তব্ধতা। বিনয়ের হাতের মুঠোয় মিনতির উষ্ণ নরম হাত শিথিল, ঠাণ্ডা।

'ঘরে এসো।' বিনয় এক সময়ে বলল।

মৃতদেহের সামনে মিনতি নিশ্চুপ বসে রইল। ঈষৎ তফাতে পাশে বিনয়। বাতির ক্ষীণ আলো কম্বল-চাপা লম্বা মৃতদেহের ওপর কাঁপছে। মোড়া হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মিনতি সেদিকে তাকিয়ে আছে।

নিঃসাড় নীরবতা ভাঙল বিনয়। 'দেখবে মিনতি, বাবার মুখ কিন্তু একটুও মৃতের মনে হবে না।' বিনয় বাবার মুখের ওপর থেকে আবরণ সরালো।

মিনতি একভাবে দেখতে দেখতে চাপা রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না। কত সুস্থ দেখে গিয়েছিলাম!' মিনতির দৃষ্টি স্থির। এর আগে অনেক মৃত্যু দেখেছে মিনতি। বাবার, দিদিমার, এক পিসতুতো ভাইয়ের, একটু কম বয়সে ঠাকুমারও। ভিতরটা শক্ত মিনতির। কাঁদছে না। ঘরের শীতল পরিবেশে কাঠ হয়ে বসে রইল।

'কাল পর্যন্ত বাবা বাঁচার কথা বলেছে! এমন কি একবার শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলেই কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবে ভেবে রেখেছিল।' বিনয় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

মিনতি বিনয়ের দিকে তাকাল। 'সবই নিয়তি।' বিড় বিড় করার মত বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ও।

'বাবা এটা বুঝেছিল।'

'কি?' মিনতি স্পষ্ট করে তাকাল বিনয়ের দিকে।

'খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে।'

'বলতেন বুঝি?'

'বরং উল্টোটাই বলত। কালও তাই বলেছে।' থামল বিনয়। 'হয়ত আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই!'

'তবে !'

'দেখ।' একটু দূরে পড়ে-থাকা কুষ্ঠিটা আঙুল দিয়ে দেখাল বিনয়। "এটা বাবা বালিশের নীচে রাখত, দেখত। একটু আগে মনে পড়তেই বার করে দেখি, শেষের দিকের বেশ খানিকটা কবে যেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বাবা !'

মিনতি কুষ্ঠিটায় হাত দিল না। অবাক হয়ে শুনছে।

'জান মিনু, আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। একটু আগে বাবার কুষ্ঠি দেখে আমার কিরকম কৌতূহল হল। এইমাত্র দেয়ালের তাকে খুঁজতে খুঁজতে আমারটাও পেয়ে গেলাম। মা এগুলো নিজের কাছে রাখত। মারা যাবার আগে কি ভেবে বাবার কাছেই রেখে গেছে। আমাকে কিন্তু মা কিছুতেই এসব দেখতে দিত না !' একটু থামল বিনয়। 'আগে একবারও তা দেখতে ইচ্ছে বা কৌতূহল দেখা দেয় নি আমার। অথচ আজ—'

'আজ দেখেছ বুঝি ?'

'দেখলাম।'

'কি ?'

'কি ঠিক বোঝাতে পারব না মিনু।' বিনয় থামল। হঠাৎ যেন একটু একটু করে হাঁপাতে শুরু করেছে। 'এখন তো পঁয়তিরিশ। যখন সদ্য-যৌবন ছিল, তখন এসব বিশ্বাসই করতাম না। প্রসঙ্গ উঠলেই হেসে উড়িয়ে দিতাম। একটা বিরাট মজা, কৌতুক, ভবিষ্যৎ নিয়ে টাকা ফেলে বাজি ধরার মত মনে হত গোটা ব্যাপারটা। এখন, এই মুহূর্তে বাবার সামনে নিজেকে হঠাৎ একা মনে হল। প্রথমে মনে হয়েছিল সাধারণ ভয়, যে কোন মৃত্যুর মত সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু না, মনে হল, শূন্যতা তো আমার কোনদিন ছিল না !' বিনয় যেন রীতিমত হাঁপাতে শুরু করেছে। 'এরই মধ্যে ওটা দেখলাম।'

মিনতি সামনে পড়ে থাকা বিনয়ের কুষ্ঠির দিকে তাকাল। আবার বিনয়কে দেখল।

যেন ক্লান্ত অসহায় বিনয় বলে চলেছে, 'জান মিনু, সেই অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ কোত্থেকে ভয়ঙ্কর ভয় ঢুকে গেল। আমি ভিতরে ছটফট করছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে ! ঠিক ঘুমের স্বপ্নের দেখা মৃত্যুর মধ্যে বোবায় ধরলে যেমন দম বন্ধ হয়, সেই রকম !'

'কেন, কি আছে ওতে ?' মিনতির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'আমি কি ছাই বুঝি যে তোমায় বোঝাব! এখন শুধু মনে হচ্ছে এই পাকানো হলদে রঙের হাত-চারেক লম্বা কাগজটা আমার জীবনের আদি-অন্ত আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আমি কিছুতেই ও থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। আর বয়স যত বাড়ছে, ওটা আমাকে টিবি জীবাণুর মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ করে দেবে। আমি কিছুতেই ও থেকে মুক্তি পাবো না।' বিনয়ের শেষ কথাগুলো ফিসফিস শোনাল।

বাবার মৃত্যুতে বিনয় কাঁদে নি, খুব শক্ত থেকেছে। কিন্তু এখনি যেন মনে হল, বিনয় নিজের মধ্যেও কোথাও যেন ভয়ঙ্করভাবে শেষ হয়ে গেছে। এমন ক্লান্ত শীতল হতে বিনয়কে কোনদিন দেখে নি মিনতি।

মিনতিরও কি যেন ভয় হল। বলল, 'তুমিই বা কেন দেখতে গেলে ওটা।' একটু থামল, 'দেখি ওটাতে কি আছে।' হাত বাড়াল মিনতি।

বিনয় কি ভেবে হঠাৎ যেন ছোঁ মেরে মেঝে থেকে কাগজটা তুলে নিল। 'না, তুমি দেখো না।'

মিনতির ভয়ের সঙ্গে চাপা বিস্ময় মিশল। 'তুমি সত্যি এত ভয় পাচ্ছ!' বিনয়কে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখে ওর কাছে একটু সরে এল। ঘনিষ্ঠ হল বিনয়ের। হাত ধরল। 'তুমি এরকম কোরো না। কেমন পাগলের মত হয়ে গেছ! আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।'

বিনয় উৎকণ্ঠিত মিনতির হাতের স্পর্শ অনুভব করল। ওর মুখ দেখল। দুচোখের জমি জলে চকচক করছে। 'মিনু, তুমি বিশ্বাস কর, আমি আর একদিনও একা থাকতে পারব না।' মিনতির হাত জোরে চেপে ধরল বিনয়।

'জানি।' মিনতি একভাবে বিনয়কে দেখতে লাগল। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মেশানো শব্দে বলল, 'এই মুহূর্তে তোমাকে দেখার পর আমিও আর ভরসা পাচ্ছি না।'

মিনতির হাত বিনয়ের হাতের মুঠোয় ধরা। কত মুহূর্ত কে জানে ওরা এভাবে চুপ করে বসে থাকল।

এক সময় মিনতি বলল, 'এভাবে বসে থাকলে তো হবে না। অন্য সব ব্যবস্থা করতে হবে তো?' শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর মিনতির।

'আমার কাছে কিন্তু এখনি এত খরচের পয়সা হবে না।'

'আমার কাছে আছে, দুজনের মিলিয়ে হয়ে যাবে, নাও।' মিনতি ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতের মধ্যে নিল। 'পাশের বাড়ির টেলিফোনে মাকে খবর দি। আমার ভাই এসে যাবে। তুমি বোস, আমি বরং দিদিদেরও টেলিগ্রাম করে আসি।'

'তুমি কতক্ষণ থাকবে ?'

'শেষ পর্যন্ত।' মিনতি বিনয়ের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর ডান হাতের দিকে তাকাল। 'ওটা কি হবে ? দাও।'

'না।' বিনয় যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই ঘাড় নাড়ল। বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবার মুখের সঙ্গে ওর নিজের মুখের অনেক মিল আছে। মা বলত, ঠাকুর্দার সঙ্গে ওর আরও বেশী মিল। বাবাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বিনয়ের একথা মনে হল। মনে হল বাবা একা নয়, মৃত্যু হলেও বাবা হারিয়ে যায় নি। একবার মিনতির দিকে তাকাল। তার পরেই কম্বলটা গলার কাছ থেকে তুলে মুখ মাথা ঢেকে দিল।

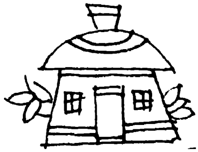
হাতের কাগজটার কিছুটা খুলল বিনয়। খোলা অংশটা বাতির দপদপে শিখায় ধরল।

'এই, কি করছ!' মিনতি হাত বাড়িয়ে বিনয়ের হাত ধরে টানার চেষ্টা করল।

'একটু পুড়িয়ে দিলে আমরা দুজনেই ভয়ঙ্কর সাহস ফিরে পাব। কি, তাই না ?' বিনয় মিনতির দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

হলদে কাগজটা পুড়ছে। লাল কালির লাইন টানা অংশের মধ্যে রহস্যময় জটিল শব্দগুলো পুড়ে কালো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। জ্বলন্ত আগুনের আভায় অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল, আলোকিত। মৃতদেহের ওপর লাল আগুনের দপদপে আভা। মিনতির ফর্সা, সুগঠিত মুখ, দৃঢ় পরিশ্রমী শক্ত শরীর লাল আলোয় নতুনের মত দেখাচ্ছে। বিনয় দেখছে মিনতিকে। মিনতির নির্ভয় দৃষ্টি বিনয়ের চোখে স্থির। দুজনের ছায়া পিছনের দেয়ালে জড়িয়ে যাচ্ছে।

খানিকটা পুড়ে যাওয়ার পর পঁয়তিরিশ বছরের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ জ্বলন্ত কাগজটা নিভিয়ে দিল বিনয়। বাকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। বাতির স্বল্প আলোয় ঘরের কোণ শীতল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কঠিন হয়ে আছে।





অনাস্বাদিত অন্ধকার

আমি, হীরু, গণেশ, সোমনাথ আর নিতাই। আমরা এই কজন তখন সদ্য হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশ করে মফঃস্বল কলেজে ভর্তি হয়েছি। গ্রামের ইস্কুলের ছেলে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। কো-এডুকেশন্যাল কলেজ হলেও আমাদের পুরোপুরি গেঁয়ো স্বভাবের জন্যেই কলেজের মেয়েদের দিকে তাকাতে রীতিমত ভয় পেতাম, কথা বলা তো দূরের ব্যাপার। তা ছাড়া অধ্যাপকদেরও সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা তটস্থ থাকতাম। তবে কলেজের বাইরে, আমাদের গ্রামের স্কুল-মাঠের সন্ধের আড্ডায় মেয়েদের সম্পর্কে যে গোপন মজার কথা একেবারেই বলতুম না, একথা বললে মিথ্যাচার করা হবে।

সেইরকম এক দুপুর-শেষের আড্ডায়, কলেজ থেকে ফিরে আমরা এক এক করে জড়ো হয়েছি। কলেজে সদ্য-ভর্তি-হওয়া মণিকা-ফণিকা এই রকম কি একটা নামের মেয়ের হাঁটা, ববচুল, কথা বলার ঢঙ নিয়ে ক্যারিকেচার করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ছি, হঠাৎ প্রায় দৌড়তে দৌড়তে হীরু এসে হাজির।

'কিরে, হাঁপাচ্ছিস কেন!' আমি বললুম।

'আরে দারুণ নিউজ!' বলেই ভিজে মাটির ঘাসের ওপর ধপ করে বসে পড়ল হীরু।

তিনজন বসেছিলুম—আমি, গণেশ, নিতাই। সোমনাথ তখনো এসে পৌঁছয় নি। ও একটু দূরে থাকে বলে সাইকেল নিয়ে বেরোয়।

হীরু কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'আহ: আমাদের পাড়ায় একটা যা মেয়ে এসেছে না মাইরি! একেবারে কুইন!'

'তোদের পাড়ায় মেয়ে! মানে!' গণেশ রীতিমত অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ মেয়ে! একেবারে খাস বালিগঞ্জের মেয়ে। বয়স বোধ হয় পনেরো-ষোলো হবে! কি সুন্দর দেখতে মাইরি, তোরা কল্পনাই করতে পারবি না।' বলে হীরু ইস্কুল মাঠের এদিক-ওদিক তাকাল। কাউকে না দেখতে পেয়ে হাতের মুঠোয় আড়াল-করা সিগারেটটায় কষে টান দিল একটা।

নিতাই আগেই একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, নিভে গেছে। হাত বাড়িয়ে হীরুর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটা আধপোড়া সিগারেট ধরালো। বলল, 'ভাল করে খবরটা দে তো হীরু। গুল মারছিস না তো?'

'ব্যাটা গুল মারলে মেরে শেষ করে দোব।' গণেশ বলল, 'মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে গুল মারবি না হীরু! খারাপ হয়ে যাবে!'

'ছাখ, স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান হীরালাল সরকার কখনো গুল মারে না।' একটা ভারিক্কি চালে সিগারেট ফুঁকে চলেছে হীরু। কিছু সময় নীরব, নির্বিকার থেকে যেন দর বাড়াতে চাইছে! হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানিস, একটু আগে আধঘণ্টার ওপর একটা সুন্দর দেখতে মেয়ের সঙ্গে রীতিমত কথা বলে এসেছি!'

'ভ্যাট্‌, সত্যি বলছিস?' নিতাই সিগারেটে জোরে কয়েকটা টান দিল, 'শালা, এমন অজ পাড়াগাঁয়ে একেবারে বালিগঞ্জ! ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি!'

'খুলে বলতো হীরু।' গণেশ উৎসুক চোখে তাকাল হীরুর দিকে।

আমি চিরকালই লাজুক, নিরীহ স্বভাবের, বন্ধুদের মধ্যেও বেশী কথা বলতে পারি না। বাড়ির ভয়ে সিগারেট ছুঁতেই পারি না, লুকিয়েও না। এ নিয়ে ওরা উঠতে-বসতে আমায় ঠাট্টা করে। হীরুর নতুন খবরে মজা পাচ্ছি। তাই এমনি জিজ্ঞেস করলুম, 'কার বাড়ি এসেছে রে হীরু? চাটুজ্জেদের বাড়ি? ওই বোষ্টম পাড়ার খেলার মাঠের ঠিক গায়ের পাকাবাড়িতে?'

হীরুর চোখ বড়। 'ও, তুইও এরই মধ্যে দেখে এসেছিস! আর এসে টুঁ শব্দটি করিস নি!'

'না, না, আমি এমনি আন্দাজে ধরলুম!'

'আহ্‌, চুপ কর তো কল্যাণ।' গণেশ আমাকে থামিয়ে দিল। 'বল্‌ হীরু, ডিটেল্‌স্‌-এ! একটুও লুকোবি না!'

হীরু বলল, 'কল্যাণ ঠিকই বলেছে। চাটুজ্জ্যে বাড়ির ব্রজদা, ওর কি রকম দূর সম্পর্কে বড় শালী এসেছে, তারই মেয়ে। কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। দেখা হয়ে গেল! আহ্‌, ফাইন দেখতে!'

'তোর ওই ফাইন দেখতে রাখ তো! যত্তো সব! তারপর কি হল বল্।' নিতাই সিগারেট শেষটুকু টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঠিক এই সময়েই সোমনাথ সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে এসে হাজির। আমরা সকলে ওর দিকে তাকালুম। হীরু বলা বন্ধ করেছে। সোমনাথ মাটির ওপর সাইকেল শুইয়ে রেখে আমাদের মধ্যে বসেই বলল, 'কি ব্যাপার রে! তোরা খুব মন দিয়ে কি যেন শুনছিস?'

'চুপ কর সোমনাথ। এখন হীরু যা বলে শোন্।' নিতাই বলল, 'মাঝখানে ফোড়ন-টোড়ন কাটিস না যেন, তোর যা অভ্যেস। হীরুদের পাড়ায় একটা সুন্দর মেয়ে এসেছে—এটুকু শুনে রাখ, ব্যাস্! তারপর।—'

হীরু বলল, 'মেয়েটা, আর ওর মা, সঙ্গে এক ছোট ভাই নিয়ে আজ দুপুরের গাড়িতে এসেছে। ব্রজদাও বোধ হয় সঙ্গে ছিল।'

'তুই নিজে দেখেছিস!' গণেশ বলল।

'না, আমি তো এই একটু আগে দেখলুম।'

'আলাপ হল কি করে তোর সঙ্গে!' নিতাই জিজ্ঞেস করল।

'মেয়েটা চাটুজ্জ্যেদের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল। আমার তো ওদের ঘাটের কাছ দিয়ে যাওয়া-আসার রাস্তা। আমি যাচ্ছি, হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি।'

'ওই প্রথম কথা বলল!' গণেশ জিজ্ঞেস করল।

'শোন্ না, আমি তো ওকে দেখে ট্যারা! ও রকম বিউটিফুল দেখতে, তার ওপর আমারই দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে, আমি তো থতমত। হঠাৎ মেয়েটা বলল, আপনি কি এদিকে থাকেন?'

'তারপর!' সোমনাথ, গণেশ, নিতাই তিনজনে একসঙ্গে ঢোক গিলে বলে উঠল কথাটা।

'আমি বললুম, হ্যাঁ। আমি ওই বাড়িটায় থাকি। মেয়েটা বলল, আপনাদের এইটুকু মাঠে বুঝি বল খেলা হয়? গোল পোষ্ট পোঁতা দেখছি?' হীরু থেমে থাকল কিছু সময়।

'কিরে বল্? তারপর তুই কি বললি?' নিতাই যেন হীরুর দিকে এগিয়ে এলো একটু।

'ও আবার কি বলবে। শালা, ওর নিজের সাবজেক্ট্ পেয়ে গেছে। এবার লাইন।' সোমনাথ হাসল।

'থাম তো সোমনাথ। তোকে বারণ করেছি কথা বলতে।' নিতাই চোখ পাকাল।

'সোমনাথ ঠিক বলেছে। বললুম, আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে তো এখানে খেলি! তারপর সে অনেক কথা। মোটকথা টানা আধঘণ্টা ধরে কথা বললুম। মেয়েটি গ্রামের কিছু জানে না, গ্রাম দেখতে এসেছে। দিন পনেরো থাকবে। তবে এমন বর্ষা-বাদলের দিন বাইরে বেরুতে পারবে কিনা, তাই চিন্তা।'

সোমনাথ বিরক্ত হল, 'তখন থেকে ছ্যাখ হীরু, তুই 'মেয়েটি' 'মেয়েটি' করে যাচ্ছিস। নাম জানিস নি এতক্ষণ আলাপ করে!'

নিতাই বলল, 'এটা ঠিক ধরেছিস তো সোমনাথ! হ্যাঁ, মেয়েটার নাম কিরে?'

'কি জানি। নাম জিজ্ঞেস করতে ভীষণ লজ্জা করল। মেয়েটা তো আর আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে এগিয়ে আসে নি, এমনি কথায় কথায় গ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছিল। হঠাৎ নাম জিজ্ঞেস করি কি করে বল্?'

আমি বললুম, 'যাই বলিস মেয়েটা কিন্তু খুব স্মার্ট বলতে হবে।'

'কেন। কি করে বুঝলি?' সোমনাথ তাকাল আমার দিকে।

বললুম, 'যে মেয়ে এমন অজ পাড়াগাঁয়ে এসে হুট করে আমাদের মত একটা ছেলের সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলে, আধঘণ্টা কথা বলে যায়, সে মেয়ে ভাই খুব চালাক! বেশ চালু তো নিশ্চয়ই!'

'না, না, চালাক হলেও কিন্তু কল্যাণ, তুই দেখলে বুঝতিস, একেবারে নিষ্পাপ মুখ মেয়েটার! কি চোখ! একেবারে পাখির মত! আর চেহারাখানা কি! একেবারে মাখনের মত।'

'আহা! মেয়েদের কত চেনো! বাইরে ওরা এই, ভেতরে কিন্তু—' সোমনাথ চোখ টিপল।

'এই কল্যাণ, তুই এমন 'চালু' বলে ছোট করিস না তো মেয়েটাকে! হীরুর লাগছে।' গণেশ হাসতে হাসতে বলল। 'ব্যাটা এরই মধ্যে প্রেমে পড়েছে মনে হচ্ছে!'

'প্রেম!' নিতাই শব্দ করে উঠল। 'ও মেয়ের যা বর্ণনা শুনলুম, ও হীরু-ফীরুকে পাত্তাই দেবে না! হোক প্রথম আলাপ। ওর জন্যে চাই কল্যাণের মত ছেলে। দেখতে খুব সুন্দর, ফর্সা, স্বাস্থ্য ভাল! হীরুটার তো আবার দাঁত উঁচু।'

আমি লজ্জা পেলুম। 'যাহ্ নিতাই, বাজে বকিস না। হীরুর ফিগার গ্যাখ। খেলোয়াড় ছেলে! মেয়েরা পছন্দ করে খুব।'

সোমনাথ হঠাৎ অভিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল। 'তা অবশ্য ঠিক, খেলোয়াড় ছেলেই মেয়েরা চায়। মেয়েটি বালিগঞ্জের তো!'

আমরা চারজনে ওর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলুম।

হীরু বলল, 'মেয়েটা কিন্তু কলকাতায় খেলা দেখে রে!'

'খেলা দেখায় না তো?' নিতাই ফোড়ন কাটল।

'যাহ্, বাজে বকিস না, নিষ্পাপ!' গণেশ বিড় বিড় করল।

'আহ্, ওকে বলতে দে—তুই বলে যা তো।' সোমনাথ দৃষ্টি দিয়ে গণেশ আর নিতাইকে ধমক দিলো।

হীরু কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্কের মতন ভেবে নিয়ে আগের কথার জের টেনেই বলল, 'আরে, ও বলল তো, দাদাদের সঙ্গে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখেছে বেশ কয়েকবার!'

'কিন্তু কি নামটা তুই জানতে পারলি না হতভাগা।' গণেশ এবার কৃত্রিম ধমক দিল। 'তোর কিছু হবে না রে হীরু। পাখি ধরতে জানিস না।'

'মনে হয় রাণী-টানী হবে। আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিল, ওর মা তো দেখলুম, ওকে 'রাণু' বলে ডাকল! ওই 'রাণু', রাণীর কোন একটা হবে।'

'দূর, ওতো ডাক নাম।' নিতাই বিরক্ত হল, 'ভাল নাম নিশ্চয়ই আছে। বালিগঞ্জের মেয়ে!'

আমি হঠাৎ বলে উঠলুম, 'কেন, রাণী নামটা তো বেশ ভাল রে! হোক পুরনো, কিন্তু রাণীর মত মেয়েকে 'রাণী' বলতে ভাল লাগবে না? আরও ছোট করে 'রাণু'! দারুণ।' বলেই জিভ আর টাক্‌রা মিলিয়ে আচার খাওয়ার আনন্দের মতন লালা টেনে টক্ করে একটা শব্দ করে ফেলেছি।

সোমনাথ হঠাৎ ঝুঁকে আমার থুতনি ছুঁয়ে টেনে টেনে আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'মান্তু রে! দারুণ বলেছিস। কল্যাণটাকে যত নিরীহ ভাবি, ততটা নয়, দেখছিস গণেশ! ব্যাটা সব লুকিয়ে রেখে ভিজে বেড়াল সেজে থাকে!'

আমরা সকলেই হেসে উঠলুম।

নিতাই কি ভাবছিল, বলল, 'বাজে কথা রাখ্ সোমনাথ। এখন ওই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এই হীরু, আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। ওই কলেজের পুঁটলির মত জবুথবু মেয়েগুলোর থেকে এ বরং ভাল।

এখন তো আমাদের গ্রামের মেয়ে—অন্তত কদিনের জন্যে তো হয়ে গেছে! আলাপ করি চল।'

হীরু বলল, 'চল না, আজ যাবি? এখনি!'

'এখনি!' সোমনাথ-গণেশ দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল। দু'চোখ ড্যাবড্যাবে।

'হ্যাঁ, এখনি। আলাপ হয়ে যাবে।'

'কি করে?'

'আসার সময় দেখে এসেছি, বাচ্চাগুলো বোষ্টমপাড়ার মাঠে টেনিসবল নিয়ে খেলতে নেমেছে। মাঠটা তো ঘাস-জলে নোংরা। ওদের সঙ্গে আমরাও খেলতে নামি চল।'

'তারপর?' গণেশ-সোমনাথ-নিতাই তিনজনে রুদ্ধশ্বাস বলে উঠল।

আমি বললুম, 'তারপর আর কি। মেয়েটিতো ওই মাঠের একেবারে ধারের বাড়িতে উঠেছে। হীরু বলছিল, খেলায় ভীষণ ইণ্টারেস্টেড। নিশ্চয়ই খেলা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তখন হীরু নিয়ে গিয়ে—।'

'আমার কিন্তু ভয় করে। যদি কিছু ভাবে।' গণেশ কৃত্রিম গলা কাঁপিয়ে বলল।

'আরে দূর,' হীরু সকলকে থামিয়ে দিল, 'মেয়েটা খুব চটপটে আছে। ব্রজদা এ সময়ে বাড়ি নেই। আমি ঠিক আলাপ করিয়ে দেব, চল। আমার সঙ্গে তো আগে কথাই বলেছে।'

নিতাই একবার আমার দিকে তাকাল। আমি গণেশের দিকে। সোমনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

হীরু আবার বলল, 'গিয়েই বল খেলতে নেমে যাব।'

হঠাৎ সকলে রাজি হয়ে গেলুম। সোমনাথ সাইকেল ধরে হাঁটতে লাগল। আমরা আগে-পিছে পাশাপাশি।

নিতাই বলল, 'হীরু, খেলতে নামার আগে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নি। দে তো দেশালাইটা। তা ছাড়া ওদিকটায় যাবার আগেই সিগারেট শেষ করে ফেলতে হবে। কে দেখে ফেলবে না হলে।'

ওরা সকলে সিগারেট ধরাল। আমি বাদ।

বোষ্টমপাড়ার মাঠ ছোট ছোট ঘাসে ভর্তি। এক পাশে বাঁশবন, আশ-স্যাওড়ার ঝোপ। আর একদিকে বড় বড় কচুরি পানায় ঠাসা মজা থানা,

এপাশটায় কয়েকঘর বসতি বাড়ি। তারই মধ্যে পাকা-দেয়ালের বাড়ি ব্রজদার। পেয়ারা, অশ্বত্থ, পাকুড, আম আর যজ্ঞ-ডুমুর গাছে বন হয়ে আছে মাঠের ওদিকের জলা জায়গাটা। চোরকাঁটা-গাছ ভর্তি। ব্রজদাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে অবহেলায় গড়ে-ওঠা খেলার মাঠ। মাঠের গায়ে টিনের ছাউনি দেওয়া দুখানা কুঠরির পোড়ো মেটে বাড়ি। অগোছালো পড়ে থাকে। ওর দেয়ালের গা বেয়ে একটা সুপুরি গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে। আজ সকালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে মাঠের মাঝখানটায়—যেখানে ঘাস উঠে গেছে—কাদায় প্যাচপ্যাচে। আমাদের থেকে একটু কমবয়সী কয়েকজন টেনিস বল নিয়ে নেমে পড়েছে খেলতে।

আমরা কথা বলতে বলতে দূরে ওই টিনের ছাউনির পোড়ো বাড়ির দালানে গিয়ে বসব বলে এগোচ্ছি। ততক্ষণে ব্রজদাদের বাড়ির ঘাটের সামনে এসে গেছি। নিতাই গণেশ অতি সন্তর্পিত দৃষ্টিতে ব্রজদাদের বাডির চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে। মেয়েটাকে খুঁজছে ওরা। আমার হাসি পেল।

আমি চাপা গলায় কিছু বলতে যাব, হঠাৎ হীরু প্রায় লাফিয়ে ওঠার মত বলল, 'এই! ওই তো বসে আছে রে!'

আমরা প্রত্যেকের ভিতরে যেন সত্যি কোন সাপ দেখার মতন চমকে উঠলুম। যেন কিছুই জানি না, শুধু হঠাৎ খেলার ইচ্ছে হয়েছে খেলতে আসছি, এই রকম একটা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গী ও কথায় ডুবে থেকে এগোচ্ছিলুম, হঠাৎ হীরুর চীৎকার করে ওঠার মত চাপা কথায় রীতিমত চমকে উঠলুম। আমাদের গোপন ভানটা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

'এই, দাঁড়িয়ে থাকিস না, অন্যকিছু ভাবতে পারে।' হীরু চাপা গলায় বলল, 'মেয়েটা ওদের খেলা দেখছে ওই বাদাম গাছের নীচে বসে। সঙ্গে ওর ছোট ভাইটা!'

'ভালই হল, আমরা তো ওদিকেই যাচ্ছি!' সোমনাথ বলল। ও যেন একটু বেপরোয়া!

'আমাদের ব্যাপারটা যদি বুঝতে পারে!' গণেশ ভয়ে ভয়ে বলল, 'লজ্জার ব্যাপার মাইরি। একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে হ্যাংলামো! ইস্ প্রেস্টিজ পাংচার।'

'বাচ্চা!' নিতাই ভেঙচাল। 'শালা, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। দেখে তোর বাচ্চা মনে হচ্ছে?'

'চুপ কর্ নিতাই। ও কিন্তু ভাবতে পারে আমরা ওর সম্পর্কে কথা বলছি।' হীরু দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিসিয়ে বলল।

আমরা কথা বলতে বলতে মেয়েটির দৃষ্টির সীমায় এসে গেছি। বুঝতে পারছি, ভীরু ধুকপুকে বুকের শব্দ নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই চাপা ভয়ে ভিতরে রীতিমত আড়ষ্ট।

হঠাৎ মেয়েটাই ডেকে বলল, 'এই যে হীরুবাবু, আপনারা খেলবেন নাকি।'

'ইস্ কি মিষ্টি গলা রে!' নিতাই বিড়বিড় করল।

'নির্ঘাৎ গান জানে।' গণেশ মেয়েটাকে দেখছে।

'রবীন্দ্র সঙ্গীত।' সোমনাথের গলায় যেন অব্যর্থ শব্দ। সোমনাথের দৃষ্টি মেয়েটির ভারী চুলের লম্বা বিনুনীতে আটকে গেছে।

হীরু, হঠাৎ ওর এমন নাম ধরে ডেকেছে বলে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আমরাও। আমি বললুম, 'এই হীরু, তুই এগিয়ে যা। তোর নাম ও জেনে গেছে।'

হীরু এগিয়ে গেল আমাদের ছেড়ে। এবার আমরা সামান্য একটু এগিয়ে মেয়েটার থেকে কিছু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। যেন মেয়েটাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছি না, ওই বাচ্চাদের খেলা দেখছি—এইভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকলুম।

হীরু বলল, 'আরে, আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?'

'এই তো ছেলেরা বলছিল। আপনার সঙ্গে তখন কথা বলছিলাম, ওরা দেখেছে।'

হীরু হাসল। 'আমরা ভাবছি একটু খেলতে নামব।'

'দারুণ ভাল হয়, খেলুন না, দেখি বসে বসে।'

'আপনি মোহনবাগানের খেলা দেখেন, আমাদের কি ভাল লাগবে? তাও-তো টেনিস বল।'

'তাতে কি? কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় তো টেনিস বলে কম্পিটিশান হয়।' মেয়েটি কুচোনো কচি থোড়ের মত সাদা দাঁতে হাসছে। 'আর, আপনি তো খুব ভাল খেলেন, ওরা বলছিল। আপনার ফিগার তো খেলোয়াড়ের।' মেয়েটি অদ্ভুত হাসতে হাসতে অকপটে বলল। তাকিয়ে আছে হীরুর দিকে।

আমরা কয়েক মুহূর্ত সন্তপিত দৃষ্টিতে নিষ্পলক। কি সুন্দর দেখতে মেয়েটা! সবুজ ছিট-ছিট টি-শার্ট পরেছে। রঙটা কি রকম যেন, সবুজের পাশে লাল

শালুক, নাকি রাধাচূড়া! ভিজে মুসুর ডাল বাটলে বুঝি এরকম রং হয়। মাথার চুল বেশ লম্বা, ঘন কালো, কোঁচকানো। আঁট-সাট শরীরে আমরা মেয়েটার কি যে দেখছিলুম, বলতে পারি না, তবে ফ্রকের নিচে পা পর্যন্ত অংশটায় কেন যেন নরম থোড় দেখছিলুম! কখনো বা আমাদের গ্রামের আটচালার ধারে শীতলা মন্দিরের মধ্যেকার সোনার মূর্তিটা ভেসে উঠছিল আমাদের প্রত্যেকের ভাবনায়।

এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হীরুকে। হীরু একবার আমাদের দিকে তাকাতেই সম্বিত এল। 'আমাদের গোটা ব্যাচটাই ভাল খেলে। ব্যাচ মানে আমাদের বন্ধুরা!' দূর থেকে একবার আমাদের দিকে তাকাল হীরু। 'আসুন, আলাপ করিয়ে দি।'

ছোট ভাইটি বসে রইল, মেয়েটি উঠে এল।

'এই দেখুন, এরা আমার বন্ধু। সব কলেজে একসঙ্গে ফাস্ট' ইয়ারে পড়ি।' বলে হীরু নাম ধরে ধরে পরিচয় করিয়ে দিল। আশ্চর্য! হীরু কেমন সহজ হয়ে গেছে মেয়েটার সামনে একেবারে প্রথম পরিচয়েই! স্পোর্ট'স্‌ম্যান বলেই বোধ হয়! আমরা কিন্তু লজ্জায় ভয়ে নুয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। আমি কখন যেন মেয়েটির কচি শালুক-ডাঁটার মত আঙুলগুলো দেখছি, বুঝি আর সবাইকে লুকিয়েই।'

সোমনাথ বলল, আপনার নামটা তো বললেন না!'

'আমার নাম সুতপা। সুতপা সেনগুপ্ত।'

'কিন্তু আপনার মা তো আপনাকে রাণু বলে ডাকছিলেন না?' হীরু যেন কোন ভুল সংশোধন করতে চাইল।

'ও!' সুতপা সেই রকম সুন্দর করে হাসল। 'ওই রাণী থেকে রাণু—ডাক নাম আর কি! আপনারা রাণুই বলবেন।'

'আপনি কি পড়েন?'

'সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেব।'

হীরু বলল, 'আপনি কিন্তু অসময়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। এত কাদা, বৃষ্টি। তার ওপর ভাদ্র মাস তো। গ্রাম তো একেবারে পচে যায়।'

সোমনাথ বলল, 'তাতে কি! এ সময়ে ইলিশ তপসে খুব উঠছে, খেয়ে যান। কলকাতায় তো বরফ দেওয়া, পচা!'

রাণু হাসল। বলল, 'থাকব তো দিন-পনেরো। আমার কিন্তু খুব ভাল

লাগছে। এমন গ্রাম কোনদিন দেখিনি তো! একেবারে ইলেকট্রিক পর্যন্ত নেই!'

নিতাই এতক্ষণ রাণুকেই দেখছিল। বলব, 'কিরে, খেলতে নামবি তো আয়। দেরী করে লাভ কি?'

হীরু বলল, 'এই কাদায় খেলছি, আমাদের খেলা শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো?' হীরুর কথার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন দাবি থেকে গেল।

মেয়েটি সুন্দর হাসল। সলজ্জ হাসি। মাথার বেণীটাকে বুকের ওপর রাখল। সদ্য-কৈশোর-উত্তীর্ণ আমরা কজন তখন স্থির।

'নিশ্চয়ই দেখব! আর আপনাদের দলটা তো দারুণ মনে হচ্ছে। সকলেরই বেশ স্পোর্ট্‌স্‌ম্যান ফিগার!' সুতপার সলজ্জ হাসির সঙ্গে দু'পাশের চিবুকে টোল স্পষ্ট হল।

আমরা হাসতে হাসতে চকিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। কি এক চাপা অহংকার আর খুশিতে যেন হাল্কা হয়ে গেছি মুহূর্তে। মনের মধ্যে উড়ছি তুলোর মত বা নীল আকাশের বুকে শরতের মেঘের মত, অথবা হয়ত সদ্য-আসা বসন্তের উড়াল উদ্দাম বাতাসের মত!

সোমনাথ বলল, 'বুঝতে পারছি আপনি ভীষণ খেলা ভালবাসেন।'

'ভালবাসি মানে!' রাণু চোখ বড় করল, 'কাল সকালে আসবেন, মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। মা ভীষণ ভালবাসেন খেলাধুলো—আমার থেকেও। আপনাদেরও ভাল লাগবে। আর দেখবেন, আমার মা খুব লিবার‍্যাল! এমনি কথা বলেও ভাল লাগবে।'

আমরা পাঁচ জনেই ভিতরে ভিতরে অবাক হচ্ছি তখন। ক্রমশ গেঁইয়া জড়তা ভীতু ভাবটা কেটে যাচ্ছে। 'রাণু খুব ভাল!' যেন গভীর মন্ত্রোচ্চারণের মত মনে মনে আমরা প্রত্যেকেই বিড়বিড় করলুম। কেমন সহজ অন্তরঙ্গভাবে কথা বলে। এতটুকু ডাঁট নেই! অথচ ডাঁট দেখানোর মত চেহারা, রূপ, কণ্ঠস্বর! মাত্র কিছু সময়ের আলাপেই নেমন্তন্ন করে বসল! খুব চটপটে মেয়ে! হঠাৎ আমরা সকলেই কেমন ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবী পেয়ে যাওয়ার আনন্দে, উৎসাহে রাণুর প্রতি গোপন আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম।

এতক্ষণ গণেশ আর আমি কোন কথা বলি নি। গণেশের কি হল, বলল, 'এই, মাঠে নেমে পড়্। আর দেরী করে কি হবে?'

'আপনি বসুন। আমরা খেলতে নামছি এবার।' বলেই হীরু, নিতাই,

গণেশ যেন একটু অস্বাভাবিকভাবে দৌড়ে মাঠের মধ্যে চলে গেল। সোমনাথ সাইকেল শুইয়ে প্যাণ্টের পায়ের দিক ভাঁজ করতে বসেছে। রাণুর সামনে আমি একা। এতক্ষণ অন্যদের কথার ফাঁকে লুকিয়ে-চুরিয়ে রাণুকে দেখছিলুম। এখন রাণুর সামনে একা হতেই কোথা থেকে এক স্তূপ লজ্জা ভয় আমায় ঢেকে দিল। রাণুর দিকে সোজা তাকাতে পারছিলুম না।

রাণুই বলল, 'আপনি খেলবেন না?' কি অদ্ভুত মোহ ভর্তি রাণুর গলা। আমাকে খেলতে বলছে, না কি খেলতে বারণ করছে, রাণুর সেই মুহূর্তের দৃষ্টি, মুখের ভাব আর কণ্ঠে বুঝতে পারলুম না।

'হ্যাঁ।' বলেই যেন কিছুটা অভদ্রের মত রাণুর সামনে থেকে সরে গিয়ে মাঠের মধ্যে চলে এলুম।

সেদিন রাণুর সামনে আমাদের কি হয়েছিল জানি না, আমরা প্রত্যেকেই পাগলের মত খেলেছিলুম। একসময়ে খেলার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না। কোন নিয়মকানুন মানি নি। ঘাস, মাটি-কাদায় আমরা সকলেই এমন কিম্ভুত হয়ে মাঠ ছেড়েছিলুম যে তখন মনেই হয় নি আমরা প্রত্যেকেই বল ছেড়ে আজ রেষারেষির মাথায় প্রত্যেককে কোন না কোন ভাবে জখম করেছি! সেদিন সন্ধেয় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খেলার সমালোচনায় মুখর হতে পারতুম, ভীষণ তর্ক করতে পারতুম, এমন কি আমাদের মধ্যে মারামারি হাতাহাতি ও পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কেউ কিছুই বলিনি। সেদিন যেন রাতের কোন অন্ধকার অতি সংগোপনে আমাদের রক্তে মিশতে শুরু করেছিল! কারোর ওপর কোন দোষারোপ করিনি। রাণু কখন মাঠ ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল বুঝতেই পারিনি। আমরা প্রত্যেকেই সন্ধে গভীর হয়ে ক্রমশ-নেমে-আসা অন্ধকারের মধ্যে যে যার প্রথম নক্ষত্র চোখে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম।

এর পর থেকে আমাদের গ্রামে রাণুর পনেরো দিনের থাকার মধ্যে অদ্ভুতভাবে রাণুর সঙ্গে আমরা পাঁচ বন্ধু ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলুম। একদিন রাণুর মা আমাদের খেলার গল্প শুনলেন, কলকাতার ভাল ভাল খেলার গল্প শোনালেন, চা খাওয়ালেন। রাণুর মায়ের সামনেই ব্রজদা আমাদের খুব একচোট প্রশংসা করলেন। আমরা কত ভাল ছেলে, কি বড় স্পোর্টস্‌ম্যান হতে পারি! আমরা দেখেছি, রাণু অবাক হয়ে শুনত আর আমাদের দেখত! রাণু ক্রমশ আমাদের খুব আপন হয়ে গেল।

কিন্তু রাণুর চলে যাওয়ার দিনটা যত কাছের হতে লাগল, আমাদের সকলেরই

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এমন কি কলেজেও যেতে ইচ্ছে করছে না তখন। অথচ আমরা রাণুর চলে-যাওয়া ঠেকাতে পারি না ভেবে অসহায় আক্রোশে নিজেদের মধ্যে দিন দিন বিরক্ত হয়ে উঠছি।

নিতাই বলল, 'দুর, কিচ্ছু ভাল্লাগছেনা রে হীরু। রাণু চলে যাবে!' বলেই সদ্য-ধরানো সিগারেটটাই ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। মুখ বিকৃত।

'কেন? তুই কি প্রেমে পড়েছিস?' হীরু টিপ্পনী কাটল।

'কেন, তুইও তো?' নিতাই চেঁচিয়ে উঠল।

সোমনাথ বলল, 'আমরা সকলেই। একরম মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব! ভোলা যায় মাইরি? ভেবে ছাখ তো, আমরা কজন কি'রকম গল্প, মজার মজার কথায়, আড্ডায় কাটিয়েছি কদিন!'

গণেশ বলল, 'ভাব্‌তো, ছোটবেলায় বাবা যদি ডবল প্রমোশান না দিত, আমি-রাণু এক ক্লাশে পড়তাম! একেবারে ক্লাশ-ফ্রেণ্ড! এবং ওর বয় ফ্রেণ্ড। রাণুকে আমি বলতে পারতুম, আর কদিন থেকে যাও রাণু।'

ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেও আমরা সকলেই বুঝতে পারছিলুম, একটা চাপা ক্ষোভ, হতাশা, অসহায়তা কি রকম যেন শূন্যতাবোধ আমাদের মধ্যে জমে উঠেছে। কিন্তু কিছু করার নেই! এক সময়ে বললুম, 'এই, একটা কাজ করলে হয় না?'

'কি?' গণেশ বলল। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে।

'চলে যখন যাবেই—রাণুকে একটা ফেয়ারওয়েল দেওয়া যাক।'

'তার মানে?' সোমনাথ ভুরু কোঁচকাল।

'মানে, এখন তো বেশ বৃষ্টি নেমেছে। রূপনারায়ণে খুব তপসে উঠছে। একদিন ফিস্ট করি আয়। রাণু আমাদের অনারেব্‌ল্ গেস্ট!'

সকলে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে স্থির, অনড়। হঠাৎ বিস্ময় সামলে হীরু চেঁচিয়ে উঠল, 'দারুণ বলেছিস গুরু, এটা তো ভাবিনি!'

'কিন্তু ওর মা কি রাজি হবেন?' নিতাই বলল। কণ্ঠে হতাশা।

হীরু বলল, 'কেন, যে মাঠে আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ সেই মাঠের কুঁড়ে ঘরটাতেই ফেয়ারওয়েল সেলিব্রেট করব! ব্রজদার বাড়ির একেবারে সামনেই তো!'

'কখন করবি!' নিতাই জিজ্ঞেস করল।

'রাত্রে! বিকেল থেকে শুরু করব, আটটা সাড়ে-আটটায় বড় জোর নটায় ফিনিশ্!'

'ইউনিক্!' সোমনাথ বলেই একটা সিগারেট ধরাল। 'তা হলে ঠিক কর্। হারু গিয়ে রাণুকে বল্। রাণুকে তো ওর মা খুব ভালবাসে। একটুও বকে-টকে বলে তো মনেই হয় না। রাণু ঠিক রাজি করিয়ে নেবে। আমরা বোস্টমপাড়ার মাঠের গায়ে ওই পোড়ো ঘরটায় ফিস্ট করব। আমি দুপুরেই বেরিয়ে একেবারে নদীর ধারে নৌকো থেকে সদ্য-জালে-তোলা তপ্‌সে নিয়ে আসব! আমার সাইকেল আছে, অসুবিধে হবে না।'

এরকম একটা প্রস্তাবে আমরা সকলেই যেন বর্ষার জলে গজিয়ে ওঠা কচুরি পানার মত ফুলে উঠলুম। যেই কথা সেই কাজ। রাণুর মায়েরও অমত হলনা, ব্রজদারও না। রাণু যাবে এক মঙ্গলবার। আমরা সোমবার বিকেলেই ফিস্টে মেতে উঠলুম। সেদিন আর কলেজও গেলুম না।

কিন্তু মুশকিল হল, সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু। মাঝে মাঝে থামে, আবার শুরু হয়। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া। বিকেলের দিকে অবশ্য বৃষ্টি একেবারে কমে গেল।' মাঝে মাঝে ভাসা মেঘে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। হাওয়া বইছে গাছে-পাতায় শব্দ তুলে। মেঘ থমথমে। বিকেলের মাঝামাঝি সময়েই ঘন সন্ধে নেমে এল।

সোমনাথ একেবারে টাটকা বড বড তপসে মাছ নিয়ে এসেছে নৌকা থেকে। নিতাই আর হারু দু'টো হ্যারিকেন নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। গণেশ এনেছে দু'টো চ্যাটাই আর চ্যাটাই-এর ওপর পাতবার মত বিছানার চাদর, ছেঁড়া কাপড়। ওরা রান্নার ফাঁকে একটু তাস খেলে নেবে বলে ভেবেই রেখেছিল। সদ্য টোয়েন্টি নাইন শিখেছে। বাড়িতে লুকিয়ে সুযোগ পেলেই খেলে। আমরা কোন ফিস্ট করলেই তাসের আড্ডায় জমিয়ে বসি। আমি তাস খেলা জানি না। আমি আর রাণু আনাজ কুটে রাখছিলুম, হারু, নিতাই ওরা বাকি কাজ করছে।

গণেশ বলল, 'রাণু, আপনি আমাদের গেষ্ট, কাল চলে যাবেন, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। আপনি এসব করলে কেমন কষ্ট হয়।'

'তা সত্যি। আমারও যেন মনে হয় আপনাকে এসব মানায় না!' সোমনাথ বলল।

রাণু লজ্জা পেল। আজ প্রথম এখানে এসে শাড়ি পরেছে। এতদিন ওকে ফ্রক পরা অবস্থায় দেখেছি। হাঁটা, ছোটা, বসে থাকা—সব ভঙ্গিতে রাণুকে আমার প্রজাপতির মত মনে হয়েছে—অন্যদের কি মনে হয়েছে জানি না।

জংলা ছিটের টি-শার্ট পরে রাণু। আজ সে শাড়ি পরেছে। একেবারে অন্য-রকম। মাথার চুল কেমন টান টান খোঁপা করা। শাড়ি-জামায় জড়ানো একটি মেয়ে যে এমন রহস্যময়তা কি করে পেলো, আমরা সকলেই ওকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখে নিজেদের মত করে ভাবছিলুম।

রাণু বলল, 'তাতে কি? এত সব কাজ! ছেলেরা পারে না।'

সোমনাথ বলল, 'দেখুন, ছেলেদের নিন্দে করবেন না। এখানে মেজরিটি আমরা।'

আমরা সকলেই হেসে উঠলুম। রাণু আরও বেশী। অনভ্যস্ত সজ্জিত খোঁপা ভেঙে পড়ছে পিঠে। রাণু বুকের কাপড় টানল।

আনাজ কোটা শেষ, রাণু বলল, 'বলুন, এবার কি করতে হবে।'

দারুণ লাগছে রাণুকে। আমরা সকলেই অবাক হয়ে দেখছি ওকে। সত্যি রাণীর মতন। ইঁট দিয়ে কাঠের জ্বালানির উনুন করা। তার সামনে একটা হ্যারিকেন নিয়ে গণেশ আর হীরু মাছ কুটতে বসেছে। কিছু মোমবাতি কিনে এনেছে নিতাই।

নিতাই বলল, 'এখানে আপনার কোন কাজ নেই। আপনি পাশের খাবার-ঘরটা একটু পরিষ্কার করুন গিয়ে। আমরা বাকি সব করছি।'

আমি বললুম, 'ভাত তো হবে না। শেষ পর্যন্ত খিচুড়িই হবে তো?'

হীরু বলল, 'তা নয় তো কি? কয়েকটা ভাজা হয়ে গেলেই মাছ নিয়ে বসব। তার পরেই খিচুড়ি।' একটু থেমে বলল, 'মাছ ভাজা হয়ে গেলেই, নিতাই, মাসিমা-ব্রজদাদের দিয়ে আসবি মনে করে। ভুলে যাস না যেন!'

'সে আর বলতে!' নিতাই রাণুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

সোমনাথ বলল, 'খিচুড়ি চাপিয়ে আমরা কিন্তু একটু খেলতে বসব।'

'নিশ্চয়ই।' নিতাই জোর দিল।

রাণু বলল, 'তা হলে তো তাড়াতাড়ি শেষ হবে। আমি বরং পাশের ঘরটা পরিষ্কার করি।'

আমি চুপ করে বসেছিলুম। রাণু বলল, 'কই, আসুন, আমাকে হেল্প্ করবেন! আপনি তো কিছুই করছেন না।' রাণু আমার দিকে তাকিয়ে। মনে হল, কি যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসছে। কদিন ধরেই এরকম হাসি দেখি। আমার ভয় হয় যেন।

'ঠিক বলেছেন, এক নম্বরের অকর্মা, ওকে নিয়ে যান তো।' সোমনাথ

ফোড়ন কাটল, 'ওকে ঘরের সব কাজ করান। আপনি একটুও হাত দেবেন না তো!'

আমি হাসলুম, বললুম, 'চলুন। সঙ্গে তো বাতি নিতে হবে?'

'তাই।' রাণু একটা বাতি আর দেশলাই নিয়ে উঠে পাশের ঘরটায় গেল।

বাইরে হাওয়া, দুরন্ত হাওয়া। আজ পূর্ণিমা। মেঘে ঢাকা আলোয় সারা আকাশ কেমন আভাময়। বৃষ্টির বেগ বোধ হয় বেড়েছে. মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারপাশে বিজবিজ শব্দ। আমি রাণুর পিছু-পিছু পাশের ঘরটায় এলুম। ওরা তখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত।

ঢুকেই রাণু বলল, 'নিন, দেশলাইটা জ্বালুন, আমি বাতি ধরছি।' রাণু আমার হাতের ওপর দেশলাই রাখল।

আমি দেশলাই জ্বাললুম। বাতির সুতো যখন জ্বলতে সুরু করল, রাণু সেটা দেয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে বসিয়ে ঝাঁটা হাতে নিল। 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এগুলো সরিয়ে নিচ্ছি: পরে ঝাঁট দেব।' বলেই রাণু কোমরে আঁচল বেঁধে পরিষ্কার করতে বসল।

'আরে, আরে, আমায় দিন, আপনি করবেন কি?' আমি সত্যিই অপ্রস্তুত হচ্ছিলুম।

রাণু আমার দিকে বড বড় চোখে তাকাল। 'থাক, ওই তো শুনলুম. আপনি এক নম্বরের নিষ্কর্মা: শুধু যা দেখতেই সুন্দর।'

'কি বললেন?' আমি যেন ধাক্কা খেলুম। কিন্তু একজন কিশোরীর মুখে কোন কথা যে এমন মধুর হতে পারে, এমন ভয়, শিহরণ, লজ্জা আনতে পারে, এই প্রথম তা অনুভব করলুম।

রাণু খুক খুক করে হাসল। 'নিজে খুব দেখতে ভাল, বার বার শুনতে ইচ্ছে করছে বুঝি?' রাণুর গলা চাপা।

আমি হঠাৎ কেমন একটা ভয় পেলুম। তবু যেন বেপরোয়া হয়েই বলে ফেললুম, 'আপনিও কম সুন্দর না!'

'কি?' রাণু ঝাঁটা-নাড়া থামিয়ে তাকাল আমার দিকে।

'আপনিও বারবার শুনতে চান নাকি?' আমি সোজা তাকিয়ে হাসলুম।

রাণু উঠে দাঁড়াল। 'ইস্, আপনাকে যতটা নিরীহ ভেবেছিলাম ততটা তো নন দেখছি!' চাপা গলায় বলেই ওপাশে সরে গেল।

'নিরীহ যেমন নই, অকর্মাও নই।'

'প্রমাণ করুন।' খুক খুক করে হাসছে রাণু। সামনে দাঁড়িয়ে, চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি।

আমি দাঁড়িয়ে থেকে রাণুকে দেখছি। মোমবাতির আলোয় রাণুর চামড়া কেমন যেন দেখাচ্ছে। লালরঙের মোমবাতির মুখে আগুন জ্বলতে থাকলে বাতির মুখের মোমে যেমন রঙ ধরে, রাণুর গায়ের রং ঠিক তেমনি। হঠাৎ কি ভেবে সামনে থেকে সরে গিয়ে উবু হয়ে বসল। পায়ের পাতা থেকে কাপড়ের আঁচল অনেকটা উঁচুতে। কেমন লক্ষ্মীর পায়ের মত পা। যেন মাখন দিয়ে তৈরী পা! রাণু যেন সোনার প্রতিমা!

'যান না, আরও দুটো বাতি নিয়ে আসুন! কি দেখছেন?'

আমার যেন সম্বিত ফিরে এল। হঠাৎ চাপা লজ্জা আর ভয়ে বুক কেঁপে উঠতেই রাণুর কথামত বাইরে চলে এলুম।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। তপসে মাছ কোটা হয়ে গেছে ওদের। সোমনাথ খিচুড়ির চাল-ডাল ধুচ্ছে। গণেশ উনুনে কাঠ গুঁজতে ব্যস্ত। দুচোখে জল, চোখ-মুখ লাল। নিতাই খুন্তি হাতে নিয়ে কড়ায় তেল দিয়ে বসে। হারু মাছে নুন-হলুদ মাখাচ্ছে।

আমি বাইরে বেরুতেই হারু বলল, 'এই কল্যাণ, তপসে মাছগুলো দ্যাখ্।'

'কি দেখব আবার?'

'সোমনাথ বলছিল, আমাদের রাণুর মত দেখতে।' হারু যেন ফিসফিস করল।

'যাহ্!' আমি হেসে উঠলুম।

'হ্যাঁরে।' সোমনাথ গলা নামিয়ে বলল, 'তপসে মাছ হল মাছের রাণী। রাণুও তো রাণীর মত!'

নিতাই বলল, 'তপসের রঙ দেখেছিস। রাণুর গায়ের রঙ যেন তুলে এনে মাখানো।'

গণেশ বলল, 'শালা, তপসে মাছ খাওয়া নয় তো, একেবারে আসল—'

আমি ধমক দিলুম, 'এই গণেশ, আজে-বাজে বকবি না!'

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে দালানে বেরিয়ে এসে এ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে রাণু। 'কই, বাতি আনলেন যে! নাকি আনতে গিয়ে বুড়ো হয়ে গেলেন?' এ ঘরে খেতে বসার মত অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করতে বাকি!'

আমি হেসে উঠলুম। 'যাচ্ছি, চলুন।' আমি রাণুর পিছু পিছু ঘরে চলে এলুম।

'নিন, আর দু'টো বাতি জ্বালুন, মাঝখানটা পরিষ্কার করেছি। এবার

পাশের কাঠগুলো একটু সরিয়ে একটা চ্যাটাই পাতি। সব ওই চ্যাটাইএ খেতে বসব।'

'ভাল করেছেন। আপনার হাত খুব পরিষ্কার।'

রাণু আমার দিকে তাকাল। 'থাক, প্রশংসা করতে হবে না।'

'কেন, প্রশংসা ভালবাসেন না?'

'কি হবে শুনে?' রাণু হাসতে হাসতে বলল, 'দিন বাতিটা।'

'বলতে ভাল লাগে যে! না শুনলে বলব কি করে?'

'আপনি খুব চালাক। অথচ প্রথম দিন দেখে কেমন বোকা বোকা, ভীষণ ভীতু মনে হয়েছিল!'

'প্রথম দিন! কবে!' আমি অবাক।

'মাঠে! ইস্, আমার সামনে একা দাঁড়িয়ে থেকে ভয় পেয়ে যেভাবে পালালেন! আমার খুব হাসি পেয়েছিল। আমি পরে লুকিয়ে কতবার যে হেসেছি!'

'আমার কিন্তু সেদিন খুব ভাল লেগেছিল আপনাকে!'

'আমাকে! হঠাৎ!' রাণুর তিনটি বাতিই জ্বালা হয়ে গেছে। আমার দিকে পিছন-ফেরা।

'আপনাকে কিন্তু মনে হয়েছিল ঠিক একটা প্রজাপতি! কেমন সুন্দর একটা ফ্রক পরেছিলেন!'

'এখন মনে হচ্ছে না!' রাণু হাসতে চটুল ভঙ্গিতে হাতের চ্যাটাইটা মেঝেয় পাতল। 'আসুন এর ওপরে বসি। ও'রা কি করছেন?'

'কি করছে এখান থেকে বুঝতে পারছেন না? কিসের গন্ধ পাচ্ছেন?'

'তপসে মাছ ভাজার। ইস্ কি মাতাল করার মত গন্ধ।'

'একেবারে টাটকা। বরফ দেওয়া নয়!'

'জানি মশাই।'

রাণুর অদ্ভুত মুখভঙ্গিতে চমকে উঠলুম। 'তপসে মাছটা ঠিক আপনার মত।'

'যান্, বাজে বকবেন না তো।' একটু থামল রাণু। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। অকারণ। আমিও স্থির, নিশ্চুপ।

এতক্ষণে বাইরের মুষলধারে নামা বৃষ্টির শব্দ, একটানা ব্যাঙের ডাক, দুরন্ত হাওয়ার হিসহিস শব্দ কানে এল আমাদের দুজনেরই।

'ইস্ কি বৃষ্টি বলুন তো?' আমি বললুম।

'আমার খুব খারাপ লাগছে জানেন?' রাণুর গলার স্বর কেমন গাঢ়, দুঃখ-দুঃখ।

'কেন?' আমি যেন কণ্ঠস্বরে কখন ওর খুব কাছে চলে গেলুম।

'কাল চলে যাবো!' রাণুর বড় বড় চোখ যেন ছল ছল করে উঠল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরটার পিছনের দিকের জানালার একটা অংশ খুলে দিল।

আমার কি মনে হল, ঘর থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির ঝাপটায় ভেজা দালান পেরিয়ে এ ঘরে এলুম।

'কি রে, ও ঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

নিতাই খিচুড়ি চাপাচ্ছে। সোমনাথ তাস খেলতে বসার তোড়জোড় করছে। গণেশ, হারু চ্যাটাই পেতে তাসগুলো ভাগ করে নিয়ে রিসাফ্‌ল্ করেছে নিজেদের মনে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। সামনে দামী সিগারেটের প্যাকেট খোলা।

হারু বলল, 'এই কল্যাণ, খেতে বসার আগে দু'টো করে মাছ ভাজা খাওয়া যাক। গরম। কি বলিস?'

আমি বললুম, 'ভাল তো। রাণুকে ডেকে আনি।'

গণেশ বলল, 'তুই নিয়ে যা রাণুর জন্যে। তুই তো তাসে একটুও ইন্টারেস্‌টেড্ নোস, এখানে বসে খেলে খেলতে বসতে দেরী হয়ে যাবে আমাদের। শালা শুধু রান্না করেই গেলুম। মেজাজ খাট্টা হয়ে আছে।'

নিতাই বলল, 'সেই ভাল। আমারও খিচুড়ি চাপানো হয়ে গেল। হতে হতে আমাদের কটা হাত খেলা হয়ে যাবে।'

আমি রাণুর জন্যে কলাপাতায় গরম তপসে মাছ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, হারু বলল, 'কি রে, সিগারেট খাবিনা আজ? কথা দিয়েছিলি গুরু!'

আমি বললুম, 'থাক না, তোরা খা।'

সোমনাথ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওসব চলবে না যাদু। এক যাত্রায় পৃথক ফল! তুমি সাধু সেজে কতদিন আর কাটাবে বাছাধন?'

গণেশ বলল, 'তা হলে রাণীকেও খেতে বল।'

'এই যাঃ।' হারু বলল, 'গেস্টকে এসব নয়।' গলা অনেক নামাল, 'শালা, অমন সুন্দর মুখে সিগারেট! মানাবে না মাইরি একটুও! বাঁদিকের বুকে কষ্ট পাবো মাইরি!'

আমি হাসলুম। 'আচ্ছা দে, আমি দেখছি ওকেও খাওয়াতে পারি কিনা। পারলে তোদের সামনে নিয়ে আসছি।'

একটা সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই আর ভাজা তপসে মাছ-রাখা কলাপাতা হাতে ধরে এ ঘরে এলুম। রাণু তখন জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে হাতের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা নিচ্ছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, 'ইস্, কি বৃষ্টি, আর কি অন্ধকার দেখুন বাইরেটা! আপনাদের রাত্রে ভয় করে না?'

'আপনার করছে নাকি?' আমি হাসলুম। 'নিন, জানলা বন্ধ করে এসে খেতে বসুন। আর, এ অন্ধকার আমাদের চেনা।'

'কি!' পিছন ফিরে তাকাল রাণু। 'অন্ধকারের আবার চেনা-অচেনা আছে নাকি?'

'আছে। ধরুন এ ঘর যদি এখনি অন্ধকার হয়ে যায়!' হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে বললুম, 'নিন, মাছ ভাজা, ওরাও খাচ্ছে।'

'ও'রা কি করছেন এখন!'

খিচুড়ি চাপিয়ে তাসে বসেছে। এখন তাস থেকে ওদের তোলা কঠিন। খেলতে বসলে টু'শব্দটি পর্যন্ত করে না।'

'বাব্বা। নেশা!' রাণু জানালা থেকে সরে এসে চ্যাটাইটার ওপর বসল। 'একি, আপনার হাতে সিগারেট! আপনি তো খান না!'

'আপনার জন্যে নিয়ে এলুম।' আমি বলতে বলতে বসে পড়লুম রাণুর উল্টো দিকে, মুখোমুখি। সামনে একটা বাতি বসানো হল।

রাণু আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছু সময়।

'কি দেখছেন!' আমি বললুম।

'দেখছি আপনাকে।' একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা, আমরা দুজনে দুজনকে আপনি বলছি কেন?'

আমি ভয় পেলুম। 'মানে!'

'মানে, তুমি বলতে বাধা কোথায়? আমরা বন্ধু তো?'

'কোন বাধা নেই। তবে আপনি বন্ধু নন, বান্ধবী।'

'তা হলে বলি, তোমাকে দেখতে কিন্তু খুব ভাল।' হঠাৎ চপল হয়ে উঠল রাণু।

'তোমাকেও!' আমি কেমন যেন ঘোরের মধ্যে বলে ফেললুম কথাটা।

হঠাৎ আমরা দুজনেই মুহূর্তের অজানা রহস্যময় খেলাটা যেনবা বিদ্যুতের

আলোর মধ্যে খেলে নিয়ে চুপ করে গেলুম। যেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি বেড়েছে। আমাদের ঘরটায় টিনের চাল থেকে গড়িয়ে-পড়া জলের শব্দ কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে বাজছে। হু হু হাওয়ায় ঘর ভরে উঠছে মাঝে মাঝে। বুঝতে পারছি পাশের ঘরে ওরা তাসে একেবারে ডুবে গেছে।

আমি হঠাৎ বললুম, 'কি, মাছ খাবে না?'

'থাক।' রাণু হাসল। কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন যেন উদাস, পালকের মত নরম, হালকা।

'তা হলে একটা সিগারেট খাও। ওরাও খাওয়াতে বলেছে তোমাকে।'

'আমাকে!' শব্দ করে হেসে উঠল রাণু। 'যাকে খাওয়াবার ভার দিয়েছে, সেই আগে খেয়ে দেখাক! তারপর।'

'আমার কথা বলছ?'

'তাই।' মুখভঙ্গি করল রাণু।

'আমি খাই না, কিন্তু এখন ঠিক খেতে পারি।' আমি কেন যেন কাঁপছি।

'খাও।'

আমি সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলুম। মনে হচ্ছে হাত কাঁপছে, বুকের মধ্যে ধক ধক শব্দ। ফস্ করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে সিগারেট ধরালুম। 'এই দেখ, আমি খাচ্ছি।' আমি অনভ্যস্ততার মধ্যে ধোঁয়া টেনে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিলুম। পরপর কয়েকটা টান দিলুম একভাবে।

'হুঁ:, ও আবার খাওয়া নাকি! ওভাবে আমিও খেতে পারি।'

'খাও তো দেখি।' আমি নতুন একটা সিগারেট দিলুম। আমার হাতে দেশলাই ধরা।

'না, নতুন ধরাবো না, তোমারটা দাও। কয়েকটা টান দিচ্ছি।'

'ইস্, না, আমারটা তো এঁটো।'

'তাতে কি।' বলেই রাণু ঝুঁকে আমার ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা টেনে নিল। নিজের ঠোঁটে ধরে কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে কাশতে লাগল।

'দেখলে তো, ধোঁয়া গিললেই এ রকম হবে! কিছু জান না।'

'তুমিও তো কিছু জান না।' রাণু হাসতে হাসতে বলল। হাতে সিগারেট জ্বলছে। রাণুর মুখ-চোখ লাল। চিবুক বাতির আলোয় জ্বল জ্বল করছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর তামাকের গুঁড়ো, সিগারেটের ছেঁড়া কাগজ আটকে গেছে।

'কী তুমি? কাঁচা সিগারেটও খাচ্ছ নাকি?' আমি সোজা রাণুর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে বললুম।

'কেন?'

'তোমার ঠোঁটের ওপর তামাকের গুঁড়ো, কাগজ। মুখে কিন্তু বিশ্রী গন্ধ ছাড়বে।'

'আহা। মোটেই না।' বলেই রাণু ঠোঁটের ওপর আঙুল ঘষে ঠোঁট পরিষ্কার করল।

'ঠিক দেখো, গন্ধ ছাড়বেই।'

'কিছুতেই না।'

'তুমি আবার ধোঁয়া গিলেছ।'

'কই, গন্ধ শুঁকে দেখ।' রাণু এগিয়ে এল। হাঁ করে আমার মুখের কাছে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আমি অবাক হয়ে রাণুকে দেখছি—রাণুর ঠোঁট, চিবুক, চোখ, মুখ-গহ্বর, জিভ। রক্তে মুখের ভিতরটা যেন রক্তজবার মত। আমার কি যে মনে হল, যেন একটা অত্যন্ত অচেনা খেলা পেয়ে গেছি এভাবে বললুম, 'না, সত্যি গন্ধ ছাড়ছে।'

'কই, এই তো।' মুখের শ্বাস দিয়ে আমার ঠোঁট নাক ভরিয়ে দিল রাণু। 'পাচ্ছ?'

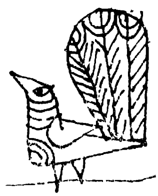
'হ্যাঁ।'

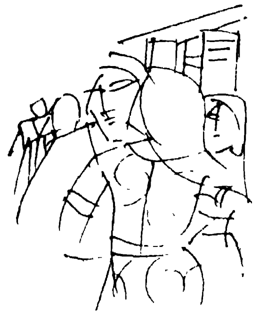
'আবার শোঁক।' বলেই রাণু একেবারে আমার নাকের সামনে বারবার মুখের শ্বাস দিতে লাগল।

হঠাৎ-খোলা জানালা থেকে ভেসে আসা দমকা হাওয়ায় ঘরের সব বাতি নিভে গেল। আর আমার কি যেন হল, আমি চকিতে রাণুর মুখমণ্ডল দু'হাতে ধরে হাঁ-করা মুখের মধ্যে আমার ঠোঁট চেপে ধরলুম। রাণুর ছোট্ট লাল সাপের মাথার মত জিভ ঠোঁট-সমেত আমার দু' ঠোঁটে চেপে বসে গেল।

ঘরের মধ্যে গভীর অন্ধকার। জানালা দিয়ে তুমুল হাওয়া ঢুকছে ঘরে। বাইরের শুকনো জলে-ভেজা পানা, কাদা, কিছু বুনো ঘাসের গাছ-গাছালির গন্ধ-মেশানো হাওয়া আমাদের যেন ঢেকে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আছড়ে ফেলছে মাটির ওপর। একসময়ে আমি-রাণু স্থির। আমি ভয়ে কাঁপছি ভিতরে। কিন্তু রাণুর থেকে আমি আলাদা হতে পারছি না। ওপাশের ঘরে ওরা এখন

কি করছে? তাস খেলতে খেলতে গরম তপসে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে এক মনে। আর আমি? আমি যেন তপসে মাছের স্বাদ গন্ধ ভুলে গেছি। রাণু বালিগঞ্জের মেয়ে। অত্যন্ত চালাক, অথচ নিষ্পাপ। আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে। অন্ধকার, বৃষ্টির ঘ্রাণ, মাটির বিজ বিজ শব্দের মধ্যে কখন যেন আমি, একজন সদ্য-যৌবনে-পা-দেওয়া পুরুষ এক বয়স্ক কিশোরীর শীতল শরীরের মুহূর্তের ঠাণ্ডা অনুভব করছি। এমন ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ তো কোনদিন পাই নি! রাণুও না! বাইরের ভিজে দুরন্ত, শব্দময় বুনো-গন্ধে-ভর্তি হাওয়া এক এক দমকায় আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে তাল তাল অন্ধকার ঘরের মাঝখানে ছুঁড়ে মারছে। উত্তাল এলোমেলো হাওয়ায় আমাদের ঘর-ঘেঁষে দাঁড়ানো সুপুরি গাছের শীর্ষ এখন মত্ত সিংহের মত উথাল-পাথাল আছড়ে পড়ছে অবিরাম।





গোলকধাঁধা

হঠাৎ সারা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল।

দোতলার কোণের ঘরের মায়া চার ছেলেমেয়ে সামলে পুজোয় বসছিল, প্রদীপ জ্বেলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। মেঝেয় বসে থেকেই চেঁচাল, 'কি করে আলো নিভল আবার! মিটারে কেউ হাত দিয়েছে বুঝি?'

কর্পোরেশানের ভেঙে দেওয়ার বার তিনেক নোটিসে ঝুলছে এই বাড়িটা।

পুরনো বাড়ির মিটার নীচের তলায়। নীচে কোন সাড়া-শব্দ নেই। মায়ার পাশের ঘরে দোতলায় পা দেওয়ার সিঁড়ির মুখে শেফালির ঘর। শেফালি আর বছর-দুয়েকের মধ্যে চল্লিশে পা দেবে। এখনো ছেলেপুলে হয়নি। শেফালির স্বামী অরবিন্দ ফ্যাক্টরীর চাকরী চলে যাওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকমাস বেকার থাকার পর এখন ডান পা ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়ার রোগে শয্যাশায়ী। এই মুহূর্তে শেফালি অরবিন্দর পায়ে মালিশ করছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মালিশ থামিয়ে বলল, 'দেখ কে আবার মিটার বাক্সে কি করছে। বাড়িওলা লাইন সারাবে না, কিছু দেখবেও না! বারোয়ারী মিটার হয়েছে।' গজগজ করার মত বলল শেফালি।

মায়া এতক্ষণে অন্ধকার হাতড়ে ভাঙা বারান্দার রেলিংয়ে চাপ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শেফালির কথা কানে এল। কোন মন্তব্য না করে ওপরে তাকাল। তারাভর্তি আকাশকে পিছনে রেখে আধখানা ছায়ামূর্তি ঝুঁকে থাকতে

দেখল। শান্তিলতাকে চিনতে পারল মায়া। দিনরাত ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকে। আজ সকালেই তুলকালাম হয়ে গেছে। কথা নেই। তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিল মায়া।

শান্তিলতা খনখনে গলায় চেঁচাল, 'অ জয়া, জয়া, নীচে কি সব সন্ধেতেই ঘুমিয়ে পড়লি? একবার ভ্যাখ না কি হল? মিটার তো তোদের সামনেই!'

জয়ারা নাচের তলার অনেক দিনের ভাড়াটে। মা বাবা দুজনেই চাকরী থেকে ফেরে রাত আটটার পর। জয়ার দিদাই সব রান্নাবান্না করে। একমাত্র ভাই নান্টু সদ্যকৈশোরে পা দিয়েছে। খুব সুন্দর দেখতে, নিষ্পাপ, কিন্তু জন্ম থেকেই বোবা-কালা। জয়া ছোট মেয়ে, বড় পূরবী। পূরবী সবেমাত্র প্রাইভেট টিউটর তপনের কাছে পড়তে বসেছে। শান্তিলতার গলা কানে এলেও কোন কথা বলল না, উঠল না।

শেফালির সঙ্গে সদ্ভাব আছে শান্তিলতার. অবশ্য সেটা শেফালির জন্যেই সম্ভব হয়েছে। শান্তিলতা ডাকল, 'অ শেফালি, ভাখো তো নীচে গিয়ে, কি হল। বাড়িতে তো কেউ লোক নেই দেখার। সব খোঁজখবর যেন আমাদেরই নিতে হবে! শুধু চীৎকার করলে কি আর কাজ হয়?' শান্তিলতা মায়াকে খোঁচাতে চাইল।

শেফালি অরবিন্দর বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, এই সময়ে জয়া বাইরে থেকে বেড়িয়ে, ফিরে পায়ে পায়ে চাতালের অন্ধকার সরিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়াল। শান্তিলতার শেষ কথা কানে এসেছে। 'মাসিমা, শুধু এ বাড়ি নয়, আমাদের পাড়া. এমন কি সেই অতদূরের ট্রাম লাইন পর্যন্ত আলো নিভেছে!'

'সেকি! আমাদের পাড়াতে আরম্ভ হল আবার!' শান্তিলতা বিরক্ত।

'আর বলবেন না মাসিমা, কলকাতায় বোধহয় আমাদের পাড়াটাই বাকি ছিল, তা-ও হয়ে গেল।' বলতে বলতে জয়া ওদের ঘরের সামনে এল। 'কিরে দিদি, আলো জ্বালিস নি কেন?' একটু থেমে ঠোক্কর খেতে খেতে দেয়াল ধরে বলল, 'তপনদা কখন এলেন।'

'এই একটু আগে।' তপন আস্তে ওর মুঠোয় ধরা পূরবীর মুখমণ্ডল থেকে হাত সরিয়ে পূরবীর নরম ঠোঁট, গাল টিপে দিল।

অন্ধকারে বসে থেকেই পূরবী তপনের মুঠো থেকে মুখ সরিয়ে জয়াকে বলল, 'এই তো আলো নিভল। তা ছাড়া অন্ধকারে বসে থাকতে খুব ভাল লাগে, তাই না?' পূরবী চাপা আরামে কথা বলতে বলতে এক হাতে তপনের বাঁ হাত

জোরে ধরে থাকল। তপনের বাঁ হাতটা ওর সামনের দিকে গলার কাছ থেকে শামুকের মত সামনে শরীরের নীচের দিকে নামছিল।

'মন্দ না।' জয়া পূরবীর কথার জবাব দিল। 'নাণ্টু কোথায় রে?' জয়া প্রশ্ন করল। এতক্ষণে জয়া পাশের ঘরের মেঝেয় পা রেখেছে।

'দিদার কাছে তো বসেছিল। ত্যাখ্, এই অন্ধকারে সারাবাড়ি চষতে বেরিয়েছে কিনা। ওর তো সব সময়ে বাড়ি ঘুরে বেড়ানো অভ্যেস। ছাদে বিজনদার ওখানেও যেতে পারে।' পূরবী অনেক কথা বলে জয়ার সামনে সহজ হতে চাইছে।

ওদিকের রান্নাঘর থেকে ঈষৎ আলো এসে পড়েছে এ ঘরে। জয়া দেখল, দিদা একটা আধপোড়া মোটা বাতি জ্বেলে কোনরকমে রাঁধছে। ঘরের মধ্যে একদিকে সরে বসে নাণ্টু পূরবীদের ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দিদা!' জয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আর বাতি নেই?'

'থাকবে কোত্থেকে? তোর বাবাকে কতবার বলেছি বাতি কিনে রাখ্ বা একটা হ্যারিকেন কেন্, কখন কি দরকারে লাগে। ভেবেছে, এদিকে কোনদিনই আলো নিভবে না। এখন বোঝ। এই একটা আধপোড়া বাতি ছিল, আর তো নেই। তোরাই বা পড়তে বসবি কি করে?'

'প্রেসে মদনদার কাছে দেখি, যদি পাই। না পেলে বাইরে থেকে আনছি দিদা।' জয়া সরে এল।

'বাইরে সাবধানে যাবি। তা ছাড়া দোকানেও তো অন্ধকার, পাবি কি করে?' দিদা রান্না থামিয়ে বলল।

'দেখে এসেছি, দোকানগুলোয় বাতি জ্বেলেছে।' জয়া বলতে বলতে এ ঘরে এসে চটি গলিয়ে উঠোনে পা দিল। জয়ার চোখে অন্ধকার অনেকটা সয়ে এসেছে এতক্ষণে।

নাণ্টু সুন্দর বড় বড় টানা চোখে একভাবে পূরবা-তপনকে দেখছে।

'জয়া তো বাইরে চলে যাচ্ছে, এবার?' তপন ফিস ফিস করল।

'হুঁঃ, পারবে নাকি? নাণ্টু দিদা আছে না?' পূরবী কাঠ হয়ে সামনে পড়ার টেবিলে উপুড় হয়ে রইল।

'নাণ্টু কিছু বোঝে নাকি?' তপন গলা চেপে হাসল। 'দেখলেও কিছু বলতে পারে না, বোঝেও না।'

'তুমি বোঝ না, ও কেমন বেড়ালের মত হাঁটে! কেমন করে যেন তাকায়। মনে হয় সব বোঝে। বাবা বলে, ওর নাকি ভগবানের চোখ।'

'দুর, বাবা এই বলে তোমাদের ভয় দেখায়। তুমি তো আবার বাবা-মার কাছে খুব ভাল মেয়ে।' খুক খুক করে হেসে পূরবীর পিঠে হাত রাখল তপন। 'একদিন পাশের বাড়ির কার কাছে যেন দিদা তোমার খুব প্রশংসা করছিল।'

'এই, দিদা আছে কিন্তু!' ফিস ফিস করল পূরবী।

'রান্নাঘর অনেক দূর।' পূরবীর কানের কাছে ফিস ফিস হয়েই কথাটা সরে গেল।

'আমি চেঁচাব।'

'তা হলে চেঁচাও।' তপন চেয়ার ছেড়ে পূরবীর পাশে উঠে এল সন্তর্পণে। ওর সামনে দাঁড়িয়েছে, নাণ্টু আস্তে আস্তে এগিয়ে একটু দূরে দাঁড়াল।

'মদনদা আছ?' বলতে বলতে জয়া যেন পরিচিত ঘরে অভ্যস্ত পায়ে ঢুকল।

'থাকব না তো যাব কোথা? কম্পোজিটার মেশিনম্যান সব চলে গেছে। এখনি একটা অর্ডার মিটিয়ে টাকা আনব বলে মেশিনে হাত দিয়েছি, ব্যাস, কারেণ্ট গেল। এবার মেশিনটাও যাবে।' একটু থামল মদন। 'দিনকাল যা চলছে কাজ-ফাজ হবে কোত্থেকে?' বলেই একটা চাপা নোংরা খিস্তি করল প্রেসের মালিক মদন। বছর বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বয়স। বউ-ছেলে-মেয়ে গ্রামে থাকে। ছ'মাস অন্তর গ্রামে যায়। মদন একটা বাতি জ্বালিয়ে বসে আছে। পাশেই ট্রেড্‌ল মেশিন।

নোংরা কথাটায় জয়া নিঃশব্দে খিক খিক করে হেসে উঠল। 'মদনদা, ক'টা বাতি হবে তোমার কাছে?'

মদন হাসল। বাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় স্কার্ট-টিশার্ট-পরা জয়াকে এক পলক দেখল। 'হবে, এসো।'

'সত্যি হবে? দাও না। তা হলে এই অন্ধকারে আর বাইরে যাব না। যা অন্ধকার, ভয় করে।'

মদন টাইপ কেসের নীচে হাত চালাল। দুটো সরু সরু বাতি হাতে ধরে বলল, 'নিয়ে যাও।'

জয়া মদনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'দুর, এই ছোট্ট ছোট্ট দুটোতে হবে না। আমাকে বাইরে যেতেই হবে।'

মদন হি হি করে হাসল। 'বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? তোমাকে কিন্তু খুব ভাল লাগছে।'

জয়া এ হাসির অর্থ বোঝে। দু'পা পেছোবার মত করে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন কিছু না। ও দুটো তো এখন দিদা জ্বালুক, তাড়াতাড়ি দাও।' জয়া হাত বাড়াল।

মদন হঠাৎ জয়ার কোমর ধরে টানল। সামনের দেয়ালে রাখা গণেশ আর লক্ষ্মীর পুতুল দুটোয় চকিতে আলো ঘুরে গিয়ে ধাক্কায় বাতিটা পড়েই নিভে গেল। প্রেসের ঘরটায় ট্রেড্‌ল্ মেশিনের কালো লোহার মত ভারী অন্ধকার।

জয়া যেন ফিস্ ফিস্ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মদনদা, কেউ দেখে ফেলবে। মা-বাবা আমায় প্রেসে ঢুকতে একেবারে বারণ করেছে। মা জানে আমি কোনদিন ঢুকি না।'

'কেউ দেখবে না। এমন অন্ধকারে ভগবান-ফগবানেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে! কি যে বল!' হি-হি করে হাসছে মদন।

'আহ্। এই ছাড়ো। আমার ভাল্লাগে না। জামায় দাগ ধরে যাবে কিন্তু! তোমার হাতে প্রেসের যত কালি! দিদি যদি বুঝতে পারে, তখন?' তবু জয়া দাঁড়িয়ে রইল।

নাণ্টু এতক্ষণ অবাক চোখে প্রেসের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একভাবে দেখছিল। জয়াকে মদন ছেড়ে দিতেই নাণ্টু পিছন ফিরে উঠোনের মাঝখানে এল।

অন্ধকার হাতড়ে ঠোক্কর খেতে খেতে বাড়িওলার বছর তিরিশের নাদুস-নুদুস ছেলে গলায় হার পরা গৌরাঙ্গ উঠোনের সামনে এল। মাসের এই শেষ দিকটা চারতলার শিবনাথ সরকার ভাড়া মেটায় বলে আসে। ঠিক এই সময়েই শিবনাথের বিজনেস পার্টনার সাবলেট্-এর ভাড়াটে সুরেশপ্রসাদের ছোট ভাই লক্ষ্মণপ্রসাদ নীচে নামল। বছর পনেরো বয়স, সুন্দর দেখতে, টেরিলিনের প্যাণ্ট-শার্ট পরা। সন্ধেয় বেড়াতে বেরিয়েছে। ভাল বাংলা জানে।

'এই, শিবনাথবাবু ওপরে আছেন?' সামনে আসতেই গৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করল।

'আছেন, ওপরে যাও।'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস? খুব সেজেছিস যে!' গৌরাঙ্গ লক্ষ্মণপ্রসাদের একটা হাত ধরে আর একটা হাতে নরম গাল টিপল।

'ছাড়ো। বন্ধুরা সব দাঁড়িয়ে আছে।'

'এখনি যাবি? বন্ধুরা তো এখানে আসেনি ডাকতে। আয় না ও ঘরে।' বাড়িওলা নীচের তলায় যে বড় ঘরটা সময়ে অসময়ে ব্যবহার করার জন্যে তালা দিয়ে রেখেছে, সেটা ইঙ্গিত করল। আগে বেশ কয়েকবার গৌরাঙ্গ এ ঘরে একা থেকেছে। গৌরাঙ্গর বাবা বৈষ্ণব। এ ঘরটায় বৃন্দাবনের ব্রজবাসীরা কলকাতায় এলে আশ্রয় নেয়। তা না হলে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে পুরনো প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি অনেকদিন ধরে পড়ে আছে।

'না, থাক। বড অন্ধকার! তা ছাড়া সব সময় বন্ধ থাকে, বিচ্ছিরি গন্ধ।'

'বেশীক্ষণ নয় তো, একটু থাকবি, আয় না, তোর সঙ্গে আরও অনেক কথা আছে।'

গৌরাঙ্গ যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে লক্ষ্মণপ্রসাদের হাত ধরে টানল। 'আমি এই অন্ধকারে আর ওপরে যাব না, তোর সঙ্গেই বেরুব।' একটু থামল, 'আজ ভাল একটা সিগারেট খাওয়াব, দেখবি ঘরের গন্ধ থাকবে না।' ফস্ করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে তালায় চাবি ঢোকাল।

'বিছানা খুব নোংরা, জামা-প্যাণ্ট ময়লা হয়ে যাবে। আমি যাব না।' লক্ষ্মণপ্রসাদ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আপত্তি জানাল।

'না-রে না। ব্রজবাসীরা তো কিছুদিন ছিল। ওরা পুজো-আচ্চা করেছে। দেখবি ঘরে ধূপধুনোর গন্ধ এখনো আছে।' বলতে বলতে গৌরাঙ্গ চাবি খুলে লক্ষ্মণ প্রসাদকে নিয়ে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

নাণ্টু শ্যাওলা-ধরা বড় চৌবাচ্চাটার এ কোণে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সব দেখল। চারপাশে পচা শেওলার গন্ধ। ওদের এভাবে একসঙ্গে এর আগেও নাণ্টু কয়েকবার দেখেছে। জয়া কখন প্রেস থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেছে, ও দেখতে পায়নি। নীচের তলায় একেবারে ও কোণের ঘরে টিমটিমে বাতি জ্বলতে দেখে এগোল।

প্রভাবতী-দয়ালবাবুর ঘর। কলকাতার বাইরে অনেক দূরে দূরে তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর বছর-এগারো আগে রিটায়ার করে এখানে আছেন ওঁরা। বেশ কিছুদিন দয়ালবাবু ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে বিছানায় পডে আছেন।

নাণ্টু ধীর পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'তুই একবার পা দুটো ধর তো বাবা, আমি এই ওষুধটা খাইয়ে দি।'

মুখে বললেন প্রভাবতী, কিন্তু নান্টুর চোখে চোখ রেখে ইশারা করলেন হাতে নানা ভঙ্গি করে।

দয়ালবাবু বিছানায় ছটফট করছেন, হাত পা ছুঁড়ছেন, কাতরাচ্ছেন। নান্টু একটু এগিয়ে দয়ালবাবুর ছু' পা চেপে ধরল।

'উঃ এত অন্ধকার কেন?' দয়ালবাবু কথা বলেই হাঁপাতে লাগলেন। জোরে নিঃশ্বাস টানতে টানতে ছু'চোখ বড় করে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধুত্তোর, আলো জ্বালোনি কেন?' যেন চীৎকার করতে চাইছেন।

'সব আলো নিভে গেছে। পাড়া অন্ধকার।' প্রভাবতী দয়ালবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, 'নাও, ওষুধটা খেয়ে নাও।'

'না, এখন না।' ছু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল দয়ালবাবুর।

'কি কষ্ট হচ্ছে?'

'বুকে ভীষণ জ্বালা করছে, আমার নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি এবার মরে যাব।'

'ও রকম কথা বোল না ভর সন্ধেবেলায়।' প্রভাবতী ওষুধ মুখের মধ্যে ঢেলে দিলেন। দাঁতে ঠোঁটে কিছুটা লেগে গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

একটু পরে দয়ালবাবু যেন শান্ত হলেন। ফ্যাল ফ্যাল করে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন অন্ধকারের মধ্যে। মাঝে মাঝে যে চোখ ছুটো উল্টে যাচ্ছে, প্রভাবতী ছানিপড়া চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, বুঝতেও পারছেন না।

'কিছু বলবে?' প্রভাবতী অনেকটা ঝুঁকলেন।

'আর কি বলব? দেখছ না অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অন্ধকারেই আমাকে পালাতে হবে। লুকিয়ে থাকার কি মজা বল তো?'

প্রভাবতী দয়ালবাবুর কোন কথার খেই ধরতে পারছেন না। হঠাৎ চোখ ছল ছল করে উঠল। অসহায়ভাবে দয়ালবাবুর গায়ে হাত রাখলেন। 'কি যে করি। এই অন্ধকারে কাকে দিয়ে এখন ডাক্তার ডাকি!'

নান্টু দয়ালবাবুর মুখ-চোখ, প্রভাবতীর কান্না দেখল। কি ভেবে নিজেই উঠে গিয়ে দয়ালবাবুর মাথায় হাত বুলোতে বসল।

বাইরে থেকে উঠোনে আসার আগে লম্বা একটা প্যাসেজ পেরোতে হয়। ড্যাম্প আর পায়রাদের শুকনো পায়খানার গন্ধে ভর্তি ইঁট-ওঠা এবড়ো-খেবড়ো প্যাসেজ। অফিস থেকে ফেরার পথে মৃগাঙ্ক হঠাৎ অন্ধকারে দেয়াল ধরে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনে এল। ওপরের তারা-জ্বলা নিঃসীম অনন্তকাল আলোকিত

আকাশের ছায়ায় একটু যেন উঠোনটা স্পষ্ট হয়। অফিস-ফেরত মৃগাঙ্ক খুব ক্লান্ত। এই বাহান্ন বছর বয়সের চোখে এতদিন পরে যেন কম দেখতে শুরু করেছে।

মৃগাঙ্ককে দেখতে পেয়েই নান্টু ঈষৎ নিদ্রিত দয়ালবাবুর মাথায় কাছ থেকে উঠে বাইরে এল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চারতলার শিবনাথ সরকার একতলায় নামার শেষ ধাপে পা দিয়েই চার ব্যাটারির টর্চটা হঠাৎ জ্বালল। একবার ঠোক্কর খেয়েই পড়ে যাবার মত থেমে, সামলে নিয়ে, যেন বা একটু টলতে টলতে দ্রুতপায়ে অন্ধকার প্যাসেজ ধরে বেরিয়ে গেল।

শিবনাথ চারতলাটা পুরো নিজের পয়সায় হোয়াইট্‌ওয়াশ করে কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট বসিয়ে নতুন করে নিয়েছে। বড় বিজনেসম্যান। পাড়ার বড় বড় পুজোয় পাঁচশো এক টাকা চাঁদা দেয়। কমিটির সভাপতি হয়। দাতাদের তালিকায় প্রথম নাম ছাপা থাকে। খুব ভদ্র, সব সময়ে হাসিমুখ, বিনয়ী। পাড়ার একটা জলসায় বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিল। অনেক নাকি দান-ধ্যান আছে। চকিতে কথাগুলো মৃগাঙ্কর মনে পড়ে গেল মুখস্থর মত। এখন কোন জরুরী কাজে বেরুচ্ছে বলে বোধহয় মৃগাঙ্ককে দেখতে পায়নি। সামনে পড়লে মৃগাঙ্ককে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। একবার মৃগাঙ্ককে টাকা ধার দিয়েছিল।

মৃগাঙ্ক শিবনাথের কথাগুলো মনের মধ্যে যেন বিড় বিড় করতে করতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ধাপে পা রাখল। দোতলা থেকে শেফালি মাঝের চাতালটায় এসে দাঁড়িয়েছে। নীচে আর নামছে না। মৃগাঙ্ক কয়েক ধাপ উঠে এসে চাতালের এক ধাপ নীচে এসে দাঁড়াল।

'টাকা এনেছ?' শেফালি ফিস ফিস করল।

'আমি আসছি তুমি এই অন্ধকারে বুঝতে পারলে কি করে?' মৃগাঙ্কর কণ্ঠে চাপা বিস্ময়।

'তুমি আসবে, তাই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন অন্ধকারে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়ালে বৌদি টেরই পাবে না।'

'ভগবান দেখেন।' মৃগাঙ্ক এমন ক্লান্তির মধ্যেও রসিকতা করল।

'ও লোকটার নাম কোর না। দেখলে কি আজ আমার এই অবস্থা হয়?' শেফালির চাপা রাগে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ল। 'কত এনেছ?'

মৃগাঙ্ক যেন ক্লান্তিতে পড়ে যাবার মত হওয়ায় শেফালির নরম ডান হাতের মুঠি চেপে ধরল। 'এনেছি ধার করে। কিন্তু অরবিন্দ কি আর কোনদিন ভাল হবে?'

শেফালি কিছু সময় চুপ করে থাকল। বলল, 'ভাল হোক না হোক চেষ্টা তো করি।'

'যদি কিছু না হয়!'

'তুমি তো আছ।' শেফালির গলা হঠাৎ লঘু।

মৃগাঙ্ক শেফালির ধরা হাতে অতি মনোরমভাবে একটু চাপ দিল। শেফালির বুক-মুখের কাছে নুয়ে পড়ল মৃগাঙ্ক।

'ছাড়। এখন থাক। ওপরে যাও, গা ধুয়ে নাও। ভীষণ ঘামের গন্ধ ছাড়ছে। তা ছাড়া আজ সকালে মায়ার সঙ্গে বৌদির খুব একচোট হয়ে গেছে। এখন সামলাও গিয়ে।'

মৃগাঙ্ক হাত ছেড়ে দিল। মায়া-শান্তিলতার ঝগড়ার মুখোমুখি খুব কম দিনই মৃগাঙ্ক পড়েছে। আর সেসব ঝগড়া সাধারণ দুটো-একটা কথাতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু মৃগাঙ্কর আড়ালে যে ঝগড়া হয়, তার পরের জের সামলাতে মৃগাঙ্ক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। শান্তিলতার সমস্ত বিরক্তি, রাগ, চীৎকার—এ সবের তাল অকারণ ওকেই সহ্য করতে হয়। মাথা তখন গরম হয়ে ওঠে, মৃগাঙ্কর মধ্যে যেন সেই তাজা যুবকের শিকল-বাঁধা হাতের শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হতে থাকে বার বার। গেল বছর ছেলেগুলোকে এই রকম অন্ধকারে ফাঁকা নির্জন মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুলিস যেমন গুলি ছুঁড়ত, এখন যেন সেইরকম গুলির শব্দ মাথার মধ্যে হচ্ছে। খবরের কাগজে পড়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে মৃগাঙ্ক বার বার একই সঙ্গে পুলিসের অজস্র গুলির শব্দ আর তাজা ছেলেগুলোর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা চেহারার মিশ্রিত অনুভূতিতে কাঁপে।

'কি ভাবছ! ওপরে যাবে তো?' শেফালি মৃগাঙ্ককে একটু ঝাঁকানি দিল। 'ভয় পাচ্ছ?'

'না। এই যাচ্ছি।' মৃগাঙ্ক সহজ হল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'নীচে। জয়াদের ঘরে দেখি যদি বাতি থাকে। তা না হলে জয়াকে আনতে দেব।' শেফালি চাতাল থেকে নীচের দিকে পা বাড়াল।

মৃগাঙ্ক অন্ধকারে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখল। চারমিনার ফুরিয়েছে, দেশলাইয়ের বাক্সও ফাঁকা, মৃগাঙ্ক অন্তত কয়েকটা কাঠি জ্বেলে তাড়াতাড়ি উঠতে পারত।

নাণ্টু স্পষ্ট ওদের দেখছিল। শেফালি ওর সামনে দিয়ে চলে যেতেই ও দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা রাখল।

মায়া চাইছিল, শেফালি একবার অন্তত নীচে নামুক। মৃগাঙ্ককে দেখে শেফালি দোতলা থেকে সিঁড়ির একধাপে পা নামাতেই মায়া সন্তর্পণে অতি অভ্যস্ত পায়ে তেতলায় উঠে এল। তেতলার বারান্দার ডান দিকে লোহার রেলিং দেওয়া জানালার মত ফাঁকা জায়গা। ওখানে শান্তিলতা বেশ কিছু ঘুঁটে-কয়লা কিনে রাখে।

মায়া শান্তিলতাদের দিকে টানা লম্বা বারান্দাটায় চোখ বুলোল। দরজা বন্ধ, বাইরে কেউ নেই। হাতের দুটো থলেয় দ্রুত কয়লা আর ঘুঁটে ভর্তি করল। একটিও যাতে মাটিতে পড়ে না থাকে সেইভাবে, সন্তর্পণে। একটা প্যাকেট কাঁধে আর একটা প্যাকেট হাতে ঝুলিয়ে দোতলায় নেমে এল। বুঝতে পারল, সামনেই মৃগাঙ্ক উঠছে দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে। মায়া জানে, মৃগাঙ্ক আজকাল চোখে কম দেখে। তবু দেয়াল ঘেঁষে মৃগাঙ্ককে যাবার জায়গা করে দিল।

অন্ধকার ঘরের মেঝেয় প্যাকেট দুটো নামিয়ে মায়া রীতিমত হাঁপাচ্ছে। চার ছেলে-মেয়ের মা হলেও মায়ার শরীরের বাঁধুনি বেশ শক্ত, ছিমছাম। তবু পরিশ্রমের থেকেও চাপা ভয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল মায়া। শেষ-হয়ে-আসা বাতিটার সামনে ছেলেমেয়েগুলো খেলছে। মায়া বিজয়িনীর হাসি হাসল। মনে মনে বিড় বিড় করল, 'মর্ শালী এবার ঝগড়া করে তোর জবা ঝিয়ের সঙ্গে। জবাই তো তোর সব কয়লা-ঘুঁটে নেয়। আমার ছেলে মেয়েদের গালাগাল দিবি?' রাগে চাপা গজগজানি স্পষ্ট হল, 'সামনের জন্মে তুই আঁটকুড়ো হয়ে জন্মাবি, দেখিস!'

নাণ্টু নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্যাকেটগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। প্লাস্টিকের যে তোবড়ানো চকচকে পুতুলটা আজ বিকেলেও ও শান্তিলতার কয়লা-ঘুঁটের চাঁইয়ের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিল, মায়া অন্ধকারে ঘুঁটের সঙ্গে সেটাও নিয়ে এসেছে। এখানে এইভাবে পুতুলটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল নাণ্টু।

মায়া নাণ্টুর চোখ দেখে বোধহয় ভয় পেল সামান্য। এগিয়ে এসে বলল, 'তুই একটু খ্যাল্ ওদের সঙ্গে, এঁ্যা?' মুখে বলে নাণ্টুকে ইশারা করল খেলবার। নাণ্টু এগিয়ে গেলে মায়া প্যাকেট দু'টো টানতে টানতে ঘরের কয়লা ঢালার ফাঁকা জায়গাটায় সরিয়ে রাখল।

মৃগাঙ্ক ততক্ষণে তেতলায় ওর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শান্তিলতা

একটা বাতি জ্বেলে ঘরের একদিকে পটের সামনে আহ্নিকে স্থির। মৃগাঙ্ক ঘরে ঢুকল।

'উঁ-উঁ-উঁ!' পূজো করতে করতে শান্তিলতা যেন কোন কথা না বলে চেঁচিয়ে উঠল। কটমট করে তাকাল মৃগাঙ্কর দিকে। শান্তিলতা নীরব থেকেই এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়ল। হাতের আঙুলে একভাবে গাঁট গুণে চলেছে, মুখে বিড বিড করছে, আর চোখে মৃগাঙ্কর প্রতি এক নীরব কঠিন শাসন।

মৃগাঙ্ক বুঝতে পারল। শান্তিলতার সন্ধ্যাহ্নিকের এলাকায় পা দিয়ে ফেলেছে। এখনি শান্তিলতাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে ভেবে চকিতে পিছিয়ে এল। ঘামে পোশাকগুলো দড়ির আলনায় ঝুলিয়ে রেখে লুঙ্গি পরে তক্তপোষে গা এলিয়ে দিল। ও ঘরে ছোটছেলে বছর পনেরোর নীরদ টিমটিমে বাতির সামনে পড়া মুখস্থ করছে।

পুজো শেষ। প্রদীপ হাতে শান্তিলতা উঠে দাঁড়াতেই মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, 'প্রবোধ-সুবোধ বাড়ি ফেরেনি?' প্রবোধ মৃগাঙ্কর বড়ছেলে, বি. এ পাশ করে বছর ছয়েক বেকার। সুবোধ তিন বছর পর পর ফেল করে শেষে গেল বছর বই খুলে টুকে বি. এস্‌সি. পাশ করেছে। এখনো চাকরী জোটাতে পারে নি, টিউশানি করতেও ভয় পায়।

'ফিরবে না কেন? ঠিক সময়ে ফিরে, গিলে আবার আড্ডায় বেরিয়েছে।' গলা উঁচু হল শান্তিলতার, 'বাপ যেমন, ছেলেরাও তো তাই হবে! নিজের অফিসেও একটা চাকরী জুটিয়ে দিতে পারলে না, আবার বড় বড় কথা বল!'

মৃগাঙ্ক চুপ করে রইল। চার মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। যা দিনকাল, একটা ছেলেরও চাকরী হচ্ছে না। জিনিস-পত্তরের দাম হু হু করে বাড়ছে। মৃগাঙ্কর একার আয়। স্বাস্থ্যটা রাখতে পেরেছে বলে তবু খাটতে পারছে। কিন্তু তারপর? ভয়ঙ্কর ক্লান্তিতে মৃগাঙ্কর যেন মাথার মধ্যে ঝম ঝম করে হাতে বেড়ি-দেওয়া শিকলের শব্দ হল। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। মৃগাঙ্ক পৈতেটা পিঠের নীচে থেকে টেনে গলায় জড়াল।

অন্ধকারে ওঘরে যাবার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেল শান্তিলতা। হাতের প্রদীপটা ছিটকে পড়ে গেল মেঝেয়।

'আঃ, কি হল!' দ্রুত উঠে বসল মৃগাঙ্ক। 'সাবধানে যাও।'

শান্তিলতা মুখিয়ে উঠল। 'ন্যাকামো কোর না। অনেক দরদ দেখিয়েছ, আর না।'

মৃগাঙ্কর চাপা বিরক্তি ঠেলে উঠল। এই মাসের শেষে অফিসে কুড়িটা টাকা ধার করতে গিয়ে অন্য কয়েকবারের মত এবারেও অপমানিত হয়েছে। সেই বিরক্তির সঙ্গে শান্তিলতার কর্কশ কণ্ঠ আর বিচ্ছিরি শব্দগুলো মিলে যেন থাপ্পড় মারল ওকে। 'চেঁচাচ্ছ কেন? মায়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? তাই এত রাগ?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল শান্তিলতা, অন্ধকারেই মৃগাঙ্কর দিকে ঘুরল। 'এর মধ্যে কে আবার খবরটা দিল তোমাকে? ওই মাগিটা বুঝি? ঠিক এই অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে লাগিয়েছে!'

'আঃ, ভালভাবে কথা বলো।' মৃগাঙ্ক ছোটছেলের দিকে তাকাল। মনে পড়ে গেল মায়ার প্রসঙ্গটা তুলে ভুল করেছে, শেফালির কথা তো বলতে পারবে না!

'চুপ করো!' দাঁতে দাঁতে চাপল শান্তিলতা। 'এখন বুঝছি, তোমাকেও পাকড়েছে ওই ডাইনিটা!'

'শান্তি! কি বলছ তুমি!' মৃগাঙ্ক অসহায়ের মত বলল।

'ঠিক বলেছি। না হলে এত জোর পায় কোত্থেকে? সকালে বাসন মাজছি নীচে, দুই ছেলে-মেয়ে সামনেই পেচ্ছাব পায়খানা করেছে। বলেছি বলে কি রাগ! কি কথা শোনাল! এখন বুঝেছি, তোমার জোরেই সে এত।'

'শান্তি!'

'চুপ করো।' শান্তিলতা ধমক দিল। 'আমি কি বুঝি না, কেন আজ কুড়ি বছর ধরে এ বাড়ি আঁকড়ে পড়ে আছ? এমন পুরনো ঝরঝরে বস্তিবাড়ির মত একটা বাড়ি, না আছে আব্রু, না কিছু!' একটু থামল শান্তিলতা, হাঁপাচ্ছে, যেন দম নিল. 'আমি সব বুঝি। ওই সব মেয়েদের দেখ. ফষ্টিনষ্টি কর, এ আর অন্য জায়গায় পাবে কোথায়?' যেন ভেঙাল শান্তিলতা।

মৃগাঙ্ক হতবাক। কে যেন মাথার মধ্যে কামড়ে ধরল। উঠে গিয়ে বারান্দার দিকের দরজা বন্ধ করল। শান্তিলতার গলা অনেকে উঁচু। তক্তপোষে বসতে বসতে বলল, 'বাজে কথা বোল না, কত নীচে নামছ তুমি!'

'আমি নীচ! বেশী বোল না—তোমার সব কথা বলে দেব।'

'কি, কি কথা?' মৃগাঙ্ক যেন রাগে বিড় বিড় করল শব্দগুলো। মনে পড়ল. বিয়ের পর থেকে শান্তিলতা ওকে কিভাবে দাঁতে দাঁত চিপে সব ব্যাপারে শাসন করে এসেছে। ওর মিথ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস থেকে একটি দিনও রেহাই পায়নি·

মৃগাঙ্ক। মুখ বুজে নিজের সখ-সুখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে ওর মর্জিমত খেটে গেছে টাকা উপায়ের জন্যে। শান্তিপ্রিয় মৃগাঙ্ক একটি দিনও মুক্তি পায়নি। কি একটা কথা কানে আসতেই মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে উঠল, 'মুখ সামলে কথা বল।'

'কেন, মারবে নাকি ?'

'না, ছেলেটা সামনে আছে।' মৃগাঙ্ক আবার নিজেকে সংযত রেখে যেন বিড় বিড় করল। দেখল, নীরদ পড়া থামিয়ে চুপ করে বসে আছে।

'ওরাও জানে, বোঝে। বাবাকে চেনে ওরা।'

'শান্তি !'

'আমি চোখ-রাঙানিতে ভয় পাই না।' একটু থামল শান্তিলতা, 'মনে নেই নীচের তলায় আইবুড়ো সোমত্ত ঝি কনকটা যখন কাজ করত, কি করতে ? কেমন লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতে, আড়ালে ফষ্টি নষ্টি করতে। ভাবতে, আমি কিচ্ছু টের পাব না।'

'কি, কি বললে ! এত নীচে নামতে পারছ !' কথাগুলো জড়িয়ে যেতে মৃগাঙ্ক যেন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। ডান দিকে বাতির স্তিমিত আলোর সামনে মেঝেয় ঠাকুরের পিতলের লম্বা পিলসুজটা চক চক করছিল। এখনি হাতের মুঠোয় নিতে পারত। হঠাৎ ওঘরে টিমটিমে আলোয় ছোটছেলের ভীত চোখ অন্ধকারেও ধাক্কা দিল। মৃগাঙ্ক থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে শান্তিলতার পাতলা চেহারার প্রেতের মত ছায়াটা দেখল।

...মাথার মধ্যে সেই হাত-বাঁধা বেড়ির শিকলে ঝমঝম শব্দ। পুলিসের গুলি ছোঁড়ার শাঁ শাঁ শব্দগুলো শুনছে মৃগাঙ্ক। একের পর এক বাইশ-তেইশ বছরের তরতাজা জোয়ানগুলো সেই নির্জন অন্ধকার মাঠের কোণে শরীর ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে বুটের শব্দ আর গুলির মধ্যে ...!

মৃগাঙ্ক আলনায় সদ্য-ছাড়া জামাটার সামনে এল। ভক্ করে সারাদিনের পচা ঘামের টক গন্ধ নাকে এল। ধার করা কুড়ি টাকার মধ্যে দশটাকার নোটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে খালি পায়ে বারান্দায় এল। টলছে। মাথার মধ্যে আগুন। চারপাশে ভীষণ, যেনবা দমবন্ধ-করা অন্ধকার। ওপাশের দুটি ঘরের দিকে তাকাল। বন্ধু সুধাংশুকে সাবলেট করা। সুধাংশু মারা গেছে বছর ছয়েক। দু'ছেলে এক মেয়ে কি অমানুষিক পরিশ্রম করছে। বিধবা মা, দু' ভাই আর বোন এ বাড়ি থেকে যেন একেবারে আলাদা হয়ে থাকে। খুব প্রয়োজনে মৃগাঙ্কর সঙ্গে যা একটু কথা বলে, আর কারোর সঙ্গে নয়। দরজা বন্ধ করে যেন এই বাড়ি

থেকে আলাদা জগত করে রাখে। কি শান্তি ওদের! বন্ধ দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একসময়ে অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে দোতলায় নামার সিঁড়ির দিকে এগোল।

দোতলায় শেফালি স্বামী অরবিন্দর পাশে বসে বুকে-গায়ে হাত বুলোচ্ছে। মাথার কাছে নান্টু অবাক হয়ে অরবিন্দকে দেখছে। একটু আগে ও মায়ার ঘর থেকে চলে এসেছে।

'সত্যি, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না? দেখো, আমি আর ক'দিন পরেই ভাল হয়ে উঠব।' অরবিন্দ শেফালির হাত ধরল।

শেফালি অরবিন্দর আবছা অন্ধকারে ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাথার কাছে বাতি জ্বলছে।

'কি, তুমি কথা বলছ না কেন?' অরবিন্দ শেফালির হাত টানল। 'জান তো, মুকুন্দ সেদিন বলে গেছে, বাকি ছাঁটাই-করাদের নিয়ে আরও লোক নেবে। এবার মুকুন্দ-আমি সবাই চাকরী পাব।'

'যখন পাবে পাবে, এখন চুপ করো।'

'তুমি কষ্ট পাচ্ছ?' অরবিন্দ যেন মুষড়ে পড়ল। ঘোলাটে বিষণ্ণ চোখে শেফালির দিকে তাকাল। 'জান, আমি কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, আমার ডান পা-টা ঠিক বাঁ পায়ের মত হয়ে গেছে। আমি একেবারে নরম্যাল। এই তো গতকাল ভোরেও স্বপ্ন দেখেছি। আর এক সপ্তাহ পরেই উঠে দাঁড়াব। তখন তোমার সব টাকা শোধ করে দেব। তুমি গয়না করে নিও।' অরবিন্দ কথাগুলো বলতে বলতে যেন হাঁপাচ্ছে।

'তুমি কেন এসব বলছ বল তো?' শেফালির গলা ভারি হয়ে এল। 'ডাক্তারবাবু কথা বলতে বারণ করেছেন না?' শেফালি অরবিন্দর বুকের হাড়গুলোয় হাত বুলোতে লাগল।

অরবিন্দ যেন শিশু হয়ে গেল। 'আমার যে ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে শেফালি, আমি যে অনেকদিন বাঁচতে চাই। বিশ্বাস করো, এত কষ্টের মধ্যেও আমার মরতে এতটুকু ইচ্ছে করে না, একটুও না। ঠিক তুমি যেমন আমার জন্যে বাঁচতে চাইছ, সেই রকম।'

শেফালি ঝুঁকে পড়ল। 'থাক, বেশী কথা বোল না, কাল ডাক্তার নিয়ে আসব।' মৃগাঙ্কর কাছে চাওয়া দশটা টাকার স্মৃতি শেফালির চকিতে মনে পড়ে গেল।

অরবিন্দ কি ভাবছিল, অন্যমনস্ক। বলল, 'জান শেফালি, ছাটাই হওয়ার পর অমন ভেঙে পড়া আমায় উচিত হয়নি, না? ডাক্তারবাবুও বলছিলেন, সে সময়ে খাওয়াটাও খারাপ হচ্ছিল। কি করব বল, আমি কোন অন্যায় করিনি, পাপ করিনি, তবু কেন যে আমার চাকরী গেল—এই ভাবনাই আমাকে পাগল করে তুলেছিল। অথচ দেখ, ফ্যাক্টরি খোলার পর এত লোক নিল, মুকুন্দকেও তো নেয়নি! ছেলেমেয়ে-বউ নিয়ে ও তো আজও ভেঙে পড়েনি! আমি শালা একটা বোকা।' অরবিন্দ যেন কি এক অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল। উত্তেজনায় অরবিন্দ অবশ।

শেফালি অরবিন্দর কথা কিছু শুনছিল, কিছু বা কানে যাচ্ছিল না। ওর কানে সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামা মৃগাঙ্কর পায়ের খস্ খস্ শব্দ আসছিল। উঠে দাঁড়াল। 'লক্ষ্মীটি, তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক, আমি এখনি আসছি।' নান্টুর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল, 'তুই একটু এখানে বোস, এঁ্যা।'

শেফালি বাইরে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত পা চালিয়ে সিঁড়ির মুখে এল। চেয়ে দেখল, ওকোণে মায়ার দরজা বন্ধ।

সামান্য দূরে থেকে মৃগাঙ্ক ফিস ফিস করল, 'কে?'

'আমি।' শেফালি গলা অনেক নামাল। 'বৌদির সঙ্গে খুব ঝগড়া হচ্ছিল বুঝি?'

'ওর কথা ছেড়ে দাও।' নামতে নামতে মৃগাঙ্ক ফিস ফিস করল। উত্তেজনায় গলা বোধ হয় কাঁপছে।

মৃগাঙ্ক শেফালির সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ শেফালির হাত জোরে ধরে টেনে ওপাশে নিয়ে গেল। বারান্দার ওদিকে পরিত্যক্ত অংশটা নির্জন। কেউ বড একটা আসেনা। পায়রাদের শুকনো পায়খানার বিশ্রী গন্ধে ভর্তি।

'এদিকে কেন?' শেফালি ফিস ফিস করল। 'ছাড়ো, ভাল লাগছে না একটুও!'

'এই নাও।' হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়েই জোরে শেফালিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল মৃগাঙ্ক। ঠোঁট কামড়ে ধরল।

কোনরকমে ঠোঁট সরিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নান্টুটা কিন্তু সামনেই আছে। ও দেখতে পাবে, ছাড়ো এখন।' অসহায় শেফালি স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

'দেখলে কি হয়েছে? একটা হাবা-কালা তো?'

'ওর চোখ দুটোকে আমার ভীষণ ভয় করে। কেমন করে তাকায়। মনে হয় ও মানুষের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়।'

'দেখুক।' বেপরোয়া মৃগাঙ্ক শেফালিকে পাগলের মত চুমু খেতে খেতে পায়রাদের শুকনো পায়খানা ছড়ানো মেঝেয় শুইয়ে দিল।

নান্টু সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় চোখ মেলে স্থির হয়ে রইল।

একতলায় নামার সিঁড়িতে পা দিতে যাবে মৃগাঙ্ক, শিবনাথের চার ব্যাটারির টর্চের আলো এসে পড়ল গায়ে। আলোটা নাচতে নাচতে দোতলার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। যেভাবে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, এখন ঠিক সেইভাবে শিবনাথ পাশ দিয়ে চলে গেল। যেন মৃগাঙ্ককে দেখতেই পায়নি।

নান্টু চারতলায় ওঠার মাঝের চাতালটায় দাঁড়িয়ে ছিল। শিবনাথ ওকে একবার দেখল। ওর সারা শরীরে আলো ফেলে একবার হাসল। 'কিরে, ছাদে যাচ্ছিস!' বলেই নান্টুর মাথায় একটা টোকা মেরে ওর ফ্ল্যাটের কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। গেটের ভিতরে দরজা। সুরেশপ্রসাদ দরজা খুলে দিলে ভিতরে পা দিল।

'কি, সব ঠিক আছে?' সুরেশ বলল।

'সব ঠিক। তাড়াতাড়ি করো। আজ প্রথম আলো নিভেছে। পাড়ায় বলছে, তাড়াতাড়ি আবার জ্বলে যেতেও পারে। তার আগেই—'শিবনাথ ইশারা করল।

নান্টু চাতালটার এক কোণে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল।

দুটি লোকের সঙ্গে সুরেশপ্রসাদ নামছে। পিছনে শিবনাথ। সুরেশপ্রসাদের হাতে চ্যাপ্‌টা ধরনের চারকোণা কালো বাক্স। খুব সতর্কভাবে হাতে নিয়েছে সুরেশপ্রসাদ। আগের দুটি লোকের হাতে দুটো চামড়ার সুটকেশ।

শিবনাথ টর্চ জ্বালেনি। সুরেশপ্রসাদ কি একটা ফিস ফিস করে বলতেই শিবনাথ হাসল। 'দূর, এরপর পুলিসের বাবা কি, ভগবানের চোদ্দপুরুষও টের পাবে না।' একটু থামল, 'তবে আলো জ্বললে পুলিস আসতে পারে বলে মনে হচ্ছে, সেইরকম খবরই পেয়েছি। খুব সাবধানে যাও। এখন বাইরে কেউ নেই।'

লোকদুটি আর সুরেশপ্রসাদ দ্রুত নামছে। ওরা একতলার চাতালে গেছে, শিবনাথ তখন দোতলার বারান্দায়।

'আমাকে কি আর যেতে হবে ?'

'না।' সুরেশপ্রসাদ বলল, 'আর আসতে হবে না।'

'তবু একতলা পর্যন্ত একবার নামি।'

হঠাৎ মায়া শিবনাথের হাত ধরল। ওরা তখন প্যাসেজের অন্ধকারে ঢুকে পড়েছে। মায়া ফিস ফিস করল 'কি ?'

'ভাল।' শিবনাথ চতুর হাসল।

'ওপরে যাব, কেউ তো নেই !'

'রাখালবাবু কখন ফিরবেন ?'

'ও আজ থেকে বনগাঁ লাইনে ক্যানভাসে লেগেছে। ফিরতে রাত হবে।' ফিস ফিস করে বলল মায়া।

শিবনাথ কি যেন ভাবল, 'চল, কিন্তু সেই বোবা-কালা নান্টুটা ওপরে গেছে।'

'যাক, ও আবার কি বুঝবে ?' মায়া হাসল। 'আজ মনে হচ্ছে একটু বেশী খেয়েছ ?'

'কেন, খুব গন্ধ পাচ্ছ ?'

ওরা তিনতলায় বারান্দায় পা দিতেই মায়া বলল, 'তাড়াতাড়ি চল। সামনেই রাক্ষুসীটার ঘর। বেরিয়ে পড়তে পারে, রুগ্নটার যা শুকুনের মত চোখ।'

'কার, শান্তিলতার ?' শিবনাথ হাসল।

'ওর নয়তো কার ?' মায়া নিতম্ব দিয়ে শিবনাথকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে চারতলার সিঁড়িতে পা রাখল।

'এবার পুলিশের বাবাও ধরতে পারবে না।' শিবনাথ নিঃশব্দে হাসল।

'পুলিশ সত্যি আসবে নাকি ?' মায়া ভয়ে আঁতকে উঠল, 'তবে তোমার তো পুলিশ চেনা।' মায়া যেন একটু আশ্বস্ত।

'এই অন্ধকারে এলে ভয় কি ? আমার বউ তো এখন ঘরেই। কি, তাই না ?' শিবনাথ মায়ার হাত ধরে ওপরে এল।

নান্টু তেতলা পর্যন্ত নেমে এসেছিল। ওদের ওপরে উঠতে দেখে নান্টুও পিছু পিছু উঠতে লাগল। অন্ধকারের মত নিশ্ছিদ্র নির্বাক আড়ষ্টতায় দেখল, মায়া-শিবনাথ ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

বড় ছাদটার এ কোণে দুখানা মাত্র ঘর। বিয়ের আগে বিজন একা এখানে থাকত। সামান্য ক'দিন আগে বিয়ে করে গ্রামের মেয়ে প্রভাতীকে নিয়ে এখানে উঠেছে।

প্রভাতী তোলা জলে গা ধুয়ে পাশের ঘরে কাপড় বদলাচ্ছিল। এই মাত্র এ ঘরে ঢুকে বলল 'কেমন জব্দ, বাইরে বেরুতে পারলে না। বেশ হয়েছে।'

বিজন সিগারেট টানতে টানতে হাসল। 'তোমার কথা বন্ধ কর তো, এখন আলো জ্বাল। কতক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকব ?'

'দাঁড়াও, এখন বাতি কোথায় আছে খুঁজি।'

ফস্ করে দেশলাই কাঠি জ্বালল বিজন। একটু আগে সিগারেট ধরিয়েছে, হাতে দেশলাই বাক্সটা ছিল। 'উঃ, কতক্ষণ ধরে যে গা ধোও! তবু যদি খুব মোটাসোটা চেহারা হত!' বিজন খুক খুক শব্দ করল। 'গ্রামের পুকুরে সাঁতার কাটার অভ্যেস তো।'

'থাক্, এমন সন্ধ্যেয় খুঁটো না তো।' প্রভাতী খিল খিল করে হেসে উঠল. বাতি খুঁজছে। 'দুর, বাতি পাওয়া যাচ্ছে না।'

'বাতি জ্বাললে তোমাকে রেখে একবার চারতলার শিবনাথবাবুর কাছে যাব ভাবছিলাম।' বিজন ঈষৎ চিন্তিত।

'কেন ? টাকা ধার করতে ?' প্রভাতী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিজনের দিকে তাকাল।

'মাসের শেষে কিছু টাকা দরকার।'

'তুমি ওঁর কাছ থেকে নিও না। আমার ভাল লাগে না।'

'লোকটা যাই হোক না, তাতে কি ? আমার টাকাটা দরকার। ওর কাছে না পেলে নীচে জয়াদের কাছে একবার যাবো।'

'আমাকে গ্রাম থেকে এনে খুব অসুবিধেয় পড়েছ, না ?' প্রভাতীর কণ্ঠ করুণ, অসহায়।

বিজন সিগারেট মুখে কিছু যেন ভাবছে। প্রভাতী নিশ্চুপ।

'যাই বল, আমার এ বাড়িটাকে একটুও ভাল লাগে না। তবু ছাদের ঘরটা পেয়েছ, তাই রক্ষে। সারা বাড়িটায় ওপর-নীচ করলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।' প্রভাতী যেন বিড় বিড় করল। একটু থেমে বলল, 'বন্ধুদের কারোর থেকে নাও, এখানে কাউকে চেয়ো না!'

'তাই যাব! তা-ও তো এই অন্ধকারে সারা পৃথিবীটা মাড়িয়ে যেতে হবে। বাড় নয় তো যেন একটা পৃথিবী! যেমন এই অন্ধকার, তেমনি লোকজন! উফ্।'

'কেন! এরা কি ?'

'ও কিছু না।' বিজন হঠাৎ সহজ হল। যেনবা দমবন্ধ করা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চল, একটু ছাদে যাই। ভীষণ গরম লাগছে।' বিজন ছাদে এল।

তারাভরা নিঃসীম আকাশের আলোয় ছাদের মেঝে একটু স্পষ্ট।

বিজনের পিছু পিছু প্রভাতী ছাদে এসেছে।

'ছাদে এ সময় দারুণ লাগছে, তাই না? এরকম অন্ধকার এখানে কোনদিন দেখেছ?' বিজনের পাশে এসে দাঁড়াল প্রভাতী।

'নাহ্, সত্যি অপূর্ব! যুদ্ধের সময় অন্ধকার হত, কিন্তু কারেণ্ট চলে-যাওয়া এরকম অন্ধকার হত না।' বিজন অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলল।

'ইস্, আকাশটা একবার দেখ! কি সুন্দর লাগছে, নক্ষত্রে ঠাসা। গ্রামের অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ঠিক এই রকম লাগত।'

'খুব ভাল বলেছ।' বিজন প্রভাতীর দিকে তাকাল। কিছু সময় নীরব থেকে বিজন বলল, 'জান প্রভাতী, এই বাড়ির মধ্যে থাকলে মনে হয় বেশী দিন বাঁচব না, আমাদের যেন কিছু করবার থাকবে না। আর বাইরে এলে মনে হয় অনেকদিন একেবারে সুস্থ মানুষের মত বাঁচতে পারব। আমাদের যত অভাবই থাক—'

পিছনে শব্দ হতেই প্রভাতী ফিরে তাকাল! নাণ্টু দাঁড়িয়ে। 'দেখ, নাণ্টু এই অন্ধকারে ওপরে এসেছে। ইস্, একটুও ভয়-ডর নেই!'

'বোবা-কালা হলে কি হবে, কি নিষ্পাপ দেখেছ মুখ-চোখ! ওই সুন্দর বড় বড় চোখে ও কিন্তু সব দেখে, বুঝতে পারে।'

প্রভাতী নাণ্টুকে কোলের কাছে টেনে আনল। আঙুল দিয়ে নরম চিবুকে আদর করতে করতে ওদের মাঝখানে রাখল। নাণ্টুর খুব ভাল লাগছে এখন। নাণ্টু বড় বড় চোখে প্রভাতীর দিকে তাকিয়েই হাসল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে আলো জ্বলে উঠল।

দোতলায় শেফালির স্বামী অরবিন্দ দেয়ালের দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। শেফালি মেঝেয় বসে কেন যেন বমি করছে। পিঠের জামায়, মাথার এলিয়ে-পড়া খোঁপায় পায়রার শুকনো পায়খানা জড়ানো। শেফালি ডান হাতের মুঠো খুলে দশ টাকার নোটটা মেঝেয় ফেলে দিল। ওর সারা শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে।

পাশের ঘরে মায়া লক্ষ্মীর পটের কাছে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করল, 'উহু আলো সত্যি জ্বলল তাহলে। কি অলক্ষণ? সন্ধের সময় পুজোয় বসতে দেয় নি।'

বলতে বলতে মেঝেয় বসল। বার বার কপালের ওপর জড়ো-করা হাত ঠেকাতে লাগল।

নীচে শ্যাওলা-ধরা চাতালে মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। বারোয়ারী চৌবাচ্চা থেকে বাসি জল একভাবে ঢেকে চলেছে গায়ে-মাথায়।

হঠাৎ একতলায় কান্নার রোল উঠল। ছাদের প্রভাতী-বিজন নান্টুর হাত ধরে দ্রুত এপাশের কার্নিশের সামনে এল। নীচের দিকে একটু ঝুঁকল। নান্টু কিছু বুঝতে না পেরে ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নীচে দয়ালবাবু কখন মারা গেছেন, প্রভাবতীর খেয়াল ছিল না। কান্নাটা দয়ালবাবুর ঘর থেকে আসছে।





মধ্যদুপুর

মেয়েদের স্কুলের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল টিপু। আগে এখানে যতবার এসেছে, এভাবে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যেত দিদিমণিদের স্টাফরুমের সামনে। কোন লজ্জা, সংকোচ, ভয় বা আড়ষ্টতা থাকত না হাঁটা-চলায়। আজ তা করল না। কাঁধে ঝোলানো বই-এর ভারী ব্যাগটাকে একটু আলগা করল। ক্যাম্বিসের ব্যাগের স্ট্র্যাপে কাঁধ জ্বালা করছিল। তার ওপর এমন মধ্যদুপুরে প্রচণ্ড রোদ। একটু আগেও টিপুর ভয়ংকর রাগ ছিল ভিতরে। এখন যেন একধরনের চাপা ভয়, হঠাৎ কোন কিছু বিস্বাদ হয়ে যাওয়ার মত অস্বস্তিকর আড়ষ্টতা।

টিপু গেটের মুখে ছায়ার নীচে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। একটু আগেই টিফিন হয়েছে স্কুলের। কয়েকটা ফ্রক-পরা সুন্দরী কিশোরী স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। টিপু ওদের দিকে তাকিয়ে নির্বিকার। একসময় স্কুলের মধ্যে ঢুকে একতলায় দিদিমণিদের স্টাফরুমের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীরা স্টাফরুমের টেবিলে খাতা রেখে মন দিয়ে কি দেখছিল। ঠিক এই মুহূর্তে স্টাফরুমে হেডমিসট্রেস ছাড়া আর কেউ নেই। হেডমিসট্রেস স্নেহলতা মুখ টিপে হেসে বলল, 'নীরা, তোমার ছোট্ট বন্ধুটি এসে গেছে, দেখ।'

নীরা খাতা দেখায় নিবিষ্ট ছিল। ভিতরে অকারণ চমকে দরজার সামনে তাকাল। 'ও, তুই! যাচ্ছি, তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া।' নীরা খাতাপত্তর গুছিয়ে আলমারীর মধ্যে রাখল। ততক্ষণে টিপু অন্যদিনের মত আজও এই মুহূর্তে গেটের মুখে সেই ছায়াটায় আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নীরা হেডমিস্‌ট্রেসের দিকে তাকাল। 'বড়দি, আমি একটু বেরুচ্ছি। টিফিনের পরে তো আমার পর পর দু'পিরিয়ড অফ্‌।'

'দুটো পিরিয়ড কাটিয়ে তো ?' স্নেহলতা হাসছে।

নীরার চিবুক হঠাৎ সলজ্জ লাল হয়ে গেল। টিপ এলে বড়দির মুখের হাসি কেন যে নীরাকে এত অপ্রস্তুত করে দেয়, নীরা নিজেই ঠিক বুঝতে পারে না। নাকি বড়দি ভেবেছে, টিপুর সঙ্গে এভাবে বেরিয়ে নীরা দুটো অফ্‌ পিরিয়ড স্বদেশের সঙ্গে কাটাবে! টিপুটা বেরুবার ছুতো মাত্র! তা ভাবলে নীরা অবশ্য একেবারেই আশ্বস্ত হয়!

কয়েক মুহূর্তের চকিত ভাবনায় নীরা যেন সহজ হয়ে গেল। 'এলে অসুবিধে হবে না তো ? আজ সকলেই তো স্কুলে প্রেজেন্ট আছে ?'

'ঠিক আছে যাও, তবে ফিরে এসো কিন্তু!'

নীরা স্বচ্ছন্দ হাসির শব্দ করে বেরিয়ে এল। স্কুলের গেটের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার রে টিপু ? আজ এমন বই-এর ব্যাগ নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছিস ? ছুটি নিয়ে চলে এসেছিস বুঝি ?' নীরার গলায় সূক্ষ্ম শাসনে-আদরে মেশানো প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। আজ শরীরটা ভাল নেই। আর স্কুলে যাব না। তোমার সঙ্গে কথা বলেই বাড়ি চলে যাব।' টিপু যেন নীরার মুখের দিকে না তাকিয়ে কথা-গুলো বলল। একটু গম্ভীর গলা।

'তাহলে রোদে ঘুরছিস কেন, চল্‌ রেস্টুরেন্টে বসি। কিছু খেয়ে-দেয়ে বাড়ি যাবি।' নীরা এগোল। পিছু পিছু টিপুও হাঁটতে লাগল।

কেবিনে ঢুকেই টিপু নীরার পাশে না বসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, নীরা যেন ধমক দিল, 'কি রে, ওদিকে বসছিস কেন ? আমার পাশে আয় !'

'থাক, আমি এ-পাশটায় বসি।'

নীরা টিপুর হাতটা হঠাৎ ধরল। কি ব্যাপার! মনে হচ্ছে অনেক বড় হয়ে গেছিস! তোর নীরাদির পাশে বসতে লজ্জা করছে!' একটু থামল নীরা। চোখ পিট পিট করে মাথা-হেঁট দাঁড়িয়ে-থাকা টিপুকে দেখতে দেখতে বলল, 'উঁহু, মনে হচ্ছে বাবুর খুব রাগ হয়েছে! তাহলে তো আমার পাশে বসতেই হবে!' একটু জোরে টেনে ওর পাশে বসালো টিপুকে।

এবার নীরা টিপুকে ভাল করে দেখতে লাগল। কোন একটা সন্দেহ মনের

মধ্যে ছায়া ফেলল নীরার। 'এই', ঠেলা দিল টিপুর গায়ে, 'কেশবদের সঙ্গে খুব মিশছিস বুঝি আজকাল?'

টিপু মুখ তুলে একবার নীরাকে দেখে নিয়ে দৃষ্টি নামাল।

'তোকে বারণ করেছি না! ওরা খুব ভাল ছেলে নয়। ওরাই বুঝি তোকে কিছু বলেছে?' নীরার স্বরে কৃত্রিম ধমক।

'ওরা আবার কি বলবে?' টিপু বিড় বিড় করল, 'ওরা অনেক ভাল। যা করবে বলে ঠিক করে, তা-ই করে। কথার নড়চড় করে না।'

'মানে!' নীরার স্বর হঠাৎ থমকে দাঁড়ানোর মত।

টিপু উপেক্ষা আর অভিমানের মিশ্রিত ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকায়।

বেয়ারা ঢুকলো।

নীরা নিজেকে মুহূর্তে স্বাভাবিক করল। 'কি খাবি বল? মোগলাই পরটা মাংস?'

'নাহ, কিছু খাব না।'

নীরা মুখ টিপে হাসল। 'আমারও আজ ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে যে।'

টিপু তাকাল নীরার দিকে। 'তুমি খাও, আমার ভাল্লাগছে না।'

'তা কি হয়!' বেয়ারার দিকে তাকিয়ে নীরা অর্ডার দিল।

'একটু দেরী হবে দিতে।' বেয়ারা বলল।

'তা হোক। চা-টা একসঙ্গে দিও না।' নীরা বেয়ারার দিকে তাকাল। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে যেতে নীরা বলল, 'তোর বই-এর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখ তো। যা ভারী!' নিজেই টেনে তুলে আনল ব্যাগটাকে: টেবিলের একধারে রেখে টিপুর দিকে তাকাল। টিপুর সুন্দর ফর্সা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে টিপু। এখন ইলেভ্‌ন্‌-এ পড়ছে। কত বয়স হল? সতেরো চলেছে। মাথায় কালো কোঁচকানো ঘন চুল। সুন্দর নাক, মুখ, চোখ, চিবুক। যৌবন আসায় মুখে ঠোঁট দুটো বেশ পুরু, পুরুষালি হয়ে উঠেছে। খাঁটি দুধ-ঘি-মাখন-খাওয়া শরীর টিপুর। মাখনের মত শরীর, শরীরের আভা। হাতে-পায়ে একটু সোনালী আভার লোম। স্বভাব কেমন ধীর, শান্ত। বড় হলে টিপু চওড়া কাঁধ আর প্রশস্ত বুকে অনেক সুন্দর হবে!

হঠাৎ গা শিরশির করে উঠল নীরার। টেবিলের দিকে চোখ রেখে টিপু একভাবে বসে আছে। 'শরীর খারাপ বলছিলি না, কই দেখি!' নীরা টিপুর বাঁ-দিকের চিবুকে হাত রাখল, কপালে হাত বোলাল। আদর করার মত নরম

চিবুক টিপে দিয়েই বলল, 'দুর, কই না তো, গা একেবারে ঠাণ্ডা!' নীরা হেসে উঠল। 'আচ্ছা দুষ্টু হয়েছিস তো?'

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পর টিপু এতক্ষণ টেবিল থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসেছিল। হঠাৎ নীরার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ ঘোরাল।

'আমায় কিছু বলবি?' নীরা উৎফুল্ল চোখে হাসতে হাসতে বলল। টিপুর একটা হাতের মুঠি ধরে নরম আঙুলগুলোয় সুড়সুড়ি দিয়ে ওর পরিচিত হাতের খেলা খেলছে নিজের খেয়ালে।

টিপু ওর হাত সরিয়ে নিল। আবার তাকাল নীরার দিকে। ভিতরে যেন সেই বাঘের মত চাপা রাগটা এবার গরগর করতে শুরু করেছে।

'কি-রে, কি দেখছিস?' নীরা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'আমি কি তোর কাছে নতুন?' বলেই ঘনিষ্ঠ আদরের ভঙ্গিতে টিপুকে এক হাত দিয়ে ধরে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে নিল।

'নীরাদি, একটা কথা বলব?'

নীরা অবাক। 'বলবি কি রে! বল্? আবার জিজ্ঞেস করতে হবে?'

'আজ সকালে স্কুলে আসার সময় তুমি কার সঙ্গে আসছিলে?'

নীরা টিপুকে ছেড়ে দিল। টিপু সোজা হয়ে বসল।

'কখন দেখেছিস?'

'আমি তখন স্কুলে। লাস্ট-বেঞ্চে বসেছিলাম। জানলা থেকে দেখেছি তোমাদের দুজনকে। খুব হাসছিলে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নীরা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। 'ওহো, এই জন্যে মুখ গোমড়া?'

'ও কে বলো?' টিপুর কঠিন গলা।

'আরে, ও তোর স্বদেশদা, আমার বয়ফ্রেণ্ড। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব এবার।'

'আমি আগেও কয়েকবার দেখেছি তোমাদের, দূর থেকে।'

'কই, বলিসনি তো আমাকে? বেশ কথাটা লুকিয়ে ফেলেছিস!' নীরা খুব সহজ হয়ে উঠল।

'তুমি কি আমাকে আগে বলেছ? তুমিই তো আগে লুকিয়েছ!' টিপুর রাগটা এখন অভিমানে ঢাকা

নীরা চুপ করে গেল হঠাৎ।

'তোমার সঙ্গে কবে ভাব হল ?'

নীরা টিপুর রাগ দেখছিল। বলল, 'কেন, তোর হিংসে হচ্ছে বুঝি ?' আবার হেসে উঠল নীরা।

'বাজে কথা ছাড়। বল কতদিন ভাব হয়েছে ?'

'জেনে কি হবে ? ততদিন ধরে দুঃখে নতুন করে কাঁদতে বসবি বুঝি ?' বলেই বাচ্চা ছেলেকে আদর করার ভঙ্গিতে টিপুকে আবার কাছে টানল। 'বলছি তো, আলাপ করিয়ে দেব, স্বদেশদাকেই জিজ্ঞেস করবি।'

'আমি আলাপ করব না। তুমিই বল।'

টিপুকে ছেড়ে দিল নীরা। 'এই একবছর হল।' থামল নীরা। টিপুর কোন বদল হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করল। 'তুই আমার কাছে ঠিক থাকবি রে বোকা। তোর সঙ্গে কতদিনের সম্পর্ক বল্ তো !'

টিপু এবার স্পষ্ট করে তাকাল নীরার দিকে। 'তুমি ওকে ভালবাস ?'

'যদি বাসি,' হাসছে নীরা মুখ টিপে, 'তাতে কি ? ইস ! খুব বড় হয়ে গেছিস যে !'

'ওকে বিয়ে করবে ?'

'যদি করি,;' একটানা হেসে চলেছে নীরা।

টিপুর ভিতরে আবার সেই রাগ গরগর করে উঠল। চকিতে উঠে দাঁড়াল। 'আমি চলি নীরাদি।'

'এই, বোস্।' টেনে বসিয়ে দিল নীরা। বুঝল, সত্যি টিপু খুব রেগে গেছে।

'আমি বুঝতে পারি, তুমি তাই আমার সঙ্গে আজকাল ভাল করে মেশো না, কাছে ডাক না !'

'কে বলল ?' নীরা টিপুর চুলে বিলি কাটছে। টিপুকে নিখুঁত করে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন নীরা অনুভব করল—টিপুর রাগের সঙ্গত কারণ একটা আছে। টিপুকে কতদিন কাছে ডাকেনি ! রাগ তো হবেই !

'তুই আমার কাছে আগের মতই ঠিক থাকবি রে। তোকে কি ভুলতে পারি ?'

'তা কখনো হয় ?' ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে টিপু। কোমল ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে। 'বিয়ে করলে তুমি পাল্টে যাবে। তুমি আমার থাকবেই না।'

কেমন কষ্ট হল নীরার টিপুর জন্যে। 'বিয়ে সকলকেই করতে হবে-রে টিপু।

আমরা বড় হচ্ছি না বুঝি?' যেন দিদির মত বোঝাচ্ছে নীরা টিপুকে। 'আমি তো স্বদেশকেই বিয়ে করব। ও আমার থেকে বড়। তুই কত ছোট বল্?' গলার স্বরে হাসি জড়িয়ে খিক খিক শব্দ হ'ল নীরার। 'তোর একটা খুব ভাল বউ এনে দেব। আর একটু বড় হয়ে ওঠ্।'

'না।'

'যতক্ষণ না আরও বড় হবি ততক্ষণ আমার থাকবি।' নীরা যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে টিপুকে।

টিপু এবার স্পষ্ট করে নীরাকে দেখল। দু'চোখে জল টলটল করছে। হঠাৎ নীরার বুকের মধ্যে মুখ লুকোল টিপু। 'তুমি আমার, আমার, আমার! আর কেউ তোমাকে নিতে পারবে না।' ফুলে ফুলে কাঁদছে টিপু। 'তোমার কাছে আমি কাউকে সহ্য করব না।'

নীরার কেমন কষ্ট হল। টিপুর ঘন চুলে ঢাকা মাথাটা বুকে চেপে ধরে কাঁদতে দিল নীরা ওকে। নীরারও যেন এমন দুপুরে আগের অনেক দুপুরের মত টিপুর গরম নিঃশ্বাসের তাপ বড় আপন মনে হচ্ছে।

'এই বোকা ছেলে ওঠ্।' নীরা টিপুকে সোজা করে বসাল। 'কাঁদছিস কেন?' বুকের ওপর বেণীটা ঝুলছিল নীরার। পিঠে সরিয়ে বলল, 'আমি তো এখুনি তোর স্বদেশদাকে বিয়ে করছি না বোকা ছেলে।'

টিপু চুপ করে বসে রইল।

'আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছাখ।' থুতনি ধরে টিপুকে ডাকল নীরা। টিপু বড় বড় চোখে তাকাতেই কি ভেবে টিপুর চিবুকে হঠাৎ চুমু খেল। তার পর অতি সন্তর্পিত ভঙ্গিতে গভীর করে ঠোঁটে। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া এক সরল নির্বোধ পুরুষ বয়স্কা তরুণীর চুম্বনে তার সমস্ত রক্ত বুঝি নরম তুলোর মত উড়িয়ে-ছড়িয়ে দিতে পারে। টিপুর দুচোখ যেন বা তন্দ্রায় ঢাকা।

বাইরে ঈষৎ দূরে বেয়ারার পায়ের শব্দ কানে আসতেই রক্ত খেয়ে ফুলে ওঠা জোঁকের মত নীরা টিপুর ঠোঁট থেকে অনায়াসে মুখ সরিয়ে নিল। দ্রুত ঠিক হয়ে বসল দুজনে।

বেয়ারা এক এক করে প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখল টেবিলে। খাওয়া হয়ে গেলে চা দিয়ে যাবে বলে বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

নীরা তাকাল টিপুর দিকে। 'অনেকদিন তো আসিস নি টিপু, সামনের রববার দুপুরে আসবি?'

'তুমিই তো আগের মত একবারও ডাকো না!' যেন টিপুর গলায় অভিমান।

'আসিস, আমি থাকব। আসলে খুব ব্যস্ত থাকি তো। স্কুলের কাজ, অনেক ঝামেলা।' নীরার গলা থসথস করল। 'নে, খেতে আরম্ভ কর্।' নীরা খাবারের প্লেট টানল।

গম্ভীর হয়ে টিপু খাওয়ায় মন দিল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে নীরাকে ছেড়ে টিপু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। চারতলা বিরাট বাড়ি ওদের। একতলা-চারতলা ভাড়া দেওয়া। দোতলা-তিনতলায় টিপুরা নিজেরাই থাকে। টিপুর পড়ার ঘর তিনতলার এক কোণে। ওখান থেকে ওর নীরাদির ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। চওড়া গলিতে ঢুকতে বাঁ দিকে দোতলা পোড়ো বাড়ি। দোতলায় নীরাদিরা ভাড়া থাকে। একতলায় পুরনো রেস্টুরেন্ট। প্রত্যেক দিন এমন দুপুর গড়িয়ে পড়লে মুরগী কাটে রেস্টুরেন্টে। একসঙ্গে অনেক মুরগী-কাটা টিপু কতদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে!

আজও থমকে দাঁড়াল। রেস্টুরেন্টে মুসলমান বাবুর্চিটা মুরগী কাটতে বসেছে। ঝটপট করছে হাতের চিত করে ধরা যুবতী মুরগীটা। মুরগীটা সুন্দর দেখতে। হাতে ধারালো ছুরি লোকটার। হঠাৎ মুরগীর গলার এপাশ-ওপাশ করল ছুরিটা বার কয়েক। একটু ঝটপট, তার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঠাণ্ডা। ঠেলে সরিয়ে দিল কাটা মুরগীটাকে ডাঁই-এর মধ্যে। ফিন্ দিয়ে রক্ত ঝরছে সামনে মেঝের কোণের নালা বেয়ে। বাইরে রাস্তায় নালার জল লাল হয়ে বয়ে চলেছে।

মুরগী কাটার জীবন্ত ছবিটা নিখুঁত করে দেখল টিপু।

একসময়ে টিপু ওদের বাড়ির গেটের মুখে যাওয়ার সরু গলি ধরতে সামনের পথে থমকে দাঁড়াল। সেই ভিখিরি যুবতী মেয়েটা হাত বাড়িয়ে বসে আছে। দু'চোখ অন্ধ। কপালে সিঁদুর চকচক করছে। মেয়েটার বাচ্চা হবে। শীর্ণ চেহারা। পোড়ো একফালি জমিটার মাথায় হিজিবিজি পলকা ছাউনি। কত-দিন ধরে ওকে দেখছে টিপু! এক পলক দেখে টিপু চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে ফিরে এল। বাড়ানো হাতে কয়েকটা পয়সা দিল।

টিপু ওদের বাড়ির গেটের মুখে এলে কে যেন ডাকল, 'টিপু।'

টিপু ঘুরে দাঁড়াল। 'কি রে কেশব?' টিপুর সঙ্গে একই ক্লাশে পড়ে কেশব।

'তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।' ফিসফিস করে বলল কেশব। 'তোর স্কুলে

গিয়েছিলুম, তুই নাকি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিস অনেকক্ষণ!' কেশব টিপুর থেকে বছর-তিনেক বড়।

'কেন?'

'কদিনের মধ্যেই বড় রকমের এ্যাক্‌শান্ স্কোয়াড বেরুবে, কিছু টাকা দে।'

টিপু হাসল। টিপু বুঝতে পেরেছে ও কেন এসেছে। তবু আজ ওর মন ভাল নেই একটুও। আসার সময় ভিতরের রাগ আবার তৈরী হয়েছে নতুন করে। তাই যুক্তি-তর্কের মধ্যে গেল না।

'দেরী করবি না। পুলিশ কিন্তু খুঁজছে। এখনি পালাব।'

'দাঁড়া এখানে। আনছি।' দ্রুত পায়ে টিপু ওপরে ওর নিজের ঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল। মুহূর্তে কেশব অদৃশ্য হয়ে গেল ওর সামনে থেকে।

টিপু নিজের ঘরে এসেই নিঃশব্দে খিল আঁটল। জোরে পাখা খুলে পোশাক না বদলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাড়ির সকলেই বেলায় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এখন ঘুমে অচেতন।

বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ছটফট করল টিপু। নীরাদি ওকে ঠকিয়েছে, এখনো ঠকাচ্ছে! নীরাদি বিশ্বাসঘাতক। বিড়বিড় করল টিপু। এখন বিয়ে করবে না নীরাদি। পরে তো করবে? ওই স্বদেশদাকে। তারপর? নীরাদি সম্পূর্ণ স্বদেশদার। স্বদেশদা ঠিক, যেভাবে টিপু নীরাদিকে কত দুপুরে কাছে পেয়েছে, সেইভাবে পাবে। নীরাদি একেবারে স্বদেশদার হয়ে যাবে। তখন? টিপু কেউ না। এতদিনের নীরাদি তার কাছে একেবারে পর। অথচ নীরাদির থেকে আপন ওর ছোটবেলা থেকে আর কেউ ছিল না, এখনো নেই।

স্থির হয়ে গেল টিপু। যেন দু'চোখে জল চেপে আসছে। নীরাদিকে নিজেরই কত ছোটবেলা থেকে দেখছে টিপু। তখন কত রোগা নীরাদি, টিপু কত ছোট। নীরাদিরা ব্রাহ্মণ, টিপুরা জাতে ওদের অনেক নীচে। একটু বড় হয়ে বুঝতে পারে, নীরাদিদের অবজ্ঞা করত টিপুরা। নীরাদিরা গরীব। কিন্তু মনে পড়ে টিপুর, খুব ছোটবেলায় টিপু যখন স্কুলে যেত, নীরাদি দোতলা থেকে নীচে নেমে আসত। হঠাৎ খপ্ করে টিপুর হাত ধরত।......

'তুই খুব সুন্দর দেখতে রে ছেলেটা!'

টিপু বড় বড় চোখে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

'একবার আমার কাছে আয় তো!

'না।' টিপুর মধ্যে তখন ভয়ংকর গর্ব। বড়লোক ওরা। দামী আর পরিষ্কার প্যাণ্ট-জামা পরে!

'আসবি না! তবে রে!' বলেই নীরাদি এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে কোলে নিত টিপুকে। ভয়ংকর আদর করত। বুকের ওপর চেপে ধরে সারা মুখ-চোখ-চিবুক-ঠোঁট লাল করে দিত আদরে। রাগ হত টিপুর খুব। অথচ প্রত্যেকদিন ঠিক এইভাবে নীরাদি ওকে আদর করত। একদিন তো ঠোঁট জ্বালা করতে কেঁদেই ফেলেছিল টিপু। মনে পড়ে, নীরাদি অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেদিন স্কুলে পাঠিয়েছিল। কাউকে বলতে বারণ করেছিল নীরাদি। কেন বারণ করেছিল. টিপু বুঝত না। কাউকে বলেওনি কোনদিন।

টিপু তখন ক্লাশ সিক্স-এ পড়ে। আর একদিন ছুটির ভরা-দুপুরে নীরাদি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। টিপুদের জানলায় ওকে দেখেই নীরাদি আঙুল নেড়ে আস্তে আস্তে ডাকল। নীচে নেমে ওদের ঘরে আসতে বলছে। নীরাদি টিপুকে নিয়ে মজার খেলা খেলত। সেই খেলার লোভে টিপু নেমে এল নীচে। নীরাদিদের ঘরে ঢুকে দেখল, নীরাদি শুয়ে আছে চুপ করে। বই পড়ছে। তখন নীরাদি কলেজে পড়ত।

'নিরুদি!'

অবাক হয়ে তাকাল নীরাদি ওর দিকে। 'তুই সত্যি-সত্যি এলি! আমি ভাবলাম তুই বড়লোক, আসবি না। আয়!'

'তুমি খেলবে না? সেই সাপলুডো খেলা!'

'কাছে এসে বোস।' টিপু কাছে যেতে বলল, 'আজ ভীষণ গরম। খেলতে ভাল্লাগছে না। বোস, গল্প করি।'

তখন নীরাদির বাড়িতে পাখা ছিল না। অবস্থা ভাল ছিল না নীরাদিদের।

'আমার পাশে শো, গল্প করি।'

টিপু গল্পের লোভে পাশে শুয়ে পড়ল নীরাদির।

'এই টিপু।'

'উঁ।'

'নীরা নামটা কেমন রে?'

'খুব সুন্দর।'

'আমারও খুব ভাল লাগে।' নীরাদি থামল। 'তাহলে আমাকে তুই নীরুদি

বলবি না, নীরাদি বলবি। নীরুদি বললে কেমন নিরুপমা-নিরুপমা নামের পুরনো গন্ধ ছাড়ে। বুড়ীদের নাম। তাই না?' নীরাদি হাসতে লাগল।

কথা বলতে বলতে নীরাদি এক সময় ছটফট করে উঠল। 'উঃ কি গরম।' হাতপাখাটা নিল। জোরে জোরে বাতাস করতে করতে বলল, 'এই ছেলেটা, পিঠের বোতামটা খুলে দে তো।'

সত্যই গরম লাগছিল টিপুরও. উঠে বসে উপুড় হয়ে টান টান শুয়ে-থাকা নীরাদির পিঠের দিকে জামার বোতাম সব খুলে দিল। ময়লা ব্রা চওড়া পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মত আটকে আছে।

'মাঝখানের ক্লিপটা খুলতে পারবি?'

টিপু কিছু জানত না। 'কোন্‌টা?'

'ওই যে ক্লিপের মত আটকে আছে যেটা! ঠিক মাঝখানটায়! দেখতে পাচ্ছিস?'

'খুলছি।' টিপু শক্ত হয়ে বসে-থাকা হুকটা টানতে লাগল। খেলা পেয়ে গেছে টিপু।

নীরাদি বুক চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে অফুরন্ত হাসছে। টিপুর ততই হুক খোলার খেলায় ঝোঁক চেপে যাচ্ছে। একসময়ে নীরাদির হাসির দমকে আর টিপুর টানাটানির মধ্যে ব্রা ছিটকে খুলে গেল। নীরাদি দেখতে ভাল নয়, লম্বা চোয়াড়ে মুখ, কিন্তু পিঠে বেশ মাংস।

'একটু হাত বুলিয়ে দে তো টিপু, যা গরম।' একটু থেমে বলল, 'তোর গরম লাগছে না রে?'

টিপু হাত বুলোতে লাগল। 'হুঁ, খুব গরম।'

'উহ্‌, ভীষণ কুটকুট করছে রে টিপু। একটু চুলকে দিবি?'

'কোনখানটায়?'

'ডান দিকে হাতের গোড়ায়, কাঁধের ঠিক নীচে। হ্যাঁ, আর একটু, আর একটু সরে, একটু ওপরে ওইখানটায়। হ্যাঁ, আহ্‌—।' নীরাদির খুব ভাল লাগছে।

টিপু হঠাৎ বলল, 'নীরাদি, এখানে একটা লাল মত কি হয়েছে!'

'ওইটাই তো, দে তো জোরে জোরে চুলকে।'

টিপু চুলকোতে লাগল।

'দুর, তোর হাতে একটুও নখ নেই। দেখ।' নীরাদি একটু পাশ ফিরে

শুয়ে টিপুর আঙুল দেখল। চমৎকার আঙুল টিপুর, চাঁছা-ছোলা নখ। চাঁপা ফুলের পাপড়ির মত আঙুলগুলো। নীরাদি হাসতে হাসতে বলল, 'বড়লোকের ছেলে তুই, আঙুলের নখ দেখলে বোঝা যায়রে!'

টিপুর খুব ভাল লাগল কথাটা। হেসে উঠল।

নীরাদি টিপুকে দেখছে। টিপুর সুন্দর দাঁত সাদা সাজানো বরফ কুচির মত। খুব মিষ্টি হাসি টিপুর।

'দূর, তোর তো আঙুলে নখ নেই, কি কুটকুট করছে! ওই লাল জায়গাটা একটু কামড়ে দে তো টিপু। দু'তিনবার জোরে কামড়ালেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'সত্যি দেব?' টিপু অবাক হয়ে দেখছে নীরাদিকে। 'লাগলে আমি কিন্তু জানি না।' হি হি করে টিপু হাসছে তখনো।

'দে-না, তুই কামড়ালে কি আর মাংস ছিঁড়ে যাবে? দে।' বলেই নীরাদি উপুড় হয়ে শুলো। দু'টো হাত দুপাশে ছড়ানো।

জমানো খেলা পেয়ে গেছে টিপু। পিঠের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে নীরাদির লাল জায়গাটা কামড়াতে লাগল। আস্তে আস্তে টিপু কেমন পাউডারের গন্ধ পাচ্ছে নীরাদির নরম চামড়া থেকে। 'নীচে কোমরের দিকে কুটকুট করছে টিপু, একটু কামড়ে দে।' টিপু নীচের দিকে পিঠে কামড়াল কয়েকবার। 'এপাশটায় এখানে, ওদিকটায় একটু।' করতে করতে নীরাদি কখন চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে।

'দ্যাখ তো টিপু', নীরাদি কণ্ঠনালীর নীচে একটা জায়গা দেখাল। কণ্ঠার হাড়ের কাছে সত্যিই একটা লাল ঈষৎ ফোলা অংশ। 'এখানটায় একটু কামড়ে ধর। বেশ জোরে।'

খোলা বুক নীরাদির। টিপু উপুড় হয়ে কণ্ঠার কাছে কামড়ে ধরল। নীরাদির কথামতো জোরে জোরে বারকয়েক। তারপর কখন যেন সামনেটায় নীরাদি চুলকে দেবার মত কামড়াতে বলেছে। টিপু এক এক করে তাই করেছে। এক সময়ে টিপু স্থির। নীরাদিও। নীরাদির বুকের মধ্যে মুখ রেখে টিপু যেন কখন ওর ছ'মাসের ঘুমন্ত ছোট ভাইয়ের মায়ের বুকে মুখ রেখে ঠোঁট নাড়ার মত নীরব খেলায় ডুবে গেছে।.........

ভাবতে ভাবতে টিপু এই দুপুরে চাপা রাগে উত্তেজিত হল। আর তারপর থেকে যতবার নীরাদির ঘরে দুপুর কাটিয়েছে—এই কিছুদিন আগেও ক্লাস ইলেভ্ন্-এ ওঠা পর্যন্ত, কেন যেন ক্রমশ বুনো ঝোপের গন্ধ পেয়েছে টিপু।

কেশবরা ওর সঙ্গে স্কুলে পড়ে। গোপনে কি সব করে বেড়াত। ওর কাছ থেকে টাকা নিত প্রথম প্রথম জোর করে, ভয় দেখিয়ে, পরে টিপুই দিত নিজে থেকে! কিন্তু একদিন ওদের ব্যাপার দেখাতে কেশবরা ওকে নিয়ে গিয়েছিল উল্টোডাঙ্গায় রেললাইনের পাশে একটা বুনো ঝোপের আড়ালে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। কেশবদের সব যুক্তি ও বোঝে, ভাল লাগে। তবু ভয় পেত তখন। তারই মধ্যে একদিন ওদের গোপন আড্ডায় যায়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সেখানে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে ওরা। ব্রীজের নীচে একটা চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়। ও থাকতে থাকতে পুলিশের ভয়ে একবার উপুড় হয়ে গাছের ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়েছিল টিপু। বিরাট বড় লোকের ছেলে টিপু, এসব কিছু বোঝে না, তবু কেশবদের একধরণের রাগ, ঘৃণা, ভয়ের সঙ্গে কোথায় যেন টিপুরও অদ্ভুত মিল আছে। তাই সেই সময় বুনো ঝোপের মধ্যে অনেকক্ষণ শুয়েছিল টিপু। বুনো গন্ধটা রাগে কেমন টিপুকে মাতাল করে দিয়েছিল। নীরাদির সঙ্গে বহু দুপুর নিঃসঙ্গ কাটাতে কাটাতে টিপু সেই গন্ধ পেয়েছে কতবার! সেই গন্ধে নীরাদি ওর একেবারে আপনতম।

আর সেই নীরাদিকেই স্বদেশদা নিজের করে নেবে? তারপর টিপু একা! রক্ত গরম হয়ে উঠল টিপুর। বিছানার ওপর উঠে বসল। কিন্তু স্বদেশদার তো কোন দোষ নেই! নীরাদিই তো চায় স্বদেশদাকে। অথচ নীরাদির সমস্ত চেনা শুধু নয়, চিনতে চিনতে নীরাদি ওর অধিকারের মধ্যে থেকে গেছে। তাহলে, নীরাদিকে ছাড়বে কি করে টিপু? অথচ নীরাদি ওকে ছেড়ে যাবেই! নীরাদি বিয়ে করবে টিপুকে তো না! টিপু যে অনেক ছোট। তখন, স্বদেশদা কিছুতেই নীরাদিকে টিপুর কাছে আসতে দেবে না। দাঁতে দাঁত টিপল টিপু।

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর পাখা ফুল স্পীডে ঘুরছে। টিপর মধ্যে ভয়ংকর অস্থিরতা। এ অস্থিরতার কথা কেউ জানবে না। কাউকে নীরাদির কথা বলেওনি টিপু, কোন বন্ধুকেও না। নীরাদি অনেক করে বারণ করেছে। আর নীরাদিই কিনা তাকে গোপন করে…!

টিপু জানলার সামনে এলো। কেশবদের মুখ স্পষ্ট ভেসে উঠল। কেশবরা কতবার ডেকেছে ওকে ওদের মধ্যে যেতে। ভয় আছে টিপুর। তবু কেশবদের ব্যাপারটায় ভয়ংকর মজাও পায়, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে না। কেবল নীরাদির জন্যে। আর এখন! টিপু নীচের দিকে তাকাল। দোতলায় নীরাদির ঘর বন্ধ। পাশের ঘরে একা মা ভাই বোন ঘুমোচ্ছে। আরও নীচে দৃষ্টি পড়ল।

রেস্টুরেন্টের মুরগী কাটা শেষ। এত যে মুরগী কেটেছে, এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ বোঝা যায় না। বাইরে রাস্তার নালার জলে রক্ত অনেক ঘন এখন। টিপু ওদিকে তাকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল।

রবাবর, ছুটির দিন। ঠিক আগের মতই মধ্যদুপুরে টিপু নীরাদির ঘরে টোকা দিল। বড় রাস্তায় লোকজন কম। এসময় এই গলিও নিথর। পাশের ঘরে তালা দেওয়া। নীরার মা, ছোট দু'ভাই-বোন আজ সকাল থেকেই বাড়ি নেই।

নীরা দরজা খুলল। 'এসেছিস, ভেতরে আয়।' গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে দরজায় খিল দিল। বলল, 'তুই যা রেগে আছিস, ভাবলাম বোধহয় আসবিই না।'

'নীরাদি, দরজাটা খিল দিয়ে কি হবে! খুলে রাখ।' স্কুলের চাকরীতে ঢোকার পর নীরাদি ঘরে পাখা এনেছে। টিপু পাখার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল।

নীরা হাসল। 'আজকাল খুব সাহস হয়েছে তোর, তাই না?'

টিপু ম্লান হাসল। 'না, পাশের ঘরে তো কেউ নেই।'

নীরা খিল নামিয়ে রাখল। 'অনেক বড হয়ে গেছিস টিপু। কি রকম ভারী গলায় কথা বলিস।'

টিপু হাসতে হাসতে নীরাকে নিস্পলক দেখছে। নীরা এমন দুপুরের গরমে জামা পরেনি। বুকে পিঠে একটা ব্রা টাইট হয়ে বসে আছে। পিঠের ওপর শাড়ির আঁচল জড়ানো। টিপু দেখছে। কত দিনের পরিচিত নীরাদি। নীরাদির সব কিছু জানে টিপু। তবু আজকের নীরাদিকে যেন নতুন লাগছে। নীরাদি স্কুলের চাকরীর জন্যে কলকাতা থেকে এক বছর বাইরে কি একটা পড়তে গিয়েছিল। এই কিছুদিন হল ফিরে স্কুলে জয়েন করেছে। সেখানেই স্বদেশদার সঙ্গে আলাপ, বন্ধুত্ব। আর সেখান থেকেই নীরাদি বেশ মোটা হয়ে এসেছে। বুক, পিঠ, ঘাড়, দু'হাতের কনুই মসৃণ ভারী।

টিপু একভাবে তাকিয়ে আছে। নীরা ওর দিকে পিছন ফিরে তখনো ঘরের দু-একটা টুকিটাকি কাজ সারছে। গলায় গানের সুর। নীরাদি লম্বা। কোমর থেকে নীচের পায়ের পাতা পর্যন্ত টান-টান। শাড়ির সীমার ওপর দিয়ে তলপেটের কাছে একটা খাঁজ স্পষ্ট চোখে পড়ে। কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন শির শির করে টিপুর ভিতরটা। গলাটা সরু লম্বা, সারস পাখির মত, কণ্ঠার কাছটা মাংসল নরম, যুবতী মুরগীর মত। চমকে উঠল টিপু নিজের মধ্যে।

পিছন ফিরল নীরা। 'তক্তপোষের ওপর পা তুলে বোস, আমি যাচ্ছি।' নীরা একগ্লাস জল খেল উবু হয়ে বসে।

'আমায় ডেকেছ কেন নীরাদি ?'

নীরা অবাক হয়ে পিছন ফিরল। মুখ টিপে হাসল। 'বাব্বা, চমৎকার কথা বলতে শিখেছিস তো টিপু! বলছিলাম না, তুই হঠাৎ যেন কত বড় হয়ে গেছিস! ঠিক তাই।' নীরা এগিয়ে এসে টিপুর সামনে দাঁড়াল। 'বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই।' বলেই বুকের ওপর চেপে ধরল টিপুর মাথা। 'বেশ ছেলে।'

'নীরাদি, স্বদেশদা এখন আসবে না ?'

নীরা দুহাতে ওর চিবুক ধরে তাকাল। 'এখন ওরই আসার কথা ছিল, তুই আসবি বলে ওকে বারণ করে দিয়েছি। তবে ও এসব কিছু জানে না। তুই যেন কোনদিন বলে ফেলিস না! যা রাগী ছেলে তুই, ভয় করে।' নীরা মিষ্টি হাসল।

'কেন বারণ করলে ?' টিপুর মধ্যে কেমন একধরণের ঘৃণা তৈরী হতে শুরু করেছে।

'বাঃ! তুই আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু যে!' বলেই ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে টিপুর মাথার কিছু চুল মুঠো করে ধরে ছেড়ে দিল। জানলার দিকে সরে গেল।

'আজ বুঝি দুপুরে তোমরা সিনেমায় যেতে ?' সন্তপিত, চাপা রাগ আর ঘৃণা থেকে যেন কথাগুলো বলল টিপু।

'দুপুরে যেতাম না, সন্ধের শো-এ যাব। তাই দুপুরটা ওকে আর আসতে বলিনি।' একটু থামল নীরা। রাস্তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে টিপুর দিকে তাকাল। 'তোর সঙ্গে কতদিন সিনেমা দেখেছি বল্ তো ? জানিস, এটাতেও তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এ একেবারে বড়দের বই, তোকে ঢুকতেই দেবে না যে।'

'আমি যেতামই না।' টিপু ঠোঁট ওলটালো। 'স্বদেশদার সঙ্গে যাচ্ছ, আমিই বা যাব কেন ?' একটু তাচ্ছিল্য ভেসে উঠল টিপুর কণ্ঠে।

খিল খিল করে হেসে উঠল নীরা। 'বাঃ, চমৎকার হিংসে করতে শিখেছিস তো! এত হিংসে কেন রে ? আমি তো তোরই ?' নীরা টিপুর পাশে এসে বসে পড়ল।

'থাক, তোমার কথা বিশ্বাস হয় না।' টিপু যেন নীরাকে এবার ঠিকমত বুঝতে পেয়েছে—এইভাবে কথাটা বলল।

'হয় না বুঝি ?' নীরা চঞ্চল চোখে তাকাল টিপুর দিকে। 'উঠে দাঁড়া, দেখি তোর বিশ্বাস হয় কিনা।'

টিপু আজ ফুলপ্যাণ্ট পরে এসেছে। বেশ বড় দেখাচ্ছে ওকে। নীরার ভাল লাগছে। সুন্দর দেখতে টিপু। অজ্ঞাতে অস্পষ্ট কালি লেগে যাওয়ার মত গোঁফের রেখা। নীরাকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে টিপু উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

নীরা মুহূর্তে জড়িয়ে ধরল টিপুকে। 'এবার বিশ্বাস হয় ? ওরে দুষ্টু, মেয়েরা জড়িয়ে ধরলে চালাক পুরুষ ঠিক বুঝতে পারে তা ভালবাসার কিনা। বুঝলি ?' গাঢ় ফিসফিস কণ্ঠে বলেই নীরা টিপুকে জোরে চেপে ধরল বুকের ওপর। একটানা চুমু খেতে লাগল টিপুর মুখে-চোখে।

নীরার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে ডুবে থেকে টিপুর মনে হল. আজকের এই মুহূর্তে নীরাদি ওকে একটুও আদর করছে না। ঠিক এভাবে তো কোনদিন আদর করে না! এমন আদর যেন অন্য কারোর জন্যে তোলা ছিল। টিপু এখন স্থির হয়ে আছে নীরার দুই ঠোঁটের ভয়ংকর আকর্ষণে। টিপু অনুভূতিহীন শক্ত কাঠ।

নীরা টলছে। টিপুকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘরময় একভাবে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ভিতরের দিকে বারান্দায় চলে এল। এদিকটা অন্ধকার। বাইরে থেকে কারোর চোখে পড়ে না। নীচের দিকে জলপড়ার মোটা পাইপ দেয়ালে আটকানো। বারান্দার নালার মুখে ছাদ থেকে টানা লাগোয়া মোটা পাইপটায় চেপে ধরল টিপুকে নীরা। টিপু বুঝতে পারছে ওর দম হয়ে আসছে। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, ঠিক এরকম করে তো কোনদিন নীরাদি আদর করেনি! এ যেন তার পাওনা নয়, আর কারোর জন্য তুলে রাখা জিনিস সে গ্রহণ করছে। স্বদেশদার আসার কথা ছিল না ?

চকিতে ঠোঁট সরিয়ে নিল টিপু। হাঁপাচ্ছে। রক্ত গরম। ভিতরে মাথার মধ্যে কি যেন ঝাঁঝাঁ করছে। নীরাদি পাগলের মত টিপুর কাঁধে মুখ ঘষছে। টিপু নীরার লম্বা গলার কণ্ঠায় হাত বুলোল গভীর আদরে। এই জায়গায় হাত বুলোলে নীরার বড় ভাল লাগে, আরাম হয়। একথা নীরাই টিপুকে আগে কতবার বলেছে। নীরা আরামে আবেশে চোখ বুজে নালার গোড়ায় বসে পড়ল দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

দু'চোখ খোলা টিপুর। মুহূর্তে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকচকে জিনিসটা বার করল! নীচে মুরগী কাটার শব্দ, মুরগীর হঠাৎ চীৎকার ও থেমে

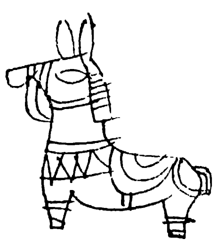
যাওয়া। বিদ্যুৎ চমকের মত রেস্টুরেন্টর বাবুর্চির সেই ধারালো ছুরিটা খেলে গেল নীরার বন্ধ চোখের সামনে। 'আঁক্' করে একটা শব্দ হতেই নীরা হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে গেল পাইপের প্রান্তে বারান্দার ঝাঁঝরির মুখে। কাটা মুরগীর মত দুটো হাত ছটফট করছে নীরার।

টিপু ভীষণ হাঁপাচ্ছে। এক মুহূর্ত স্থির, নিষ্পলক। টিপু ঝাঁঝরির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল রক্তাক্ত ছুরিটা। ধীর পায়ে নীচে নেমে এল। নিচে গলির মধ্যে কেউ নেই।

তবু সোজা রাস্তায় গেল না টিপু। আর একটা চোরা গলি ধরে এগোল বড় রাস্তার দিকে। হিজিবিজি আঁকাবাঁকা চোরাগলি যেখানে শেষ হয়েছে, তার মুখেই সেই যুবতী অন্ধ ভিখিরিকে চোখে পড়ল। এখন ঘুমোচ্ছে। পাশে ওর সদ্যজাত শিশু শুয়ে। দু'চোখ খোলা। দু'হাত ছিটকে ওপরে তুলে চীৎকার করে চলেছে। টিপু স্থির নিষ্পলক দেখল শিশুকে। ওর দু'চোখের তারায় এখন মধ্য দুপুরের আলো চকচক করছে।

টিপু শ্বাস চেপে এক মুহূর্ত কি ভাবল। দুপুরটা ওর সামনে যেন দাউদাউ করে জ্বলছে! কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিল বাচ্চার কাছে। নিঃশব্দ পায়ে সামনে এগোল। এখন ওর ভয়ংকর সাহস। কেশবদের থেকেও বেশী। এবার ও সম্পূর্ণ মুক্ত। এখন থেকে কেশবদের অনেক কাজ ও করে দিতে পারে। কেশবরা ওর বড় আপন! এই মধ্যদুপুরে রেস্টুরেন্টের গায়ে রাস্তার নালায় এরই মধ্যে রক্ত অনেক ঘন হয়ে গেছে। টিপু নির্বিকার গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াল।

এবার দৌড়নোর মত হাঁটবে, বা হয়ত লুকিয়ে দৌড়বে। কেশবদের সেই গোপন ডেরায় চিনে চিনে ওকে পেঁছতে হবে এখনি। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের বুনো গন্ধের মধ্যে সেই অন্ধকার জায়গায় টিপুর একটা স্থায়ী আশ্রয় চাই।





দহন

একটা খারাপ গালাগাল, যা আমি কোনদিন মনেও ভাবিনি, অন্যদের মুখে শুনেছি মাত্র, এখনি মনে আসছিল। শব্দ করে বলে ফেলতাম হয়ত। কিন্তু তা আমার একেবারেই স্বভাব-বিরুদ্ধ বলে না উচ্চারণ করায় শব্দটা ঠোঁটের আড়ালে আটকে গেল। আমি রাস্তায় পা দিলাম। ভিতরে ভয়ংকর উত্তেজিত আর কাঁপছি। 'শালা।' নিজেকেই বললাম। এভাবে আর কদিন বাঁচা যাবে? মাসের প্রথম থেকেই টিউশনির আগের মাসের টাকা কটার জন্যে তীর্থের কাকের মত বসে থাকা। সামান্য ক'টা টাকা দেবে, তার আবার এত কথা। কাঠের ব্যবসায় তো টাকার ওপর বসে আছে! মোটাসোটা নাদুস-নুদুস গবেট ছেলেটাকে 'একটু নাম সই করার মত লেখাপড়া শেখাতে পারলেই হল বুঝেছেন কল্যাণবাবু' বলেছিল মিশকালো ধুমসো এক নম্বরের কঞ্জুস মোটা বাপটা। অথচ ঠিক সময়ে মাইনে দেবার নাম নেই।

ভিতরে কঠিন বিরক্তি বলেই হঠাৎ হোঁচট খেলাম। থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। পেটের বাঁদিকটায় সেই অম্বলের ব্যথাটা চিন চিন করছে। ছাত্রের বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালাম। বিড় বিড় করতে করতে আমি হাঁটছি। পড়িয়ে তো নিজেরই গাধা হয়ে যাবার মত অবস্থা। অফিস থেকে ফিরেই ছুটতে ছুটতে এই নতুন টিউশনি করা, আবার সন্ধের পরে আরও একটা সেরে রাত দশটার পর বাড়ি ফেরা। নিজের মা-বাপকে দেখার সময় নেই, ভাই-বোনদেরও পড়াশুনা কিছুই দেখাতে পারি না, জিজ্ঞেস করলেই বিরক্ত হই। মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অথচ বাইরে এমন গাধার খাটুনি খেটে মাইনেটা ঠিক মত পাই না।

সামনে হর্ণের শব্দ হতেই ঈষৎ চমকে পাশে সরে গেলাম। সামান্য চল্লিশটা টাকা! বাবা এর দিকে তাকিয়ে আছে। কালই রেশন তুলতে হবে। মায়ের সামান্য হাতখরচও এখান থেকে দিতে হবে। তার ওপর আমার অফিসের মাস-মাইনেটা সব সংসারে দিয়ে দেওয়ায় অফিস যাবার খরচও বলতে কিছু নেই। এই পনেরো তারিখেই সকালের টিউশনির টাকা ফতুর। এখন যে-বাড়ির টিউশনিতে যাচ্ছি, ওরা শুধু এ-মাসেই হঠাৎ দেরীতে দিচ্ছে বলে ভাবনা বেশী। লিলিরা আজ দেবে তো? তার জন্যেই এমন হাঁটছি। বোধ হয় এক অসহায় শূন্যের মধ্যেই এইভাবে হাঁটা।

আমার মনে হল, দূরে খাবার পড়ে থাকলে রাস্তার কুকুর যেমন ভাবে হাঁটে, আমি বুঝি দ্বিতীয় টিউশনির বাড়ি সেই ভাবে চলেছি। জানি, সারাদিন অফিসে কলম-পেশার পর, একটু আগের এমন নোংরা উত্তেজনাটা কমে এলে আমি ভয়ংকর ক্লান্ত বোধ করব, কিন্তু ক্লান্ত হলে আমার চলে না। এখন রাস্তার লোকজন, গাড়ির শব্দ, আলো-বাতাস কিছুই আমার বোধের জগতে নেই। আমি একসময় মিনার্ভা থিয়েটার হল পাশে রেখে গলিটায় ঢুকে পড়লাম। সন্ধের আবছা অন্ধকারে ঢাকা গলি। গলিটা একটু নির্জন। পথচারী কখনো একজন, কি দুজন এপাশ-ওপাশ হাঁটছে। এই রকম পরিবেশে আবার আমি নিজস্ব বোধের জগতে চলে এলাম। আমার তলপেট টনটন করছে, পেচ্ছাব করতে হবে এখনি। ছাত্রের বাড়ি পরিষ্কার মোজেকের মেঝের বাথরুম-পায়খানা পড়ার ঘরের গায়েই। কিন্তু আমি যেতে পারি না। বাড়ির বড় বড় ছেলেমেয়েরা সব সময়েই সেখানে কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়ায়। ওদের সামনে দিয়ে যেতে আমার লজ্জা করে। এই আমার স্বভাব। আমার প্রত্যেকটা দিন যন্ত্রের মত কাটে। নিজের মত করে ভাববার সময় পাই না, কিন্তু কিছু পুরনো স্বভাব একেবারে নিজের মত করে থেকে গেছে। যেমন আমি কোন নোংরা শব্দ মুখে-মনে আনতে পারি না, তেমনি কোন অভ্যাসের সঙ্গে নোংরা শব্দ, কথা ইঙ্গিতে তৈরী হতে পারে এরকম অভ্যাস লোকের কাছে গোপন করি যতটা সম্ভব।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গলির মুখে অন্ধকারে আমার কাজ সারলাম। উঠে দাঁড়িয়েই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দেরী হয়ে গেছে। ছাত্রীর বাড়ি আমাকে এখনি পৌঁছতে হবে। টাকাটা আজ দেবেই, আমি জানি। গলিটা অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারছি, পথচারী আমি ছাড়া কেউ নেই। দ্রুত হাঁটছি। একটু এগিয়েই হঠাৎ আমার গতি মন্থর করতে হল। মনে

হল, কেউ যেন আমায় হাত বাড়িয়ে ডাকছে। লোকটার দিকে তাকালাম। স্পষ্ট চোখে পড়ল, আমার সামনে একটু দূরে এক স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ় গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলছে। বাঁ হাতে একটা লাঠি, ডান হাত দিয়ে কিছু যেন ধরবার চেষ্টা করছে, নাকি আমায় ডাকছে? আমি কয়েক মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস। ভদ্রলোক কি অসুস্থ? আমি ভিতরে কেঁপে উঠতেই যেন শুনলাম, কে যেন 'কল্যাণ' এই নামে আমায় ডেকেই থেমে গেল।

ভিতরে ঝাঁকানি খেয়ে আমি ধীর সন্তর্পিত পায়ে হাঁটতে শুরু করেছি। লোকটির ডান হাত কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে টান হয়ে থাকার পর ওপরে আকাশের দিকে প্রসারিত হল শরীরের ভার ঠিক রাখতে গিয়ে। এবার আমার দিক থেকে হঠাৎ ঘুরে যখন পিছন ফিরল, হাতের লাঠিটা ছিটকে পড়ার শব্দ হল। তখনো আমি কিন্তু আমার মন্থর গতি স্তব্ধ করিনি। এবার এক মুহূর্ত চাপা ভয়ে গলির এপাশ-ওপাশ দেখলাম। না, ঠিক এই সময়ে গলির দুই মাথায় কেউ নেই। আমি প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গলিটা থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলাম। যেন আমার অনেক কাজের চিন্তায় আমি ভীষণ অন্যমনস্ক, যেনবা আমি ব্যস্ততায় গলির অন্ধকারে ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাইনি—এমনি উদাসভাবে হাঁটতে হাঁটতে সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর দিকে পথের বাঁকের মুখে চলে এলাম। এখানে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও পিছনে তাকাইনি। এবার সন্তর্পণে একবার তাকলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক আড়ালে পড়ে গেছে। আরও জোরে হাঁটলাম। মনে হল খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাতে হবে।

কেন? থমকে দাঁড়িয়েই নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম। অনেক বেশী ঘামছি কেন? আজ গরম পড়েছে বেশী, কিন্তু তার থেকেও যেন বেশী ঘামছি! একটু আগে কেউ কি আমায় পিছন থেকে তাড়া করছিল? কে? আমার নিজের দায়িত্ব, না নীতিবোধ? একটু আগে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সামনে কে আমায় আমার নাম ধরে ডাকল? এইরকম হয় আমার। আমি নিজে কখনো কোন ব্যাপারে ভীষণ ভয় পেলে, বা নিজের খুব কষ্ট হলে, অথবা কারোর করুণ অসহায় অবস্থা দেখলে আমার মধ্যে থেকেই আমাকে কেউ যেন নাম ধরে ডাকে। আমার মধ্যে থেকেই কি 'কল্যাণ' ডাকটা উঠে এসেছিল?

আমি এখনি রাস্তা পার হতে পারছি না। মনে হল, সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর ওপর গাড়ি, লোকজন, যাওয়ার ব্যস্ততা, এত কোলাহল কোনদিন দেখিনি। আমি একটা লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। আমি এত কাঁপছি কেন?

ভদ্রলোক যখন নিরুপায় হয়ে টলছিল, মুহূর্তের ভাবনায় মনে হয়েছিল লোকটির নিশ্চয়ই স্ট্রোক হয়েছে। রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ স্ট্রোক! বাড়ির কেউ জানবে না। মাটিতে পড়ামাত্রই সংজ্ঞাহীন! বা একেবারে মৃত্যুও ঘটতে পারে! তখন? এই অবস্থায় সারা নির্জন গলিটায় আমিই একমাত্র সাক্ষী বা দর্শক! আমাকে এখন কি করতে হবে? লোকজন জড় করে, ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। সেখানে ডাক্তার দেখিয়ে ভদ্রলোকের ঠিকানা জোগাড় করে পুলিশের কাছে খবর দেওয়ার আগেই বাড়িতে খবর পৌঁছে দেওয়া! যদি রাস্তায় বা ট্যাকসিতে নিয়ে যেতে মারা যায়, পুলিশ-কেস হয়ে যেতে পারে। তখন আমিই প্রধান এবং প্রথম সাক্ষী হয়ে যাবো। উহু, সে এক দারুণ ঝামেলা।

একটু আগে প্রৌঢ় লোকটিকে দেখে কথাগুলো মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে কে যেন ঝাঁকানি দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিল আমাকে এখনি পড়াতে যেতে হবে। আজ টিউশনির টাকা নিতেই হবে। একজন মুমূর্ষু লোককে ট্যাক্সি করে নিয়ে যেতেও যে পয়সা লাগবে তা আমার নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বাইরের লোকের ঝামেলা বয়ে বেড়ানোর মত আমার এতটুকু উৎসাহ, উদ্যম, বাসনা নেই।

সামনেই গাড়ি ব্রেককষার বিকট শব্দে আমার অন্যমনস্কতা সরে গেল। আমি দ্রুত পার হলাম। কেন যেন আবার পিছন ফিরে একপলক দেখলাম। সামনে দ্রুত পা ফেলতে গিয়ে হাতঘড়ি দেখলাম। বাবার পুরনো ঘড়ি আমি ব্যবহার করছি। ডায়াল হলদে হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ-হঠাৎ তাকালে সময়ের অঙ্কগুলো অস্পষ্ট মনে হয়। আমি এবার স্পষ্ট করে ঘড়ি দেখলাম। এত দেরী! আমি জোরে পা চালালাম।

স্রোতের মুখে একই জায়গায় স্থির পাক খাওয়া জলের মত ঘুরে ঘুরে সেই প্রৌঢ়ের কথা আমাকে এমন তাড়া করছে কেন? আমার কি উচিত ছিল ভদ্রলোককে সাহায্য করা? সেই মুহূর্তে হাতটা ধরা উচিত ছিল? আমাকেই তো ডাকছিল! ভেবেছিল, বা স্থির বিশ্বাস হয়েছিল আমি ওর হাতটা অন্তত ধরব। ধরে বসিয়ে বা শুইয়ে দেব। আর শেষে একটু সামলে নিয়ে হাসপাতালে না হলেও অন্তত ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। কিন্তু আমি দেখেও দেখিনি। আমার টিউশনি আছে, ব্যস্ততা আছে। টাকা পাওয়ার দিন। অসুখ, হাসপাতাল, মৃত্যু, পুলিস—এসব ঝামেলা এড়াতেই তো একটু আগে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি! এই তো এমনভাবে পালিয়ে যাচ্ছি!

হ্যাঁ, পালানোই বলে একে। ভীরু কাপুরুষ স্বার্থপর একজন ক্লীব মানুষের মত আমি প্রৌঢ়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আর আমি যে পালিয়ে যাবো, আমি যে ওকে সামান্য মাত্র সাহায্য না করে চোরের মত লুকিয়ে চলে আসব, বুঝতে পেরেছিল। তাই আমার দিকে হাত বাড়িয়েই পরমুহূর্তে ওপরে হাত তুলেছিল। এসময় মুহূর্তের ডাকই সত্য! আমি যে সে ডাকে সাড়া দিইনি! তাই পর মুহূর্তে ঈশ্বরকে ডাকছিল হয়ত। কথাটা মনে হতেই আমার বুকের ভিতরটা দপ দপ করে উঠল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার। ঈশ্বর ওকে বাঁচাবে? অথচ আমি এমন একজন জলজ্যান্ত তিরিশ বছরের যুবক কিছুই করার চেষ্টা করিনি!

নিজেকে হঠাৎ উল্লুকের মত মনে হল। শুয়োরের মুখে দাড়ি গোঁফ গজালে যে রকম দেখায়, আমার দুদিনের দাঁড়ি-না-কামানো মুখ সেরকম মনে হচ্ছে! থমকে দাঁড়ালাম। ছাত্রীর বাড়ির সরু গলির মুখে এসে গেছি। গলির মুখে এক মধ্যবয়সীর পান-বিড়ির দোকান। দোকানে বড় একটা সস্তা দামের আয়না ঝোলানো। তার চারপাশে দেওয়ালে কুৎসিত অশ্লীল ভঙ্গির বিদেশী ও হিন্দী সিনেমার উলঙ্গ মেয়েদের ছবি আঠা দিয়ে আটকানো। আমি আয়নায় মুখ রাখলাম চকিতে! মুখটা ফুলে তোবড়ে কি রকম বীভৎস হয়ে গেল! আমার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, তোবড়ানো গাল, ঘামে-ভেজা চকচকে চিটচিটে মুখমণ্ডল, ভাবলেশহীন চোখ দুটি আয়নায় তালগোল পাকিয়ে নতুন কোন জানোয়ারের মত মনে হল। হঠাৎ কারা যেন হেসে উঠল। ময়দানের এক বড় প্রদর্শনীর মধ্যে 'হাসির ঘর' নামের একটা তাঁবু ঘরে একবার ভাই-বোনদের নিয়ে দেখতে গিয়ে বিচিত্র ধরনের আয়নায় মুখ রেখে দেখার সময় লাউড স্পীকারে যেমন হাসির কলরব শুনে ছিলাম, ঠিক সেইরকম। কেউ কি আমায় ব্যঙ্গ করছে? আমি ডানপাশে তাকালাম। কয়েকজন যুবক-যুবতী নিজেদের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে হাসতে ওদিকে চলে যাচ্ছে। তীব্র বিরক্তি নিয়ে সামনের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

'এইতো, মাস্টারমশাই এসে গেছেন। আসুন।' দরজা খুলে ছাত্রীর দাদা সরে দাঁড়ালেন। 'আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম, দেখা হয়ে গেল।' দাদার গলার স্বর মার্জিত, ভদ্র।

আমি চেয়ারে বসতে বসতে অল্প একটু হাসবার চেষ্টা করলাম।

'আপনার মাইনেটা নিন।' একটা খাম আমার সামনে ধরলেন, 'কিছু মনে

করবেন না, এ-মাসে বেশ দেরী হয়ে গেল। জানেন এরকমটা হত না, বাড়িরও খুব অসুবিধে হয়েছে! আসলে একটা টাকা—।'

'জানি, শুনেছি। আপনারা তো কোনদিনই পয়লা তারিখ ফেল করেন না! অসুবিধেয় পড়েছেন বলেই তো?' আমি বেশ কিছুটা লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে বললাম।

ছাত্রীর দাদা হাসছেন। 'বসুন, আমি লিলিকে ডেকে দিচ্ছি।' আমি ভীষণ ঘামছি দেখে পাখাটা ফুল স্পীডে ঘুরিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি কেন যেন ভিতরে প্রায় বিপর্যস্ত। আমি জানি, লিলি, মানে আমার ছাত্রী, যে ক্লাস টেন-এ পড়ে আর সব কিছু গলা-ধরানো চীৎকারে পড়ে মুখস্ত করে পাশ করতে চায়, সে এখানে আসতে দেরী করবে। তাই আমার মধ্যেকার পাষাণভার যা আমাকে প্রতি মুহূর্তে আড়ষ্ট-ক্লিষ্ট করে তুলছে, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চোখ বুজিয়ে একটু নির্বিকার হবার চেষ্টা করলাম।

'মাস্টারমশাই আপনার শরীর খারাপ নাকি?' লিলি সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না না, তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?'

'কি জানি, কি রকম যেন লাগছে আপনাকে!'

'ও কিছু না।' আমি একটু থেমে বললাম, 'তোমার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা কবে হবে?'

'আর তো এক সপ্তাহ!'

'তাহলে পুরনো অঙ্কগুলো একটু ঝালিয়ে নাও।'

লিলি বইখাতা টেবিলে রেখে চেয়ারে বসল। আমি ওকে একটা প্রশ্নমালা করতে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

লিলি মাথা নীচু করে নিবিষ্ট হয়ে অঙ্ক কষছে। আমি কিছুটা শূন্য অন্যমনস্কতার মধ্যে লিলির বসার ভঙ্গি দেখতে লাগলাম। শিবনাথের বোন শুভা, আমি যাকে ভালবাসি সেই মানসী—সকলেরই ভঙ্গি এরকম হয় চেয়ারে বসে নিবিষ্ট হয়ে কিছু লেখার সময়। মেয়েদের কোন কোন জায়গায় একাধিক সাধারণ মিল থেকে যায়। তাই একটি মেয়ে কেমন অবলীলায় একাধিক মেয়েকে মনে করিয়ে দেয়! এরকম প্রয়োজনহীন ভাবনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে গিয়ে

হঠাৎ শিবনাথ আর মানসীর কথা মনে হতেই সোজা হয়ে বসলাম। অন্যমনস্কতা ছুটে গেল।

মানসীর বাবার একটা স্ট্রোক হয়েছিল না! শিবনাথের বাবারও তো হার্টের অসুখ আছে! যে ভদ্রলোককে একটু আগে দেখেছি তিনি মানসীর বাবা নন তো! ভদ্রলোকের চেহারা মনে পড়ল। গভীরভাবে অবয়ব ধরতে গিয়ে মুখটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মানসীর বাবার মুখ মনে পড়ছে। কিন্তু চেহারা, পোষাক-আসাক, হাতে লাঠি-ধরা দেখে মানসীর বাবার কথাই কেন মনে পড়ছে বার বার?

হঁ্যা, মানসীর বাবাই তো! মানসীর বাবা প্রিয়নাথবাবু প্রায়ই হাতে লাঠি নিয়ে একা একা রাস্তায় বেড়াতে বের হন। ঠিক সেই মুহূর্তে মানসীর বাবাই 'কল্যাণ' বলে ডেকেছিলেন! নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন আমাকে। যদি সত্যি মানসীর বাবা হন! আমার মেরুদাঁড়া ধরে একটা হিমেল স্রোত মাথার চুলের গোড়ায় শিরশির করা ঢেউ তুলল।

আমি চেয়ারের পিছনে হেলান দিলাম। মানসীর বাবা যদি ওখানে মারা যান তাহলে! পেনসনের সামান্য কটা টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। মানসী ওর বাবার জন্যে তো পাগল! শুধু বাবার জন্যেই দিনরাত বড় সংসারটাকে বুক দিয়ে আগলে থাকে! দাদার একার আয়ে সংসারে কি হবে? মানসীর পরে পিঠোপিঠি ক'টি ভাই বোন। মা নেই। মানসীর ওপরে দাদা ছাড়া কোন অভিভাবক থাকবে না। না না, মানসীর বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। আমি বিড়বিড করে চোখ বুজোলাম। কেউ না কেউ তাঁকে এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। আর? আর মানসীদের ওই সংসারে নতুন করে খরচ বাড়ল। বাবার ডাক্তার দেখানোর। পড়ে গিয়ে প্রিয়নাথবাবুর যদি একটা পা প্যারালিসিস হয়ে যায়? প্রথম স্ট্রোকের সময় আমি ওকে লুকিয়ে আমার খুব কষ্টে জমানো চারশ টাকা দিয়েছিলাম। এখন? প্রিয়নাথবাবুর আজকের সমস্ত কিছুর জন্যেই তো আমি দায়ী! হয়ত এতক্ষণে হাসপাতালে মারা গেছেন! 'না।' আমি ভিতরে চেঁচিয়ে উঠলাম। মানসী এখন অবিরল কাঁদছে, না নিথর নিশ্চুপ! বেশ কিছুদিন যাইনি। এখনি ওর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেব।

'লিলি!' হঠাৎ আমি ছাত্রীকে ডাকলাম। গলার স্বর খসখসে।

লিলি মুখ তুলল। 'আমাকে ডাকলেন?'

'ক'টা অঙ্ক করলে?'

'তিনটে করেছি। এইবার দেখাবো।'

'তুমি তো নিজে নিজেই পারছ! তাহলে আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠব?'

লিলি স্থির তাকিয়ে থেকে বলল, 'মাস্টারমশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার শরীর খারাপ।'

'কিছুটা তাই।' আমি বিড় বিড় করলাম। 'তুমি আজ নিজে নিজেই কিছু কর, কাল এসে সব দেখে দেব।'

'তাই। আপনি যান!' একটু থেমে হঠাৎ কি ভেবে লিলি বলল, 'আপনি একটু চা খাবেন? আপনি তো আবার চা খান না।'

'নাহ্ থাক। আমার তাড়া আছে।' বলেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'তুমি সময় নষ্ট কোরো না কিন্তু, আমি কাল এসে এই প্রশ্নমালার সব অঙ্কগুলো দেখব।' যেন দ্রুততায় একটু পিছু হেঁটে দরজার বাইরে পা রাখলাম। লিলি অতি-বিনীত ছাত্রীর মত ঘাড় নাড়ল।

মানসী এই রকম শান্ত প্রকৃতির। ঠিক এইভাবে ঘাড় নাড়ে, এমন মন দিয়ে সব কথা শোনে! সেই মানসী এখন কেমন? ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরু অন্ধকার গলিটায় অভ্যস্ত পায়ে হাঁটছি। মানসীর বাবা এখন কেমন? কথাটা আবার মনে হল। আমার বুকের মধ্যে অনড় পাষাণভার।

গলিটা শেষ হতেই বড় রাস্তা। চারপাশের লোকজন আলো পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট। কি ভেবে ডান হাতে বাঁধা মাদুলিটা জামার ওপর দিয়ে একটু স্পর্শ করে ছুঁয়ে নিলাম। কয়েক পা এগোতেই দেয়ালের কোণে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভিখিরী বসে। কিছু বলছে না, ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের প্রান্ত পেতে নিচু হয়ে বসে আছে। যেন ঠোক্কর খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেট থেকে একটা পাঁচ পয়সা বের করে কাপড়ের ওপর ছুঁড়ে দিলাম। কোনদিন ভিখিরিকে পয়সা দিয়েছি কি? ছোঁড়বার সময় একটু বেশী সতর্ক হয়েছি যেন পয়সাটা গড়িয়ে না যায়, আর ভিখিরিটা যেন সামান্য শব্দ শুনেও তাকিয়ে দেখে—আমিই দিয়েছি! আমি বাঁদিকের বুকে হাত বুলোলাম অবহেলায়! ভিতরের পকেটে এইমাত্র পাওয়া মাইনের খামটা আছে তো!

ভিখিরির কাছ থেকে সরে এসেই আমার মনে হল মানসীর বাবা নিশ্চয়ই ভাল আছেন। মানসী অনেক সুস্থ। যিনি একটু আগে অন্ধকার গলিতে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি অন্যলোক। শিবনাথের বাবা হতে পারেন কি? শিবনাথের বাবা প্রায়ই এপাশে বেড়াতে আসেন। শিবনাথ কতবার আমাকে বলেছিল।

তিনিই কি আমায় ডেকেছেন ? হয়ত তাই। শিবনাথের বাবারও তো লম্বা-চওড়া চেহারা, হাতে লাঠি। আমাকে খুব ভাল করেই চেনেন।

একবার শিবনাথের বাড়িই বরং যাওয়া ভাল। মনে মনে বিড়বিড় করলাম। শিবনাথের বাড়ি যেতে মিনিট-পাচ লাগবে। আমি ওর বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। শিবনাথ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক গ্রামে আমরা থাকতাম। নিজেদের আপদে-বিপদে আমি শিবনাথ আর সব বন্ধুরা গ্রামে কি না করেছি! হঠাৎ আমার শরীরে রক্ত-চলাচল যেন দ্রুত হল। শিবনাথের মা মারা যাবার মাস কয়েক আগের ঘটনা হঠাৎ কেন মনে পড়ছে ?

স্কুলের শেষ ক্লাশে পড়ি তখন। সন্ধেয় স্কুল-মাঠে গল্প করছি আমরা কজন। শিবনাথ আসে নি। হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এলো ও।

'কল্যাণ।' হাঁপাচ্ছে শিবনাথ।

'কি রে!' আমি অবাক হয়ে বললাম।

'মা হঠাৎ কাপড়ে আগুন লেগে পুড়ে গেছে।' বলতে বলতে শিবনাথ কেঁদে ফেলল।

'সে কি!' আমরা সবাই ভয়ে-উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছি, 'কি করে ?'

'আমি এখনি কিছু বলতে পারছি না।' শিবনাথের দু-চোখ বেয়ে জল। 'আমার সঙ্গে একবার আসবি ?'

'নিশ্চয়ই।' আমিই আগে এগিয়ে গেলাম। 'চল, এখন কেমন আছেন ?'

'সেন্সলেস।' একটু থেমে বলল, 'ডাক্তার ডাকতে ছুটেছি। বাবা তো কলকাতা থেকে আসে নি। আমি একা কি করি!'

আমরা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে শিবনাথের সঙ্গ নিলাম। যাবার পথে আমার মাকে বললাম, 'মা, শিবুর মা আগুনে পুড়ে গেছে, আমি যাচ্ছি। ওখানে সারা রাত থাকব।'

'কি করে পুড়ল ?'

'সে অনেক কথা, পরে বলব। এখন যাচ্ছি।'

'কিন্তু সারারাত থাকবি ? দু'দিন পরেই পরীক্ষা!'

মায়ের ইচ্ছে নয় আমি পরীক্ষায় দু'দিন আগে এমনভাবে বাইরে রাত কাটাই। আমি বললাম, 'কিছু ভয় নেই। আমরা সবাই আছি। শিবু যে খুব ভীতু। ও নিজে থেকে কোন কাজই করতে পারে না। কাকাবাবুও এখনো কলকাতা থেকে আসেন নি।'

আমরা সারারাত শিবনাথের মায়ের কাছে ছিলাম সে সময়। সেই কিশোর বয়সে কি গভীর দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধে শিবনাথের বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম সে কদিন। আজও ভাবতে অবাক লাগে।

অথচ আজ! সামান্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অসহায়তাকে এমন উপেক্ষা করতে পারলাম কি করে? তা কি আমার স্বার্থপরতা? আমি বোধহয় কখন কোন্ অজ্ঞাতে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। নাকি, আমার রুটিন-বাঁধা জীবনের অস্তিত্বেই কোথাও বুঝি ঘৃণা জমতে জমতে আমাকে তা খুন করেছে, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে আমি পাপী! নিজেকে ঘৃণা করতে করতে আমি বোধহয় আত্মহননকারী খুনী! চমকে উঠলাম নিজের মধ্যে। যেনবা টাল সামলাতে না পেরে থমকে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠ কানে এলো, 'কল্যাণদা।' ডাকটা সন্তর্পিত।

দোতলায় তাকালাম। শাড়ি পরলেই পরিপূর্ণ যুবতী হতে পারে এরকম একজন দাঁড়িয়ে। শিবনাথের ফ্রক-পরা কিশোরী বোন শুভা। 'কিরে?' আমি শিবনাথের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে।

'আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন কেন?'

'শিবনাথ আছে?'

হঠাৎ শুভা আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে নীরব হতে ইশারা করল। ভ্রু-চোখেও সন্তর্পিত ইসারা। 'আমি নীচে যাচ্ছি।'

কিছু বুঝতে না পেরে আমি অবাক। একতলার দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি চাপা উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকাবাবু কেমন আছেন?'

'বাবার তো সেই বুকে ভয়ংকর ব্যথা।' গলা নামাল শুভা।

'স্ট্রোক?'

'হ্যাঁ।'

'কখন থেকে?' আমার গলা হঠাৎ যেন শুকনো হয়ে গেল।

'বিকেল থেকে। জানেন, বাবা কেমন আপনাকে সন্দেহ করছে। জ্ঞান হলেই এখনো 'আপনার নাম বলছে।'

আমি যেন মুহূর্তে বোবা হয়ে গেছি। শুভার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি। ভিতরে রক্ত বুঝি হিম হয়ে আসছে।

শুভা হঠাৎ হাসল। 'কল্যাণদা, আপনি বোধ হয় সব জানতেন?'

শুভার হাসি দেখে আমি বিস্ময়ে কথা বলতে পারছি না। 'তার মানে?'

'এই যে দাদা লুকিয়ে বিয়ে করে বাবার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে এসেছিল!'

আমি যেন এবার কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম। 'না, আমি জানতাম না। শিবনাথ গেল কোথায়?'

শুভা সম্ভবত আমার মুখ দেখে বুঝল আমি সত্যি কিছুই জানি না। 'দাদা তো এ বাড়ি থেকে চলে গেছে। বাবার সঙ্গে সে কি কথা কাটাকাটি। নতুন বৌ নিয়ে প্রণাম করতে এসেছিল।'

'কখন?'

'এই বিকেলে।' শুভা যেন দম নিল, 'দাদা চলে যেতেই বাবার বুকে যন্ত্রণা। দাদা-দিদিরা সব এসে গেছে। পিসিমা সকলকে ফোনে ডেকে এনেছেন।'

আমি এরপর কি বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আপনি ওপরে যাবেন না?'

'না থাক। পরে আসব।'

'দিদিরাও বলছিল আপনি সব জানেন। জানেন তো, আমি বলেছি কল্যাণদা অনেক দিন আসেন নি আমাদের বাড়ি, কি করে হবে?' একটু থামল শুভা, 'দাদা যে এরকম করতে পারবে কোনদিন, কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। আপনি তো জানেন দাদা বাবা-দিদিদের কি ভয় করত!'

আমি স্পষ্ট করে তাকালাম শুভার দিকে। শুভার কথায় কোথাও যেন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞতার ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'শিবনাথ জানে, কাকাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'না, জানবে কি করে? চলে যাবার পরে তো!'

হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা, এখন চলি শুভা, পরে আসব।' এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে না থেকে এগোনোর জন্যে পিছন ফিরলাম।

'ঠিক আসবেন কিন্তু কল্যাণদা!'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। শিবনাথদের বাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেছে। আমি ঘামছি। শিবনাথের বাবার প্রথম খবরে আমার নিজের অন্যায়-বোধের বোঝাটা কেমন ভারী অনড় হয়ে গিয়েছিল! এখন তা হাল্কা। কিন্তু গ্রামে শিবনাথ কি ভাতু ছিল। এই কিছুদিন আগেও যে শিবনাথ নিজের মত করে চলতে জানত না, সে এমন দুঃসাহসিক কাজ করল কি করে?

আর আমি? আমার সেই ছোটবেলার সাহস কোথায় গেল? আমি

মানসীকে বিয়ে করবই, কিন্তু একজন মুমূর্ষুকে দেখে কিসের ভয়ে আজ পালিয়ে এসেছি ? এমন শামুক-স্বভাব তো আমার নয় ! স্থির দাঁড়িয়ে থেকেই কথাগুলো ভাবছিলাম। সচেতন হয়ে চারপাশে তাকাতেই বুঝলাম রাত হয়েছে। কাল রববার। অফিসের তাড়া নেই। এখনি একবার মানসীর বাড়ি যেতেই হবে। অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। তা ছাড়া বারবার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথার সঙ্গে মানসীর বাবার কথা মনে পড়ছে কেন ? মানসীর বাবাই কি তিনি ? আমি আর এক মুহূর্তও দেরী না করে সামনের রাস্তা ধরলাম।

মানসীদের একতলায় ভাড়ার ফ্ল্যাট। পুরনো বাড়ি। আমি মানসীদের বাড়ী থেকে একটু দূরে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। কটা বাজে এখন ? দশটা। মানসীদের সব ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরের দরজা খোলা ? এত রাতে তো দরজা বন্ধ হয়ে যায় ! আমি দ্রুত এগোব ভেবেও না হেঁটে ধীর পায়ে খোলা দরজার কাছাকাছি এলাম। রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই প্রথম ঘরটা বাইরের ঘর। যেন ওই ঘরে সন্তর্পিত পদ শব্দ ! তারপরেই ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন মানসীর দাদা রমানাথ। আমার দিকে তাকাবার যেন সময় নেই। ওদিকে চলে গেলেন। কোথা যাচ্ছেন ? মানসীদের বাড়ি এমন থমথমে কেন ?

আমি দরজার সামনে আসতেই দেখি, মানসীর শাড়ীর আঁচল হঠাৎ ভিতরের ঘরে ঢোকার দরজায় উড়ে মিলিয়ে গেল।

মানসীকে খুব চাপা গলায় ডাকলাম।

একটু পরেই মানসীর বিষণ্ণ কান্না-ক্লান্ত মুখ দূরে স্থির হতে দেখা গেল।

'কি ব্যাপার !' আমার কণ্ঠস্বর চাপা, অনেকটা ফিসফিস করার মত।

মানসী দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। 'কথা বোলো না, এখানে বোসো।'

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আমি মানসীর নির্দেশ মত ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলাম।

'কি হয়েছে ?'

'বাবার স্ট্রোক ! পড়ে গিয়ে। সেরিব্র্যাল হ্যামারেজ।'

'কোথায় পড়ে গেছেন ?'

'বাইরে রাস্তায়।' ফিস ফিস করে মানসী বলল। মানসী বোধ হয় এখনি কেঁদে ফেলবে। ওঘর থেকে হঠাৎ ককিয়ে কান্নার শব্দ আসতেই মানসী দ্রুত ভিতরে চলে গেল।

আমি নিশ্চল বসে রইলাম। ভিতরে ভয়ংকর কাঁপছি। কেন কাঁপছি

এমন? সত্যিই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি মানসীর বাবা ছিলেন? হয়ত তাই। তাই বোধ হয় অমন করে হাত নেড়ে ডাকছিলেন। নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন! এখন মনে হচ্ছে স্পষ্ট করে তাকিয়ে ছিলেন যতক্ষণ ওঁর দিকে চোখ খোলা ছিল! হয়ত হাতের লাঠি কাঁপছিল তখন। ঠিক সেই সময়েই তো একবার 'কল্যাণ' নামে ডাকটাও শুনেছি আমি! হ্যাঁ, প্রিয়নাথবাবুরই কণ্ঠস্বর যে!

হঠাৎ কেন যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'এ কি, বসো!' আমার সামনে বিড়বিড় করে মানসী বাইরে যাবার দরজার সামনে এল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার রাস্তার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইল। আমি এই মুহূর্তে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারছি না। চাপা ভয়ে বুকের মধ্যেটা পাকিয়ে গেছে।

মানসী ভিতরে এল।

'কখন হয়েছে!'

'সন্ধের দিকে।' মানসীর দুচোখ পরিপূর্ণ সিক্ত। আবার একবার দরজার দিকে এগোল।

'এখন কেমন?'

'ভাল না।' অসহায় শূন্যতায় মানসীর গলার স্বর নির্মম নির্বিকার। যেনবা অন্যমনস্ক হয়েই বলল, 'একটু যদি কেউ ধরে ফেলত বাবাকে, এতটা হত না।'

আমি মেঝের দিকে মাথা নীচু করলাম।

আমি বুঝতে পারছি মানসী ছটফট করছে। রাস্তার দিকে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বলল, 'তুমি কদিন তো আসোই নি। এসে ভাল করেছ।'

'কেন একথা বলছ' বলতে গিয়েও পিছন-ফেরা মানসীর দিকে একবার তাকিয়ে আবার মাটিতে চোখ রাখলাম।

'বাবাকে ঘরে আনার সময় পর্যন্ত জ্ঞান ছিল। কেবল তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে আমাকে।' মানসী থামল, 'তোমাকে যে কত বিশ্বাস করে, ভালবাসে।' দীর্ঘশ্বাসে কথাগুলো জড়ানো।

'কোথায় পড়ে গেছেন!' একথাও বলা হল না, মানসীর দাদা ঘরে ঢুকল হঠাৎ। পিছনে ডাক্তার। ওরা দুজনে অতিব্যস্ততায় ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

'তুমি চলে যেও না যেন, বড় একা লাগছে! আসছি।' ওদের পিছন-

পিছন মানসী এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে ধ্বনিহীন কয়েকটি শব্দ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল। মানসী অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

সারা ঘর নির্জন। আমি কি একবার ভিতরের ঘরে যাব? মানসীর ছোট ভাই-বোনরা কোথায়? ওদের একসঙ্গে একবার সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম পাইকপাড়ায়। তারপর এই গত তিন মাসের কোনদিন ওদের একসঙ্গে পাইনি। সামনে থাকলে ওদের সঙ্গে ব'লে একটু-বা আশ্বস্ত হতে পারতাম। মানসীর ছোটভাইকে এখনি সেই খাঁচার বাঘের বানানো গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। আমি কি ভিতরে যাবো? ওরাও কি কাঁদছে? প্রিয়নাথবাবুর মুখ মনে পড়তেই কে যেন আমাকে জোর করে বসিয়ে রাখল চেয়ারে। এ-ঘরে শুধু আলো জলছে। পাখাটা কেউ খুলে দেয়নি। আমারও কোন শক্তি নেই উঠে সুইচ-অন করার। আমি চেয়ারটায় শরীরকে দুমড়ে ছোট হয়ে ফাঁসীর অপরাধীর মত বসে রইলাম। এ ঘরে কোথাও বুঝি টাইমপীস আছে। টিক-টিক শব্দটা আমার বুকের প্রতিটি ধ্বনিতে যেন তীব্রভাবে আঘাত করছে। আমি কি প্রতিটি আঘাতে ক্রমশ পাথর হয়ে যাচ্ছি? এখনো কেন বারবার সেই গলির মধ্যে প্রৌঢ়ের বাড়ানো টান-টান হাতটা চোখে ভাসছে? সে কি মানসীর বাবার আশ্রয় প্রার্থনা? আমি ভীষণ ঘামছি। দু' হাঁটু কনকন করছে। আমার যেন এবার সত্যি সত্যি দম বন্ধ হয়ে আসছে। মেঝের ওপর থেমে-থাকা পাখার ব্লেডের ছায়া পড়েছে। ফাঁসীর ঠিক আগে আসামীর এইকরম হয় বুঝি?

হঠাৎ আমার ভয় হল। জোর বাতাসে ঝোলানো পাখার ব্লেড দুলে নড়ে উঠতেই আমার সামনে প্রৌঢ়ের সেই হাত কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে আবার ককিয়ে কান্নার শব্দ এল। মানসী কি কাঁদছে? আমি চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। কোনদিকে না তাকিয়ে গরম ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এখন যত দ্রুত সম্ভব হাঁটছি। যে কেউ ভাবতে পারে আমি বোধ হয় কোন পাপ করে আত্মগোপনের আশায় এমন করে কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটছি। এখন বোধ হয় আমায় দৌড়তে হবে। এখনি যদি মানসী বাইরের ঘরে এসে আমাকে দেখতে না পায়? বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখবে আমি দ্রুত পায়ে পালাচ্ছি। কি ভাববে মানসী? প্রিয়নাথবাবু কি ওদের বলেছেন, রাস্তায় কল্যাণকে দেখেছেন? না, তা বললে মানসীই জিজ্ঞেস করত দেখামাত্রই। তবু এখনি দেখতে পেলে মানসী অদ্ভুত কিছু একটা ভাবতে পারে।

আমি মানসীর দৃষ্টিপথ থেকে লুকোবার জন্যে সত্যিই দৌড়তে লাগলাম।

রাস্তা ফাঁকা। রাত হয়েছে। এখন দৌড়লেও রাস্তার কোন লোকেরই আমার আচরণ বিসদৃশ মনে হবে না। আমি দৌড়চ্ছি সত্যি সত্যি। দুপাশের ফুটপাথে ভিখিরিরা দল বেঁধে শুয়ে আছে। আমার দৃষ্টিপথ থেকে এ দৃশ্য এখন দ্রুত অপস্রয়মান। আমি কোন দিকে যাচ্ছি? ভীরু কাপুরুষের মত আমি জনারণ্য থেকে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে চাইছি? দুপাশের ঘুমন্ত অসহায় নারী-পুরুষের অজস্র হাত আমাকে এমনভাবে ডাকছে কেন? আমার চারপাশে এত হাতের চলমান ছায়ারা কেন? না কি আমি থামতে ভুলে গেছি!

জীবনের কাছ থেকে আমার এই পলায়ন? মানুষের ওপর কি আমার বিশ্বাস নেই? সংসারে ঠিকমত বেঁচে থাকায় কোথাও বুঝি এমনি গোলমাল থেকেই যায়। স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, ভীরুতা —সমস্ত কিছুই বুঝি আমার দুকাঁধে ভর করে আমাকে এমন করে হোঁচট খেতে খেতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে? কোথায়? কোন্ দিকে? দু-পাশের অবহেলায় পড়ে-থাকা ভিখিরিদের ছেলেমেয়েগুলো এমনভাবে কাঁদছে কেন?

গায়ে চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস লাগল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। পিছনে যেন মালগাড়ি সান্টিং-এর শব্দ, বিকট। আমি বুঝি কোন কয়েদখানায় আছি! কোথায় এসেছি? গঙ্গার ধার। দূরে জলের অবিরাম শব্দ······

'এই তো এখানে এলাম। এবার বল।'

'কি বলব?' মানসী মিষ্টি করে হাসল।

'বাঃ, গঙ্গার জল পবিত্র। আমাদের ভালবাসাটা যে পবিত্র, তার শপথ নেবে না?'

'তুমি কেমনভাবে যেন কথা বলছ? যেন লেখক-লেখক।' মানসী ভুরু তুলে সুন্দর করে তাকাল। মুখ-চোখ চাপা কৌতুকে মনোরম।

আমি মানসীর হাত ধরলাম।

'এই, হাত ছাড়ো, লোকজন আছে।'

'চলো ওই একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়াই।' আমি এগোলাম।

'কেন? শৈবলিনী-প্রতাপ?' খিল খিল করে হাসছে মানসী।

'জল ছুঁয়ে একটু শপথ-শপথ খেলা খেলি।' আমি মানসীর দিকে কৌতুক করার মত মুখভঙ্গি করে তাকালাম।

'নাহ্ বাবা, পড়ে যাবো এতো ধারে গেলে।'

'এসো না, এই জল দিয়ে তোমার মুখ ছুঁই। এত কাছে তুমি, এমন পবিত্র তোমার মুখ!' আমি মানসীর ঘনিষ্ঠ হলাম।

'আহা! থাক।' মানসীর কথা, মুখভঙ্গি যেন স্নিগ্ধ আবেশ, লজ্জা আর গোপন প্রেম জড়িয়ে ওর বুকের ধ্বনিহীন কোন অতিরিক্ত শব্দে মিলিয়ে গেল।

'এই। দ্যাখো।'

'কি?' মানসী আমার পাশাপাশি জলের ওপর ঝুঁকল।

'আমাদের পাশপাশি দুটো ছায়া কেমন জলের ওপর মিশে এক হয়ে গেছে!'

জ্যোৎস্নায় মাজা মানসীর ত্বক। মানসী পরিপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল।

'ঠিক দুটো সাপ জলের বুকে খেলা করলে যেমন দেখায়! দেখ, ছায়ার ওপর ছোট ছোট ঢেউ আর জ্যোৎস্নার আলো। ঠিক তাই না?'

'এই! খুব ফাজিল হয়েছ যে!' মানসীর মুখ রক্তিম। হঠাৎ আমার হাত ধরে টেনেই বলে উঠল, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও তো, পড়ে যাবে যে।'

'সত্যি যদি পড়ে যাই, তাহলে?'······

চমকে উঠলাম আমি। এ কোথায় এসেছি! আমি কেন এমনভাবে জলের দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছি? মানসী পাশে নেই বলে? আমি একা বলে? আমি কি আমার কাপুরুষতা স্বার্থপরতা এইভাবে মুছে ফেলতে চাই? জলের ছায়ায় অবিরাম ঢেউয়ের কম্পনে কোন কাপুরুষের, খুনীর ছায়া বুঝি এভাবে মিলিয়ে যায় না? বুক টিপটিপ করতেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমার চারপাশে কেউ নেই। আমি একা। কি মনে হল, আমি জলের একেবারে ধার থেকে উঠে এসে পাড়ের একটা বেঞ্চে চুপ করে বসে রইলাম। দূরে শ্মশানের মধ্যে চিতা জ্বলার আগুনের ঝলক। মালগাড়ি সান্টিং-এর ক্রমাগত শব্দ। নদীর বুকে জাহাজের ভোঁ বাজল। আমি ভীষণ ক্লান্ত। দুচোখে আমার ঘুম······

আমি সমবেত কোলাহলের মধ্যে হেসে উঠেই বাঘের খাঁচার দিকে তাকালাম। এবার বাঘের খেলা হবে। এত বাঘ খাঁচার মধ্যে! খাঁচার মাঝখানে এত কমবয়সী একজন খেলোয়াড়! এ কি? ও যে আমি, কল্যাণ! সদ্য-যৌবনে পা দিয়ে আমিই বাঘের এমন ভয়ানক খেলা খেলছি! অথচ আমি এখানে দর্শকদের মধ্যে। আমার খুব মজা লাগছে। এক মুহূর্তে খেলা দেখানোর খাঁচার মধ্যে একটা ক্লাউন ঢুকে পড়েছে। আমি কোথায়? আমিই সেই ক্লাউন! ক্লাউনটা চূন-কালি মেখে ঘুরে ঘুরে বারবার পেটে হাত, মুখে হাত

দিয়ে হাত বাড়িয়ে কি চাইছে ? পয়সা ? আমি ক্লাউন হয়ে এমন করে ভিক্ষেয় বাঁচতে চাইছি ! চারপাশে হাসির ঢেউ। ক্লাউন হয়ে আমি চারপাশের বাঘগুলো দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি, বাঁচবার জন্যে ডাকছি কাদের ? একি ! বাঘগুলো কোথায় গেল ? খেলার ঘর ফাঁকা। একটা গাধা কোত্থেকে এল ! ক্লাউন গাধা হয়ে কেমন ঘুরছে ! ক্লাউন তো আমিই ! আমার মুখে কেন গাধার মুখোশ, নাকি আমার সত্যিকারের মুখ ? আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম …না…না…না…

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। বেঞ্চে শুয়ে পড়েছিলাম। ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। আমি অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখলাম কেন ? চারপাশে তাকালাম। কখন যেন ভোর হতে শুরু করেছে। শ্মশানের মধ্যে থেকে শেষ হরিধ্বনি কানে এল। চিতায় জল ঢালায় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে। দূর থেকে একবুক জলে দাঁড়ানো এক স্নানার্থীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'ত্বমেব ভান্তমনুভাতি। সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' এরই সঙ্গে কে যেন আমার মধ্যে বিড়বিড় করল, 'তিনি স্বয়ং প্রকাশিত, জগত, মানুষ সকলেই তাঁরই অনুসরণ করে। সেই পরমময়ের দীপ্তি থেকে জগতে আমরা সকলেই এমন আলোময়, উদ্ভাসিত।' বাতাসে ভাসতে ভাসতে অস্পষ্টভাবে আবার কানে এল, 'কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু'ণশ্চ।' আমার যেন বলতে ইচ্ছে করছে, 'আমরা যে কোন কাজই করি না কেন সব তিনি জানেন, জগতের সমস্ত কিছুতেই তাঁর বাস। আমরা যা কিছু করি তিনি তার অধিষ্ঠাতা। তিনিই আমাদের প্রত্যেককে চেতনা দেন, তিনি নিগু'ণ।' এইভাবে আমার মধ্যে ঈশ্বরকে জানলেই কি সমস্ত কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?

পরিচ্ছন্ন মনোরম বাতাসে আমি তারা-ভরা আকাশ, নদী, আসন্ন উষার রঙ দু-চোখ ভরে নিলাম। আমার থেকে একটু দূরে এক রুগ্ন ভিখিরি-মা ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে। মায়ের পিছনে জড়িয়ে লেপ্টে আছে তার মেয়েটি। মায়ের খোলা বুকে মুখ ডুবিয়ে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট শিশুটি। ছেলেটির ডান হাতে আধ-খাওয়া রুটি ধরা। সকাল হলেই বাকিটা খাবে ও।

আমি নিষ্পলক মা-ছেলে-মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।





শূন্যের ছায়ায়

অফিসে বেরুবে শেখর। দাড়ি কামাতে বসেছে। এমন কনকনে শীত, তার ওপর মোটা দাড়ি। ভাত চাপিয়েছে বলে মন্দিরাও গরম জল দিতে পারেনি। তাই দাড়িতে বেশ কিছু সময় লাগবে সাবান ঘষতে। শেখর ছোট কাঁচিটা নিয়ে আগে-ভাগে নাসারন্ধ্র থেকে ঝুলে-পড়া লোম, ঈষৎ মোটা গোঁফ ছেঁটে নিচ্ছে।

আয়নার দিকে মুখ রেখেই শেখর বলল, 'উঁহু, দিলু হাত দিও না। ব্লেডে হাত কেটে যাবে।'

দিলু শেখরের একমাত্র ছেলে। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ঘাঁটছিল। শেখরের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'আমি কিছু করছি না বাবা।'

'যাও, মা কি করছে দেখ। আমার তাড়া আছে, এখন বিরক্ত কোরো না।'

দিলু কথা শুনল না। দশ বছরের ছেলে দিলু। পড়া ছেড়ে ঠিক এই দাড়ি কামাবার সময় বাবার কাছে বসবেই।

মন্দিরা রান্নাঘরে নেই। বাইরে যাবার দরজার সামনে থেকে গলার শব্দ আসছে ওর। রান্নাঘরে ভাত ফুটে ওঠার শব্দ।

শেখর আয়নায় মুখ দেখছে। দৃষ্টি স্থির। চোয়াল ভাঙা, মাথার চাঁকে হাস্যকরভাবে চুল ছড়ানো। দু'চোখ ক্লান্ত, কোল জুড়ে কালি। কদিন ঘুমোতে দেয়নি মন্দিরা। ছোট বোন নীরার বিয়েতে একটা দামী সোনার গয়না দিতে চায় ও। সেই নিয়ে দিনরাত খিটখিট করছে। শেখর ক্লান্ত, বিরক্ত, প্রায় বিধ্বস্ত।

'বাবা, এই ব্লেডটা আমি নিচ্ছি। পেন্সিল কাটার মত একটাও নেই।' দিলু একটা ঝকঝকে ব্লেড পাশে সরিয়ে রাখল।

শেখর দিলুকে একবার দেখে দাড়িতে সাবান ঘষতে বসল।

বাইরে বেরুবার দরজার সামনে মন্দিরার গলার স্বর হঠাৎ চড়ে গেল। 'না, না, ঠিক করে ওজন কর। তোমরা ভীষণ ওজনে মারো।' মাসের শেষ দিকে জমে-ওঠা কাগজগুলো বিক্রী করছে মন্দিরা।

'এই তো, দেখুন না মা, আমার কাছে ওসব পাবেন না।'

'সবাই ওরকম বলে যায়। এই, একটি কাগজও বেশী নিও না। না, না, নামাও।' মন্দিরা জোর করে হাত থেকে কাগজটা টেনে নিল। 'এটা থাক, আবার যখন দেব তখন নেবে।'

'দিন না মা! একটা কাগজ তো! চেয়ে নিচ্ছি। ওজন তো ঠিক দিয়েছি।'

'চেয়ে নেওয়ার দিন চলে গেছে বাবা। কাগজের দাম এখন কত দেখছ তো? আমাদের কাগজ রাখতে হয় কত দিয়ে?'

শেখর শুনেছে। এমনিতে মন্দিরার গলা ধীর শান্ত। কাগজওলার সঙ্গে দর কষাকষি করতে চড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল যেন একটুতেই গলা চড়ে যায় মন্দিরার।

শেখর সাবান-ঘষা থামিয়ে হাতে সেফটি-রেজারটা নিল। আয়নার দিকে পাশ ফিরে জুলফি দেখছে। কোন্ দিকে, ঠিক কোন্ জায়গাটায় ব্লেড রাখবে নিখুঁত করে দেখছে। পাশ থেকে মন্দিরার পদশব্দ কানে এল।

'কি? হঠাৎ কাগজ বিক্রী করলে যে!'

'হঠাৎ কেন? কাল চলে যাবো, এমাসে তো ফিরছি না, তাই।' বলতে বলতে মন্দিরা রান্নাঘরে ঢুকল। সামনেই রান্নাঘর।

'সামান্য কখানা কাগজ। কি হল বিক্রী করে?'

'ওর সঙ্গে দিলুর পুরনো কখানা খাতাও দিয়ে দিয়েছি! নতুন ক্লাসে উঠেছে ওগুলো আর কি হবে?' মন্দিরা যেন নিজের মনেই বলে গেল। ফুটন্ত ভাতে জল দিয়ে হাঁড়ি নামাল।

'খবরের কাগজের সঙ্গে দিলুর খাতা!' শেখরের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়। আয়নায় দৃষ্টি স্থির রেখে দাড়ির এক পাশ পরিষ্কার করে ফেলেছে এক হাতে। আর এক পাশে টানতে গিয়ে কড় কড় শব্দ হল। লাগছে খুব। দাড়ির চামড়া যেন আগুনে জ্বলছে।

রান্নাঘর থেকে মন্দিরার কথা কানে আসছে না। মন্দিরা ভাতের হাঁড়ি উপুড়

করে ডাল চাপিয়েছে। বাইরে এসে দাঁড়াল স্বামীর সামনে। 'জান, দিলুর ওই খাতাগুলো খবরের কাগজের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। না হলে কটা খবরের কাগজে ক'পয়সা হবে!'

'মিশিয়ে!' শেখর দাড়ি-কামানো থামিয়ে মন্দিরার দিকে তাকাল। 'তার মানে?'

'মানে আবার কি?' মন্দিরা মৃদু হাসছে। 'খাতাগুলো খবরের কাগজের দামেই চলে গেল। কাগজের দাম এখন তিন টাকা কে. জি। লোকটা ধরতেই পারল না!'

শেখর হঠাৎ যেন বিমূঢ়। 'সে কি! তুমি শেষ পর্যন্ত এই করলে?' শেখরের গলা চাপা কিন্তু ভয়ংকর কঠিন।

কিছু বুঝতে না পেরে মন্দিরা শেখরের দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে।

বাবার কথায় দিলু শেখরের দিকে তাকাল।

হঠাৎ দিলুর নিষ্পাপ মুখের দিকে লক্ষ্য পড়তেই কেন যেন মাথা গরম হয়ে উঠল শেখরের: 'এই, কি করছিস এখানে! যা এখান থেকে!' অস্বাভাবিক চিৎকার করে উঠল শেখর। 'যা, ঘরে পড়তে বস।'

বাবার কাছে এরকম ধমক দিলু সাধারণত খায় না। আচমকা বকুনি খেয়ে দিলু ভয়ে ঘরে ঢুকল।

মন্দিরা আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। 'কি ব্যাপার। হঠাৎ এমন বকলে কেন ওকে?'

'আস্তে কথা বল।' শেখর চাপা গলায় বলল। কদিন ধরে মন্দিরার সঙ্গে কথা-বার্তায় একটা চাপা রাগ নোংরা তলানির মত শেখরের মনের মধ্যে জমে উঠেছে। সেফটি রেজার থেকে খোলা ব্লেডটার ধারালো দিকে অন্যমনস্কের মত মুছছে শেখর। 'যত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছো তত তোমার বুদ্ধি মোটা হয়ে যাচ্ছে মন্দিরা।' কনকনে ঠাণ্ডার দিনের শীতলতায় যেন শেখরের কণ্ঠস্বর জড়ানো, ভারী, স্থির।

'কি! আমি নীচ!' মন্দিরা শেখরের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বিড় বিড় করল।

শেখর একভাবে মাথা নীচু করে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম গোছাতে বসল। মন্দিরার দিকে তাকাল না। ওর কথা কানে এসেছে, জবাব দিল না।

মন্দিরা কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরে ঢুকল।

একতলায় একখানা বেশ বড় আর একটি ছোট ঘর, চওড়া এক টুকরো বারান্দা, মাঝারী গোছের রান্নাঘর, লাগোয়া বাথরুম পায়খানা নিয়ে শেখরের ছোট ফ্ল্যাট। রোদ হাওয়া ছড়িয়ে-উড়িয়ে ফ্ল্যাট ঢেকে রাখে—এই যা এ ফ্ল্যাটটার সুবিধে।

শেখর স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রোদে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল। যা হাড়-কাঁপানো হাওয়া! একসময়ে গম্ভীর মুখে অফিস যাবার পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিল। দিলু পড়তে পড়তে বাবাকে শুধু দেখছে। কোন কথা বলার সাহস পাচ্ছে না। বেরিয়ে গেলেই ওকে স্কুল যাবার জন্যে তৈরী হতে হবে।

রান্নাঘরে এল শেখর। 'ভাত দাও নি এখনো! আমার দেরী হয়ে গেছে।'

মন্দিরা চুপ করে বসে আছে উনুনের দিকে তাকিয়ে। রাতের তরকারী বসিয়েছে কড়ায়। ভাত ছাড়া বাকীগুলো সকালেই রেঁধে রাখে মন্দিরা, রাতে খাবার আগে গরম করে নেয়।

শেখর নিজেই রান্নাঘরের মেঝেয় এক কোণে আসন পেতে নিল। বসে বলল, 'কই দাও।'

মন্দিরা নির্বিকার তরকারী নাড়ছে খুন্তি দিয়ে।

শেখর মন্দিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভয়ঙ্কর চাপা অভিমান প্রকাশ করার এই এক নীরব ভঙ্গি মন্দিরার। রাগ দুঃখ অভিমান হলে, বিশেষ করে সংসার খরচের ওপর, মন্দিরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। শেখরকেই সেই দুর্গ ভাঙতে হয় নানান কথা বলে।

'কথা বলছ না কেন? আমি কি বলেছি?'

'আমি তোমার কাছে তো কোন কৈফিয়ৎ চাই নি!' মন্দিরা বিড বিড করল।

'কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, কত ভুল করেছ! ছেলের সামনে—! তা ছাড়া তোমার কথাটা নোংরা কিনা বল?' গলা নামিয়ে বলল শেখর।

মন্দিরা স্পষ্ট করে তাকাল শেখরের দিকে। 'ভুল! হ্যাঁ, ভুলই করেছি। তোমাকে ভালবেসে বিয়ে করার সময় এতটা বুঝিনি।'

গম্ভীর শেখর হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'তোমাকে কিছু দিতে পারিনি বলে বলছ?'

'বলার কি আছে ? কি দিয়েছ তুমি আমায় ? আবার ন্যায়-নীতি দেখাচ্ছ ! আমি একটা নীচ ?' গলা চড়ল মন্দিরার।

'আস্তে কথা বল মন্দিরা।' শেখর যেন অনুরোধ মিশিয়ে বাধা দিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার যা আছে তাই দিয়েছি, বেশী পাবো কোথায় ?'

'নীরার বিয়েতে যাবো, একটা ভাল ভেতরের জামা কেনার মত পয়সা আমার হাতে নেই। ভাল কাপড়-জামা তো দূরে থাক।' মন্দিরার চোখে জল। 'সামান্য কাগজ বিক্রী করেছি বলে প্রেস্টিজে লাগছে ?'

'আমি তা বলিনি। ওভাবে কাগজওলার কাছে ছোট হওয়া উচিত হয় নি।'

'থামো।' মন্দিরা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

শেখর মন্দিরাকে দেখল। ময়লা জামা-কাপড়ে বড় দীন মনে হল ওকে। অথচ এইভাবে থাকবে বলেই কি মন্দিরা একদিন ওর বাড়ীর ও আত্মীয়স্বজনদের সমস্ত বাধা আপত্তি অত্যাচার উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসেছিল ? শেখরের নিজেকে বড় করুণ অসহায় মনে হল।

মন্দিরাকে সহজ করার জন্যে শেখর বলল, 'নীরার বিয়েতে যাবে তো ?'

মন্দিরা নীরব।

একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল শেখর, 'যাবে না ?'

'না।'

'কেন ?'

'কেন আবার জিজ্ঞেস করছ ?'

'বলেছি তো, সামান্য যে ক'টা টাকা আছে ওতেই ছোটখাটো একটা ভাল জিনিস নিয়ে যাও।'

মন্দিরা কোন উত্তর দিল না।

'বেশ, আমি আজ কিনে আনব এখন।'

'না, আনবে না। আমি যাব না।'

'তা কি কখনো হয়। নিজের ছোটবোনের বিয়ে, শেষ কাজ ? না গেলে খারাপ দেখায়। লোকে তো তোমার-আমার ঝগড়া বুঝবে না !'

'কি বুঝবে তবে ?' মন্দিরা স্বরে ঈষৎ ব্যঙ্গ করল।

শেখর থেমে গেল। তাকাল মন্দিরার দিকে স্পষ্ট করে। 'ভাববে পয়সা নেই, একেবারে ভিখিরি বা কৃপণ। কলকাতায় থেকে নিজের ছোট বোনের বিয়েতেও এলো না।'

মন্দিরা শেখরের চোখে চোখ রাখল। 'পয়সা নেই-ই তো। তুমি আর কি দিচ্ছ?'

'কেন! সোনার দাম না হয় বেশী। কিন্তু তিরিশ-চল্লিশের মধ্যে একটা ভাল জিনিস হয় না! যার যা সামর্থ্য!' শেখর যেন দম নিল। 'বেশ তো, তোমার দুল-আংটির মত খুচরো কয়েকটা গয়না বদলে একটা জিনিস করে নাও!'

'চুপ কর তো, বাজে বকো না। যার দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার এসব বলা সাজে না।' মন্দিরা তরকারীতে একটু জল ঢালল। 'যে নিজের স্ত্রীর কাছে প্রেস্টিজ রাখতে জানে না, তার প্রেস্টিজ-বোধ কতটুকু বোঝা গেছে!'

'প্রেস্টিজ!' শেখর ক্রমশ নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে অতি সন্তর্পণে।

'হ্যাঁ, তাই।' মন্দিরা থামল। 'দিদিরা সব থাকবে, তাদের কাছে ছোট হতে পারব না।'

'তার মানে!'

'মানেটা বুঝিয়ে দিতে হবে?'

শেখর নির্বিকার মন্দিরার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'দিদি-জামাইবাবুরা কত ভাল ভাল জিনিস দেবে। সব সোনার! আর আমি? আমি শুধু নয়, তুমিও কি ছোট হয়ে যাবে না সেখানে?' একটু থামল মন্দিরা। 'এর আগে কতবার যে ছোট হয়েছি! তার থেকে নীরার বিয়েতে আমি যাব না। আমার কি কোন মান-সম্মান নেই?'

শেখর কি যেন ভাবছে। বলল, 'কিন্তু দিদিদের সঙ্গে পাল্লা দিও না মন্দিরা, এতটা আমি পারব না। তোমার জামাই-বাবুরা সব বিজনেসম্যান, বাড়ি-গাড়ির বড়লোক। আমি কিছুতেই অতটা উঠতে পারব না।' বিড়-বিড় করল শেখর। 'তা ছাড়া আমি পছন্দ করি না।'

'পছন্দ করা-না-করা কি? বল অক্ষম, অপদার্থ! কিছুই পার না। নিজেকে গোছাতেই পারলে না এতদিনেও। রেশনিং-এর সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে কি করলে?' একটু থামল মন্দিরা। উনুন থেকে কড়াটা নামিয়ে রাখল মেঝেয়। কয়েকটা শুকনো গুল আঁচের ওপর ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'অথচ আমার দু-তিনজন আত্মীয় রেশনিং অফিসে কাজ করে বাড়ি-গাড়ি জমি-জায়গা কত করেছে, দেখে এস। তুমি এমনি সামান্য একটু খোসামোদ করে অফিসারও হতে পারলে না। ন্যায়-নীতি দেখাচ্ছ?' মন্দিরা নোংরা হাত নিয়েই স্থির হয়ে বসল।

'আঃ, চুপ কর মন্দিরা। অনেকবার একথা শুনেছি তোমার কাছে।' শেখর

মাটির দিকে তাকিয়ে। 'আমাকে বিয়ে না করাই তোমার উচিত ছিল। ভুল করেছ।' গলা অনেক নামিয়ে কথাগুলো বলে শেখর যেন একেবারে থেমে গেল।

'এখন তাই মনে হয়।' মন্দিরা অন্যমনস্ক হয়ে মনে মনে বলল।

…'দেখবি মন্তু, এভাবে বেরিয়ে গেলে সুখী হবি না। যাকে নির্ভর করে চলে যাচ্ছিস সে তোকে সুখী করতে পারবে না।' মন্দিরার মা শেষ কথা বললেন।

'কেন মা? অভিশাপ দিচ্ছ? কিন্তু এখন কিছু নেই বটে, আমি গিয়ে নিজের মত ঠিক গড়ে তুলতে পারবো, দেখো।'

'তা হয় না।' মা থামলেন. 'তোর বড়, মেজ, সেজদের ত্যাখ, ওরা কি অসুখী? জামাইরা লেখাপড়া জানা নয়, কিন্তু অভাব কিছু আছে ওদের? সমাজে টাকা না থাকলে কেউ মান্য করে? লেখাপড়ায় কি হবে?'

'আমার অভাব থাকবেই, এটা ভাবছ কেন মা?'

'শেখরকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।' মা মন্দিরার দিকে তাকালেন। 'আমাদের মত সংসারে তুই মানুষ মন্তু, আমাদের সমান মর্যাদায় থাকতে পারিস যদি যা।' একটু থেমে বললেন, 'তোর বাবা ভাই-বোন আত্মীয়রা তো এই জন্যেই তোর সঙ্গে কথা বলছে না।'

মনে পড়ে বাবা মুখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। 'দেখো, পারি কিনা! আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও তো আগে!'

'যা। কিন্তু আবার বলি, ভুল করছিস।'……

হ্যাঁ, কোথাও বুঝি ভুলই হয়ে গেছে! মন্দিরা কয়েক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা থেকে সচেতন হতেই যেন নিজের মধ্যে অনেক গভীরে কথাটা শুনল। শেখরের দিকে তাকাল। কেমন অক্ষম, দুর্বল, ভীরু, নীতিবাগীশ মনে হল ওকে। শেখর স্থির বসে আছে।

ছোট বোনের বিয়েতে কাল সকাল থেকেই বালিগঞ্জ গিয়ে থাকতে হবে। পরশু বিয়ে। একটা ভিতরের জামা কিনবে বলে কাগজগুলো বিক্রী করেছে তাতেই এত ঝগড়া! তার ওপর সোনার দোকানে একটা দামী ভাল পেনডেন ঝোলানো হার পছন্দ করে রেখে এসেছে মন্দিরা। তা নিয়ে দিনরাত কথা কাটাকাটি। অথচ শুধু নিজের নয়, বাপের বাড়িতে শেখরেরও সম্মান বাঁচাতে চায় ও। ভাবতে ভাবতে শেখরের দিকে তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল।

'ভাত দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।' শেখর গম্ভীর হয়ে বলল।

মন্দিরা নোংরা হাত ধুয়ে নিল। কোন কথা না বলে ভাত বেড়ে দিল।

শেখর মাথা নীচু করে খেয়ে যাচ্ছে, মন্দিরা একসময়ে বলল, 'কি ঠিক করলে? আমি কিন্তু বিকেলে গয়নাটা আনতে যাবো।'

শেখর কোন কথা বলল না।

'কি, চুপ করে আছ কেন? বলে যাও। না গেলে দিলুর স্কুলের ছুটিটা নেবো না।'

'যাও, আমি তো বারণ করছি না।' শেখর থালার দিকে তাকিয়ে বলল। মুখের মধ্যে ভাত নিল।

'যাও বললে তো হয় না। ওটা না আনলে যাবো কি করে?'

'পাবো কোত্থেকে।' দাঁতের গোড়ায় মাছের কাঁটা আটকাতেই থেমে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'ব্যাঙ্কেও তো তেমন কিছু নেই!' শেখর চিবনো বন্ধ রেখে জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়ায় বোলাতে লাগল। খচ খচ করে লাগছে কাঁটাটা।

'তা হলে?'

'এবার তুমি ভাব।' ভাতটা গিলে নিল শেখর। কাঁটাটা সরছে না। 'তা ছাড়া আমি এসব পছন্দ করি না। তার থেকে না গেলেই ভাল।' এতক্ষণে দাঁতের গোড়া থেকে কাঁটাটা সরে গেল।

মন্দিরা পিছন ফিরে উনুনে দিলুর খাবার করছিল। শেখরের শেষ কথাগুলো কানে যায়নি। বলল, 'আমি ভাবব!' পিছন ফেরে মন্দিরা। মুখে শ্লেষের হাসি। শেখরের দিকে ফিরল। 'আমার কাছে কি আলাদা হুণ্ডি দিয়ে রেখেছ?'

'তা হলে বলছ কেন? দেখছ আমি পারছি না!' শেখর কাঁটাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাতের গোড়ায়। এবার তাড়াতাড়ি খেতে লাগল ও। 'আমাকে কি চুরি করতে বল?'

'দরকার হলে তাই করতে হবে! অপদার্থ অক্ষমরাই তো চিরকালের ভিখিরি!'

শেখর চকিতে তাকাল মন্দিরার দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক। ম্লান হাসল শেখর।

'হাসছ কি? কেবল আমিই নীচ হয়ে যাচ্ছি, তাই না?'

'আমাকেও বুঝি টানতে চাও?'

'সংসারটা আমাকে করতে হয়।' মন্দিরা জোর দিয়ে বলল।

'ভাল তো! কর।' শেখর এতক্ষণ হঠাৎ-জেগে-ওঠা চাপা রাগটাকে সামলাচ্ছে। মন্দিরার সামনে সংযত থাকতে চায়। আসন ছেড়ে উঠে পড়ল শেখর। খেতে হয়ত এখনো সামান্য বাকি।

'কি, বল? এখনি তো বেরিয়ে যাবে!' জেদী মেয়ের কণ্ঠ মন্দিরার। 'তুমি তো অফিসে যাবার পর দোকানে দোকানে ঘুরবে!' মন্দিরা শেখরকে পুরনো পথটা ধরিয়ে দিতে চাইছে।

'ওসব বাদ দাও।' কুলকুচি করা জল শব্দ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মুখ থেকে।

'মানে।'

'না থাকে দেবে না। অসুবিধে থাকলে যাবে না সেখানে। কিন্তু ইতরের মত বেঁচে থেকে কোন তৃপ্তি, সুখ নেই।' শেখর চাপা রাগে কাঁপতে কাঁপতে মুখ-ধোয়া শেষ করল। তাড়াতাড়ি করছে, এবার বেরুবে।

মন্দিরা রান্নাঘর ছেড়ে উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। দুচোখ ছলছল করছে। জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে ব্যস্ত শেখরকে দেখছে মন দিয়ে। শেখরের কঠিন মুখের স্বর যেন নিথর করে দিল মুহূর্তে মন্দিরাকে। কোন কথা না বলে শেখর বাইরের দরজার দিকে এগোল। প্রতিদিনের মত দিলুকে পর্যন্ত একবারও আদর করল না। শুধু মান্দরার দিকে একবার স্পষ্ট করে তাকিয়ে গেল।

মন্দিরা দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে ঢুকল। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে ও।

বাস থেকে নেমেই একটা সিগারেট ধরাল শেখর। ওকে খানিকটা হাঁটতেই হয় অফিসে পৌঁছতে। অফিসে পৌঁছে সই করে কয়েকটা দোকান ঘুরতে বেরুতে হবে। তারপর ক্লান্ত হয়ে অফিসে ফিরে বসতে বসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। কিন্তু শেখর এখনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে। বাসে আসতে আসতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। মন্দিরা আজ বেশ কিছু টাকা চায়। কেন চাৎকার রাগারাগি করে টাকা আদায় করতে চায়, শেখর বোঝে। তাছাড়া ব্যাঙ্কে যা ছিল দিলুর দুবার ভারী অসুখে শেষ হয়ে গেছে। ওর অসুখের আগে মন্দিরাকেই একবার বাঁচানো দায় হয়েছিল আট মাসের মাথায় মেয়েটা হবার সময়। মেয়েটা আগে পেটেই মারা গিয়েছিল কিন্তু পরে শেখরকে নিঃসম্বল করে রেখে গেছে! সেই থেকে মন্দিরার মেজাজ কেমন রুক্ষ! আর মন্দিরার অভিমান? দুচোখ ভর্তি জল দেখে এসেছে মন্দিরার। অথচ সেই বিয়ের আগে মন্দিরা!

…'কাঁদছ কেন মন্দিরা ! এ বিয়ে আমাদের হবেই ।' শেখর বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস টেনে বলল। 'জাত-বেজাতের কোন ঝামেলা নেই যখন! আর থাকলেও মানত কে ?'

সেই শীতের সকালে মন্দিরা বাড়িতে লুকিয়ে চলে এসেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছনে। পুকুরপাড়ে বসেছিল ওরা শিশির-ভেজা ঘাস ছুঁয়ে।

মন্দিরা চোখ মুছল। 'আমার ভীষণ ভয় করছে শেখর!'

'কিসের ভয় ?'

'তুমি সত্যিকারের বড় হতে পারবে তো ? অনেক বড় !'

শেখর হাসল। 'এই তো এম-এ পাশ করলাম। একটা চাকরী হলেই আর ভয় কিসের ? এবার হবে!' শেখর হঠাৎ অন্যমনস্ক। এখানে-ওখানে সাজানো লাল-নীল-হলুদ ফুলের কেয়ারী-করা গাছগুলোয় ওর দৃষ্টি ছুঁয়ে আছে। রোদ-লাগা শীতের কুয়াশা থিক-থিক করছে চারপাশে।

মন্দিরা কি ভেবে আলতো করে হাত বুলিয়ে চলেছে ঘাসে।

'তুমি কি ভাবছ ? কোনদিন চাকরী পাব না !'

'না, ভাবছি আমার মা-বাবা, আমার দিদি-জামাইবাবুদের মত বড় হতে পারবে তো ?'

'মানে! অত বড়লোক!' শেখর থামল। হাসতে হাসতে বলল, 'অত বড় না হই তবু তুমি সুখী হবে।' শেখর একটু সরে বসল মন্দিরার কাছে। 'মানাতে পারবে না ?'

মন্দিরার সামনে ঈষৎ দূরে লাল ফুলের ঝাড়। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছে। মন্দিরা ফুল-গুলো দেখছিল। অদ্ভুত একটা পাখি বাঁশির টানা শব্দের মত কোন একটা গাছের গভীরে ডেকে চলেছে এমন সকালে। মন্দিরা তাকাল শেখরের দিকে। 'পারব।'

'ঠিক!' মন্দিরার স্থির দৃষ্টির মায়ায় শেখরের চোখ নিষ্পলক।

দুজনের চোখে তখন অফুরন্ত কথা, অনন্ত বিশ্বাস, বিনিময়।

হঠাৎ মন্দিরা হাসিতে ভেঙে পড়ল শেখরের বুকের গভীরে। 'দেখো, যেভাবে রাখবে থাকব…থাকব…থাকব।'……

পথচারীদের ক্রমাগত ধাক্কায় শেখর সচেতন হল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট নিভে গেছে। আর কখন যে সিগারেট ধরিয়ে গতি মন্থর হতে হতে রাস্তার মধ্যেই ও থেমে গেছে, ওর খেয়াল নেই। ওর মুহূর্তের উদাস মুখে ক্লান্তি, চাপা

যন্ত্রণার চিহ্ন আবার স্পষ্ট হল। পথচারীরা কেউ ওর মুখ দেখছে না। শেখর বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে অফিসের দিকে এগোল।

দুপুর গড়িয়ে গেলে শেখর দোকান-ঘোরা শেষ করে অফিসে এসে বসেছে। অফিসের বড় হলঘরের চেয়ারগুলোয় বসে সহকর্মীরা গালগল্প করতে করতে কাজ করছে। এত চীৎকার ভাল লাগছে না। শেখর অফিসারের ঘেরা ঘরটার দিকে তাকাল। আজ উনি আসেন নি। শেখর হাতের কাগজপত্র, ছোট ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে অফিসারের ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসল। এই শীতেও চড়া রোদে ওর মুখ যেন পুড়ে গেছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে তন্দ্রার ভঙ্গিতে চোখ বুজতেই বেয়ারা ঢুকল। একটা শ্লিপ হাতে দিয়ে বলল, 'সেই লোকটা আবার দেখা করতে এসেছে স্যার।'

'আবার কে এল এ সময়ে!' বিড়বিড় করে শ্লিপটা দেখল শেখর। সেই লোক—চৌথিরাম বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ! বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বিরক্তমুখে বলল, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।'

লোকটা অবাঙালী। এখন ভাঙা-ভাঙা হিন্দী মিশিয়ে পরিষ্কার বাংলা কথা বলে। গোলগাল ভারী মোটা ঈষৎ নোংরা জামা-কাপড় পরা বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ ঢুকল স্যুইং-ডোর ঠেলে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স।

'কি ব্যাপার বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ? আবার এসেছেন! সেদিন আপনাকে অফিসে ঢুকতেই বারণ করেছিলাম!' দাঁতে দাঁত চাপল শেখর সন্তর্পণে।

বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ যেন বিনয়ে গলে গেল। 'এমোন একঠো ব্যাপার, আমার তো কুছ মালুম হয় না স্যার!' ফ্যাল ফ্যাল করে শেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না এসে উপায় নেই স্যার!'

শেখর স্থির তাকাল ওর কুতকুতে চোখ দুটোর দিকে। যেন ধমক দিল, 'বসুন, কি চান বলুন?'

বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ বসছে না। বলল, 'আপনি তো স্যার শোব কুছ জানেন। একটা কুছ করে দিন! না হলে মারা পড়ে যাবো স্যার!'

শেখর লোকটার থেকে দৃষ্টি নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। কিছু একটা ভাবছে। এই লোকটা কদিন ধরে একটানা বিরক্ত করছে ওকে! এতদিনের চাকরীতে আজ পর্যন্ত এরকম সমস্ত লোককেই তাড়াতে পেরেছে! কাউকে মুহূর্তের জন্যেও পাত্তা দেয়নি। এ লোকটা আঠাকাঠির মত লেগে আছে শেখরের পিছনে। চেয়ারে হেলান দিয়ে লোকটাকে এক পলক দেখে নতুন একটা সিগারেট

ধরাল। শহরতলীর মিল এলাকায় রেশনের দোকান দিয়ে চেহারা সুন্দর করেছে! আরও কয়েকটা বেনামে দোকান ছড়িয়ে রেখেছে শহরের মধ্যে। মুখ-চোখ চেহারায় ব্যবহারে সুন্দর ভদ্র হতে জানে! অথচ লোকটা পুরনো বাস্তুঘুঘু!

'কিন্তু কিছু করতে তো পারব না আমি বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ!' শেখর ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা বলল।

'সে তো আপনি ওনেকবার বোলছেন স্যার। নোতুন কোথা দু'চারটে ছাড়ুন!' যেন ভাল কৌতুক করেছে, এই রকম হাসি-হাসি মুখের ভাব বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদের।

'লোকটা কি আমাকে ধরতে চায়? কোন্‌খানে?' মনে মনে বলল শেখর। হাসিটা এখনো লেগে আছে ওর মুখে। শেখরের হঠাৎ ইচ্ছে হল, একটা কষে চড় লাগায় ওই নিটোল গালটায়। নির্লজ্জ হাসিটা বন্ধ হয়ে যাবে এখনি।

'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ—আমি তো প্রথমদিনই বলেছিলাম!' অন্যমনস্ক থেকে মাথা নেড়ে যায় শেখর।

'না স্যার, না। ঠিকই এসেছি।' বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদের গলা আদুরে, হালকা। 'আপনি তো ইনচার্জ-স্যার!'

শেখর হঠাৎ সোজা টান টান হয়ে বসল। 'আপনি যান। আমি তো বলে দিয়েছি বিরক্ত করতে আসবেন না।' শেখর উপেক্ষার সঙ্গে ফাইল দেখতে বসল।

'স্যার!' বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ একটু ঝুঁকল সামনে। 'স্যার, বোঝেন তো, ছেলে-বউ নিয়ে সোংসার করি। একটু-আধটু ইধার-উধার তো হোবেই। লেকিন, আপনি যদি না দেখেন তো—!'

'আহ্ থামুন।' শেখর চীৎকার করে উঠল। 'আমারও ছেলে-বউ আছে।' বলেই কিসের আচমকা ভয়ের শিহরণে শেখর শান্ত হয়ে গেল।

'সে ভি বাত তো আমিও বোলে স্যার!' অনেকটা সামনে ঝুঁকেছে বিন্ধেশ্বরী-প্রসাদ। গলা নামিয়ে বলল, 'সেহি তো বোলছে ঠিক জায়গায় আসছি আমি।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবার বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ শব্দহীন হেসে চলেছে।

লোকটার দিকে তাকাল শেখর। হঠাৎ মনে হল, একটা কুৎসিৎ জানোয়ার তার গোপন থাবা বাড়িয়ে এতক্ষণে কিছুটা কব্জা করতে পেরেছে শেখরকে। শেখরের মাথা ঝিম ঝিম করছে। 'মন্দিরার সঙ্গে কি কোনো গোপন যুক্তি করেই

এসেছে লোকটা ?'…বিড়বিড় করল। ঠিক সকালে মন্দিরার সঙ্গে চড়া কথা বলার সময় যেমন করছিল মাথার মধ্যে, সেই রকম মাথার মধ্যে চাপ-চাপ যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস দ্রুত হল শেখরের। মন্দিরার মুখ মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, অফিস বেরুবার সময় দিলুকে একটুও আদর করে আসা হয়নি। দিলু হবার পর থেকে এমন অশান্তি বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

'স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'না।' শেখর তাকাল বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদের দিকে। 'আপনি এখন যান।' শেখর শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'তোবে কি হামি একটু ঘুরে আসবে স্যার ? বোডোবাজারে একঠো কাম আছে, করিয়ে ফিরবে ?'

শেখর ভিতরে ভয়ংকর কাঁপছে। মনে হচ্ছে, সকালের মত মন্দিরা ওকে চীৎকার করে কিছু বলছে, ও রেগে যাচ্ছে ক্রমশ। মন্দিরা আরও চীৎকার করে চলেছে, শেখর ক্রমশ যেন রাগ নিঃশেষ হলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

'না, আর আসতে হবে না।' শেখর ফাইলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল।

'তা হলে স্যার—'

'ঠিক আছে, যান। আমি বলে দেব কাল থেকেই সব ব্যবস্থা হবে।'

'সাচ্ বাত তো ?' বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ চাপা আবেগ সামলাতে না পেরে বলে ফেলল কথাটা।

'আঃ আর বিরক্ত করবেন না। এখনি বেরিয়ে যান এখান থেকে।' চাপা চীৎকারের স্বর শেখরের গলায়।

'কুছ মোনে কোরবেন না স্যার, আপনাকে কদিন বড় বিরক্ত করলাম।'

যেন ক্লান্তির মধ্যেই গলা নামিয়ে শেখর বলল, 'মনে রাখবেন, ফারদার যেন এরকম না হয়। আমরা পাবলিক প্রপার্টি নিয়ে ডিল করি।'

হাতের বড় ফোলিও ব্যাগে ততক্ষণে বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ কিছু যেন খুঁজছে, পাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের মনেই বলছে, 'হামি সোব কুছ বুঝি স্যার। পাবলিক নিয়ে আপনাদের কারবার। আমাদেরও ভি পাবলিক নিয়ে চলতে হয়। অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। তবে তো—।'

মুখ খোলা বড় ফোলিও ব্যাগের মধ্যে হুমড়ি খাওয়ার মত পড়ে থেকে বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ কথা বলছে। 'না না স্যার। এমন কোন কাজ ফিউচারে হোবে না। তবে কিনা স্যার—'বলতে বলতে থেমেই একটা নতুন ডায়েরী হাতে তুলে

আনল ব্যাগের মধ্যে থেকে। শেখরের সামনে যত্ন করে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনি আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিলেন স্যার, আপনাকে এবার খুশি হোতে হবে। এ বছরকা একঠো নয়া ডায়েরী—।' হাসছে ও।

শেখর বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদকে দেখছিল। মনে হল, ওর গোল মুখটা একটা বীভৎস দাঁতাল জানোয়ারের মত লম্বা হয়ে গেছে। আর সেই লম্বা মুখে একটানা হাসছে ভদ্র মানুষের মত। শেখরের এখনি ইচ্ছে হল, একটা লাথি মারে লোকটাকে।

বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলল, 'চলি স্যার, আর একবার আপনাকে টেলিফোন করব কি স্যার? খোঁজ নেবো কাল ফার্স্ট আওয়ারে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে সরে দাঁড়াল। 'ডায়েরীটা খুব দামী স্যার। দেখবেন, কাউকে দেবেন না যেন!' বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদ হাতজোড়-নমস্কার করে বেরিয়ে গেল সুইংডোর ঠেলে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির শেখর। ওর সামনে বিন্ধেশ্বরীপ্রসাদের সযত্নে রাখা ডায়েরী পড়ে আছে। একবার তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। একটু ফাঁক হয়ে থাকা সুইংডোরের দিকে তাকিয়েই দ্রুত হাতে ডায়েরীটা তুলে নিল। খুলতেই মোটা সাদা খামটা হাতে ঠেকল। কোটের ভিতর পকেটে রাখল ওটা। ডায়েরী ছোট ফোলিও ব্যাগে রেখে ব্যাগ বন্ধ করল।

আর এক মুহূর্ত যেন অফিসে থাকতে পারছে না শেখর এই সময় থেকে। বাইরে বেরিয়ে হলঘরের মধ্যে ওর টেবিলে ফাইল গুছিয়ে রেখে রাস্তায় নেমে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে শেখরকে বেড়াতেই হবে। এই শীতেও ভিতরে বুঝি ঘামছে ও।

সন্ধের একটু পরেই নীরার বিয়ের পাট চুকে গেছে। সাজানো হলঘরটায় ছিল বরাসন। এখন ফাঁকা। চারপাশের দেয়ালে লাগানো বড় বড় আয়না-গুলোয় চারপাশের আলো সূর্যের মত জ্বলছে। হলঘরেরই এ কোণে লম্বা কোচে শেখর বসে বসে ওই দিনেরই খবরের কাগজ দেখছে। অফিস থেকে বাড়ি ঘুরে তৈরী হয়ে এসেছে শেখর। বয়স্কদের ইতস্তত ঘোরাফেরার জন্যে সিগারেট ধরাতে পারছে না। দূর থেকে বাসরঘরের সমবেত হাসি-ঠাট্টার ঢেউ কানে আসছে।

সামনে দিয়ে মন্দিরার সেজো-জামাইবাবু যাচ্ছে। হাতে লুচির ঝুড়ি। খুব ব্যস্ত। হঠাৎ শেখরকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে মশাই, আপনি এবার তো আমাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছেন!'

'কি রকম!' শেখরের দৃষ্টিতে অকৃত্রিম বিস্ময়।

'আপনার ছোট শালীটি তো আপনার প্রেজেন্টেশানে পঞ্চমুখ। সত্যি, আপনার টেস্ট কিন্তু স্বীকার করতেই হয়। একটু আগে সকলে আপনাকে খুঁজছিল।' একটু থেমে বলল, 'যাই, পরে কথা হবে শেখরবাবু।' চকিতে সরে গেল সামনে থেকে।

দিলু ওপাশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে শেখরের সামনে এসে দাঁড়াল। ধুতি পাঞ্জাবিতে মজার লাগছে ওকে! 'বাবা, মা তোমাকে খুঁজছিল।'

'তোমার খাওয়া হয়েছে বাবা?' টেনে পাশে বসাল শেখর দিলুকে।

'না। পরে বসব।'

'মা কখন খুঁজছিল?'

'একটু আগে।'

বাসরঘরের দিকে যাচ্ছিল মন্দিরা। নিজের পেনডেন হার, চুড়ি, বালা ছাড়া ওর মায়ের দেওয়া কিছু গয়না পরেছে মন্দিরা। গায়ে ঠাসা গয়না, দামী বেনারসী। দোকান থেকে বানিয়ে-আনা সুদৃশ্য খোঁপায় মন্দিরাকে যেন রাজরাণীর মত দেখাচ্ছে। শেখরকে দেখতে পেয়ে দূর থেকেই বলল, 'এই, তুমি এখানে আছ তো?

'কেন?'

'এখনি কোথাও যেও না যেন! আমি আসছি এখন।' মন্দিরার গলা থেকে যেন খুশি উপচে পড়ছে।

শেখর অবাক চোখে মন্দিরাকে দেখল। মন্দিরা দ্রুতপায়ে বাসরঘরের দিকে চলে গেল।

দিলুকে বাঁ হাতে জড়িয়ে পাশে টানতে গিয়ে ওর পকেটে শেখরের হাত ঠেকে গেল। 'দিলু, তোমার পকেটে পয়সা কোত্থেকে এল? দিদা দিয়েছেন বুঝি?'

দিলু খুশি হয়ে বলল, 'না বাবা, এসব পয়সা আমার!'

'তোমার! কে দিল? মা?'

'না, না। ও, তুমি জান না বুঝি? আমার গত বছরের বইটা একটা ছেলে নেবে বলেছিল। মা ওকে বিক্রী করে দিতে বলেছিল। বাবা, জান, বইটার যা দাম লেখা আছে এখন তো তা থেকে দাম বেড়ে গেছে! ক্লাশের একটা ছেলে আমায় বলল! আমি সেই বেশী দামেই দিয়েছি। কম দামে কেন দোব বল?

মা আগের দামটা নিয়ে আমার কাছে এই পয়সাগুলো রেখে দিয়েছে।' দিলু বাবাকে জড়িয়ে ধরে শেখরের গা ঘেঁষে বসে কথা বলছে।

নিষ্পাপ মুখ দিলুর। একভাবে তাকিয়ে থেকে শেখর কথাগুলো শুনতে শুনতে যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে। দিলুর দিকে নিথর তাকিয়ে থেকে এই প্রথম যেন শেখরের মনে হল, দিলু যত বড় হচ্ছে যেন সমস্তটাই শেখর হয়ে উঠছে! কোথাও কোন ভুল নেই! ভিতরে চমকে উঠল। ওর মাথা হঠাৎ গরম! কিন্তু কিছু করতে না পেরে বিবর্ণ মুখে দিলুর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

'কি বলছে ও?' ঝলমলে বেনারসীর শব্দ গায়ে জড়িয়ে মন্দিরা হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। হাসছে। পাশে এক বিবাহিতা মহিলা। মন্দিরার সমবয়সী। 'এই, শোন। ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।'

'ও, আচ্ছা, নমস্কার।'

'ইনি হলেন নীরার বড় ননদ। নিউ আলিপুরে থাকেন। এম-এ পাশ ইনি। তোমাকে দেখতে চাইলেন, তাই!'

'থাক, ও আর কি?' ভদ্রমহিলা লজ্জা পেলেন।

'আর জান!', মন্দিরা যেন ফুলে ফুলে উঠছে, 'ইনি তোমার কেনা গয়নাটার, ইস্, কি প্রশংসাই যে করছিলেন না! এঁর হাসব্যাণ্ডও। আমি সকলকে বলেছি, তোমার রুচি কোনদিনই খারাপ না।' মন্দিরা ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল।

'যাক, তবু ভাল যে আপনাদের ভাল লেগেছে।' শেখর নির্বোধের মত তাকিয়ে হাসছে।

'সত্যি! আপনার কিন্তু চয়েস আছে! আমাদের বাড়ির মেয়েরাও বলছিল।' ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর অভিভূতের মতন।

'না, ও আর এমন কি।' শেখর ভদ্রমহিলার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মন্দিরাকে দেখল এক পলক। গয়নাটা মন্দিরারই পছন্দ করা, শেখর একটুও মনে করতে পারছে না কি রকম গয়নাটা!

মন্দিরার মুখে-চোখে চাপা অহংকার। এমন উপচে-পড়া খুশিমুখ অনেকদিন দেখেনি শেখর।

'তুমি আমার কাছে এসো তো!' নীরার ননদ দিলুর হাত ধরে টানল। 'ইস্, কি সুন্দর ছেলেমানুষ মুখ! কি ভাল দেখতে তুমি!' ভদ্রমহিলা গালে হাত বুলিয়ে আদর করছেন দিলুকে।

মন্দিরা দিলুর দিকে তাকাল। 'দশ বছর বয়স মনেই হয় না, তাই না?' একটু থেমে বলল, 'চলুন ভাই, ওদিকে আবার ডাক পড়বে!' শেখরের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি বোস।'

'চলি। বউভাতের দিন আমাদের বাড়িতেই আবার দেখা হবে।' ভদ্রমহিলা দিলুর হাত ধরে আছেন।

শেখরের মুখে এখনো হাসি লেগে। নির্বোধের মত। শেখর চকিতে নিষ্পাপ দিলুকে দেখল। সুখী মন্দিরাকে দেখল। ততক্ষণে ওরা পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছে। দিলুর পাশে সোজা হয়ে টান টান চেহারায় মন্দিরা হেঁটে যাচ্ছে।

শেখরের মুখ থেকে হাসি সরে গেল। দূরের দেয়ালে লাগানো স্বচ্ছ আয়নার দিক থেকে চকিতে মুখ সরিয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি ফেলল শেখর। ক্রমশ নিজের মধ্যে এক গভীর অসহায় শূন্যের ছায়ায় হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে ও।



যীশুর পুতুল

মাঝে মাঝে সশব্দ বর্ষণসহ গত তিনদিন বেশ ঝড় বয়ে গেছে। ফিনফিনে পাতলা কাগজের মত উড়াল কিছু মেঘে এই সকালে বৃষ্টিও হতে পারে, কিন্তু জমাট চাপা দিগন্ত-জোড়া সাদা মেঘে চার পাশ থমথমে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই কবিতার তাই মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গিরিজাশংকরের গজগজ কণ্ঠস্বর কানে এল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পাশে শুয়ে-থাকা স্বামী দেবেশকে দেখেই মনে মনে বিড়বিড় করল, 'বড়দিভাই কি আজ এখনো ওঠেন নি?' ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন সাতটা।

গিরিজাশংকর আবার চীৎকার করলেন, 'ব্যাপারটা কী? আমাকে এখুনি বেরুতে হবে, চা-টা তার আগে পাবো না?' এই বয়সেও বাড়ির সকালের দুধ-আনা, বাজার, দোকান সব নিজেই করেন গিরিজাশংকর। সব সেরে চা-টা ঠিক সময়ে ওঁর চাই।

'কেন চেঁচাচ্ছ সকালবেলা? কে তোমার চাকরাণী আছে যে এমন সাত-সকালে প্রত্যেকদিন চা যুগিয়ে যাবে মুখের সামনে? বাইরে গিয়ে খেয়ে নাও!' যোগমায়াদেবী চাপাকণ্ঠে শাসন করলেন স্বামীকে। 'যতো বুড়ো হচ্ছো ভীমরতি হচ্ছে তোমার! পোড়া সংসারের হাল দেখছ না? নাকি কানা?'

কবিতা দরজা খুলে বাইরে এল। পুরনো জীর্ণ দোতলা বাড়ি। ড্যাম্পের ভ্যাপসা গন্ধ সকালের আবছা অন্ধকারে মিশে কবিতার মুখ চোখ ঢেকে দিল। দোতলার বারান্দা ধরে একটু এগোতেই পাশে মেজদিভাই-এর ঘর চোখে পড়ল। দরজা আধ-ভেজানো। তিনি মেয়েকে সামনে নিয়ে চা খাচ্ছে। মেঝেয় ভাঙা

কাপ, তোবড়ানো বাটি ছড়ানো। বিছানায় মেজভাসুর নেই! বোধ হয় ভোর হতেই জোর করে তুলে কোন কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে বাইরে মেজদিভাই। কবিতার খারাপ লাগল। গতকাল রাতের তুমুল ঝগড়ার জের সকাল থেকেই শুরু হয়েছে! এখন কিছু বলতে যাওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক ছোট-বড ঝগডার যেন একটা নিয়ম হয়ে গেছে! কেউ কারোর ঘরে ঢোকে না, কথা বলাও প্রায় বন্ধ, বললেও ঘুরিয়ে। অন্তত কবিতা বছর চারেক আগে এ বাড়ির বউ হয়ে ঢোকার পর থেকেই এসব দেখছে।

নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এল কবিতা। সিমেণ্ট-বাঁধানো সরু সিঁড়ি! জলের ছিটে লেগে মোটা শ্যাওলা-ধরা। দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে নিল। বালি ঝুর ঝুর করছে। নীচে থেকে মুখ ধুয়ে উঠে আসছে মনু—বড় ভাসুরের মেয়ে। চোখাচোখি হল।

'মা ওঠেননি এখনো?'

'কাল রাত থেকে যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।'

'ও!' কবিতা গলায় শব্দ করল। 'বাবা চা চাইছেন, তাই ভাবছি বড়দিভাই তো অনেক আগে ওঠেন, কি হল!' একটু থেমে বলল, 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' নীচে নেমে এল কবিতা।

গিরিজাশংকর বেরিয়ে এলেন বাইরে। যাবার জন্যেই তৈরী হয়েছেন।

'আপনি একটু বসুন, আমি চা করে দিচ্ছি।' কবিতা শ্বশুরের দিকে না তাকিয়েই লাজুক চাপা গলায় বলল।

'থাক মা, বাড়ির নিয়ম যখন বদলাচ্ছে তখন যে যার নিজের মত করেই বদলে নিক! আমি এবার থেকে না হয় চা-টা বাইরেই খেয়ে নেব!' প্রায় আশি বছরের শক্ত-সমর্থ বৃদ্ধ এক অদ্ভুত অভিমানে দৃপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন কবিতাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। গায়ের লোম, মাথার চুল, গোঁফ সব সাদা।

কবিতা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শ্বশুরের চেহারা, চলে-যাওয়া দেখল।

তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে খুড়শ্বশুরের একমাত্র ছেলের বউ বাণী। দেখে মনে হল, উঠেছে অনেকক্ষণ। কবিতা আড় চোখে একবার দেখে নিল। কথা বলল না। কবিতাকে নোংরা হিংসে করে সেজদিভাই। তাই খুব দরকার না হলে কথা বলে না।

বাণী রান্নাঘরে ঢুকল।

'বৌমা !' যোগমায়াদেবী ডাকলেন।

'আমায় বলছেন ?' কবিতা শাশুড়ীর ঘরের দিকে একটু এগোল।

'তোমায় নয়তো কাকে ?' থামলেন যোগমায়াদেবী। 'মেজবৌমা তো দেখলুম উঠেছে অনেক ভোরে! কমলকে চা করে খাওয়ালো, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজেও খেল। শ্বশুরকে একটু দিতে পারল না ?' একটু থেমে যেন নিজের মনেই বললেন, 'আমি যে আর তেমন চলা-ফেরা করতে পারি না, পারলে ছেলে-বউদের তোয়াক্কা করতুম নাকি ?'

'থাক মা, সকালে আর এসব নিয়ে কথা তুলবেন না।' কবিতার কণ্ঠস্বর চাপা, ভয়ার্ত। রান্নাঘরে সেজদিভাই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আরও কথা তৈরী হবে, গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে পড়বে স্রোতের মত। তাই কবিতা দ্রুতপায়ে কলঘরের দিকে এগোল। আজ ওকেই এখুনি রান্নাঘরে ঢুকতে হবে।

কলঘরে কবিতার মুখ ধোয়ার শব্দ হতেই বাণী এক ফাঁকে বেরিয়ে এল বাইরে। যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি ত্রস্তপায়ে ওপরে উঠে এল।

'এই শোন !' মেজবৌ শান্তা ডাকল বাণীকে। ঘরে নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'মা কি বলছিলেন ?'

'তুমি নাকি ভোরে উঠে চা করেছ, শ্বশুরকে দাও নি ?'

'মাকে কে বলল ?'

'কে আবার ! আমার মনে হয় ও-ই তোমায় দেখে গিয়ে লাগিয়েছে !'

'কিন্তু আমার তো দেওয়ার কথা নয় ? কেন, ওদের যিনি আদরের বড়বউ তিনি গেলেন কোথায় ? তিনিই তো সব সেবা-যত্ন করেন ! তাঁকে বলছেন না কেন ? হুঃ, আদেখলেপনা আর কত দেখব !' চোয়াল শক্ত করে থামল শান্তা। 'তাছাড়া সংসারের চা-চিনি-দুধ কোথায় ? কোত্থেকে দেব ? সংসারের জন্যে টাকা ঢালব, আবার নিজেদেরটাও আলাদা দেব ! আমি দিইনি বলে কত কথা ! আমি নাকি পয়সা জমাই ! না থাকলে আমার মেয়েগুলোকে দেখবে কে ?'

'থাক মেজদিভাই। ঝগড়ার মধ্যে যেও না, ভাল্লাগে না।'

'ঝগড়া আমি করেছি ? তুমি তো দেখেছ, কাল বিকেল থেকে আমাকে কি না বলেছে !'

'থাক না, চুপ করে যান।' একটু উৎকর্ণ হল বাণী। 'ছোট আসছে বোধ

হয়। ওকেই তো মা বলছিলেন।' একটু থেমে বলল, 'আমি ছাদে যাই,' বলেই বাণী অদৃশ্য হল।

শান্তা যেন নিজের মনেই গজগজ করছে, 'সব সমান। বাইরে ভাল, ভেতরে কি তা জানা আছে।' শান্তার ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। 'আমরা খারাপ, মুখের ওপর সব বলে ফেলি, এই যা!'

কবিতা শুনছে কি শুনছে না, বোঝা গেল না। নির্বিকারভাবে ঘরে ঢুকে জানালার সামনে দাঁড়াল।

তেতলার সবটাই ছিল ছাদ। চিলেকোঠা ঘরও ছিল না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, শোয়া-বসা পড়াশুনোর জায়গা পায় না বলে একখানা ঘর করোগেটের ছাদে ঢেকে তৈরী করল বড় ছেলে নিখিলেশ। দেখাদেখি মেজজায়ের চাপে পড়ে কমলেশও ঘর করে নেয়। ওদের কাকার ছেলে সরোজ। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাকা-কাকিমা অনেকদিন হল মারা গেছে। সরোজও কবিতাদের ঘরের ছাদে একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে। ওদের পুরনো ঘরটা নীচের তলায়।

ছাদের ঘরে ঢুকেই বাণী বলল, 'জান তো, সকাল থেকেই আবার লাগছে।'

সরোজ প্রেসের কম্পোজিটর। বাঁধা মাইনের কাজ ছাড়াও ওভার-টাইম হিসেবে ঠিকে কাজও করে। বেরুবে বলে থমথমে আকাশ দেখছিল। বলল, 'দেখ তো, ছাতা নিয়ে বেরুব?'

হঠাৎ মাথা গরম হল বাণীর। 'তুমি কিছু বলছ না যে!'

'কি বলব?'

'এ বাড়ি ছাড়বে না? বাড়ি করার তো মুরোদ নেই, একটা ফ্ল্যাট কেনারও তো চেষ্টা করতে পার?'

হাসল সরোজ। 'মশা আবার পাখি। প্রেসের কম্পোজিটার, তার আবার ফ্ল্যাট কেনা! বাজারটা দেখেছ, সংসারই চলে না!' একটু থেমে চোখের দৃষ্টি চশমার পুরু লেন্সে রেখে তাকাল বাণীর দিকে। বিশ্রী ভেঙানোর মত মুখভঙ্গি করে বলল, 'এ বাড়িটা ছাড়ো, আর অন্যে ভোগ করুক। ছাড়লেই বেওয়ারিশ! তখন?' সরোজের চোয়াল-ভাঙা রুক্ষ বুড়োটে মুখ কেমন হঠাৎ যেন বহুদিনের জমা বিরক্তিতে ভয়ংকর হয়ে গেল। 'তোমাদের ওই মেয়েলি ঘ্যানঘ্যানানি শুনিও না। যত্তো সব—!'

বাণী সরে গেল সরোজের কাছ থেকে। জানালায় মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। দু'চোখের পাতা ভিজে, ভারী। অসহায়

অভিমান সামলে যেন নিজের মনেই বলল, 'ছোট ভাইয়ের মত নির্বিকার হতে চাইছ ? ছোট ভাইয়ের মত উপায় করতে শেখ, তবে হবে। সংসারে যাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকে, তাদের নির্বিকার হওয়া সাজে।' থামল বাণী। 'কি আছে তোমার ? ছোট ভাইয়ের মত লেখা-পড়াও তো শেখনি।'

এর পরেই একটা বিশ্রী ধমকের শব্দ কানে এল কবিতার। সরোজ চেঁচিয়ে উঠেছে, তারপরের কোন কথা শোনা গেল না। তিনতলায় সরোজের ঘরটা ঠিক কবিতাদের ঘরের ওপর বলেই এতক্ষণ স্পষ্ট কথাগুলো কানে আসছিল। বাণীকে অদ্ভুত লাগে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ওদের। কবিতা আপন মনে হাসল। সিঁড়িতে সেজভাসুরের পায়ের শব্দ ক্রমশ নামছে। কবিতা পিছন ফিরল। উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা দেবেশের দিকে চোখ পড়ল। মানুষটা যেমন সমস্ত বিষয়ে নির্বিকার, এর শোয়া-ঘুমোনও তেমনি! এখনি তো উঠবে। মুখ-হাত ধুয়ে, চা হল কি হল না জেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে। পুরনো বাড়ির দেয়াল কত পুরনো হল, কত ঘুণ ধরেছে, একদিনও তা দেখে না। পুরুষ মানুষ বুঝি এই রকমই ভাল ? ঘরে বসে থাকলেই তো বুড়ো! বাইরে বাইরে দিনের বেশী সময় কাজে-অকাজে কাটালে প্রাণ থাকে, যৌবন থাকে। চার বছর ধরে দেখছে মানুষটাকে। কবিতা হাসল। দেবেশের হাতের শক্ত মুঠি, বুক, পিঠ, দুই ঠোঁটে চোখ বুলোল। নাকের নীচে সিঁদুর লেপ্টে আছে, আঙুলের ডগায়ও। চকিতে নিজের ঠোঁটে আঙুল বোলাল। কি ভেবে পরার কাপড় বদলাতে লাগল। এখনি রান্নাঘরে ঢুকবে।

কবিতা উনুন সাজিয়ে কাগজ জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছে, মনু সামনে এসে দাঁড়াল। 'ছোট্ কাকিমা, আঁচটা উঠলে বোলো, মা আসবে!'

'দরকার কি ? মায়ের যখন এত শরীর খারাপ।' একটু থামল কবিতা। 'বরং তুমি এসো একসময়ে। আবার তোমারও তো কলেজ, টিউশনি—!'

'তাতে কি ? আচ্ছা, মাকে আমি বারণ করছি। তুমি বরং আমাকে ডেকো। ছাদে আছি। একটা দিন তো!'

'তাই ডাকব।'

মনু চলে গেলে কবিতা আনাজ কুটতে বসল বাইরে। চুন-বালি খসে-পড়া দেয়াল, ড্যাম্প শ্যাওলায় নোংরা, ফেটে চৌচির মেঝেয় ঘুপসি রান্নাঘর। উনুন জ্বললে বসা যায় না! বাইরেও ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। মেজ জা শান্তা পায়ে শব্দ তুলে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ছোট, বলে রাখি, বড়দিভাই রাঁধলে আমি এখানে খাব না, আমার ছেলেমেয়েরাও না।'

কবিতা আচমকা এমন প্রস্তাবে কি বলবে ভেবে পেলো না নির্বিকার তাকিয়ে রইল শান্তার দিকে।

'তুমি রাঁধছ?

'হ্যাঁ।'

'তবে এই যে শুনলাম, বড়দি রাঁধবেন! সেজ বলছিল! তা যদি হয়, আমি ঘরে স্টোভ জেলে রেঁধে নিচ্ছি। এই বলে গেলুম।' যেমনভাবে এসেছিল, সেইভাবে দৃষ্টির আড়াল হল শান্তা। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, পিছু পিছু বাণীও অদৃশ্য হল।

এমন ঝগড়া নতুন নয়। বছর চারেক আগে এ বাড়িতে প্রথম ঢোকার ক'দিনের মধ্যেই কবিতা বুঝেছিল। দিনের পর দিন নিত্য নতুন অভাবের মধ্যে ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়জা ব্যতিব্যস্ত। মেজজা শান্তার তিন মেয়ে। বড়জার সঙ্গে মেজ জা-র সম্পর্ক তেমন সহজ নয়। মেজভাসুর কমলেশ সামান্য মাইনের চাকরী করত। ইউনিয়নের গোলমালে হঠাৎ চাকরী চলে যেতে বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর এখন কিছু ফাটকা করেন। কবিতা নিজের বুদ্ধিতেই আন্দাজ করেছিল। দেবেশও দাদার স্মাগলিং-এর কথা ওকে বলেছে। বেশ কিছু কাঁচা টাকা হাতে আসে! মেজদা বাড়িতে তো নয়ই, কাউকেই তা বুঝতে দেয় না। কোথায় যেন জমি কিনেছে। সেজ বাণী এক ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কোনরকমে সংসার চালায়। বাপের বাড়ির সচ্ছল পরিবেশে আদুরে ছোট মেয়ে ছিল বাণী। তারই স্মৃতি এই ধ্বসে যাওয়া শ্বশুরবাড়িতে দুষ্টক্ষতের মত সেজ জায়ের স্বভাবের মধ্যে কি তৈরী করে দিয়েছে? অহঙ্কার, দম্ভ, দেমাক? নাকি, ভয়ংকর অসহিষ্ণুতার মধ্যে নোংরা হিংসা?

কবিতা সচেতন হল। বাঁ হাতের আঙুলটা হঠাৎ একটু কেটে গেল। ডান হাত দিয়ে কেটে-যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে কবিতা চারপাশ দেখল। বেলা হয়েছে, তবু বাড়ির থমথমে পরিবেশ এতটুকু সরেনি। দেবেশ এখনো ঘুমচ্ছে। হাসল কবিতা ভাইদের মধ্যে এমন সুখী কিসে? বি-কম পাশ, সুন্দর দেখতে, ব্যাঙ্কের চাকরী—এ সবের মধ্যেও দেবেশ নিজের স্ত্রী ছাড়া বাড়ি আর বাড়ির বাইরে অদ্ভুত নির্বিকার। কাল বিকেলে অফিস-ফেরত অমন নোংরা ঝগড়া গোলমালের মধ্যেও?……

শৈলজা তখন শান্তার ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

'সাবানদানিটা ভুল করে কলঘরে রেখে এসেছি, দীপু ওটা মাখল। ও জানে ওর গায়ে নোংরা ঘা আছে। সারা বাড়ি ছড়াবে।'

'কি যা তা বলছেন বড়দি? ও কেন মাখতে যাবে? ও তো নিজের সাবান নিয়ে কলঘরে ঢুকেছে, আমি দেখেছি।'

'আমি কি মিথ্যে বলছি?' শৈলজার কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত।

'কি জানি। কাকে যে বিশ্বাস করি!'

শান্তার বলার ভঙ্গিতে শৈলজা চাপা সূক্ষ্ম অপমান বোধ করল। 'মেয়েকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তারপর বলবে। নতুন দামী সাবানটা এবার ফেলেই দিতে হবে।' ধীর পায়ে নিজের ঘরে ঢুকল শৈলজা।

'আমরাও দামী সাবান ব্যবহার করি।' শৈলজা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হতেই শান্তা ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখটায় এসে ডাকল, 'দীপু, এই দীপু, তাড়াতাড়ি নীচে আয় তো।' বছর পনেরোর রোগা লম্বা দীপু দোতলায় এসে দাঁড়াতেই শান্তা চড়া গলায় বলল, 'তুই আজ বিকেলে কার সাবান মেখে গা ধুয়েছিস?'

দীপু থতমত খেল প্রথমটা। 'আমাদের সাবানের টুকরোটা ঝাঁঝরির মধ্যে পড়ে গেছে। জ্যাঠাইমারটা একবার নিয়েছিলুম।'

যেন ধাক্কা খেল শান্তা। 'কেন নিতে গেছিস? লজ্জা করে না তোর?' বলতে বলতে দীপুর সামনে এগিয়ে এল। ঠাস করে একটা চড় কসাল গালে। 'তোরা কি সাবান মাখতে পাস না? এমন হাঘরে বিত্তি কেন?'

'আহ্ মারছেন কেন মেজদিভাই! এত বড় মেয়ে!' কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল।

'থাক ছোট, আমার মেয়েদের এত আদর দেখাতে এসো না। কথা তো আমাকেই শুনতে হচ্ছে।'

কবিতা কথা বলল না। দীপু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই শৈলজার ঘর। কোন শব্দ নেই। এমন নিরাসক্ত নীরবতা যেন ব্যঙ্গ করছে শান্তাকে। 'আর কোনদিন যদি ওদের জিনিসে হাত দিস, মেরে ফেলব।' থামল শান্তা। 'ভাল সাবান মেখে ফুলেল-ফুলেল হয়ে ছাদে দাঁড়াতে চাস্? ঝুনুর মত ছেলে ধরার শখ হচ্ছে বুঝি? যেমন দিদি!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল শৈলজা। 'যা-তা কথা বোলো না মেজ। নিজের মেয়েকে শাসন করছ করো, আমার মেয়েকে নিয়ে নোংরা কথা বোলো না।'

'নোংরা কথা? আমার মেয়ের গায়ে ঘা বলে দশটা কথা শুনিয়ে গেলেন, আর নিজের মেয়ের ভেতরে যে ঘা শুরু হয়েছে। মজাচ্ছে সারা বাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল শান্তা, গজগজ করল। 'সামান্য একটু সাবান মেখেছে তাতে এত—ছিঃ।'

'মেজবৌমা, সন্ধেবেলায় এত চেঁচাচ্ছ কেন?' যোগমায়াদেবী নীচে থেকে চীৎকার করে উঠলেন। 'তোমরা কি কেবল ঝগড়াই করে যাবে?'

'কে ঝগড়া করছে দেখে যান। আপনি তো আমাকেই শুধু ঝগড়া করতে দেখেন!'

শৈলজা ভিতরে কাঁপছে থরথর। 'ঝগড়া আমি করতে আসিনি মেজ। কিন্তু আমার মেয়ের সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলবে না।'

'কেন? মারবেন নাকি? শাশুড়ী-বৌ মিলে বুঝি তাই করবেন?'

'ভদ্রভাবে কথা বল মেজ।'

'ভদ্রতা আর শেখাতে এসো না। বংশের খবর নিলেই বোঝা যেত! কে কত ভদ্র তা জানা আছে।' বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকল শান্তা। ছোট মেয়ে নীপা কি যেন করছিল ঘরে। কোণে কাচের প্লেট পড়ে টুকরো হয়েছে। শান্তা রেগে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি করছিস রে এখানে?'

'দিদি একবার পেনটা চাইছিল।' ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে নীপার।

'পেন চাই? একটা জিনিসও কি আস্তো রাখা যাবে না তোদের জন্যে! বেরো এখান থেকে।' বলে ঘাড় ধরে ঠেলে দিল শান্তা নীপাকে। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠে। ঠোঁট কেটে গেছে। তারই ওপর একটানা মারতে লাগল পিঠে। যেন শুধু শৈলজাকে নয়, সারা বাড়ির বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ জানিয়ে কঠিন শাসন করে চলেছে শান্তা।

এরই মধ্যে যোগমায়াদেবী ওপরে উঠে এসেছেন। 'ওকি করছ বৌমা, মেয়েটা যে মরে যাবে!'

'আপনাকে বলতে হবে না যান।'

'তাহলে এমন করে মারবে অকারণ! এ তো দেখতে পারি না!'

'দেখতে হবে না। আমরা এখান থেকে চলেই যাবো। আমরা চোর, মিথ্যেবাদী।' মেয়েকে মারতে মারতে হাঁপাচ্ছে শান্তা। কথার শেষদিকে কেঁদেই ফেলল। শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দরজা বন্ধ করল। শব্দ করে খিল দিল।......

কাল সারা রাত কিছু খায়নি শান্তা। আনাজ কুটতে কুটতে কবিতার কথাটা

মনে পড়ল। আজও সেই ঝগড়ার জের জীইয়ে রাখতে চাইছে। কি হবে কে জানে? সিঁড়িতে মন্টুর নীচে নামার পদশব্দ কানে এল। কবিতা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দুপুরে নিখিলেশ খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলজার সামনে এসে বসল।

শৈলজা বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল।

'শৈল, দেখেছ দিনের পর দিন আমাদের সংসারটা কেমন নীচে নেমে যাচ্ছে।'

'যাচ্ছে কি, নেমেই তো গেছে!'

'অথচ আমাদের শেষ ঝুনু হওয়া পর্যন্ত বাড়িটা কি হাসিখুশি ছিল!'

'মেজটা তো আর থাকতে দেবে না। খুব পয়সা জমাচ্ছে তো!'

'কিন্তু শান্তার কথাই ভাবো। পিঠোপিঠি ঝুনু, দীপু, সরোজের মেয়ে কণা যখন তখন ওদের নিয়ে তোমরা একসঙ্গে কি না করতে! ঝুনুটা তো শান্তার কাছেই দিনরাত পড়ে থাকত!' একটু থামল নিখিলেশ। এই বছর-বারো-তেরোর মধ্যে কেমন সব বদলে গেছে! তুমিই কি ভাবতে পারতে, মেজ তোমার সঙ্গে এমন ঝগড়া করবে? সংসারটায় এমন পচা পাঁকের গন্ধে টেকা যাবে না?' নিখিলেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

শৈলজা পাশ ফিরে শুল। 'আমার আর ভাবতে ভাল লাগে না।'

'আসলে তুমিও ভয়ংকর অধৈর্য হয়ে পড়েছ! অসহিষ্ণুতা, দুঃখ, যন্ত্রণা, রাগে আমরা প্রত্যেকেই কোথায় নামছি দেখেছ?' নিখিলেশ উত্তেজিত কিন্তু ক্লান্ত।

'হবে না? দু'টো ছেলের কিছু করতে পারলে তুমি? মেয়ে দুটোর তো বিয়ে দিতে হবে? কাপড়ের দোকানে বসে আমায় সারাজীবন তুমি কি দিতে পেরেছ বল?'

নিখিলেশ একেবারে চুপ করে গেল। এ অভিযোগ তো দশ-বারো বছর ধরে ক্রমাগত অনেকবার করেছে শৈলজা। কিছুই দিতে পারে নি, বরং ঘুণধরা মেরুদাঁড়া নিয়ে নিখিলেশ অনেক নুয়ে পড়েছে।

পাশের ঘরে শান্তা মেঝেয় বসে কমলেশের সদ্য-আনা দশ টাকার এক হাজার নোট গুণছিল মন দিয়ে।

আগের কোন কথার জের টেনেই কমলেশ বলল, 'সামান্য সাবান নিয়ে ঝগড়াটা তুমি না বাড়ালেই পারতে।'

'তোমার মেয়েই তো যত নষ্টের গোড়া।'

'তা ওকে তো একটা ভাল সাবান কিনে দিতে পারো! বরং ওদের থেকে বেশী দামী কিনলে তোমারও মান থাকত। বুঝিয়ে দিতে ওদের যে তুমিও এসব কিনতে পার!'

টাকা গোনা শেষ করে শান্তা দম ফেলল এবার। কমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বুদ্ধি তো? এই রকমই! একটা ভাল সাবান কেনো, সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখ টাটাবে। বলবে, পয়সা হয়েছে সংসারে আরও পয়সা ঢাল। শ্বশুরমশাই তো অভাব হলেই চাইবেন। ভাল উপায় করছ যখন! দেখছ আমি কত চেপেচুপে থাকছি। একটুও বুঝতে দিই ওদের?' গলা ফিসফিস করল শান্তা।

স্ত্রীর যুক্তি অকাট্য বুঝতে পেরে কমলেশ অত্যন্ত সস্তা দামের সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে বাইরে তাকাল।

দুপুরে ফিরতে পারেনি সরোজ। প্রেসের বাঁধা কাজ ছাড়াও ঠিকে কাজও করে ও অন্যান্য প্রেসে। টাকার দরকার, তাই বাড়িতে সুস্থির হতে পারে না। বাণীর একটিমাত্র ছেলেকেই প্রেসের কাজ শেখাচ্ছে বলে বাবা সঙ্গে নিয়ে যায়। মেয়ে কণা এখন স্কুলে। বাণী একা একা ঘরে শুয়ে কবে তার ঘর হবে, একটা বারান্দা থাকবে, সেখানে বসে বসে শুধু রাস্তা দেখবে, নিজের মত করে ঘর গুছবে, প্রচুর টাকা জমাবে—এসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল এমন নিথর দুপুরে।

কবিতা শ্বশুর-শাশুড়ী আর স্বামীকে খাইয়ে শান্তাদের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। একটু পরে ও নিজের ঘরে এল। দরজা বন্ধ করতেই দেবেশ ওর দিকে তাকাল:

'কি ব্যাপার বলতো? সব কেমন চুপচাপ! তুমি একেবারে খাটতে খাটতে যেন কেমন হয়ে গেছ।'

'তোমার এসব জেনে লাভ কি? তোমার তো আর ছেলেপুলে নেই যে এসব ভাবতে হবে?'

'তা না থাক, এমন একটা গ্র্যাণ্ড, বিউটিফুল, সুপার্ব এবং ইণ্টেলিজেণ্ট বউ তো আছে!'

'হ্যাঁ। তার থেকেও বড় আড্ডা আছে।'

'কিন্তু বউয়ের সঙ্গে এমন দুপুরে আড্ডা। আহ্—' বলেই হাতের নাগালের মধ্যে কবিতাকে আস্তে ধরে টেনে আনল কাছে! 'এই, আমার কাছে কিছুক্ষণ থাকতো।'

কবিতা ঠিক করে রেখেছিল দেবেশের সঙ্গে ভাল একটা ঝগড়া করবে। পারল না। হেসে ফেলল। 'ছাড়।'

'পাগল! আর ছাড়ি! সারা দুপুর তুমি-আমি এক।'

'কি হবে? সাহস তো নেই!'

'থাকলে কি হত? সেই তো নিজের ছেলেটাকে নিয়েই ঝগড়ায় নেমে পড়তে। তার থেকে যতদিন না হয়।' দেবেশ কবিতাকে জড়িয়ে ধরে থাকল।

'না-না!' কবিতা দেবেশের বুকে মুখ লুকোল।

'কে?' সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ।

কবিতা ছিটকে সরে এসে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াল।

'আমি পাপু ছোট্ট-কাকীমা। ছোট পিসির চিঠি এসেছে বিলেত থেকে, কাল সকালে প্লেনে দমদম পৌঁছচ্ছে। চিঠিটা দেখ।'

পাপু বড় ভাসুরের বড় ছেলে। কবিতা ওর সবচেয়ে প্রিয় কাকিমা। তাই চিঠি নিয়েই আগে ওর কাছে এসেছে। কবিতা দরজা খুলল। পাপুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। কবিতাকে চিঠিটা দিয়েই চলে গেল। কবিতা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি খুলে সামনে মেলে ধরল।

'আবার এই সংসারে আসছে বাচ্চা নিয়ে বিলিতি নাস্তুটা!' দেবেশ হাসতে হাসতে বলল, 'ওহ্, এবার তো হোলিখেলা হবে সারা বাড়ি।' ছোট বোন নাস্তুর কথা ভেবে দেবেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

চিঠির দিকে চোখ রেখেই কবিতা বলল, 'আসুক না। ছোড়দির বছর তিনেকের ছেলেটা নাকি দারুণ হয়েছে। আমরা তো কেউ দেখিইনি, এক ফটো ছাড়া। আহ্, এলে যা মজা হবে না!' বলতে বলতে—যেখানটায় খবর আছে নাস্তুর নতুন একটা বাচ্চা হবে, এখন দুমাস, সেখানেই কবিতা গভীর মনোযোগী হল।

পরের দিন সকালের দিকে নাস্তুদের প্লেন দমদমে আসতেই দেরী করল বেশ। ওরা যখন ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ির সামনে এসে থামল তখন বেলা হয়ে গেছে। পুরুষরা নিজেদের কাজে বাইরে। শৈলজার দুই মেয়ে মনু, ঝুনু আজ বেরোয়নি ওরা আসবে বলে। শান্তা আর বাণীর মেয়েরা স্কুলে চলে গেছে নিয়মমাফিক। শ্বশুরমশাই এই বয়সেও কোথায় যেন হিসেবের খাতা লেখেন, বেরিয়ে গেছেন। গাড়ির শব্দ পেয়েই মনু ঝুনু নীচে নেমে এল।

'পিসিমণি, অনেক দেরী হয়ে গেল কিন্তু তোমাদের!' মনু গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

'আর বোলো না, যা ওয়েদার। প্লেন ল্যাণ্ড করতে খুব ট্রাবল্ হয়েছে।' বলতে বলতে ট্যাক্সির দরজা খুলল নাস্তু।

আগেই ছিটকে বেরিয়ে এল বুবাই।

'বুবাই, আস্তে নামো।' ভিতর থেকে বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল।

'ইস্ কি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলে! এই এদিকে এসো।' বলেই মনু হাত ধরে কাছে টানল।

বুবাই বড় বড় চোখে মনুর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ সপ্রতিভ উৎসুক দৃষ্টি, নাক তীক্ষ্ণ, দুচোখের ওপর টানা কালো ভুরু ঘন লোমে ঢাকা। দৃষ্টি গভীর নিষ্পাপ, গাল ফোলা। মাথায় এক ঝাঁকড়া চুল বুবাইয়ের। বয়সের অনুপাতে একটু বেশী লম্বা চেহারা। ঠিক মোমের পুতুলের মত! হাসি হাসি অথচ দুষ্টুমিতে ভরা মুখ।

বিকাশ নাস্তুর দিকে একবার তাকাল। 'শোন, ওদের নিয়ে যাও। আমি মালপত্তর আনার ব্যবস্থা করি। তাছাড়া কলকাতার অফিসে খুব জরুরী কিছু কাজ সারতে বেশ দেরী হবে। এখানে এ বেলা খাবোনা, বাবাকে বোলো!'

নাস্তু বলল, 'তুমি এই ট্যাক্সিতেই চলে যাও। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো।'

'পিসেমশাই, একেবারে কিছু না খেয়ে যাবেন!' মনু বলল।

'থাক থাক, ওসব পরে হবে।' বলতে বলতে ব্যস্ততায় বিকাশ গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসল। গাড়ির ভিতর থেকেই নাস্তুকে বলল, 'দেরী হলে ভেবো না।' ছেলের দিকে তাকাল, 'বুবাই, একটুও দুষ্টুমি করবে না কিন্তু।'

বুবাই একদম করবে না জানাবার মত করে ঘাড় নাড়ল। হাত নাড়ল বাবাকে বিদায় দেওয়ার। গাড়ি দ্রুত অদৃশ্য হল।

'কি, আমার কোলে আসবে তো?' মনু তাকাল বুবাই-এর দিকে।

'আসবে না আবার! ওর আপন-পর চেনা-অচেনা একটুও নেই। ওইটাই তো আমাকে ভাবায় মনু।' নীচু হয়ে সামান্য কিছু মালপত্তর গোছাতে গোছাতে নাস্তু বলল।

বুবাই ততক্ষণে মনুর কোলে। মা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাতেই বুবাই বলল, 'মা, দেখ আমি কোলে উঠেছি বুড়ো ছেলে।'

হেসে উঠল মনু-ঝুনু দুজনেই। 'কে বলল তুমি বুড়ো ছেলে?' মনু বুবাই-এর গাল টিপে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে আমি বার বার ওকে বলি, এখন তুমি বুড়ো ছেলে, কোলে উঠতে নেই!' নান্তু হাসছে।

'এসো পিসিমণি।' ঝুনু দুটো ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ওদের নিয়ে ওপরে এলো।

ঘিরে ধরল সবাই। বারান্দার ভাঙা তক্তপোষে নান্তু বসতেই এগিয়ে এল শৈলজা, কবিতা। একটু দূরে ওরা দাঁড়িয়ে রইল। পাশে বাণী। যোগমায়া-দেবী ছোট মেয়ে আসবে জেনে আগে থেকেই তক্তপোষে এসে বসেছিলেন। নান্তু প্রণাম করতেই টেনে পাশে বসালেন। 'ছেলে তো খুব বড় হয়েছে রে তোর!' যোগমায়াদেবী বললেন।

'যাশুর দেশের ছেলে মা! কি সুন্দর দেখতে দেখেচেন?' কবিতা হাসতে হাসতে মনুর কোলে বসানো বুবাইয়ের মাথার ঝাঁকড়া চুলে বিলি কাটল।

'ওকে নামিয়ে দাও না মনু। কতক্ষণ ওভাবে রাখবে? বুবাই, নেমে পড়ো, দিদির কষ্ট হচ্ছে না!'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে?' বুবাই মনুর চিবুক ধরে টানল।

'না-না কষ্ট হবে কেন?' মনু আদর করল বুবাইকে।

'দেখেছ, মায়ের সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি!' বুবাই জিভে জড়িয়ে বলল কথাগুলো।

শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। 'ইস, কি পাকা কথা শিখেছে ছেলেটা!' শৈলজা হাসতে হাসতে বলল।

'বলবেন না বৌদি, ওর কথায় আমি তো ঝালাপালা।'

'দেখ, কেমন একটুও চেনা-অচেনা মানে না।' কবিতা বলল। 'খুব ভাল।' বুবাই এতক্ষণে লজ্জায় মনুর কাঁধে মুখ লুকিয়েছে।

'ঠাকুরঝি, তোমরা কথা বলো, তোমার ছেলেকে একটু সাজাই। কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। এই মনু, এদিকে এসো তো ওকে নিয়ে।'

'বুবাই, এরা সব তোমার দিদি। ওই দেখ, ওঁরা মামীমা। এ হচ্ছে দিদা। মনে থাকবে?'

পাখির মত তাকাল বুবাই। 'তুমি তো আগে সব বলেছ মাম্মি, ছবি দেখিয়েছ! আঃ, কতবার বলবে?'

চটপটে কথায় শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। কথায় কণ্ঠস্বরে মুখভঙ্গিতে কেমন মায়া জড়ানো।

'ঠিক যেন কেউ মুখস্থ করিয়ে দিয়েছে ব্যাটাকে।' যোগমায়াদেবী হাসতে হাসতে বললেন।

'না মা। ও নিজেই কোত্থেকে শিখেছে!' নান্তু বলল।

কবিতার ঘরে এল ওরা। বিছানার ওপর বসালো বুবাইকে।

কবিতা জিজ্ঞেস করল, 'বুবাই, তোমাকে কে বেশী ভালবাসে খু-উব।'

'মাম্মি-বাপ্পি দুজনেই।' বলেই বড় বড় চোখে তাকাল কবিতার দিকে।

'তোমার আর একটা ভাই আসবে ঠিক এইরকম।' বলে বড় মোমের পুতুলটা সামনে এনে রাখল কবিতা। 'তখন তোমাকে ভালবাসবেই না।'

গম্ভীর হল বুবাইয়ের মুখ। পুতুলটাকে দেখল, নিল না। হঠাৎ বলল, 'আসুক না, এলে ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব নীচে।'

'ওরে গুণ্ডা!' ঘরের উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে শৈলজার দুই ছেলে ঢুকল। 'খুব কথা শিখেছিস!' পাপু বলল। এতক্ষণ পাড়ায় আড্ডা দিচ্ছিল ও।

'কেন হবে না? কোন্ বাড়ির রক্ত আছে দেখতে হবে তো।' মন্টু বলল, 'দাদা, তুমিও তো এরকম ছিলে, মা বলেন।'

ঝন্টু বলল, 'ছোট্-কাকিমা, একে নিয়ে ছাদের ঘরে যাবো?'

'বেশ তো, একটু সাজিয়ে দিচ্ছি, তোমরা নিয়ে যাও। আমি পরে যাচ্ছি।' কবিতা দ্রুত পাউডারের পাফ ঘসে চুল আঁচড়ে বুবাইকে সামান্য সাজিয়ে দিল।

বুবাইকে নিয়ে ওরা কবিতার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হাঁটছে। টলতে টলতে ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। পাশেই শান্তার ঘর। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ল ওঘরে।

মন্টু-ঝন্টু থমকে দাঁড়াল। কি ভাবল। মেজকাকিমার ঘরে ঢোকা বারণ। কথাও বলে না। পাপু দরকারে বাড়ি ঢুকেছিল। ও নীচে নেমে গেল। মন্টু-ঝন্টুও ঘরের মধ্যে মেজ-কাকিমাকে দেখে সরে গেল ওখান থেকে। দোতলার বারান্দা থেকে নান্তু নীচে কলঘরে গেছে।

বুবাই ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে শান্তাকে দেখছে। শান্তা আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে ডালা খুলে কি দেখছিল। বুবাই ঢুকেছে বুঝতে পারেনি।

'তুমি কে?' বুবাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। 'এত গম্ভীর কেন! আমার সঙ্গে কথা বলছ না যে?'

শান্তা পিছন ফিরল। 'আরে! এসো এসো!'

'না, আগে বল তুমি কে?' বুবাই স্থির দাঁড়িয়ে শান্তার এই মুহূর্তের মুখের ভঙ্গি নকল করেই বলল, 'মুখটা এরকম করে আছ কেন?'

'আমি তোমার মেজ-মামিমা।' বলেই এগিয়ে এসে বুবাই-এর হাত ধরল। 'তুমি আমার ঘরে আসছ না, তাই মন খারাপ। তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছি। দুষ্টু ছেলে।' একটু আদর করল শান্তা।

'তোমার এত পুতুল। আমাকে দেবে?'

'কি করবে নিয়ে, ভেঙে ফেলবে।'

বুবাই তাকাল শান্তার মুখের দিকে। 'ওটা দেবে ওই যে লাল মতন।' বুবাই কাঁচের ওপর দিয়ে চকচকে লাল রঙের বটুয়াটা দেখাল। ওর মধ্যে শান্তা সারা মাসের যাবতীয় খরচ-পত্তর রাখে।

'তোমায় সব দেব। আগে তোমার নাম বল।' শান্তা বুবাইকে কোলে তুলে নিতে চাইল।

বুবাই উঠল না। দুহাত দিয়ে শান্তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'আমার নাম বুবাই, বাবার নাম বাপ্পি, মার নাম মাম্মি।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দালানে।

'এই, এই ছেলে, সিঁড়ির দিকে যেও না। পড়ে যাবে!'

শান্তার কণ্ঠস্বর শুনে মন্টু ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুবাই ততক্ষণে ওদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শৈলজা নীচে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ঝুনু বোধ হয় ছাদে। নিমেষের মধ্যে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলো মন্টু।

'বোসো, তোমার সঙ্গে গল্প করব।' মন্টু বুবাইয়ের চিবুকে ঠোঁট বুলোল।

'আমার সঙ্গে খেলবে?' মন্টুর চিবুক ধরে টানল বুবাই। 'বাপ্পি আমার সঙ্গে যেমন খেলে, তেমনি!'

'কি রকম!' মন্টু অবাক। দু চোখে বিস্ময়ের ভাব।

'আচ্ছা, তুমি আমার মা হয়ে যাও, আমি—আমার বাবা।'

'বেশ, আমি তোমার মা।'

'আমি বাপ্পি।'

'তারপর?'

'তুমি এবার আমাকে বল, কি, আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

'কি আজ ফিরতে এত দেরী হল কেন?'

বুবাই চুপ করে বসে রইল অন্যদিকে মুখ করে। নিজের জামার পকেটে হাত বুলোচ্ছে। কিছু যেন বের করে রাখবে সামনের টেবিলে।

মনু অবাক হয়ে দেখছে বুবাইকে। কথা বলছে না দেখে মনু বলল, 'কই বুবাই, তুমি কথা বল ?'

'দূর, তুমি কিছু জান না। আমি বুবাই নাকি! আমি তো বাপ্পি! আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকব। তারপর তুমি মাম্মি, আমায় জড়িয়ে ধরলে তবে তো বলব, আঃ ছাড়ো। তোমার সংগে খেলব না, তুমি কিছু জান না!'

মনুর চোখ বড়। 'উঃ, কি দস্যি ছেলে তুমি! চল, তোমার মাকে সব বলছি!' বলেই মনু হো-হো করে হাসতে হাসতে বুবাইকে কোলে নিয়ে ছাদে চলল। ছোটপিসি নান্তু এই মাত্র নীচে স্নান সেরে ছাদে গেছে।

গড়ানো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হল সকলের। কবিতা বুবাইকে কাছে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ল। শান্তা-বাণীর মেয়েরা এখনো স্কুল থেকে ফেরেনি। প্লেন-জার্নির ক্লান্তিতে নান্তু এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে সিঁড়ির পাশের ঘরে। বুবাইকে চাপড়াতে চাপড়াতে কবিতা সামান্য তন্দ্রার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে।

বুবাই চোখ বুজিয়ে পড়েছিল, এতটুকুও ঘুমোয়নি। আস্তে আস্তে কবিতার সন্থ-কেনা চকচকে জুতো দুপাটি পায়ে গলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শোবার আগে কবিতা মোমের পুতুলটা বুবাইকে খেলতে দিয়েছিল। বুবাই মাথার কাছে রাখা পুতুলটা হাতে নিল। কিছু সময় নেড়ে-চেড়ে দেখল পুতুলটা। সারা মুখে কয়েক খা চড় মারল। এক সময় এখানে ওখানে টিপে তুবড়ে দিল। শেষে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে চেপ্টে তার ওপর বসল। পুতুলটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর নিজের খেয়ালেই ভেজানো দরজা খুলে বারান্দায় এলো। শান্তার ঘরের দরজা আধখোলা। পায়ের জুতোয় অসুবিধে হচ্ছে বলে দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরে ঢুকল। একা শান্তা শুয়ে ঘুমে অচেতন। বুবাই আলমারীর ডালা খুলে এক হাতে একটা ঘোমটা দেওয়া বউয়ের মূর্তি নিল। আর এক হাতে লাল বটুয়াটা। টলতে টলতে বেরিয়ে এসে নীচে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ফের ফিরে এল। শৈলজা গভীর ঘুমে অচেতন। ছাদের ঘরে ঝুনু-মনু শুয়ে। শৈলজার ঘরে খোলা তাকের পুতুলগুলো নাড়ল, নিজের মনে খেলা করল কিছু-ক্ষণ। একসময়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল ওর ফেলে-রাখা কবিতার নতুন জুতো-জোড়া। দুহাতে নিয়ে সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে এল। বাণীর ঘরটা সোজা দূরে দেখা যাচ্ছে। বুবাই আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকল। বাণীর

সাজানো ট্রাঙ্কগুলোর ওপর একটা নতুন ফ্রক। দুহাতে জুতো-সমেত ওটা ধরতে গিয়ে দুহাতের জুতো ট্রাঙ্কের পিছনে শব্দ করে পড়ে গেল। বাণীর ঘুম ভাঙলো না। বাণীর মেয়ে কণার ফ্রক। একটা হাতে হাত-গলিয়ে বুবাই আবার টলতে টলতে এখানে-ওখানে খেলতে খেলতে নীচে নেমে এল। বারান্দার কোণে স্থির বসে থাকা বেড়ালটাকে তাড়াল ঠেলে ঠেলে, বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে ঘুরে। কবিতার ঘরে ঢুকল আবার। হাতে পায়ে বড় ফ্রকটা জড়িয়ে যাচ্ছে বলে টেনে কোন রকমে খুলেই ছুঁড়ে ফেলে দিল তক্তপোষের নীচে। বাইরে কোন বাড়ির ছাদে বুঝি পাখি ডাকার একটানা শব্দ শুনতে শুনতে বুবাই বেরিয়ে এল আবার। ছাদে উঠতে লাগল নিজের খেয়ালে।

একতলা থেকে ওপরে ওঠার শেষ ধাপে দীপুদের স্কুল থেকে ফেরার শব্দ। পিছন ফিরতে যেতেই বুবাই ছাদে ওঠার কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল আচমকা।

'এই, এই, পড়ে গেল!' দীপু চেঁচিয়ে উঠল। ততক্ষণে বুবাই দোতলার বারান্দায় পড়ে গেছে সশব্দে উপুড় হয়ে। কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

দীপু দৌড়ে গিয়ে বুবাইকে কোলে তুলে নিল। ঘুম ভেঙ্গে গেছে শৈলজার, শান্তারও। কবিতা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এত জোর শব্দে আর কান্নায় ছাদ থেকে দৌড়ে এল মনু-ঝুনু-বাণী।

'ইস্ রক্ত পড়ছে যে!' কবিতা দৌড়ে এসে বুবাই-এর কপাল চেপে ধরল, 'বেশ ছড়ে গেছে!'

'কি করে পড়ল?' শান্তা যেন দীপুকে জিজ্ঞেস করল।

'দাঁড়াও ছোট, একটু তুলো নিয়ে আসি।' শৈলজা ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল।

বাণী দৌড়ে গেল। 'একটু জল দিতে হবে।'

'নীচে নামবে কেন, আমার ঘরে আছে দেখ।' কবিতা বুবাইকে বুকে চেপে ধরে বাণীকে বলল। বুবাইয়ের দিকে তাকাল।

'শুধু তুলোয় হবে কি!' কবিতা যেন বিড় বিড় করল।

'দাঁড়াও, দেখি, আমার ঘরে একটু বার্ণল আছে।' শান্তা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

মনু খুঁটিয়ে দেখল কাটা জায়গাটা। 'হ্যাঁ, বার্ণলেই হয়ে যাবে, সামান্য ছড়ে গেছে।'

'ছোটপিসি কোথায়?' দীপু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'থাক, ওকে আর ডেকোনা। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আচম্‌কা ডাকলে খারাপ হবে।' শৈলজা তুলো চেপে ধরে শান্তার মেয়েকে বলল।

শান্তা আরও ঘন হল কবিতার। 'বড়দি, আপনি তুলোটা চাপুন, আমি ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দি। ছোট, তুমি ধরে থাক।'

নীচে থেকে যোগমায়া দেবী চেঁচালেন, 'কি হল ওপরে?'

'কিছু না মা।' বাণী নীচে নামার সিঁড়ির কাছে ঝুঁকে উত্তর দিল।

'ইস, কখন উঠে বেরিয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি! কি দস্যি ছেলে!' কবিতা বলল।

'তোমার ঘরেই শুইয়ে দাও ছোট।' শৈলজা বলল।

'না, আমি শোব না। আমার কিছু হয়নি।' বুবাই শৈলজার দিকে তাকাল। চোখের গোড়ায় জল। ফর্সা তুলতুলে নরম চিবুক, গাল থেকে যেন এখুনি রক্ত ফেটে বেরুবে!

'দেখ, ছেলের কথা দেখ। আবার হাসছে!' বলতে বলতে কবিতা ওকে নিয়ে ঘরে এল। 'বস এখানে।' বিছানায় বসিয়ে দিল। হঠাৎ মেঝের কোণে দৃষ্টি পড়ল, 'আরে, এ-জামাটা কার? কে নিয়ে এল!'

মন্টু সামনে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে বলল, 'এটা তো সেজকাকীমার মেয়ের ফ্রক!'

ততক্ষণে বাণী ছাদের ঘর ঘুরে কবিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'এই নাও ছোট, তোমার জুতো!' এই প্রথম নতুন করে কবিতার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল বাণী ওর সঙ্গে।

'আমার জুতো! কোথায় ছিল?' কবিতা অবাক।

'আমার ঘরে।' মুখ টিপে হাসল বাণী, 'উঃ, কি ছেলে, আমার ঘরে কখন গিয়ে ফেলে রেখে এসেছে!' বুবাইয়ের দিকে তাকাল বাণী।

বুবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে বাণীকে।

একসময়ে ঘরে ঢুকে কবিতার জুতো জোড়া মেঝেয় রাখল কণা—বাণীর মেয়ে। হাত বাড়িয়ে বাণী কবিতার হাত থেকে কণার ফ্রকটা হাসতে হাসতে নিল। 'চলি ভাই।' বলে বাণী চলে গেল।

কিছু পরেই পাশের ঘরে শান্তা বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে আলমারীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল। আলমারীর সমস্ত জিনিসপত্তর তছনছ। লাল বটুয়াটা

নেই। ধড়াস করে উঠল শান্তার বুকের ভিতরটা। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেঁচিয়ে উঠল, 'দীপু, আলমারীর ডালা কেন খোলা?'

'আমি জানি না তো মা, এইমাত্র এলাম তো স্কুল থেকে!' দীপু নীচের কলঘর থেকে চেঁচায়।

শৈলজা হঠাৎ এসে দাঁড়াল শান্তার ঘরের সামনে। 'মেজ, একবার আমার ঘরে এসো।'

শান্তা বিরক্তি এবং বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো। অনেকদিন দুজনের কথা বন্ধ। কেউ কারোর মুখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত কাল বিকেল থেকে। হঠাৎ কি এমন হল? 'কেন?'

'দেখে যাও, তোমার পুতুল আর ব্যাগ কোথায়!'

শান্তা অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শৈলজার পিছু পিছু ওর ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল, শান্তার বড় পুতুলটা শৈলজার ঘরের তাকে আর একটা বউ-পুতুলের পাশে বসানো। যেন খেলতে খেলতে কেউ সাজিয়ে রেখেছে। দুটো বউয়ের মাঝখানে লাল বটুয়াটা।

'যাও, নিয়ে এস। সব বুবাইয়ের কীর্তি।' শৈলজা হাসছে।

শান্তা হাসতে হাসতে শৈলজার ঘরে ঢুকল। পুতুল আর বটুয়া হাতে নিয়ে বলল, 'উহ, সারা দুপুর এই করেছে ও! সকালেই আমাকে এই দুটো চাইছিল। আর ঘর তো একেবারে তছনছ। দেখবে এসো।' শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তা নিজের ঘরে ঢুকল।

কবিতার বুকের মধ্যে গম্ভীর হয়ে শুয়েছিল বুবাই। হঠাৎ উঠে বসল। 'আমি বাপ্পির কাছে যাবো।'

'কেন? তোমার বাপ্পি তো এখনো ফেরেনি! শুয়ে পড়।' কবিতা টানল বুবাইকে।

'বাপ্পির সঙ্গে খেলব একটু।'

'এই তো, আমার সঙ্গে খেলো। কি খেলবে?' কবিতা উঠে বসল।

'তুমি বাপ্পির খেলা জান?'

'শিখিয়ে দাও।'

বুবাই সরে বসল। 'বেশ, তুমি বড় মামিমা হয়ে যাও।'

'হয়েছি, এবার কি হবে?'

'আমি মেজ-মামিমা। আমরা খুব গম্ভীর। একটিও কথা বলবে না কিন্তু!' সুন্দর সরল ভঙ্গি করে কথা বলতে নিষেধ করল বুবাই কবিতাকে।

দুজনেই চুপ। কবিতা মিটমিট করে দেখছে বুবাইকে।

হঠাৎ বুবাই বলল, 'এবার তুমি বল, 'তুমি এত গোমড়া-মুখ কেন?' তুমি বড়, তুমি আগে কথা বলবে!'

'এত গোমড়া-মুখ কেন?' কবিতা বুবাই-এর কথা বলার ভঙ্গি নকল করল।

'তুমি এত গোমডা মুখ কেন, রাগ হয়েছে?' বুবাই কবিতার দিকে তাকাল।

কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল। বুবাইও। বুবাইকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে।

ঘর-দোর গুছিয়ে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে শৈলজা-শান্তা, বুবাই-এর খেলাটা দেখছিল এতক্ষণ। দেখতে দেখতে দুজনেরই মনে পড়ে যাচ্ছিল, খুব ছোট্ট বেলায় ঝুনু-দীপু-কণা ওদের মা-দের ঝগড়া নিয়ে এরকম খেলা খেলত। একসময়ে শৈলজা-শান্তার দৃষ্টি-বিনিময় হতেই হেসে উঠল। ওদের দুজনকে দেখেই লজ্জায় বুবাই কবিতার কোলে মুখ লুকোলো।

সন্ধের বেশ কিছুটা পরে নীচে গিরিশংকরের ঘরে সবাই হৈ-চৈ করে কথা বলছিল। বুবাইয়ের কথায় ওরা হাসিতে ভরপুর। কি এক প্রসঙ্গে বুবাইয়ের খোঁজ পড়ল। গিরিশংকর নীচে থেকে বললেন, 'ছোট বৌমা, দাদুভাইকে একবার এখানে নিয়ে এসো তো!'

কিন্তু বুবাইকে হঠাৎ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কিছুক্ষণ আগেও শান্তার ঘরে দীপু-নীপা-কণাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে খেলছিল। কোথায় গেল? দীপু নীপার কাছে ছাদে চলে গিয়েছিল। পাশের ঘরে ঝুনুর গলা পেয়ে নীপা সবাইকে কখন একা রেখে ছাদে গেছে! তারপর? নীচে সবাই রান্না নিয়ে ব্যস্ত! কোথায় গেল? ছাদে উঠে এল কবিতা। ছাদের ঘরে নেই। দোতলায় খুঁজল, নেই!

'কোথায় গেল তাহলে!' কবিতা নীচে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

'কোথায় আবার যাবে!' যোগমায়াদেবী বললেন, 'ওপরেই কোথাও আছে, দেখ।'

'বাইরে বেরিয়ে যায়নি তো?' নান্তু বলল, 'এই আমার ছেলে, কি যে দুরন্ত! চেনা-অচেনা নেই তো—আরো ভয়।'

'বাইরে যাবে কি করে? আমরা তো বসে আছি এখানে! ঠিক আছে,

আমি দেখছি।' গিরিশংকর দোতলায় এলেন। নান্তুকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই সবসময় তালা-দিয়ে-রাখা ঘরটায় কি ভেবে ঢুকলেন। মনু বিছানা করেছে নান্তুদের। তক্তপোষের ওপর বড চাদর-ঢাকা বিছানা করেছে। বেড-কভার মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। হঠাৎ কি খেয়াল হল, ঝোলানো চাদরটা তুললেন। বুবাই শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। অঘোর ঘুমে অনড।

'এই তো!' কবিতা বিস্ময় আর উল্লাসে স্বগতোক্তি করল। 'এখানে শুয়েছে কখন?'

'ডাকো সকলকে।' গিরিশংকর বললেন।

সকলে দোতলায় এলো। বুবাই আরাম করে শুয়ে আছে। মোমের ডল-পুতুলের মত হাসি-হাসি মুখ, চিবুক। দুটো হাত দুপাশে টান টান করে ছড়ানো। এক পায়ের ওপর আর এক পা রাখা, জোড়া। কপালে ছড়ে-যাওয়া লাল দাগ।

'ঠিক যীশুর মত! দেখুন বড়দিভাই।' কবিতা শব্দ করে হেসে উঠল।

'ঘুমোবে না, সারা দুপুরটা জই-জই করেছে!' শান্তা শৈলজার দিকে তাকাল।

'ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও না ছোটবৌদি। সন্ধেয় যা খেয়েছে, আর খাবে না, জাগবেও না।'

কবিতা তুলে বিছানায় যত্ন করে শুইয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরও নান্তু, বিকাশ, শ্বশুর-শাশুড়ীকে ঘিরে ভাসুর-জায়েরা হৈ হৈ করে গল্প করছে এখনো। কবিতা এক ফাঁকে নিজের ঘরে এলো। দেবেশ বিছানায় শুয়ে। কবিতা দরজায় খিল দিল। আলো না নিভিয়েই দেবেশের থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ল।

'তোমার আদরের পুতুলটা এমন দুমড়ে-মুচড়ে গেল কি করে?' দেবেশ মিটমিট করে তাকাল কবিতার দিকে।

'বুবাইটা রাগে এমন করেছে। খেলতে দিয়েছিলাম।'

'আর একটা কিনবে তো?' খুক খুক করে হাসল দেবেশ।

'বুবাই কি রকম দুষ্টু দেখলে তো? আর কি কথা!' কবিতা প্রসঙ্গ ঘোরালো। 'পাপু, মেজদিভাই-এর বড় মেয়ে, সেজ ভাসুরের মেয়ে কণাও নাকি এরকম ছিল!'

'বাচ্চা ছেলে যত দুরন্ত হয় ততই ভাল। যে কোন বাড়ির চেহারাই বদলে দেয়।'

নীচে থেকে সমবেত হাসির শব্দ কানে এল ওদের।

'তাই তো দিয়েছে!' কবিতা স্বরে খুশি ছড়িয়ে বলল।

'আজ বাড়ি ফিরে বুঝেছি।' দেবেশের মুখ বালিশে ঢাকা।

'কিন্তু বেশীদিন থাকবে না। নন্দাই তো মাস তিনেকের কাজ হয়ে গেলেই দিল্লি চলে যাবে! ওখানে নান্তুর শ্বশুরবাড়ি। ওখানে দিন-পনেরো কাটিয়ে লণ্ডন! তারপর?'

'তোমার খুব কষ্ট হবে তো?'

মাথার দিকের দেয়ালের সুইচে হাত রাখল কবিতা। আলো নিভোল। অনেক ঘনিষ্ঠ হল দেবেশের। কানে কানে বলল, 'জ্ঞান পাপী।'

দেবেশ জড়িয়ে ধরল কবিতাকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির অনড় হয়ে চুমু খেল। 'আর ক'মাস অপেক্ষা কর।' হাঁপাচ্ছে দেবেশ।

'ন্‌না।' কবিতা ব্রা খুলল আস্তে আস্তে। জামাও। ফিসফিস করে বলল, 'আর একদিনও না।'

দেবেশ অভ্যস্ত হাতে মাথার বালিশের নীচে হাত ঢুকোল কিছু একটা নেওয়ার জন্যে। কবিতা শক্ত হাতে বাধা দিয়ে দেবেশের শরীরের সঙ্গে লেগে থাকল।

কবিতা এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে, সারা বাড়ির—ওদের ঘর ছাড়া, প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক এমনটি ওর বিয়ের পর এই বাড়িতে কোনদিন দেখেনি কবিতা।





শান্তিপর্ব

সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ধীর হিমেল হাওয়ায় রহস্যময়। এই মুহূর্তে ঠিক পথটা ঠাহর করতে না পেরে থমকে দাঁড়ালাম।

আমি বোধ হয় একটু এগিয়ে এসেছি। হাতের ঝোলানো হ্যারিকেনের আলোয় চারপাশের এমন অন্ধকার স্থির দাঁড়িয়ে। গায়ের চাদর ভাল করে জড়িয়ে নিই। পিছনে তাকাই।

আমার থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছে ওরা—মণিমোহন, বিশ্বপতি, সদানন্দ। কিছুটা আগে-পিছে ঘন হয়ে হাঁটছে তিনজন। মাথার ওপর বাঁশ-ঝাড়ে তারার আকাশ আড়াল-করা। পায়ের নীচে শুকনো পাতার খসখস। নাকে আসছে কাছাকাছি কোন ডোবা থেকে পচা কচুরি-পানার গন্ধ।

আমরা চারজনই প্রায় সমবয়সী। সকলেই এখন ষাটের কাছাকাছি: মণিমোহনকে অবিশ্যি চেহারায় আমার থেকে বেশ একটু বড় বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া ভোগী চেহারা। সোজা হয়ে হাঁটে। তবু হাতের লাঠিটা অতিরিক্ত ভরসা। কর্মসূত্রে ভিলাই প্রবাসী। ছেলে-পুলে নাতি-নাতনী নিয়ে বিরাট সংসার পেতেছে ওখানে। গলায় কাশির শব্দ করল মণিমোহন। বিশ্বপতিও বেশ শক্ত-সমর্থ। খাটো চেহারা। মাথায় টাক। অথচ স্কুলে একই ক্লাশে পড়ার সময় ওরই মাথায় চুল ছিল বেশী। বড়বাজারে বিশাল লোহার কারবারের দোকানে গদিতে বসে থেকে বেশ মুটিয়ে গেছে ও। বিশ্বপতির হাতের টর্চটা জ্বলছে-নিভছে। সদানন্দ গ্রাম ছেড়ে সেই কলেজে পড়ার সময় থেকেই প্যান্ট-

শার্ট-টাইএ সাহেব হয়ে গিয়েছিল। এখন আরো। কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা এডভোকেট। মাথায় চুলের কলপে বুঝতে দেয় না কত বয়স। মাথায় আমার মতন। একটা হালকা স্ট্রোকের মতন হয়ে গেছে বছর তিনেক আগে। খুব সাবধানে থাকে। এখন গ্রামে এসে একটু বাতের অস্বস্তিতে ভুগছে। এসবের মধ্যে আসতেই চাইছিল না। আরও কতটা যেতে হবে—বিশ্বপতিকে তাই জিজ্ঞেস করল সদানন্দ।

ওরা তিনজন কাল ভোরেই গ্রাম থেকে চলে যাবে। আমাকে গ্রামে থাকতে হবে। আমার এমন রোগা চিমসে রুক্ষ চেহারা ছোটবেলা থেকেই। সামান্য জমি-জমার নিজেই চাষ-বাস দেখি। তেমন কোন অসুখ-বিসুখ আমার শরীরে এখনো উপসর্গ হয়নি। আই. এ. পাশ করার পর থেকে স্কুলে সংস্কৃতের টিচার আমি। তাই গ্রামেই থেকে গেছি। ছ'টি ছেলেমেয়ে, বউ, নাতবৌ-নাতিদের নিয়ে সংসার চালাতে আমি হিমসিম। পুজো-আচ্চা করি। পৈতৃক আমল থেকেই কিছু পুরনো যজমান আছে আমার। অবসর সময়ে একসঙ্গে কিছু ছেলেদের বসিয়ে টিউশানি। কোন বিশেষ পাল-পার্বণে রামায়ণ মহাভারত-ভাগবত পাঠ করে টাকা-পয়সার সংস্থান করতে হয় আমাকে। ওরা আমার কাছে আসার আগে আমি এক টিপ নস্যি নাকে দিলাম। নস্যির ঝাঁঝে টাক্‌রা জ্বালা করতে শীতটা যেন একটু কম লাগল।

আমাদের গ্রামের স্কুলের দেড়শ-বছর পূর্তি উৎসব আজ শেষ। সেই উপলক্ষেই আমাদের পুরনো হেড-স্যার ভবতারণবাবুকে মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হেড-স্যার একেবারে শয্যাশায়ী, আসা সম্ভব ছিল না। আমি, মণিমোহন বিশ্বপতি, সদানন্দ ওঁর এই স্কুলে আসার পর প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাঠানো ছাত্র। আমরা খুব প্রিয় ঘনিষ্ঠ ছিলাম হেড-স্যারের। মণি, বিশ্ব, সদা গ্রামের স্কুলের উৎসবে এসে একবার দেখা করতে গিয়েছিল ওঁর সঙ্গে। আমিই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই হেড-স্যার আচম্‌কা কথা তোলেন পরিমলের। প্রায়ই স্মৃতি চলে-যাওয়া ফিরে-আসার মধ্যে অসুস্থ নব্বই বছরের বৃদ্ধের ঠিক মনে পড়ে যায়, 'তোদের সেই পাণ্ডবটি কোথায়? পারি? যাকে অর্জুন বলতাম?'

আমরা প্রত্যেকেই ভিতরে ভয়ংকর চমকে উঠেছিলাম। প্রত্যেকেরই চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা ছিল, হেড-স্যার কি পরিমলের কথা ভুলে গেছেন? নতুন করে যেন কথাটা তুলছেন! পরিমল আমাদের মধ্যে আর নেই, তার রহস্যময় চলে-যাওয়া যে বড় ভয়ংকর, বীভৎস, তা আমি ছাড়া এখনো ওরা জানে না। আজ

চার বন্ধু একসঙ্গে হয়ে একবারও পরিমলের প্রসঙ্গ তুলিনি, ওরাও বুঝি এড়িয়ে গেছে। হেড-স্যারের কাছ থেকে সরে এসে এই ঘন অন্ধকার রাস্তায়, আমি জানি, আমার মত মণি, বিশ্ব, সদা সকলেই পরিমলের কথায় আড়ষ্ট, বিষণ্ণ নিশ্চুপ।

মণি এতক্ষণ পরে নিভানো চুরুটটা ধরালো। বিশ্ব সিগারেট খায় না। শীতটা ওর বেশী লাগছিল বলে গলায় মাফলার ভাল করে জড়িয়ে নিল। টর্চটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে অন্যমনস্ক রইল কিছু সময়। সদার কাশি যত বাড়ছে, বাঁ পায়ের শিরায় টান পড়ছে তেমনি। কাশি থামতে থমকে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। মাথায় উলেন টুপি কান পর্যন্ত টেনে ঢেকে দিল। আমার এক হাতে হ্যারিকেন। হ্যারিকেনটা বিশ্বর হাতে দিলাম। চাদরের নীচে ফতুয়ার পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করলাম। মোটা এক টিপ নস্যি নিলাম। ফের বিশ্বর হাত থেকে হ্যারিকেন নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। এই ক'বছরে গ্রামের রাস্তাঘাট অনেক বদলে গেছে। কেউ ওরা রাস্তা জানে না। আমাকেই যেতে হল তাই। কিন্তু একসঙ্গে থেকে কিছুটা আগে-পিছে হাঁটলেও আমরা প্রত্যেকেই অন্যমনস্ক। আমরা দলে সংখ্যায় চারজন, কিন্তু বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিমল ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে নিজেদের ছায়ার মতন। পরিমলের কথায় আমি ভিতরে ভীত, লজ্জিত। পরিমলের মৃত্যু বছর-পঁচিশ আগের কথা! তবু বিস্ময় আর রহস্য এখনো পরিমল সম্পর্কে আমার একটুও কমেনি। আমার বিশ্বাস, ঠিক কিভাবে পরিমল মারা গেছে, ওরা তা না জানলেও ওদের মনের অবস্থা ঠিক তা-ই। তা না হলে আমরা চারজনেই এমন নিশ্চুপ হেঁটে চলেছি কেন?

পরিমল ক্লাশ ফাইভে প্রথম আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হয়, তখন থেকেই ও গ্রামের দূর সম্পর্কের মামার বাড়ি মানুষ। মা, বাবা, নিজের ভাইবোন বলতে কারোর কথা জিজ্ঞেস করলে পরিমলের চোখ ক্রমশ লাল হত, কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকাত, কি এক চাপা আক্রোশে নীরব থেকে এড়িয়ে যেত। বছর তিনেক পর উঁচু ক্লাশে উঠে আমি পরিমলের বাবা-মার এক গোপন খবর শুনি। বাবা ধানবাদের কোলিয়ারির শ্রমিকদের মধ্যে ছোটখাটো নেতার মত ছিল। মা ছিল খুবই সুন্দরী। পরিমল হওয়ার পর বাবার সঙ্গে মায়ের কি নিয়ে তুমুল বচসা হয়। তার কদিন পর থেকে বাবা সেই যে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আর ফেরেনি। পরিমলকে কিছুটা বড় করে মা-ও আর একজনের সঙ্গে পালিয়ে যায়। নানাভাবে

ভাগ্যের ফেরে পরিমল এই গ্রামে দূর সম্পর্কের মামার বাড়ি ওঠে। গ্রামের সমবয়সী মামাতো ভাইদের কাছেই শোনা, পরিমল নাকি ওর বাবার সন্তান নয়। ওর মা, স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, যাকে নিয়ে সংসার বাঁধে, তারও নয়। গ্রামের এই কথা কানাঘুষোয় আমাদের স্কুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও ঘোরে। উঁচু ক্লাশে উঠে পরিমল সম্ভবত বুঝেছিল, আমরা, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, ব্যাপারটা জানি। অবিশ্যি জানার পর থেকে কোনদিন আমরা কেউই ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি এ বিষয়ে। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের রুচিতে বাধত। আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের শালীনতা, সৌজন্যবোধ, সুস্থতা, মর্যাদার সম্পর্কের কথা ভেবে প্রসঙ্গটা ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে গেছি, বলা ভাল, একেবারে নিজের মত করে নিজেদের মধ্যেই গোপন রেখেছিলাম তা।

ছোটবেলায় পরিমল দেখতে সুন্দর ছিল। ফর্সা, রোগা পাতলা চেহারা; আমাদের সবার থেকে একটু লম্বা। মাথাভর্তি ঘন চুল। চোখ দুটো ছিল বড় বড়, দৃষ্টি থাকত দূরের। স্বল্পভাষী অন্যমনস্ক পরিমল। যার বাবা নিখোঁজ, মা গৃহস্থ ঘরের বউ হলেও ভিন্ন পতিত জীবনে অভ্যস্ত, যার নিজের জন্মের মূলে আছে অসহায় অসঙ্গতি, দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তার কাহিনী সে সময়ের গ্রামের পরিবেশে যে আরও রঙিন কল্পনায়, রসাল গুজবে অন্যরূপ নেবে, সেটাই স্বাভাবিক। পরিমলকে সেই পরিবেশ মনে মনে সহ্য করতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম ভিতরে রেগে উঠত, উঁচু ক্লাশে উঠে পরিমল সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে থেকেও একা হয়ে যেত। কখনো কখনো আমাদের কারোর সঙ্গে কোন যোগাযোগই রাখত না। দেখা হলে আমরা কোন প্রশ্নও করতাম না। ওকে ওর নিজের মত থাকায় আমরা—আমি, বিশ্ব, মণি, সদা যতটা সম্ভব সাহায্য করতাম। সেই পরিমল যৌবন বয়সে নানান জটিলতার জীবনে জড়িয়ে শেষে কি তার নিজের মৃত্যু দিয়ে কোন নির্মম প্রতিশোধ-স্পৃহাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে? পুরনো সন্দেহটা আবার হঠাৎ নড়ে উঠল আমার চিন্তায়। আমি গভীর অন্যমনস্কতার মধ্যে চমকে উঠে সচেতন হলাম। আমাদের চারজনের পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে কানে ধাক্কা দিচ্ছে।

ছোট একটা হ্যারিকেনের আলোয় আমরা চারজন আগের মতই নিঃশব্দে পথ চিনে চিনে হাঁটছি। মাঝে মাঝে বিশ্ব হাতের টর্চ জ্বালছে খেলা করার মতন। সরু রাস্তার দুপাশে পানা-ভর্তি পুকুর। কোন পুকুর-পাড় বাং-চিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে মাছের ঘাই মারার শব্দ। পচা-শুকনো পানার গন্ধ আসছে

নাকে। অন্ধকার পুকুরের জলকে মনে হয় ভারী পাথর বসানো। কোথাও কোন রাত-পাখি বিচিত্র শব্দে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে বসল। শীতের কনকনে হাওয়া। অন্ধকারে তারার আলো মেখে কেউ বুঝি শূন্যে রহস্যময় শিষ দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলে যায়।

অন্ধকার ঠেলে এখনো নিশ্চুপ আমরা এগিয়ে চলেছি রূপনারায়ণের বাঁধের দিকে। গ্রামের ভিতরের রাস্তায় পাশের কাঁটা-ঝোপ আমাদের পায়ে জড়িয়ে যায়। পাকুড়, আম, জাম, বট, করমচা, আস্শ্যাওড়া, ফণিমনসা, হাতিশুঁড়, আকন্দ গাছের শিশির-ভেজা কাঁচা পাতা আর ফুলের মিশ্রিত গন্ধ নাকে এসে লাগে। আমরা এসবের মধ্যে অন্যমনস্ক। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, চারপাশের এমন গভীর অন্ধকারের সমস্ত রহস্যের সমাধান ওই আকাশের আলোয় সীমাহীন।

চওড়া বাঁধে পা রেখেই মণিমোহন হঠাৎ বলল, 'পরিমলের এত কম বয়সে মারা যাওয়াটা ভাবাই যায় না। একটা চাকরী-বাকরী করলে অন্তত ডাক্তার দেখাবার পয়সাটা পেত?' একটু সময় চুপ! 'আমি যে কোন মৃত্যুকেই বড় ভয় করি!' যেন আপনমনে বিড়বিড় করল মণিমোহন।

'এমন কম বয়সে যে কোন মৃত্যুকেই আমার মনে হয় এ কেস অব সুইসাইড!' সদানন্দ শ্বাস চেপে রেখে উদাস গলায় বলল। 'লাইফটাকে পরিমল সিরিয়াস্লি নিতেই শেখেনি। স্কুলে পড়ার সময়ই দেখতাম।' আমার দিকে তাকাল সদানন্দ।

গলায় শব্দ করল বিশ্বপতি। ভারী মুখের চোয়ালে অস্পষ্ট হাসির রেখা। 'আমি জানি না কি অসুখে সে মারা গেছে। তার মৃত্যু তো অনেকদিন আগের ব্যাপার! তবে ডাক্তার দেখাতে পারত। টাকা পয়সার তো অভাব ছিল না। চাকরি না করলেও সে সব ঠিক জোগাড় করেছিল পরি।' বিশ্বপতি টর্চটা বেশ কিছু সময় জ্বালিয়ে রেখে রাস্তায় আলো ফেলল।

মণি, আমি, সদানন্দ ওর দিকে তাকালাম।

'তার মানে তুই সব জানিস বিশ্ব যে পরিমল রীতিমত বাঁচার জন্যে টাকা-গয়না যোগাড় করত!' মণিমোহনের স্বরে বিস্ময়।

'তাই।' বিশ্ব মাথা নাড়ল। 'তার টাকার ওপর ভীষণ লোভ ছিল। টাকার জন্যে পাগল হয়ে যেত সে। টোটালি এ ম্যাড।' বিশ্ব কথাটা এমন স্বরে বলল যেন কোথায় একটা খোঁচা দেওয়ার দিক আছে।

আমি কষ্ট পেলাম। পরিমল আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে আজ যেভাবেই হোক মৃত। তাকে এভাবে খোঁচা মারা কি শোভন? আমি বিশ্বকে আবার দেখলাম। বিশ্বর হাঁটার ভঙ্গি যেন পরিমলের মৃত্যু-প্রসঙ্গটাকে তাচ্ছিল্য করার মতন।

মণি চুরুট টানছিল। বোধহয় হিমে নিভে গেছে। মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে শেষ ধোঁয়াটুকু বুকের মধ্যে আটকে রাখল। বলল, 'বিশ্ব যতটা ভাবছে ততটা না।'

'তার মানে তুই এমনভাবে কথা বলছিস মণি, পরি যেন তোকেও সব বুঝিয়ে বলেছে!' সদানন্দের কণ্ঠস্বর উৎসুক।

মণিমোহন সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। থমকে দাঁড়াল। আমরা সকলেই হাঁটার গতি মন্থর করলাম। মণিকে দেখলাম। মণি নতুন করে লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরালো। চুরুট টানতে টানতে চুরুটের আগুনে আর লাইটারের শিখায় স্থির দৃষ্টি রেখে কি যেন নিরীক্ষণ করল। লাইটার নিভিয়ে পকেটে রাখল। কয়েক পা হেঁটে মণিমোহন যেন নিজের মনেই বলল, 'পরিমল এমন এক পরিবেশে আমাকে কিছু কথা বলে, যা থেকে বোঝা যায়, পরিমল প্রয়োজনেই বাঁচতে চেয়েছিল, কোন লোভে নয়।'

'কোথায় দেখা হয়েছিল?' রুদ্ধশ্বাস আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করি। 'কলেজে পড়ার সময় পর্যন্ত আমার মনে হয়, আমাদের সকলের সঙ্গেই তার যোগাযোগ ছিল। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।'

'ছাড়াছাড়ি হয় হঠাৎই, আর তা বছর পাঁচেকেরও বেশী। আমরা কেউই তার খোঁজ পাই নি।' মণি থামল।

আমরা সকলেই নীরব। সত্যিই, আমরা হঠাৎ তাকে নিরুদ্দেশ হতে দেখেছিলাম সে সময়ে। অন্তত, আমি তাকে সে সময়ে টানা বছর-পাঁচেক গ্রামের মুখো হতে দেখিনি।

মণিমোহন বলল, 'তাকে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করি বিহারের দলমা পাহাড়ের চূড়োয়।'

'পাহাড়ে!' আমরা তিনজনেই কোন কথা না বলে অবাক চোখে মণির দিকে তাকাই।

আমাদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় মণি। 'আমার বিয়ের ঠিক এক বছর আগে। আমি অবিশ্যি একটু বেশী বয়সেই বিয়ে করি। তখন বছর

চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স আমার।' একটু থেমে মণিমোহন যেন দম নেয়। ভাল করে গুছিয়ে নেয় পুরনো স্মৃতি। 'আমি তখন চাকরি সূত্রে জামশেদপুরে বদলি হয়েছি। এক দিন-চারেকের ছুটিতে সাকচি হয়ে আমি যাচ্ছিলাম বাসে আমার বোনের বাড়ি ভাগলপুর। সাকচি থেকে মাইল-আস্টেক দূরে দল্‌মা পাহাড়। যেতে যেতে জঙ্গলটা খুব ভাল লেগে গেল। তাছাড়া পাহাড়ের গায়েই ছিল একটি পুলিশ ক্যাম্প, ওখানে আমার এক ভাগ্নে অফিসার। তার কথা ভেবেই নেমে পড়ি মাঝপথে। দল্‌মা পাহাড়ে উঠব ঠিক, কিন্তু 'ভিজিট দল্‌মা টপ' লিখে যেখানে পাহাড়ে ওঠার পথনির্দেশ দেওয়া, সেখানে না নামিয়ে দেহাতী কণ্ডাক্টর আমাকে হঠাৎ নামিয়ে দেয় ভুল পথে। আমার তো তখন ঘুরে বেড়ানো পাগলামির মত ছিল! কি খেয়াল হল ভাগ্নের ওখানে যাই। সেই পথ ধরে দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে ঘণ্টা চারেক বাদে বেলা পড়ার আগেই দল্‌মা বাবার মন্দিরে পৌঁছে যাই।' একটু থামে মণিমোহন। 'ওখানেই দেখি হঠাৎ পরিমলকে।'

আর কোন কথা বলে না মণিমোহন। আমরাও নীরব। মণি বোধ হয় বুক ভরে শ্বাস নেয়। হাতে চুরুট ধরা। যেনবা পুরনো স্মৃতির মধ্যে নির্দিষ্ট পা ফেলে ফেলে হাঁটে। এরই মধ্যে সদানন্দ জিজ্ঞেস করে, 'পরিমল কি সেখানে একা?'

'উঁহু।' মণি ঘাড় নাড়ে। 'জায়গাটা যে একা থাকার নয়, আমি পাহাড়ে ওঠার সময়েই বুঝেছিলাম। পাহাড়ে ওঠার মুখে এক প্রবাসী বাঙালীর বস্তি পাই। সেখানে মুড়ি-মুড়কি চাপাটির মত খাবার কিছু মেলে। খেয়ে-দেয়ে উঠতে উঠতে মিনিট পনেরোর মধ্যে জঙ্গল পেয়ে যাই। ঘন জঙ্গল। যেসব মেয়েরা কেউ চিহড় পাতার, কেউ বা আসন-কাঠের বোঝা নিয়ে, আর ছেলেরা কুড়ুল কাঁধে নামছিল, তাদের জিজ্ঞেস করে বুঝি, যে কোন মুহূর্তে হাতি বা 'শের'-এর সামনে পড়তে পারি সন্ধে হলে। যেখানে আশ্রম সেটা এক পুরনো বটগাছের ভিতর বিরাট গহ্বর। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ভিতরে মন্দির। বাইরের লাগোয়া চাতালটা নাটমন্দিরের মত। আশ্রমে থাকে বালক বুড়ো মিলিয়ে জনা-দশেক সাধু। তাদের একজন আমাদের পরিমল।'

'পরিমল। সাধু! আশ্রমের!' সদানন্দের স্বর বিস্ময়ে স্থির-হয়ে-থাকা বিদ্যুতের মত।

'ও প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। সন্ধের আরতির পর একটা ভজন গানের আসর বসেছে। 'কে না বাঁশি বাজাওয়ি' গানটা ফিরে ফিরে হচ্ছিল,

আমি শুনছিলাম। হঠাৎ পরিমলের মত কাউকে যেন দেখলাম। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। হয়ত সেসময় দেখতেই পেতাম না। গাঁজার কল্‌কেটা ঘুরে ঘুরে হাতে হাতে ফিরছিল। সাধুদের কল্‌কে নেবার সময়েই চোখে পড়ে যায় পরিমল। পরিমলও হঠাৎ আমায় চিনতে পারে।' মণিমোহন বেশ কিছু সময় নীরব থাকে।

আমি অধৈর্য হয়ে উঠি। বলি, 'পরে পরিমলের সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। রাতে আমাকে লোক দিয়ে কাছাকাছি পুলিশ ক্যাম্পে যেতে দেয়নি পরিমল। আমাকে আধ-ইঞ্চি পুরু চাপাটি, অখাদ্য প্রায়-বুনো টক ডাল আর এক ঘটি দুধ খাইয়ে আতিথেয়তা করেছিল সে। ওই ধরনের খাবার ওদেরও থাকত প্রতিদিন। অতিথিদেরও তাই। নাটমন্দিরেই আমার শোবার জায়গা হয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা। পরিমল শুধু বলেছিল, কলকাতায় আর ফিরবো না। লোকজন, গোলমাল আর ভাল লাগে না।'

হাসল বিশ্বপতি। 'কিন্তু সে ফিরেছে। একদিন কলকাতা তার দারুণ ভাল লেগেছিল বলেই টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছিল সে কলকাতায়।'

'হতে পারে বিশ্ব। তবু এমন ফিরে-আসার সঙ্গে তার লোভের ব্যাপারটা ছিল না।' মণিমোহন চুরুটের ধোঁয়া গিলে নিয়ে বলল, পরের দিন সকালে কয়েকটা গরু নিয়ে চরাতে যায় জঙ্গলে। আমি সঙ্গে থাকি। এমন সব জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে যায় যেখানে হাতির দল চারপাশে। কচি বাছুরের পেছনে নেকড়েদের লেগে থাকতে দেখি। এখানে-ওখানে ভালুকদের আস্তানা। রাতে আশ্রমের দেয়ালে ভালুকের শ্বাস ফেলে হাঁটার কথা বলে পরিমলকে জিজ্ঞেস করি, এমন ভয়ংকর জায়গায় থাকার মানেই তো মৃত্যু! পরিমল বলেছিল, 'মণি, মৃত্যু তো শহরে। এখানে মৃত্যু নেই, তোরা শহরে মরছিস! পচে-ধসে মরে-যাওয়া! আমরা মরি না, অন্তত আমি না। তা ছাড়া মৃত্যু আমাকে কতটা ভয় দেখায়, কিভাবে আমাকে নেয় দেখতে চাই। মৃত্যুকে ভয় পাই না।' একটু থেমে গলায় হাসির শব্দ করে মণি বলল, 'পরিটা তখন একটা বড় দার্শনিকের মত অনেক আবোল-তাবোল কথা শুনিয়েছিল। এখন সে সব মনেই নেই।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম। বিশেষ করে সদানন্দ। পায়ের শিরার টানে ওর একটানা হাঁটায় কষ্ট হচ্ছিল। এতক্ষণ কথা কম বলছিল

ও। এবার সদানন্দ বলল, 'আমরা যদি একটু বসি, ভাল হয়, ভাল করে কথা বলা যায়।'

মণি হাতঘড়ি দেখে। 'এখনো তেমন রাত হয়নি, বসা যায়।'

আমরা একটা ক্যাল্‌ভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। রূপনারায়ণের সঙ্গে যোগ-করা নিকাশী খাল। ক্যাল্‌ভার্টের ওপর রাস্তার দু'পাশে সিমেণ্ট-বাঁধানো চওড়া বেঞ্চ। আমরা সকলে একদিকের বেঞ্চে বসলাম।

বসার পর আমরা সকলেই আবার নিশ্চুপ।

নীরবতা কাটিয়ে সদানন্দ জিজ্ঞেস করল, 'মণি, তারপর কি আর তোর সঙ্গে পরিমলের দেখা হয়নি?'

'নাহ্‌। ও আমাকে ওখানে আবার যেতে বলেছিল, চিঠি দিতে বলেছিল আশ্রমে। ঠিকানাও দিয়েছিল। প্রথমে ঠিকানা হারিয়ে ফেললেও পরে চিঠি দিয়েছি ঠিকানা মনে করে, কোন উত্তর পাইনি। আমার মনে হয়েছিল ও আশ্রমে নেই।' শ্বাস ফেলল মণি, 'তবে ইস্কুলে পড়ার সময় যেমন ও চঞ্চল, অস্থির থাকত সব সময়, ওখানেও ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সেই অস্থিরতা চঞ্চল ভাবটা অন্যরকম রূপ নিয়েছে ওর মধ্যে।'

'চঞ্চল বলেই কোথাও ও টিকতে পারেনি মণি।' বিশ্বপতি বলল। 'ওর সাধু হওয়াও যেমন, তেমনি কলকাতায় এসে এর-ওর কাছে টাকা চাওয়াও তেমনি!'

'তার মানে, কলকাতায় এসেছিল ও, এই বোঝাতে চাস?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কলকাতায় ছিল অনেকদিন। আমার সঙ্গে হঠাৎ একদিন বড়বাজারে দেখা। আমি গদিতে বসে আছি, ও দোকানে এসে হাজির।'

'তোর দোকানে! চিনল কি করে?' মণি জিজ্ঞেস করল।

'তা বলল না। নানা কথা জিজ্ঞেস করতে শুধু বলেছিল, কলকাতার বাইরে থাকত। কিছুদিন হল কলকাতায় এসেছে। গ্রামেরই কার সঙ্গে দেখা, সে আমার ঠিকানাটা বলেনি, শুধু দোকানটা ঠিক কোন জায়গায় বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাতেই সোজা চলে আসে আমার কাছে।'

সদানন্দ হাসতে হাসতে বলে, 'এসেছিল কেন? টাকা চাইতে?'

বিশ্ব মাথা নাড়ল। 'না, প্রথম দিন এসে টাকা চায়নি। বেশীক্ষণ বসেও নি, সামান্য চা-ও খায়নি। কেমন অন্যমনস্ক। জামা-কাপড় ময়লা, দাড়ি-টাড়ি

কামায়নি। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলল না। হঠাৎ এলো, হঠাৎ চলে গেলো।'

আমি বললাম, 'অথচ বিশ্ব, স্কুলে পরিমল তোর সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশত। আমরা তো ভাবতাম আমাদের মধ্যে পরির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুই।'

বিশ্ব গলার মাফ্‌লারটা খুলে মাথা পর্যন্ত ভাল করে জড়িয়ে নিল। নাক টানল। ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর। 'প্রথম দিন কিছু চায়নি, কিন্তু পরে ঘন ঘন আমার দোকানে আসে পরি। একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ওর বেলেঘাটার বাড়িতে। একটা অন্ধকার একতলার ঘর। নিজেই রেঁধে-বেড়ে খায়। তাও সর্বদিন নয়। কখনো হোটেলে, কখনো বা না খেয়েই থাকে। এসব দেখে আমি ওকে কিছু টাকা দিই। বলি, শোধ দিতে হবে না। তুই ভালভাবে খেয়ে থেকে একটা চাকরী জুটিয়ে নে।' বিশ্ব হঠাৎ কথা বন্ধ করে।

বেশ কিছু সময় বিশ্বকে নীরব থাকতে দেখে মণি প্রশ্ন করে, 'তারপর? এখানেই শেষ!'

'তারপর আর কি? আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করারও পথ রাখল না। পরিমল আমার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নিতে থাকে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া পরিটাকে আমার এমনিতে ভালই লাগত। মায়া ছিল ওর ওপর। টাকা নিয়ে কি করিস জিজ্ঞেস করলে বলত, 'তোকে সব দেখাবোরে একদিন।' একটু থেমে বিশ্ব বলে যায়, 'সত্যিই একদিন সে দেখাল। আমাকে নিয়ে গেল ওর নতুন পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। নিজের নেম-প্লেট লাগানো, সাজানো ফ্ল্যাট। দেখে মনে হল ও বিয়ে-থা করবে, সংসার করবে।' হঠাৎ স্বর গম্ভীর শোনাল বিশ্বপতির। 'আমি কিন্তু সত্যি পরিমলের নতুন সংসারের জন্যে টাকা দিয়েছিলাম। বেশ কয়েক হাজার টাকা।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বন্ধুত্বকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম সুকুমার। সে কিন্তু প্রয়োজনকে করেছে লোভ, জীবনের মানে করেছে বিলাস, বন্ধুত্বকে অসম্মান করেছে মিথ্যায়। আমার টাকার অভাব নেই ঠিকই, হবেও না কোনদিন, কিন্তু আমার সঞ্চয় অমানুষিক পরিশ্রমে! পরিমলকে তাই খুব ছোট মনে হয়।'

আমি খুব ব্যথিত হলাম। সম্ভবত বিশ্বপতির এমন কথায় মণি আর সদানন্দও। বিশ্বপতির ক্ষোভ কোথায় যেন পরিমলের আত্মাকে ছোট করছে, আঘাত করছে! বিশ্ব অঙ্কের হিসেবে পরিমলকে মেপেছে। বন্ধুত্বের অভিমানের

কাছে পরির জবাবদিহি চায় হয়ত! নিশ্চয়ই তা অন্যায় নয়। কিন্তু পরিমল তো সমস্ত জবাবের বাইরে চলে গেছে! তার পরেও?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার পর আর তার খোঁজ নিসনি বিশ্ব?'

'নিয়েছিলাম। ও সেখানে ছিল না। তবে আমিও ব্যবসায়ে এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে পরিমল আর একদম আসছে না, কেন আসছে না এমন ভাবনা আমার মাথায় আসেই নি! অথচ আমার নিজের গাড়ি ছিল! গাড়িটা নিয়ে খোঁজ নেবার মতও সময় আমার ছিল না। আমার নিজের ছেলেমেয়ের সংসারকেও দেখতে পারিনি তখন!' একটু থেমে বিশ্ব বলল, 'আমার টাকাটা নিয়ে ও ফুর্তি করত, মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে ঘুরত—এরকম একটা কথা ওর পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে পরে আমি শুনেছিলাম।'

'তার মানে মেয়ে নিয়ে মাতলামি? কেচ্ছা? যা আমরা সবাই করি!' সদানন্দ জিজ্ঞেস করে। ওর স্বরে যেন কোর্টের কোন আসামীকে জেরা করার ভাষা।

'তাছাড়া আর কি? সে যে সংসারে জড়াবে না কিছুতেই, শেষের দিকে বার বার তা বলত! অথচ এত টাকা! তা ছাড়া আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো!'

সদানন্দ জোর দিয়ে বলল, 'লুকিয়ে বেড়ানো নয় বিশ্ব, সে এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, যা থেকে সে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিল না তখন!'

মণি বলল, 'তোর সঙ্গেও সে যোগাযোগ করেছিল বুঝি?'

'আমার কোর্টে একদিন গিয়েছিল।'

'কোর্টে! কেন?' মণির পাল্টা প্রশ্ন।

'একটা ডিভোর্সের ব্যাপারে আলোচনা করতে।'

আমি, বিশ্ব দুজনেই অবাক হয়ে সদানন্দকে দেখলাম। অন্ধকারে ওর মুখের ভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তবে কণ্ঠের নিরাসক্তি অনুভব করছিলাম।

সদানন্দ নিজেই বলতে লাগল, 'পরিমলকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন ওর স্বাস্থ্য খুব সুন্দর। এমনিতেই চোখ দুটো তো ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত শার্প। নাক টিকল। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, ফর্সা। মাথার চুলে ওই বয়সে পাকা চুল দেখিনি, টাক পড়ার চিহ্নও ছিল না। তখন আমরা সবাই এক বয়সী—চল্লিশের দিকে এগিয়ে এসেছি। পরিমলকে প্যান্ট-শার্টে সেই ছোটবেলার দুঃখী চেহারাটা ধরাই যাচ্ছিল না!'

'সবই স্বাভাবিক।' টিপ্পনি কাটার মত স্বরে বিশ্বপতি বলল, 'আমার সঙ্গে যোগাযোগের পর ওর স্বাস্থ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তাতেই তো ওকে সংসার করতে বলেছিলাম।'

'ও কিন্তু সংসার করতে চায়নি। মেয়েদের সম্পর্কে ওর কোন আকর্ষণ ছিল না।' সদানন্দ মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল।

মণিমোহন বলল, 'ওটা তা হলে একটা রোগ! আমরা সকলেই তো সংসার করছি সদানন্দ। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ নেই একথা ও দল্‌মা পাহাড়ের আশ্রমে নানান কথা বলার সময় বুঝিয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় এসে সে-ই আবার ডিভোর্স নিয়ে কথা বলতে আসছে! পরিমলের অস্থিরতা কেমন যেন যুক্তিহীন!' মণিমোহন সামনে তাকিয়ে রইল।

আমি নীরবে শুনে যাই ওদের কথা।

সদানন্দ বলল, 'পরিমল বিয়ে করে নি, নিজের ডিভোর্সের জন্যে সে আসেনি, এসেছিল তার পরিচিত একটি মেয়ের ডিভোর্সের ব্যাপারে।'

'তার পরিচিত! কলকাতায়?' বিশ্বপতির স্বরে গভীর বিস্ময়। 'তা হলে তো আমি ঠিকই শুনেছিলাম!'

সদানন্দ বিশ্বপতির কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'পরিচয় হয়েছিল একটি বছর পঁচিশ বয়সের মেয়ের সঙ্গে। অসাধারণ সুন্দরী দেখতে মেয়েটি। অত্যন্ত শিক্ষিত, কালচার্ড বনেদি, ধনী বংশের মেয়ে। বউও। স্বামী শিক্ষিত, বিদেশী ফার্মের অফিসার। প্রায়ই কন্টিনেন্ট ঘুরতে হয় হাজব্যাণ্ডকে। এমনি স্বামীর কন্টিনেন্ট ঘোরার কালেই মেয়েটি ডিভোর্সের কথা ভাবে। আইনের ফাঁক দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স আনা যায় কিনা আমার কাছে সেই রকম আইনের আশ্রয় চাইছিল।'

'কেন ডিভোর্স চাইছিল? পরিমলের জন্যে?' বিশ্বপতি প্রশ্ন করে।

'সেরকম কোন কণ্ডিশন্ ছিল না। তবে মেয়েটিকে আমার কাছে এনেছিল। কথা বলে দেখেছি, স্বামী ইম্‌পোটেণ্ট তাই সে আর একদিনও থাকতে চায় না। বলেছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, আছে পরিমলের ফ্ল্যাটে—নিউ আলিপুরে।'

'পরিমল তখন নিউ আলিপুরে!' বিশ্বপতি তাকিয়ে থাকে সদানন্দের দিকে।

'হ্যাঁ। মেয়েটির টাকায় ফ্ল্যাট নেওয়া। আমি সে ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। পরিমল তারই টাকায় তখন দিন কাটাত! তবে পরিমল তখন সামান্য মদ ধরলেও

এতটুকু অশালীন হতে দেখেনি মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্কে। পরিমল বার বার আমায় বলত, মেয়েটির কাছে শুধু আছে নির্ভেজাল বন্ধু হিসেবে। ডিভোর্স হয়ে গেলেই ও অন্য কোথাও চলে যাবে।' সদানন্দ নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল।

বিশ্বপতি হাতের টর্চটার আলো একবার সামনে ফেলে পর মুহূর্তে দূরে গাছের মাথায় ফেলল। তার পরেই ক্যাল্‌ভার্টের নীচে দিয়ে বয়ে-যাওয়া জলের ঢেউয়ে। টর্চ জ্বেলে রেখেই জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটির ডিভোর্স কি হয়েছিল ?'

'হয়েছিল। হাজব্যাণ্ড কোন বাধা দেয়নি। কোর্টে ডিভোর্স হওয়ার আগে হাজব্যাণ্ডই কি ভেবে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখবরটা পরিমল আমাকে দেয়।'

'শুধু খবর দেয়। তারপর ?' মণিমোহন বলে।

'তারপর থেকে হঠাৎ পরিমলের কোন পাত্তা পাই না। যেদিন শেষ দেখা করে খবর দেয়, সেদিন পর্যন্ত আমার সমস্ত ফিস সে মিটিয়ে দিয়ে যায়। টাকাটা দেয় মেয়েটিই। আমি একসময়ে তাকে কোর্টে নয়, আমার বাড়ির চেম্বারেই বসিয়ে জিজ্ঞেস করি, পরি, এবার তোর কাজ কি ? পরিমল বলে, জানি না রে সদা কোথায় যাব। তবে একটার শেষ হল, আর একটার শেষ দেখব। বলেই চুপ করে গিয়েছিল। তখন দেখেছিলাম, পরিমলের ফর্সা মুখ ব্লাশ্ করছে আমার সঙ্গে কথা বলার সময়। পরিমল যে ভয়ংকর একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে চাইছে তা বুঝি। ভয়ংকর এক খেলা। আমরা সংসারী মানুষ যে খেলা থেকে সব সময় দূরে থাকি, আমাদের ছেলে মেয়েদের দূরে রাখতে চাই, সেই খেলা।' থামে সদানন্দ। যেন গভীর মগ্ন হয়ে অল্প সময় কিছু ভাবে। নিজের মনেই বলে, 'পরিমল পাওয়ার খেলায় মেতেছিল, পেয়েছেও। সব নিজের মত গুছিয়ে নিতে পারত। আমরা বন্ধুরাও তার পক্ষে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি করে যে মারা গেল বুঝতে পারছি না।'

আবার সেই মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই আমি বিষণ্ণতায় দুর্বল হতে লাগলাম। ঠিক আমার মতই মণিমোহন, বিশ্বপতি, সদানন্দ পরিমলের মৃত্যুর বিচ্ছেদটা নিয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না।

রাত বাড়ছে। আমরা কেউই বাড়ি ফেরার তাড়া অনুভব করছি না কেন ? পরিমল কেন আমাদের এভাবে ধরে রেখেছে ? পরিমল আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এমন পুরনো বন্ধুত্বই কি এতদিনে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার আগের

কলঙ্কিত অধ্যায়? আমরা প্রত্যেকেই পরিমলের মৃত্যু নিয়ে ভাবছি কেন? চারপাশে ঘন অন্ধকার। আকাশে অগণন তারার চুমকি। আমরা সকলেই বয়সের হিসেবে ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছি! এ বয়সে এমন মৃত্যুর কথা এভাবে আসছে কেন?

এমন নিঃসাড় নিশ্চুপ পরিবেশে হঠাৎ মণিমোহন বলল, 'এবার ওঠা যাক। রাত হল।'

বিশ্বপতি বলল, 'হ্যাঁ। এবার বাড়ির দিকে এগোই।'

আমরা কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলাম।

বাঁধের বাঁদিকে নদীর বিরাট চর। চর পেরিয়ে রূপোলি সুতোর মত রূপনারায়ণের স্রোত বয়ে চলেছে। দূরাগত অস্পষ্ট তার শব্দ। অন্ধকার দিগন্তের প্রান্ত ধরে যে তারার রেখা, তার ছায়া যেন ঢেউয়ের মাথায় খেলা করে যায়। আমরা পিছনে ক্যাল্‌ভার্ট ছাড়িয়ে চারজন প্রৌঢ় ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। কানে আসছে মণিমোহনের রাস্তার ওপর লাঠি রাখার শব্দ। মাঝে মাঝে বিশ্বপতির হাতের টর্চের আলো এদিক ওদিক খেলা করে যায়। সদানন্দ সিগারেট টানে আর কাশি সামলে চলে। আমার যেন নস্যি নিতে ইচ্ছে করে না। হাতের ঝোলানো হ্যারিকেন স্থির রেখে মাটির দিকে দৃষ্টি নামাই, হাঁটি।

'পরিমলের মৃত্যুর খবরটা কিন্তু সুকুমার প্রথম আমাকে গ্রামে দেয়।' মণিমোহন বলে। 'সে সময়ে খবর-টবর এভাবে পাওয়াই ন্যাচারাল। সেই কোথায় পড়ে আছি।'

'তবু সুকুমার গ্রামে থাকে। ও নিশ্চয়ই আরো বেশী খবর রাখত!' বিশ্বপতি জোর দিয়ে বলে।

সদানন্দ কাশতে কাশতেই বলে, 'সবচেয়ে বড় কথা, সুকুমার বলছিল পরিমল এই গ্রামেই মারা গেছে। তা হলে তো ও-ই জানবে বেশী!'

'আমরা তিনজন যা বললাম, আমার মনে হয়, এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না।' বিশ্বপতি বলল, আর সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

আমি বিশ্বর দিকে তাকাই।

মণিমোহন বলল, 'আমি ভাবছি, সুকুমারের সঙ্গেও পরিমলের কোন যোগাযোগ ছিল কি না!'

আমি মণিমোহনকে দেখি। হঠাৎ যেন বিড়বিড় করি, 'ছিল, তবে বরাবর নয়।'

'মৃত্যু যখন এ গ্রামেই, তখন নিশ্চয়ই পরিমল মৃত্যুর আগে সুকুমারের সঙ্গে দেখা করে গেছে!' মণিমোহন যেন কথাটা যোগ করে অর্থটা বাড়িয়ে দিল।

সদানন্দ হাসল। 'তার মানে পরিমল মারা যাবার সময় সুকুমারকে সাক্ষী রেখে গেছে!'

আমি হোঁচট খেলাম। এখনি হয়ত পড়ে যেতাম, সামলে নিলাম। আমার পায়ের চটি খুলে যাচ্ছিল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা এমন শীতে জ্বালা করছে।

আমি কিছু বলতে চাইছিলাম না পরিমল সম্পর্কে। আমার আগাগোড়া খারাপ লাগছিল পরিমলের মৃত্যুর কথাটা ভাবতে। মৃত্যু পবিত্র, কিন্তু আত্মহত্যার মধ্যে কিছুটা কলঙ্ক থেকেই যায়। আত্মহত্যার ব্যাপারটি মৃতের একান্ত নিজস্ব, তার ওপর যে আত্মহত্যা করে তার চরিত্রেরও কলঙ্ক অনেকটা! আমি পরিমলের চরিত্র-হননে প্রবৃত্ত হতে চাই না। বিশেষ করে তার মৃত্যুর এতদিন পরে!

সদানন্দের কথায় ওর দিকে তাকাতে গিয়েই হোঁচট খেলাম। সামলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি সদানন্দকে দেখলাম। আমার হাতের হ্যারিকেনের আলো দুলে দুলে তিনজনের মুখে ভেসে যাচ্ছে। মনে হল, মৃত পরিমলের আত্মার রহস্য ওদের মুখে এক অলৌকিক আবরণ রচনা করেছে। আমার মুখেও কি?

আমি এবার সদানন্দের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'যে মেয়েটির ডিভোর্স চেয়েছিল পরিমল, তার নাম কি ছিল?'

তিনজনেই আমার দিকে তাকাল। তাকানোর অর্থ তিনজনেই আমার প্রশ্নের চমকের প্রাথমিক লক্ষ্যটা বুঝেছে। সদানন্দের এত কথার মধ্যে আমরা কেউ মেয়েটির নাম জানতে চাইনি। নাম না শুনেই যেন পরিমলকে কোন এক নির্বিশেষ মেয়েমানুষ দিয়ে বোঝা যায়। ভুলটা এখানেই।

সদানন্দ বলল, 'মেয়েটির নাম কঙ্কাবতী।'

আমি ভিতরে চমকে উঠলাম! কতদিন আগের স্মৃতি! হঠাৎ যেন পুরু লেন্সের চশমায় সামনের কিছু ঠাহর করতে পারছি না। একটু থমকে দাঁড়ালাম। আমার হাতের আলো আড়াল হওয়ায় বিশ্বপতি টর্চের সুইচ টিপল! চারপাশের অন্ধকারের বুক চিরে চার ব্যাটারির বড় টর্চটার আলো স্পষ্ট সরল মোটা রেখায় অনেকটা দূরে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

আলোর শেষ প্রান্ত কোথায় রয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি বারবার তা খুঁজে বের করার জন্যে দূরে দৃষ্টি ফেলে রাখলাম।

আমি হাঁটতে শুরু করেছি, সদানন্দ নিজের কথারই ব্যাখ্যা করল, 'আগে সরকার ছিল, বিয়ের পর সেন।'

সদানন্দের কথায় কান না দিয়ে আমি বললাম, 'পরিমলের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ হঠাৎ। আমি তো ওকে প্রথমে দেখে চিনতেই পারিনি!'

মণিমোহন বলল, 'আমি যখন দেখেছিলাম, তখন অবিশ্যি চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

'আমার কাছে যখন আসে, পরিমল অন্যমানুষ।' সদানন্দ শোনাল।

আমি বললাম, 'আমার পরিমলকে প্রথম দেখার সময় পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল। চেহারায় তো বদল হয়েছিলই, স্বভাবে সেই পরিমলকে পাইনি।'

'কোন্ পরিমলের কথা বলছিস সুকুমার?' বিশ্বপতি টর্চটা বারবার নিভিয়ে জ্বেলে আলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

'স্কুলের সহপাঠী পরিমল। হেডমাস্টারমশাই একটু আগে পরিমলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যে কথা বললেন!'

আমি সামনে তাকিয়ে হাঁটছি ধীর পায়ে। আমি বুঝতে পারছি আমার এই কথায় সকলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আর ওদের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম না। বিশ্বপতির টর্চের চলমান আলোর শেষ প্রান্তে দৃষ্টি রেখে বললাম, 'স্কুলের পরিমলকে একবার মনে করে দ্যাখ তোরা। যেমন ভীষণ দুরন্ত ছিল, তেমনি হঠাৎ হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ত! মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে থেকেও একেবারে চুপ হয়ে যেত! তোরা লক্ষ্য করতিস কিনা জানি না, আমি দেখতাম। দুঃখটা যে কি, সেই অল্প বয়সে আমিও বুঝতাম না। মনে পড়ে, মাঝে মাঝে হেসে তোদের কাছে পুরনো একটা ঠাট্টা করতাম, পরিমল একদিন কবি হবে। ও যেভাবে উদাস হয়ে যায়, একা একা থাকতে চায়, নির্ঘাৎ কবি হবেই!'

আমি ওদের স্মৃতির সমর্থনের আশায় ওদের দিকে তাকালাম। মণিমোহনের চোখে চোখ পড়ল। সদানন্দ, বিশ্বপতি আমার দিক থেকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। মনে হল, ওরা মনে করতে পারছে কথাগুলো।

'কলেজে পড়ার সময় পরিমল যখনি গ্রামে আসত, নদীর ধারে চলে যেত সন্ধেয়। এক-একবার আমিও সঙ্গে গেছি। ওর সঙ্গে কথা বলেছি অনেক, কিন্তু একটা কথা বুঝতাম ও যেন আমাদের কারোর কাছ থেকে কিছু চায় না। এই পৃথিবীর কাছ থেকেও না!' আমি থামলাম।

বিশ্বপতি বোধ হয় একটু হাসির শব্দ করল স্বরে। আমি বুঝতে পারছি, আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকাল। কিছু বলতে চায়। আমি হঠাৎ ওর দিকে তাকালাম।

বিশ্বপতি বলল, 'ওর চাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু রহস্যময় সুকুমার। মণি বলল, ওকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে দেখেছে, কিন্তু আমার কাছ থেকেই যে ও কত নিয়েছে তার আর হিসেব-পত্তর নেই।' বলতে বলতে সদানন্দের দিকে তাকাল। 'সদানন্দকে ও শেষ দেখা হওয়ার সময় যা বলেছে, তাতেও তোর কথা মেলে না সুকুমার।'

আমি গভীর মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। আবার কিছু সময় নিশ্চুপ। মণিমোহনের হাতে লাঠির শব্দ জোর শোনাচ্ছে। সদানন্দ একটু বেশী সিগারেট খায়। ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও আজ যেন বেশীই খাচ্ছে। ও নতুন করে একটা সিগারেট ধরাল। বিশ্বপতির কাশির শব্দ পেলাম।

'তোর ব্যাখ্যা পরে শুনব। এবার পরির সঙ্গে তোর প্রথম দেখা হওয়ার কথা বল।' আমার ঠিক পেছনে থেকে সদানন্দ বলল। 'কলেজে পড়ার সময় তো ওর সঙ্গে আমাদের সকলেরই যোগাযোগ কম ছিল। অন্তত এক কলেজে যখন আই. এ. পড়ছি।'

'হ্যাঁ ছিল, তবে তোরা কেউ গ্রামে থাকতিস না। আমি থাকতাম। ও গ্রামে এলে আমার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করত বেশী, আমার সঙ্গেই ঘুরত।' বলে আমি আরও কিছু মনে করতে চেষ্টা করলাম। 'কলেজ ছাড়ার পর আমার সঙ্গেও পরিমলের হঠাৎ দেখা বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের জন্যে, ঠিক তোদের মতই।' একটা চাপা শ্বাস বেশ কিছুটা সময় আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল। হাঁ করে শ্বাস ফেলে বললাম, 'হঠাৎ একদিন সন্ধেয় আমার বাড়ি এসে হাজির। তখন বাড়িতে আমার বুড়ি মা, আমার বউ, চার ছেলে-মেয়ে। শেষ ছেলেটি মাস-ছয়েকের। সংসার চালাতে আমি হিমসিম। টিউশনিতে ডুবে আছি। বাড়িতেই ছেলে পড়াই। তা ছাড়া পুজো-আচ্চায় তো সময় যেতোই। হঠাৎ ওকে আমার এই ব্যস্ততার মধ্যে দেখে রীতিমত অবাক হই, জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার! কবে এলি গ্রামে? ও বলল, কবে কি, এই মাত্র! একেবারে সোজা তোর কাছে। একটু থেমে বলল, তুই এখনো গ্রামে আছিস কিনা দেখতে এলাম। আমি বললাম, কেন এরকম ভাবছিস, আমি তো থাকবই। বলল, তোর বাড়ি দু'দিন থাকতে দিবি? বললাম, কাকে? বলল, আমাকে। মানে আমি একা নই, আমার সঙ্গে

একটা মেয়ে থাকবে। মেয়ে! আমি রুদ্ধ শ্বাসে বলেছিলাম। হ্যাঁ কঙ্কা, মানে কঙ্কাবতী। ও দ্বিধা না করেই নামটা বলেছিল। আজ সঙ্গে আনিনি, দরকার হলে নিয়ে আসব। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে আছি, ও হঠাৎ বলল, যাই রে সুকুমার, আবার আসব। আর একটু বস, আমি বললাম। পরিমল হাসতে হাসতে বলল, সামান্য সময় বসে কি হবে, একেবারে থেকে তিন-চারদিন কাটিয়ে চলে যাব। আচ্ছা চলি। বলেই পরিমল সন্ধের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।'

আমি যেন কথা বলার মধ্যে ক্লান্ত হয়েই থেমে গেলাম। ওরা কেউ কথা বলছে না। আড়ষ্ট, উৎসুক, উৎকর্ণ ওরা। বললাম, 'সেই যে প্রথম দেখা, তাতেই মনে হয়েছিল সহপাঠী পরিমলের সেই দুঃখ একটুও নেই, পরিমল দারুণ সুখী। আমাদের বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখ, ওর অন্য মেয়ে নিয়ে সুখ: পোশাকে, চেহারায় পরিমলকে টাকা পয়সায় সচ্ছল, পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিল। চোখে-মুখে-চেহারায়, হাসিতে, স্বরে সেই বুদ্ধির জৌলুষটা বুঝি সরে গেছে। পরিমল পূর্ণ-তৃপ্ত এক পরম ভোগীর মতন মানুষ।' আমার স্বর গাঢ় গম্ভীর শোনাচ্ছিল আমার কাছেই।

আমি একটু সময় বেশী নীরব থাকতেই মণিমোহন বলল, 'আবার কি পরে এসেছিল তোর কাছে?'

আমার কিছু বলার আগেই সদানন্দ বলল, 'একটু অপেক্ষা কর মণি, সুকুমারকে নিজে থেকেই বলতে দে।'

'তার মানে!' বিশ্বপতি জিজ্ঞেস করল।

'মানে, পরিমল নিশ্চয়ই আবার এসেছিল। তখন ও আমার সঙ্গে শেষ কথা বলে এসেছে, তারপর।' সদানন্দ হাসল।

'হ্যাঁ এসেছিল। এখন বুঝি, বিশ্বর কাছ থেকে সরে এসে সদানন্দর কাছে যাওয়ার আগে ও আমার কাছে একবার ঘুরে গেছে। লুকিয়ে পালানোর মত একটা নির্জনতা চাইছিল, একেবারে নির্জন জায়গাও। দুঃখীর নয়, একজন সত্যি-কারের ভোগীর, সুখীর নির্জনতা।' একটু থেমে থেকে বললাম, 'পরিমল আর এক গভীর রাতে আমার বাড়ি এলো। আসাটা হঠাৎ। ওর সঙ্গে কঙ্কাবতী।'

'কিছু না জানিয়েই একটা মেয়েকে নিয়ে গ্রামে চলে এল!' বিশ্বপতির স্বরে অকৃত্রিম বিস্ময়।

'এইটাই ওর স্বভাব ছিল বিশ্ব।' সদানন্দ যেন মনে করিয়ে দিল।

'তাতে অবিশ্যি কোন অসুবিধে হয়নি। আমার বউকে বুঝিয়ে বললাম ওরা স্বামী-স্ত্রী, রাতটা থাকবে। বুড়ি মা-ও তাই বুঝলেন। দোতলার ঘরে ওদের থাকতে দিলাম।' একটু থেমে, কেশে ধরা গলাটা পরিষ্কার করে নিলাম। 'সেদিন ওরা বিকেলেই ষ্টেশনে নেমেছিল, খাওয়া-দাওয়া ওখানে সেরে নেয়। তারপর রাত দশটা পর্যন্ত ওরা দুজন গ্রামের রাস্তা-ঘাট, নদীর ধার ঘুরে বেড়ায়।'

'এটা কি করে জানলি?' বিশ্বপতির প্রশ্ন।

'সেদিন রাতেই পরিমল এক ফাঁকে আমাকে বলে। বলে, কঙ্কা বড় গ্রাম-পাগল। বার বার গ্রামের নির্জনতা চাইছিল। মাটি, গাছপালা, পুকুর, পাখির ডাক, নদীর শব্দ, ফাঁকা মাঠ—এসবের মধ্যে কঙ্কাকে কি রকম লাগে পরিমলও তা বোঝার জন্যে গ্রামে চলে এসেছিল। সে রাতে পরিমলের চোখে-মুখে যে সুখ দেখেছি তা কোনদিন ভুলতেও পারিনি।'

আমার আর কিছু বলতে ভাল লাগছিল না। পরিমলের সেদিনের সেই মুখ এই মুহূর্তে যেন আমি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আমরা বাঁধ ধরে হাঁটছি। বাঁ দিকে বড় বড় গাছ-গাছালির আড়ালে রূপনারায়ণ লুকিয়ে পড়েছে। এখানটায় বাঁধের রাস্তা নদী থেকে বরং গ্রামের একটু ভিতরে ঢুকে গেছে। মাথার ওপর নিঃসীম আকাশে তারারা ঝলছে। এতক্ষণে চোখে পড়ল, ঘন কুয়াশা চারপাশের আম জাম বট পাকুড়ের ঘন পাতা ভাসিয়ে আমাদের মুড়ে দিয়েছে। তারই মধ্যে চাঁদ অল্প ধুলো-ঢাকা-আলোর মতন। আজ সন্ধে পার হয়ে চাঁদ দেখা দেওয়ার দিন।

মণিমোহন, বিশ্বপতি, সদানন্দ বোধ হয় কিছু ভাবছে। আমরা চারজনেই কোথাও বুঝি থেমে গেছি। মাটির ওপর মণিমোহনের লাঠিটার ঠক ঠক শব্দ। শব্দটা আমার কানে কোন ঘরের বন্ধ শেষ দরজায় আস্তে ধাক্কা দেওয়ার মত শোনাচ্ছে।

'পরিমল তোর বাড়ি কদিন ছিল সুকুমার?' বিশ্বপতি জিজ্ঞেস করল।

'তার পরের দিনই ভোরে চলে যায় ওরা। যাবার আগে আমাকে বলেছিল, ভোরের দিকে আর একটু বেড়িয়ে ওরা ট্রেন ধরবে।'

'তোর বাড়িতেই কি পরিমল মারা যায়?' সদানন্দ হঠাৎ মৃত্যুর কথা তোলে।

আমি মাথা নাড়ি, 'না।' সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর প্রসঙ্গ থেকে সরে যাই। 'তারও মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন রাতে এসে হাজির।'

'আবার! দুজনে!' বিশ্বপতি বলে ওঠে।

'না, একা। তখন ওকে এতটুকু বিষণ্ণ দেখিনি। বরং খুশিতে ভাসছিল যেন। এসে রাতে বেশী কথা বলেনি। শুধু হাসতে হাসতে বলেছিল, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে রে সুকুমার, কাল থাকছি, সব বলব। কঙ্কাকে নিয়ে পরিমলের চলে যাওয়ার পর থেকে ওর সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবে রেখেছিলাম। ঠিক করে রেখেছিলাম এবার একা দেখা হলে একে একে সব জিজ্ঞেস করব। সেই ভেবেই পরিমলকে বললাম, পরি, তুই কি সত্যি এবার সংসার পেতেছিস? তোকে দেখে তাই মনে হচ্ছে কিন্তু! পরিমল শব্দ করে হেসে উঠেছিল। হাসিতে কোন আড়ষ্টতা, অপ্রতিভ ভাব ছিল না। বলেছিল, তোরা সংসার করে যা পেয়েছিস আমি তার অনেক বেশী পেয়েছি রে, চিনেছিও। তুই তো আবার পুজো-টুজো করিস। ভগবানের সঙ্গে সংসারকে মিলিয়ে দেখছিস, জীবনকে চিনতে চাইছিস। আমি কিন্তু ওসবের ধারে-কাছে নেই। তবু সব কেমন জলের মত পরিষ্কার। কি সে? আমি তর্ক করতে চাইছিলাম। পরিমল বলল, থাক, তোকে সব বলব। আজ আর একটা কথা বলে রাখি। মানুষ, জীবন, সংসার শুধু সুখের জন্যেই, কখনো বা দুঃখের জন্যেও! তার বেশী এতে এতটুকু বাড়তি কিছু নেই।' আমি যেন নিজের ঘোরে কথা বলছি, ওরা শুনে চলেছে। ওদের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে কথা শেষ করার জন্যেই বললাম, 'এর পর ও আর কিছু বলেনি।'

'কেন? পরের দিন!' মণিমোহন জিজ্ঞেস করল।

'পরের দিন ভোরেই পরিমলকে নদীর চরে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

'সুইসাইড?' সদানন্দ হঠাৎ যেন গতি মন্থর করল।

'জলে ডুবে মারা গেছে?' বিশ্বপতির উৎসুক কণ্ঠ।

মণিমোহন হাতের লাঠির শব্দ বন্ধ করল।

'সায়ানাইড খেয়েছিল। নদীর ধার ঘেঁষে যেন শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল পরিমল।' আমি এবার নদীর দিকে তাকালাম। সামনের ছোট ছোট গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড় ছাড়িয়ে বিশাল চরের বালিয়াড়ি চোখে পড়ল। তার প্রান্তে শব্দময় রূপোলি স্রোত। আমি যেন বিড়বিড় করলাম, 'পরিমল ঠিক ওইখানে শুয়েছিল!'

বিশ্বপতি পায়ে পায়ে আমার ধার ঘেঁষে হাঁটছিল। ও বুঝি কথাটা স্পষ্ট শুনেছে। হাতের টর্চটা জেলে নদীর দিকে ফেলল। মোটা আলোর রেখা

কিছু দূরে গিয়ে চরাচর-প্লাবিত অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেল। তবু বিশ্বপতি যেন কিছু খুঁজছে।

অনেকদিন আগের ঘটনা। আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পরিমলকে সনাক্ত করি। এরা এত কথা জানে না। মৃত পরিমলের শরীরের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। যেন গরমের দিনে বন্ধ ঘরের কৃত্রিম বিছানায় শুতে ভাল লাগেনি। গভীর ঘুমের বিলাসে, সুখে, আরামে নদীর একেবারে ধারে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল! হয়ত কোন শান্তির আশ্বাস, আকর্ষণ ছিল তেমনি করে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে!

মণিমোহন যেন আমার মনের কথা শুনতে পেল। হঠাৎ বলল, 'পরিমল, মনে হয়, শান্তিই চেয়েছিল!'

সকলেই নিশ্চুপ থেকে ধীর পায়ে হাঁটছিলাম। একটু বা ক্লান্ত। এর মধ্যে মণিমোহনের কথায় সম্বিৎ এলো। আমি মণিমোহনের দিকে তাকালাম।

'কি সে শান্তি?' বিশ্বপতির গাঢ় স্বরে প্রশ্ন।

'আমরা যা চাই, পেতে চাইছি, তা থেকে একেবারেই আলাদা!' মণিমোহন বুঝি পরিমলের সেই দলমা পাহাড়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে গেরুয়া পোষাকটা ভাবতে চাইছে।

সদানন্দ বলল, 'হয়ত তাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সে শান্তি আমরা কেউই চিনি না, জানি না।' সদানন্দর স্বরে কঠিন যুক্তিতর্কে বাঁধা কোন বিশ্বাস নেই।

'আমারও মনে হয় তাই। পরিমল প্রমাণ করে গেছে, আমরা সকলেই মিথ্যে নিয়ে বাঁচছি।' আমি যেন নিজের মনেই ফিসফিস করলাম।

মণিমোহন হাতের লাঠিটা একবার তুলে শূন্যে ঘুরিয়ে নিল। 'অথচ দলমা পাহাড়ের জঙ্গলে পরিমলকে অশান্ত দেখেছি। তখনো পোষাক গেরুয়া ছিল। গেরুয়া পোষাক আর জঙ্গলের ভয়ংকর নির্জনতা কি গভীর আঁকড়ে ধরেছিল তাকে, তা এখন ভাবলে অবাক হই।'

'পরিমল যখন যেটা ধরত, সেটাকেই নিজের করে জড়িয়ে নিত।' বিশ্বপতি বলল। তারপর যেন স্মৃতির অনেক গভীরে কিছু ভাবল। অন্যমনস্ক। এমন সুদূর অন্যমনস্কতার মধ্যেই গলা নামিয়ে বলল, 'আমার কাছ থেকে টাকা নেবার সময় অবিশ্যি মাঝে মাঝে মনে হত, টাকাটা ওর কাছে ফেলে-ছড়িয়ে অবহেলায় খেলার জিনিস।' হঠাৎ চুপ করে গেল।

সদানন্দর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মাথার উলের টুপি একটু আলগা

হয়ে গেছে কখন। আলতো বসিয়ে নিল। নিজের খেয়ালেই বলল, 'কঙ্কাবতীকে নিয়ে ঘোরার সময়েও ওকে আমার তাই মনে হত। তবু বন্ধু বলে কিছু বলতে পারতাম না!'

কঙ্কাবতীর কথায় আমি যেন স্মৃতির শেষ ঘরটা এবার খুলতে পারলাম। বললাম, 'পরিমলের মৃত্যুর দু'তিনদিন পরেই কঙ্কাবতীর চিঠি পাই। তাতে ও জানায়, যেদিন রাতে পরিমল শেষ আমার বাড়ি আসে, সেদিনও ও বলে এসেছিল পরের দিন ফিরবে। এতটুকু দুঃখ, বিরক্তি ওর ছিল না।' শেষ সংবাদটুকু দিয়ে আমি চুপ করে থাকলাম কিছু সময়। শেষে বললাম, 'আমার মনে হয়, পরিমলকে কোন ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে না। ও তার কোন সুযোগ রেখে যায়নি।'

আমার একথার পর, সবাই আমরা কি ভাবছি জানি না, তবে চারজনেই শুধু হাঁটছি। বাঁধের রাস্তার এখানটা পরিষ্কার। বিশ্বপতি টর্চ জ্বালছে না। মণিমোহনের লাঠির শব্দ নেই! সদানন্দর কাশি বন্ধ। শুধু আমার হাতের হ্যারিকেনটা রাস্তার ওপর একতাল অন্ধকার ছায়ার সঙ্গে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। মাটির ওপর হ্যারিকেনের ছায়াটা মহাভারতের সেই রহস্যময় কুকুরটার মত। সন্ধে উত্তীর্ণ হলেও শীতের চাপ অনেক বেশী। হিমেল হাওয়ার কঠিন দাঁত অনেক প্রখর, নির্মম!

আমি এবার থমকে দাঁড়ালাম। আমার দেখাদেখি ওরাও পাশে-পিছনে থেমে গেল। আমি বাঁধের দিকে ঘুরে-আসা দূরে নদীর দিকে দৃষ্টি রাখলাম। বাঁধের গা থেকে সরু একটা মাটির রাস্তা নদীর দিকে চলে গেছে। রাস্তায় খানিকটা জায়গা যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত করা। এখন নদীর ঢেউয়ের শব্দ অনেক স্পষ্ট।

আমি বিষণ্ণ শ্বাস ফেলে বললাম, 'পরিমলকে এই শ্মশানে পুড়িয়েছি; ওই ওপাশে কোণে।' কখন যেন বাঁ হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে নিয়েছি। ডান হাত দিয়ে ভারী অন্ধকারের নীচে মাটির দিকে একটা কোণ চিহ্নিত করতে চাইলাম। ওরা সকলে নীরব। যেন এক ঘোরেই বলি, 'মহকুমা শহরের হাসপাতালে পরিমলের পোষ্টমর্টেম হয়। তারপর গ্রামের সমবয়সীরা মিলে ওখানে দাহ করেছিলাম।'

বিশ্বপতি এবার টর্চ জ্বালল। ও বুঝি কাছকাছি কোনো দূরত্ব ভেবে পরিমলের অন্তর্জলীর সঠিক জায়গাটা বুঝতে চাইছে। মনিমোহন হাতের লাঠি শূন্যে কয়েকবার নাড়ল। কিছুটা কুয়াশা সরাতে চায়। দেখতে চায় কোথায় সেই পরিমলের শেষকৃত্যের নিশানা। সদানন্দ চোখের চশমা সরিয়ে হাতে নিল। আমি ডান হাত নামিয়ে নিথর ওদিকে তাকিয়ে আছি।

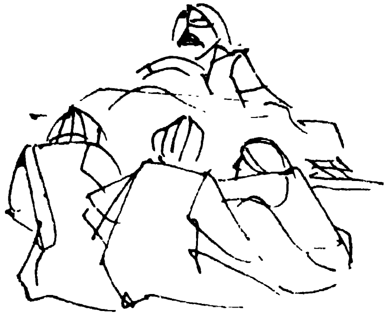
সামনের বিশাল শ্মশান নদীর ধারেই। বহুবার বন্যায় ধুয়ে-মুছে গেছে। তবু কয়েকটা দাহ করার নিশানা এখানে-ওখানে পড়ে। পোড়া মাটি আর ঘাসের ওপর একতাল পাণ্ডুর জ্যোৎস্না-মেশানো কুয়াশা বিশ্বপতির টর্চের আলোয় ধরা। আধপোড়া গুঁড়ি কাঠ, কালো পোড়া ঘাসের চিহ্ন। কোনটায় ভাঙা কলসী জলে ভারী, কোনটায় নতুন শূন্য কলসী উপুড় করা। কেউ বুঝি অন্তর্জলীর সময় মৃতের বিছানাপত্তর, খাট, আধপোড়া ফুলের তোড়া ফেলে রেখে গেছে। সামনেই একজোড়া বহুদিনের পথ-হাঁটা পুরনো জুতো উপুড় করা। হিমেল হাওয়া ঈষৎ জোরে এখানে-ওখানে দাঁত বসাচ্ছে বার বার। দূরে নদী ছাড়িয়ে ওপারে বিশাল অন্ধকার।

পরিমলকে ঠিক কোথায় দাহ করা হয়েছিল এখন মনে থাকার কথা নয়। তবু টর্চের আলোর রেখা ধরে আমরা সকলেই কখন যেন একটা জায়গায় স্থির, অন্যমনস্ক!

কিছুদিন আগের এক মহাভারত পাঠের আসরের কথা মনে পড়ে যায়! কি একটা যেন ব্যাখ্যা করেছিলাম? ভীম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন রাজা জনকের কয়েকটি প্রশ্ন-প্রসঙ্গ, আর মহাত্মা পরাশরের তারই উত্তর। মানুষ হয় বুদ্ধিমান, আবার অবোধ মূঢ়ও। প্রথমজন বিষয়ে থেকেও নিরাসক্ত, আর দ্বিতীয়রা বিষয় মাত্রেই একান্ত আসক্তিতে চরম সুখী! কেন হঠাৎ এমন কথা মনে পড়ে? কেন? কেন? গভীর চাপা রোমাঞ্চকর অস্থিরতায় আমার ভিতরটা ভয়ংকর কেঁপে ওঠে।

আচমকা সদ্য-মড়া-পোড়ানো এক তীব্র ঘ্রাণ নাকে এল। শ্বাসরুদ্ধ আমরা বুঝি ভিতরে অসম্ভব চমকে উঠেছি। প্রত্যেকের মুখ এক পলক দেখলাম।

এক নিশুত চরাচর। এমন নদীর রুপোলি রেখায় আঁকা অসীম রাত। অন্ধকার দিগন্ত থেকে ওপরে তারা-সাজানো বরফের মত কঠিন আকাশ! কোন্ এক রহস্যময় শিহরণ নিবিড় নীলিমা থেকে মাটির স্পর্শ ধরে আমাদের মধ্যে বয়ে গেল। আমরা যেনবা অসহায় দাঁড়িয়ে। আমরা চারবন্ধু এক মৃতের আত্মার শান্তি কামনায় এমন স্থির! আমরা চারজন—ঘোর সংসারী, প্রৌঢ়-শেষের ক্লান্ত অবসন্ন বিষয়ী মানুষ।



ময়না তদন্ত

রহস্যময় ঘন কুয়াশা-জড়ানো পিরামিডের মতন অন্ধকার চারপাশে। আমরা চারবন্ধু তারই মধ্যে রুদ্ধশ্বাস বসে আছি।

মৃত তনিমা পোস্টমর্টেমে কাটা-ছেঁড়া শরীর নিয়ে দূরে মাটির ওপর শুয়ে। সামনের মর্গ থেকে পড়ন্ত শীতের বিকেলে বের করে রেখে গেছে ডোমেরা। মাটির ওপর তনিমার বাড়ি থেকে কিনে-দেওয়া তালপাতার নতুন চাটাই। তার ওপর সাদা কাপড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখা তনিমার শব।

আমরা শবদেহ থেকে সামান্য দূরে বসে আছি নিশ্চুপ। আমরা চারজন—আমি, গগন, অশোক, প্রণব। আমরা তনিমার ঘনিষ্ঠ, তানমার এই পঁচিশ বছরের জীবনের বিভিন্ন সময়ের, অবস্থার, মনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

কিন্তু আমরা কেউই জানি না, কেন তনিমা কাল অফিস থেকে ফেরার পর রাতের অন্ধকারে এমন কাজ করল। কোনদিন যা হয়নি, তনিমা কাল তা-ই করে—অফিস থেকে ফেরেও রাত করে, আত্মহত্যা করে ভোর-রাতে। কিছু সময় আগে-পরে আ.রা চারজনেই খবর পাই আজ দুপুরে। খবর দেয় তনিমার বছর বারো বয়সের ছোট ভাই টোটন। ও প্রথম খবর দেয় আমাকে। আমি গগন-অশোক-প্রণবদের নিয়ে যখন আসি, তখন তনিমার শব মর্গের টেবিলে।

সেই থেকে এখানে, এই ঠাণ্ডা মাটির শীতল ঘাসের ওপর স্থির বসে আমরা চারজন। আমরা বসে আছি টোটনদেব ফিরে আসার অপেক্ষায়। টোটনের এক দূর সম্পর্কের কাকা ওর খুড়তুতো দাদা আর টোটনকে সঙ্গে নিয়ে একটু আগে নেয়ারের খাট, কিছু ফুল, অন্তর্জলীর সঙ্গে জড়িত কিছু জিনিসপত্তর কিনতে গেছেন। আমরাই যেতে চেয়েছিলুম, কাকা আপত্তি করেন। তনিমার শবদেহ

পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়ে আমাদের আগ্রহকে থামিয়ে দেন। আমরাও বোধ হয় চাইছিলুম আজ এই মুহূর্তে মৃত তনিমার কাছে চারজনে একসঙ্গে কিছু সময় নিঃসঙ্গ হতে!

একটু আগেও আজকের বিকেলের রোদ ছিল শ্মশানের নিভে-যাওয়া চিতার আগুনের মতন। তনিমার শবের ওপর রোদের আভা শেষ প্রীতির উপহারটুকুর মতন স্থির ছিল অল্প সময়। হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে পোড়া ইট-রঙের দেয়াল-ঘেরা মর্গ। মর্গের ঘরটা একটু উঁচুতে, সিমেন্টের সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ছাড়িয়ে পৌঁছতে হয়। মর্গের বাইরে চতুর্দিক ঘিরে ছোটবড় গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়। পড়ন্ত রোদের আলো তনিমার শব ছুঁয়ে আর সেইসব বুনো গাছ-গাছালির শরীর বেয়ে আকাশে মিলিয়ে গেছে। আমি সেই মিলিয়ে-যাওয়া কালো নিঃসীমলোকের দিকে চকিতে একবার তাকাই। কে যেন জোর করে আমার বুকের ভেতর থেকে ভারি একদলা শ্বাস টেনে বের করে দিল। আমি অল্প নড়েচড়ে বসলুম।

আমার সামনে গগন দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে স্থির। অশোক প্রথম আমার কাছ থেকে খবরটা শুনেই মুখ কালি করে ফেলেছিল। এখানে আসার পর থেকে একটি কথাও এখনো বলেনি। শুধু তনিমার শব ডোমেরা ধরাধরি করে ওখানে শুইয়ে রেখে যাবার পর একবার বলেছিল, 'তমার এভাবে মরার কোন মানেই হয় না।' নিছক স্বগতোক্তি। পরমুহূর্তে মাথার ঘন চুল ডান হাতের মুঠোয় খামচে ধরে বারকয়েক মাথায় ঝাঁকানি দিয়েছিল। এখন তনিমার শবদেহের দিকে স্থির-চোখ। হাতের সিগারেটটার অর্ধেকটা অব্যবহারে পুড়ে ছাই।

প্রণবকে দেখেই বোঝা যায়, ভিতরে বেশ অস্থির। একবার দূরে ঘন ঝোপের দিকে তাকায়, পরমুহূর্তে তনিমার শায়িত আবৃত শরীর দেখে। একটু পরেই দৃষ্টি সরিয়ে হাতের আঙুল দিয়ে মাটির নরম ঘাসের মধ্যে বিলি কাটে। কখনো বা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে ভিজে মাটির ওপর ছোট-ছোট গর্ত করার খেলায় অন্য-মনস্ক থাকে। প্রণব চেইন স্মোকার। সামনেই গগনের ফেলে-রাখা সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই পড়ে আছে। সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। মৃত তনিমার প্রতি শ্রদ্ধায় কি সিগারেট খাচ্ছে না?

শীতের সন্ধের অন্ধকার এভাবেই নামে—চাপ-চাপ হয়ে এক-একটা দমকে। এই মুহূর্তে আর-এক দমকে চারপাশের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে গেল। মফঃস্বল

শহর। এদিকটা এমনিতেই নির্জন। দূরে বড় রাস্তায় লোকচলাচল কম। মাঝে মাঝে কখনো খালি, কখনো বা যাত্রীর ভার-টানা সাইকেল রিক্‌শার শব্দ পরিবেশ সচকিত করে মিলিয়ে যায়। তার পরমুহূর্তেই অনড অন্ধকার যেন আরও বেশি করে আমাদের বুকে চেপে বসে। আমরা যেখানে বসে আছি, মর্গের গায়ে লাগানো লাইট-পোস্টের আলো সেখানে স্পষ্ট হয়ে আসে না এতদূর। আবার দূরের মেন রাস্তার আলোও আমাদের কাছে এসে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সহজেই। আমরা চারজন তনিমার শবদেহের সান্নিধ্যে থেকে এই অন্ধকার কুয়াশা-মেশানো পরিবেশে আমাদের ভিতরের গভীর ভয়, অস্বস্তি, শোক, বিষাদ কিছুই সরাতে পারছি না।

এমন আড়ষ্টভাব কাটাতেই যেন প্রণব বলল, 'টোটনরা এত আসতে দেরি করছে! ভালো লাগছে না।'

'ওরা এমনিতেই দেরী করে গেছে। ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে ডেড-বডি বের করে রেখে যেতেই তো দেরি হল না!' গগন যেন মনে করিয়ে দিল বেশি কথা বলে।

অশোক বড় করে শ্বাস ফেলল। হাতের আধপোড়া সিগারেটটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কিছুটা বিড়বিড় করার মতন বলল, 'হুঁ, তমার মৃত্যুর সার্টিফিকেট! জীবনের সার্টিফিকেটের সঙ্গে ও যদি এসময় একবার মিলিয়ে দেখে যেত!' অশোক শবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গগন দৃষ্টি রাখল অশোকের ওপর। 'জীবনের প্রশংসাপত্র তুই দিবি, না দিয়েছিলি?' স্বরে বিষণ্ণ শান্ত শ্লেষ জড়ানো।

'আমি একা কেন, আমরা সকলেই তমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছি। তাই না?' অশোক গগনের চোখে চোখ রাখল।

'দিলেই বা কী? তাতে তো তনিমাকে বাঁচানো গেল না!' প্রণবের স্বর ভারী। বুঝি ওর কোনো এক দুর্জ্ঞেয় চাপা কঠিন অভিমান তনিমার রহস্যময় আত্মহননকে অভিযুক্ত করতে চায়। 'তুই কী বলিস সুহাস?' এতক্ষণ পরে পড়ে-থাকা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল। সিগারেট বের করতে করতে আমাকে জিজ্ঞেস করল প্রণব।

আমি ওদের কথা মন দিয়ে শুনছিলুম। নিরাসক্তের মতন বললুম, 'বাঁচাবে কে? ও তো বাঁচতেই চায়নি!'

গগন খুব আস্তে হাঁটু-মোড়া পা দুটো ছড়িয়ে টান-টান করে বসল। আমার

কথার জের টেনে বুঝিবা প্রতিবাদ করল। 'ভুল কথা সুহাস। কাল সন্ধেয় অফিস থেকে ফেরার পথে স্টেশনের বাইরে তনুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হঠাৎ।'

আমরা তিনজন ওর দিকে তাকালুম। তিনজনের চোখেই ঈষৎ বিস্ময়। অশোক বলল, 'কই, পুলিশের সামনে সে কথা তো তুলিস নি!'

গগন ম্লান হাসল। ঘাসের ওপর ফেলে-রাখা ওর নিজেরই প্যাকেট থেকে একটা বের করে সিগারেট ধরাল। কিছু যেন গুছিয়ে নিচ্ছে মনের মধ্যে। মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দেখা হওয়াটা যেমন হঠাৎ, তেমন ব্যক্তিগত। দরকার মনে হয়নি বলার, তাই। তা ছাড়া, এতে তনুর মরার ব্যাপারটার কোন কিনারাই হত না।' গগন মাটির দিকে মুখ নামিয়ে আরও কিছু বুঝি ভাবতে চাইছে। ওর হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার সুতো জট পাকাতে পাকাতে ওর চারপাশে ছড়িয়ে গেল।

আমরা চারজনেই চুপ। গগনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সূত্র ধরে আমরা প্রত্যেকেই জানতে চাইছি তনিমার সেই শেষের কথা কী? গগনকে কাল সন্ধেয় তনিমা কী বলেছিল?

প্রণব হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল দূরে। গগনকে প্রশ্ন করল, 'গগন, আমার মনে হয় তুই কিছুটা বলতে পারবি তনিমা সম্পর্কে।'

গগন মাথা নাড়ল। 'কী আর বলব?' থেমে থাকল কয়েক মুহূর্ত। অন্ধকারের মধ্যেই অকারণে হাতঘড়ি দেখল। 'ও আগে যা ছিল তা-ই আছে। স্বভাবে তেমনি ঝকঝকে, আবার কথাবার্তায় চাপা। একটা দূরত্ব যে সে সব সময়েই বজায় রেখে চলত, তোরা তো তা জানিস!'

আমি এই মুহূর্তে গগনের কথাটায় একটা সহজ মাত্রা যোগ করার জন্যে উৎসুক। বললুম, 'দ্যাখ গগন, সে দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারটা তো তার গোড়া থেকেই ছিল স্বভাবে। তা ওর কঠিন ব্যক্তিত্বের মধ্যেই থাকত। ওটা ওর ইন্‌বর্ন্‌।'

চিবুক তুলে অশোক এতক্ষণ উদাস হয়ে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। যেন গগন আর আমার কথার সমর্থনে অন্যমনে মাথাটা অল্প কাঁপাল।

আমার কথার উত্তর দেওয়ার জন্যেই বুঝি গগন আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। দু'চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন, অন্যমনস্ক। মানুষের ধূসর স্মৃতির মধ্যে যে সামান্য কটা তারা বেশী করে জ্বলে, ও যেন তাদেরই ধরতে চাইছে। হঠাৎ বলল, 'তুই ঠিক বলেছিস সুহাস। দেখেছি, তনুর স্বভাবটা

ছেলেবেলা থেকেই ছিল বেয়াড়া ধরনের। তোরা বুঝি তাকেই বলিস ব্যক্তিত্ব!'

আমরা কেউ কোন কথা বলতে চাইছি না যেন এখনি। গগন বলুক, আমরা শুনতে চাই। অনেকদিন পরে কালই সন্ধেয় তনিমার সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছে ওর।

বেশ কিছু সময় গগন কোন কথা বলছে না দেখে প্রণব বলল, 'গগন, দেখেছি, তুই কোনদিনই তনিমার স্বভাবটা ভাল চোখে দেখতিস না! আজ আবার সেই পুরনো কথা তুলে লাভ কী?' প্রণবের স্বরে কোথাও বুঝি মৃত তনিমার প্রতি সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা জড়িয়ে যায়।

গগন নড়েচড়ে বসে। মনে হয়, ওর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা তৈরী হয়েছে। 'আমার সঙ্গে যখন তনুর আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব—তখন তোরা কেউ ওকে চিনতিস না। তনুরা তখন আমাদের পাশের বাড়ির ভাড়াটে। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে ওরা, আমার পক্ষেও তনুকে জানা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তনু তখন ক্লাশ টেনে-এ পড়ে। আমার বাবার বদলির চাকরি ছিল, তাই আমার তিন বছর নষ্ট হওয়ায় আমাকে ও ধরে ফেলেছে।' গগন হঠাৎ থেমে থাকল কিছুক্ষণ।

'কলেজে এসে তমা তোর কথা বলেছিল প্রথম।' অশোক যেন খেই ধরিয়ে দিতে চাইল।

'স্কুল আর কলেজে মিলিয়ে তনুর সঙ্গে ছ'বছরের সম্পর্ক আমার। তার মধ্যেই দেখেছি তনুর অসম্ভব তেজ। কারোর কোন অন্যায় কথা, কাজ সহ্য করতে পারত না। তোদের মনে পড়ে কিনা জানি না, আমার সঙ্গে তনুর নাম জড়িয়ে একদিন কলেজের দেয়ালে কে কি যেন লিখেছিল। তারপর ও ঠিক তাকে খুঁজে বের করে কী সব বলে! জানি না সে কে! তনুও ভীষণ চাপা, আমায় নাম বলেনি। তবু এটুকু জানি, সে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল তনুর ভয়েই।' কথা শেষ করে গগন আমাদের সকলের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল।

'সে তো অল্প বয়সের কথা!' প্রণব বলল।

'হ্যাঁ, সেই অল্প বয়সেই তনুকে দেখতে যত সুন্দর ছিল, তেমনি চাবুকের মতো ছিল ওর ব্যক্তিত্ব। আমি এত ঘনিষ্ঠ, আমাকেই সে বন্ধুত্বের দায়টুকুর মধ্যে এতটুকুও আমল দেয়নি!' গগন মাটির দিকে তাকাল।

আমরা কোনদিন তনিমার সঙ্গে গগনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন কথা

আভাসে-ইঙ্গিতেও শুনিনি! এই মুহূর্তে একটা চাপা কৌতূহল আমাদের ভিতর তৈরী হয়ে গেল। আমরা তিনজন বিষণ্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করলুম।

আমি বললুম, 'গগন, পরে আমরা সকলেই দেখেছি, তুই তনিমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতিস না!'

গগন আমার এ কথার পর গুম হয়ে বসে রইল কিছু সময়। সামনেই পড়ে-থাকা দেশলাইয়ের নতুন প্যাকেটটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, 'তনু বন্ধুত্ব চেয়েছিল। আমিও খাঁটি বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—' হঠাৎ থেমে গেল গগন। যেন গলায় কিছু এমন আটকে ওর স্বর বন্ধ করে দিল।

গগনকে একেবারে থেমে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করি, 'শেষে কী হল?'

'শেষ পর্যন্ত আমি তা রাখতে পারিনি।' গগনের স্বরে অনুতাপ, হয়তো বা একটু আক্ষেপও। এবারও গগন বেশ কিছু সময় নীরব থাকল।

এরপর আমাদের পক্ষে যে আর কিছু বলা শোভন নয়, আমরা তিনজনই অনুভব করছি। গগনের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। গগন কোনদিন বলেনি। এখন নিজে থেকে না বললে আমাদের গোপন কৌতূহলটুকু নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে হবে।

হঠাৎ গগন বলতে শুরু করল, 'তোরা আমাদের পাড়ার পানুদাকে তো চিনিস। পানুদা, পানুদার বৌ, ছেলে—এরা আমাদের খুবই পরিচিতি। একদিন কী কথায় আমি হাসতে হাসতে তনুকে বললাম, পানুদা তোমায় ভীষণ ভালবাসে। কথাটা, আজ বলতে বাধা নেই, আমি সেদিন আমাদের দুজনের সম্পর্ককে শয়তানের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। বন্ধুত্ব ছাড়িয়ে আমি-তনু একেবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথায় যদি যেতে পারি, হয়তো অন্যভাবে তনুর দিকে একটু এগোনো যাবে—এই লোভ। কিন্তু, তোরা বিশ্বাস কর্, ভাবতেই পারিনি তনু আমার কথাটা এমনভাবে নেবে!' গগনের শ্বাস হঠাৎ দ্রুত হল। আবেগে, দুঃখে, না হতাশায় বোঝা যায় না। গগন কথা বন্ধ করল।

প্রণব সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিভাবে নিল!' প্রণবের স্বরে তীব্র আগ্রহ।

গগন সোজা প্রণবের দিকে তাকাল। অন্ধকারে গগনের ভিজে চোখ জ্বলছে। 'কথাটা বলা মাত্র হঠাৎ কি যে হল তনুর, দু চোখে ভয়ংকর ভয় চেপে বসে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ লাল হয়, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে। একসময়ে বোধ হয় ভয় সরিয়ে ঘৃণায় নীচের ঠোঁট কামড়ে আমার গালে আচমকা

জোরে চড় বসিয়ে দেয়। এত আচমকা যে আমি নির্বাক। ওর দু'চোখ থেকে তখন রাগ ফেটে পড়ছে। থুতনির নীচে ফরসা চামড়ার শিরা নীল। ও থরথর করে কাঁপছে। শেষে কেমন এক অসহায়তার জন্যেই হঠাৎ সে দৌড়ে আমার সামনে থেকে সরে যায়।' গগন চুপ করে গেল।

আমরা অবাক হয়ে গগনকে দেখি। আমরাও যেন গগনের মতো উত্তেজিত। চারপাশ থমথমে। ঝিঁঝিঁর ডাক শুরু হল। আমি চশমাটা দুই ভুরুর মাঝখানে একটু চেপে বসালুম।

গগন বেশ কিছু সময় পার করে বলল, 'এই ঘটনার পর তনুরা আমাদের পাশের বাড়ি থেকে উঠে যায়। আমি কলেজেও তনুর সংসর্গ এড়িয়ে চলি। মনে হত, তনুরও তাই ইচ্ছে।' গগন একটু থেমে বলল, 'পানুদার কথায় তনুর এত রাগের কোন মানেই ছিল না—একথাটা পরে অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথাও মনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে দেখা দিত। তনু বুঝেছিল, পানুদার কথা বলে আমি আমার স্বার্থের পথ খুলতে চাইছি! ও যা ইনটেলিজেন্ট।' অনেকক্ষণের জমা বড় শ্বাস ফেলে গগন শেষ কথাটি বলল, 'আমার স্বার্থ দিয়ে তনুর বন্ধুত্বকে অসম্মান করতে চেয়েছি। ও একা হয়ে গেছে। আর এমন একা হয়ে যাওয়াই ওর জীবনকে কোণঠাসা করে আমাদের থেকে।' গগনের স্বর মৃত তনিমার জন্যে চাপা শোকেই বেশ গাঢ় শোনাল।

অশোক মাথা নীচু করে শুনছিল গগনের কথা। ও গগনের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'তমার সে ঘটনার পর একা হওয়ার কোন প্রসঙ্গই টেকে না। তমা আমার কাছে তখন বন্ধুত্বের আশ্রয় পেয়েছিল।' একটু থেমে বলল, 'তবে, পানুদার কথায় ওর অসহায় একাকিত্ব তখনো আমি জানি, কারণ পানুদাকে আমি খুব ভালো করেই চিনতাম।'

'তোর চেনার কথা নয় অশোক।' গগন ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চাইল।

'সেকেণ্ড ইয়ারে তমা যখন পড়ে, তখনি ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।' অশোক থেমে দ্রুত ওর ভাবনার মুখটা গুছিয়ে নিল। 'সত্যি কথা বলি, তমাকে আমার খুব ভালো লাগত দূর থেকে। আমিই প্রথম যেচে আলাপ করি ওর সঙ্গে, কৌতুক করে 'অন্যতমা' নামে ডেকে। সেই থেকে ও আমার কাছে 'তমা'। তমা কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। অদ্ভুত এক বন্ধুত্বে আমাকে যেন ও একটা নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিল!' গগনের দিকে তাকাল সোজা। 'এখন বুঝেছি, অবশ্যই তোর কাছ থেকে আঘাত পেয়েই সে এমন হয়েছিল।'

প্রণব যেন স্বরে অনেক দূর থেকে কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তখন আমি একটু একটু করে কী সূত্রে যেন জেনেছিলাম, তনিমাকে পানুদা রাস্তাঘাটে বিরক্ত করত।'

'হ্যাঁ ঠিকই। তমাকে পানুদা আর-একটা মেয়েমানুষ করে রাখতে চেয়েছিল।' অশোক থেমে গেল। স্বরের চাপা রাগটা চারপাশে ভেসে থাকল কিছুক্ষণ।

অশোক এমনভাবে 'মেয়েমানুষ' শব্দটা উচ্চারণ করে পানুদার প্রসঙ্গটা বলল, যাতে আমাদেরও খারাপ লাগছে। মৃত তনিমার দিকে কেন যেন আমরা সকলেই একবার করে তাকালুম। আমরা সকলেই ওর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী আজ।

অশোক যেন নিজের মনেই বলছে, 'তোরা তো জানিস, তমার বাবার চাকরি বড়দরের ছিল না। একটা ফুটো নৌকোর মতো সংসার সচ্ছল করতে পানুদাদের মতো মানুষই তো গায়ে-পড়ে এগিয়ে আসবে! কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ইলেক্‌শানের কথা মনে আছে? পানুদা একটা দলের হয়ে বাইরে থেকে কাজ করতে এসেছিল কলেজে, তমাকে ক্যাণ্ডিডেট করে দাঁড় করাতে চেয়েছিল, পারেনি। কিন্তু তারপর—।' অশোক হঠাৎ বেশ কিছু সময় নীরব থাকল।

অস্বস্তির মধ্যে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তারপর কী?'

অশোক আমার দিকে তাকাল। 'তারপর পানুদার মুখোশ খুলে যায়। পানুদা ওদের দলের লীডারকে দিয়ে তমাদের সংসারে কিছু আর্থিক সুবিধে দিতে চেয়েছিল নিজে যেচেই। না, তাও পারেনি, অথচ আমি জানি, তমা তখন পয়সার অভাবে কলেজ ছাড়বেই ঠিক করে ফেলেছিল। ছোট ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়াই তখন বড় হয়েছিল ওর কাছে।' অশোক আকাশের দিকে তাকাল। চিবুক তুলে যেন হিম-কুয়াশা-মাখা বাতাস থেকে শ্বাস টানল। 'আমি শক্ত হাতে তমাকে ধরেছিলাম। তাছাড়া তমাও পানুদাকে জব্দ করতে কসুর করেনি ব্যক্তিত্ব দিয়ে।'

'তবু তোর সঙ্গেও তনু একেবারে অকারণে ভালো ব্যবহার করেনি অশোক, একথা তুই নিজেও পরে বলে দুঃখ করেছিস আমাদের কাছে!' গগন স্পষ্ট করে অশোকের কথার মাঝখানে কথা বলে ওকে সচেতন করল।

'তখন তোদের ভুল বুঝিয়েছি গগন, তোদের কিছু মিথ্যে বলেছি।' একটু থেমে অশোক সোজা হয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইকাঠির আগুনে সামনে মাটির ওপর কিছু শুকনো ঘাসকে পোড়াতে থাকল। আগুন একেবারে নিভে গেলে বলল, 'আসলে আমিই আমার ভদ্র ব্যবহারের সীমায়

নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি ওকে।' গলার স্বর কেমন বিষাদময় রুদ্ধ শোনাল।

আমরা তিনজনে নিশ্চুপ। কাছে কোথাও ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুরু হয়েছে। প্রণব একটা মাটির ছোট ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে তনিমার শবদেহ ছাড়িয়ে দূরে ফেলে দিল।

অশোক উদাস দৃষ্টি দিয়ে তনিমা-শব দেখল। গলা নামিয়ে বলল, 'আজ তোদের বলতে বাধা নেই, তমা বন্ধুত্ব চাইলে কী হবে, আমি ওর প্রেমই চেয়েছিলাম! প্রেম, আর তারই লোভনীয় নির্ভরতা। বিশ্বাস কর্, ও প্রথম প্রথম পানুদার কথা হেসে হেসে গল্প করত, শেষে নানান ধরনের ব্যবহারের কথা যত বলত, ততই আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠতাম! পানুদা তমাকে জানোয়ারের মতো চাইত, আর তমার কাছে বন্ধুত্ব শুধু নয়, তারও বেশি—মন্দিরের পবিত্র বেদীর মতো প্রেমে ওকে আমি মনে মনে চাইতাম।' একটু থেমে ঢোক গিলল অশোক। সিগারেট-ধরা হাত স্থির। 'তোদের ঠিক মনে পড়ে কিনা জানি না, এমন একটা বিষয় নিয়ে আমি কলেজ ম্যাগাজিনে একটা কবিতাও লিখেছিলাম। তমা বুঝেছিল কবিতার অর্থ। কিছু বলেনি। কিন্তু কবিতাটা লেখার পর কবে যেন তমার একেবারে কাছের হয়ে গেলাম, নিজের মতো করে মনে মনে। হয়তো তমার সেই কিছু-না-বলাটাই ছিল আমার সাহস!' এত কথার মধ্যে অশোকের কণ্ঠস্বরের চাপা আক্ষেপ বুঝিবা একসময়ে তনিমার শবদেহ ছুঁয়ে চারপাশে একটা পাতলা আবরণ রচনা করেছে কখন।

অশোক অন্ধকারের মধ্যেই আমাদের সকলের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে চাইল। সুদূর হতাশায় বলল, 'বিশ্বাস কর্, তমাকে একদিন মরিয়া হয়ে কথাটা বলেছিলাম, একটা স্থির উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিলাম। বলার একমাস পরেই ওর বাবা মারা যান হঠাৎ এরপর আর কোন কথা বলা সম্ভব ছিল না। তবু আমার মনে হত, তমাকে আমার কাছে আনতে পারলে ওকে বাঁচানো যাবে এই দুর্দিনে। ও ভীষণ অসহায় বোধ করছিল। একদিন একা পেয়ে বললাম, কী ভাবলে? ও বলল, অশোক, আমার সংসার আছে, অসুস্থ মা আছেন, দায়-দায়িত্ব আছে। তুমি সেসবের কাছে একেবারেই মূল্যহীন। ও এমনভাবে সোজাসুজি অস্বীকার করবে ভাবিনি একদিনও। কেমন অপমানিত বোধ করলাম। সেই মুহূর্তে মনে হল, ওর ওপর একটা প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। যা কোনদিন করিনি—' হঠাৎ থেমে গেল অশোক। স্বর কাঁপছে। মনে হল চাপা উত্তেজনায় ও নিজেও

ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। মাথা নীচু করে বলল, 'তমাকে বুকের মধ্যে আচমকা চেপে ধরে সারা মুখে চুমু খেলাম পাগলের মতো। ওর ঠোঁটে রক্তের দাগ বসিয়ে দিলাম। তমার জামার কিছুটা টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উচ্ছিষ্টের মতো ছড়িয়ে দিলাম মেঝেয়। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল এইভাবেই ওকে পেতে হবে।' অশোক কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে, তার যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়—লজ্জায় নয়, অনুতাপে।

কিসের অনুতাপ? আমি, গগন, প্রণব তা বোঝার জন্যে নীরব থেকে অশোককে বাকি কথাগুলি বলার সময় দিই।

অশোক একভাবে বসে থেকে বলে, 'তমার সে সময়ের কথা মনে পড়লে কেন যেন নিজেকে অনেকদিন ধরে অপরাধী ভেবেছি। বুকের মধ্যে নিয়ে থাকার সময় মনে হয়নি, পরে ভেবেছি, তমাকে সে সময়ে মরা, বরফ-দেওয়া মাছের মতো শীতল নিষ্প্রাণ রক্ত-মাংস ছাড়া কিছুই মনে হয় নি। আমি এত হঠাৎ-ই ওকে বুকে নিয়েছিলাম যে ও ওর লজ্জা ঢাকতে পারেনি। তারপর ছিটকে সরে গিয়ে ও যে আক্রোশ চোখে-মুখে ফুটিয়েছিল, তা ভয়ংকর প্রতিবাদেই আমাদের সম্পর্ক শেষ করে দেয়।' একটু থেমে সজল কণ্ঠে বলে, 'আমার কাছ থেকে অপমান নিয়েই তমা সত্যিকারের নিঃসঙ্গ হয়। আমি আমার বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি নষ্ট করে তমাকে অপবিত্র করেছি, এর দুঃখই যে ভয়ংকর তার কাছে!' অশোক যেন অনেকদিনের পুরনো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেল।

অশোক কি কাঁদছে? যে কান্নায় দু'চোখ সিক্ত হয় না, কেবল ভিতরটাকে আগুনের তাপে একটানা পুড়িয়ে যায়, অশোক কি তেমনভাবে পুড়ছে? আমরা বাকি তিনজন কেউই এই মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারছি না! কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, আমরা তনিমাকে ভুল বুঝেই তার প্রতি অন্যায় করে গেছি পরোক্ষে। তাকে এক বিশাল নির্জন বাড়ির একটি অন্ধকার ঘরের কোণে জোর করে ঠেলে বসিয়ে দিয়েছি।

অশোক হঠাৎ নীচু মাথা উঁচু করল। বুকচাপা কষ্ট থেকে মুক্তির জন্যেই বুঝিবা উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকাল। যেন তনিমার প্রতি নিজের কিছু অন্যায় দুর্বোধ্য আচরণের ওপর শান্তির জল নেওয়ার আশায় আকাশের বুক থেকে নিঃশব্দে কঠিন শীতল হিমের গুঁড়োর স্বাদ সংগ্রহ করতে চাইছে।

আমার দিকে তাকাল প্রণব। পরমুহূর্তে গগনের দিকে। গগন কেমন

নির্লিপ্তের মতন বসে আছে। অশোক পরিপূর্ণ শ্বাস নেবার পর আকাশের দিক থেকে চোখ সরাতেই প্রণবের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

প্রণব বলল, 'তনিমার বাবা যখন মারা যান, তখন তনিমা বি. এ. ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিতে তৈরি হচ্ছে। তাই না অশোক?'

অশোক ঘাড় নাড়ল। 'আমি সরে আসার পর, প্রণব, তুই ওদের বাড়ী বেশি যেতিস!'

আমি আর গগন একই সঙ্গে প্রণবের দিকে তাকালুম, কারণ সে কথা প্রণব শুধু অশোককে নয়, আমাদেরও নানাপ্রসঙ্গে গল্প করেছে আগে। পুরনো প্রসঙ্গ।

প্রণব হাতের একটু আগের ধরানো সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে দিল। নিজের পকেট থেকে সিগারেট বের করল। নিঃশব্দে ধরাল। বেশ কয়েকটা ধোঁয়ার রিঙ ছুঁড়ল। সামনে তাকিয়ে থেকে বলল, 'গেলে কী হবে, তনিমা আমাকে এড়িয়ে চলত।'

'কেন? তোর সঙ্গে তো কোন ঝগড়া হয়নি! হওয়ার স্কোপও কম ছিল!' আমি বললুম। 'বরং তনিমার বাবা মারা যাবার পর তোদের পাড়ায় সস্তার ঘর দেখে উঠে গেলে আমায় বলেছিল, প্রণব কাছাকাছি থাকায় আমার সুবিধে হয়েছে সুহাস, আপদে-বিপদে—!'

'ওটা বাইরের কথা।' প্রণব হঠাৎ আমার কথাটা বন্ধ করতে চাইল। 'আপদ-বিপদের কথা ভেবেই ওদের বাড়ি প্রতিদিন যেতাম আমি। ওর মাকে মাসিমা বলতাম। বাবা পরিতোষবাবু মারা যাবার পর থেকেই ওদের সংসার প্রায় ভাসতে থাকে। তনিমা বড় মেয়ে। তারপর তিনটি ছোট ছোট ভাই-বোন। মাসিমার ছিল অম্বলের অসুখ, তা ছাড়াও জরায়ুর এক জটিল রোগ। সবসময়েই বিছানায়। তনিমাকেই সব করতে হত। এসব আমি যেভাবে লক্ষ্য করেছি, তোদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। বি. এ. পাশ করে বাবার অফিসে চাকরিতে ঢোকার পর সংসার আর তনিমা—দুয়ের অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে।' একটানা কিছু বলে প্রণব থামল। এমনভাবে থামল, যেন তার পর কী বলতে হবে ও ভেবে পাচ্ছে না বলেই প্রণবের এমন থেমে-যাওয়া।

'চাকরি পেলে তো সংসারের অবস্থা ভালো হওয়ারই কথা!' গগনের কথা যেন প্রণবের শেষতম কথার প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

প্রণব গগনকে দেখল। প্রণবের ঠোঁটের কোণে সামান্য শ্লেষের হাসি দেখা

দিয়ে মিলিয়ে গেল। 'যাত্রীভারী নৌকোর তলায় বড় ফুটো হলে কতক্ষণ বা ভাসবে, যতই ওপর থেকে জল তুলে ফেলতে থাক। তনিমার বাবার তোলা এতদিনের ঘড়ার জলও তখন শেষ। তনিমার সামান্য চাকরির মাইনে—!' থেমে বড় করে শ্বাস ফেলল প্রণব। হঠাৎই চুপ করে গেল। প্রণবের বলার ভঙ্গি এমন, যেন এখনই আর কোন কথা বলতে ও অনিচ্ছুক।

আর কোন কথা বলছে না দেখে আমি অন্য এক প্রসঙ্গ তুললুম। 'তনিমার তো মা ছাড়া কাকাও অভিভাবক তখন!'

প্রণব সবেগে ঘাড় নাড়ল। 'না, কেউ ছিল না তখন ওর চারপাশে। আর, কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকলে একটা ভাসা সংসারে আরও অনেক জট পাকায়।'

'তা ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলুম আমি।

যেন উৎসাহিত হল প্রণব। বলল, 'অন্য জট যাতে না পাকাতে পারে, তার জন্যেই আমি সে সময় ওদের সংসারে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। নানা ব্যাপারে যেমন তনিমাকে যুক্তি, সাহস যোগাতাম, তেমনি ভয়ংকর অর্থের অভাবের দিনে তা-ও দিতাম। তোরা তো জানিস, আমার নিজের কোনদিনই টাকার অভাব নেই। মাসিমার জটিল অসুখে তনিমার সব টাকা খরচ হয়ে যেত, আমি নিজে জোর করে সাহায্য করতাম।'

'তনিমা কি তা নিত? আমার বিশ্বাস হয় না।' অশোকের স্বরের দৃঢ়তা যেন তনিমা সম্পর্কে তার পুরনো বিশ্বাসের আশ্রয়।

'না, কিছুতেই নিতে চাইত না, আমি গোপনে নানাভাবে দিতাম। তনিমার কোনক্রমেই তা বোঝার কথা নয়। কিন্তু এরকম করতে করতে যেদিন বুঝতে পারল—' প্রণব একমুহূর্ত থামল, 'মানে যেদিন আমি ধরা পড়ে গেলাম, সেদিন—' প্রণবের কথা যেন আটকে গেল। বড় করে শ্বাস ফেলল। যেন এমন শ্বাস তার সমস্ত কথার শেষ যতিচিহ্ন। আর কিছু বলায় কোথাও বুঝি তার ভিতরে তীব্র বাধা আছে।

আমাদের চারপাশের নীরবতার মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা একটানা ডেকে চলেছে। তনিমার শব, এমন নীরবতার মধ্যে গভীর অস্বস্তি, ভয়, বিষাদ, দুঃখ যেন আমাদের সকলের মধ্যে চেপে বসায়। এক অলৌকিক পাপবোধ আমাদের নিজেদের ছায়ার মতন আমাদেরই মনের গভীরে লেগে থাকতে চায়। মৃতের কাছে কিছু গোপন করা বুঝি পাপ। সমস্ত অকপটে স্বীকার করার কথাই বুঝি

পুণ্যস্নানের মতন! আরও সেই গোপন বিষয় যদি মৃতের সঙ্গেই সম্পর্কিত হয়!

আমার নিজের মধ্যে একটা অন্যায়বোধ মাথা তুলছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করছি। আড়ষ্ট পরিবেশ কাটাতেই আমরা প্রণবের দিকে তাকালুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'সেদিন কী হল?' আমার কথাটা অন্যমনস্ক প্রণবকে ধরে আচমকা টান দেওয়ার মতন।

সত্যিই প্রণব নিজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতন বলল, 'সেদিন তনিমা আমায় যা কিছু বলেছিল, সব সেদিন মেনে নিয়েছি। মেনে নেয়ার পর বুঝেছি, তনিমার সংসারের দায়িত্ব নয়, উপকার করার কৃতজ্ঞতা-টুকুও আমি তনিমার কাছে চাইনি, চেয়েছিলাম সত্যিই তনিমাকে রক্ষিতা করে রাখতে, সেই অবস্থায় আমার কাছে নিয়ে আসতে।'

গগন, অশোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে প্রণবের দিকে। আমি ভিতরে অজানা ভয়ে কেন যেন ভীত। গগন-অশোকের বিস্ময়ের কারণ, ওরা ভেবেই পায় না কোন্ সাহসে তনিমার মতন মেয়েকে প্রণব রক্ষিতা করে রাখার কথা ভাবে?

আমাদের মুখ-চোখে দৃষ্টি বুলিয়ে অসহায়ের মতন প্রণব বলে, 'বিশ্বাস কর্, তনিমার বাড়ি যখনই যেতাম, মাসিমা তনিমার বিয়ের জন্যে বারবার পাত্র দেখতে বলতেন। আমার কেমন রাগ হত, রাগে দুর্বল হয়ে যেতাম। ভয় হত খুব। একটা চাপা ঈর্ষা আর অধিকারবোধ আমার মধ্যে জটিল হয়ে দেখা দিত। এক-এক সময় অন্য কোন জায়গায় পাত্র দেখার ব্যবস্থা হলে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। তনিমাকে তো এসব কথা বলা যেত না!' প্রণব টেনে শ্বাস ফেলল। 'যেদিন মাসিমার অসুখের জন্যে অনেক টাকা দরকার, সেদিন প্রকাশ্যেই সব দিয়ে আসি তনিমার মায়ের হাতে। তনিমা অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই সোজা আমার বাড়ি চলে আসে। রাগে থরথর করে কাঁপছে তনিমা আমার সামনে। ওর সুন্দর দুটি চোখ অপমানের কাজলে কালি-ধরা যেন! পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে ও হঠাৎই—তুমি কি মনে কর প্রণব, আমি বুঝি না? অনেকদিন ধরে অনেক কিছু করেছ, আজ তার চরম। টাকা দিয়ে আমাদের সংসার, আমার মা—এসব বাঁচাতে চাও? পানুদা প্রকাশ্যে যা চেয়েছিল, তুমি ঘুরিয়ে। ছিঃ! বলেই টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আমার সামনে। যাবার সময় শেষ কথা বলেছিল, 'কৃতজ্ঞতা চাও আমার কাছ থেকে? ভেবে দেখো গোপন নোংরা লোভের কাছে তার কানাকড়িও তোমার প্রাপ্য হয়নি!' তনিমার সে সময়ের

মুখের ভাবে, চেহারায়, স্বরে এমন আত্মমর্যাদাবোধ আমি আর আগে দেখিনি।' প্রণব যেন অনেক ভেঙে পড়েছে! 'তনিমার মা তখন মর-মর। আমার লুকোনো লোভ তনিমাকে ভীষণ আহত করে আমি জানি। সে আমার পাপ। আমার পাপ তনিমার মৃত্যু। ভাবি শুধু, সে অবস্থায় তনিমা তো পাগল হয়ে যেত! তা হলে এমন আত্মহত্যার দরকার পড়ত না!' প্রণবের ডান পা হাঁটু-ভাঙা, বাঁ-পা মাটিতে শোয়ানো। প্রণব উঁচু-করা হাঁটুর ওপর চিবুক চেপে মুখ আড়াল করল।

অশোক-গগন আমাকে দেখছে। দুজনেই আমার কাছে যেন এসবের সিদ্ধান্ত চায়।

অশোক বলল, 'সত্যি, তমার তো তখন পাগল হওয়ার মতন অবস্থা।' গলার স্বর কঠিন।

'তনুর ব্যক্তিত্ব তা হতে দেয়নি।' গগনের স্বরে স্থির নির্ভরতা।

আমি বললুম, 'প্রণবের ধারণাই ঠিক। তনিমার যা অবস্থা তখন, তা সত্যি সত্যি পাগল হওয়ারই মতো। তনিমা তখন সংসার, মা—এসবের ওপর সাহস হারিয়ে ফেলেছে। নিজের ওপরেও তার এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। তাই, গগন, তোর কথাও ঠিক নয় তনিমা ব্যক্তিত্বের জোরে পাগল হতে পারেনি।' আমি যেন দম নেবার জন্যে থামলুম।

গগন, অশোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রণব মুখ তুলে আমাকে দেখল। আমি বললুম, 'তনিমা যে পাড়ায় ছিল, সে পাড়ায় প্রণব থাকত ওদের বাড়ি থেকে একদিকে, আমি আরও একটু দূরে অন্যদিকে। এখন বুঝছি, প্রণব ওর বাড়ি আসত বলেই তনিমা আমাকে এড়িয়ে যেত। প্রণব সরে গেলে তনিমা আমার কাছে আসে। কারণ ওর তখন মাকে বাঁচানো দরকার।' আমি পিঠের মেরুদণ্ড টান-টান করে বসলুম। কিভাবে কথাগুলো বলব গোছাতে না পেরে একটু সময় নীরব থাকি। চোখের চশমার কাঁচ হিমে ঈষৎ ঝাপসা।

'তোর যা অবস্থা সুহাস, তাতে তনিমার মাকে বাঁচাতে কোন ক্ষমতাই তোর থাকার কথা নয়।' গগন বলল।

'অলৌকিক ক্ষমতার কথা তনিমা মানতে আরম্ভ করেছিল। তোরা তো জানিস, বাবার পুরুতগিরির জন্যে আমার বাড়ি নারায়ণশিলা ছিল, রাধা-কৃষ্ণেরও পুজো হত। আমিও পুজো-আচ্চায় বিশ্বাস করতুম। তনিমা মাকে বাঁচানোর শেষ উপায় ঠিক করেছিল এমন পুজো দিয়ে প্রসাদ খাইয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদে।

যত মায়ের শরীর খারাপের দিকে যেতে লাগল ততই ওর বিশ্বাস হতে থাকে ভগবানই একমাত্র ভরসা। তনিমা ক্রমশ পুজো, ধ্যান, জপতপ, মাদুলি-তাগা-তাবিজ, উপোস, হত্যে-দেওয়া—এসবের মধ্যে পাগলের মতো মেতে গিয়েছিল। এসবে আমারই ছিল যুক্তি, আমি ছিলুম সবসময়ের সঙ্গী। প্রণব ঠিকই বলেছে, পাগল সে হয়েছিল। সে পাগলামি ছিল ভগবানের কথা ভেবে জটিল রোগ সারানোর জন্যে এক অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাসের।'

কথা থামিয়ে আমি তনিমার শবদেহের দিকে তাকালুম। গাঢ় অন্ধকারে শবদেহের সাদা আচ্ছাদন ভৌতিক মনে হল। তনিমার ঈশ্বর-বিশ্বাস যে কী ভয়ংকর আগ্রহী করে ওকে, আত্ম-বিশ্বাসে নিষ্কলুষ পবিত্র করে, তা আমি ছাড়া গগন, অশোক, প্রণব—কারোর জানার কথা নয়।

কিন্তু সেখানেও তনিমা ধাক্কা খেয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই আমি ভিতরে কেন যেন চমকে উঠলুম! মাথা নীচু করে নিশ্চুপ বসে রইলুম আরও কিছু সময়।

হঠাৎ গগন বলল, 'সুহাস, তোর কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তো তনুর এমনভাবে মরার কথাই ওঠে না!'

এমন আচমকা গগন কথাটা বলেছে, যাতে অশোক, প্রণব দুজনেই আমার দিকে গগনের কথায় সম্মতিসূচক দৃষ্টি দিয়ে তাকায়। ওদের প্রশ্নও বুঝি একই!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'ঠিকই, যে এত ঈশ্বরবিশ্বাসী, সে তো নিজের সমস্ত অবিশ্বাস ঈশ্বরে সমর্পণ করেই বড় হয়, জীবনের আস্তিক্যে স্থির আশ্রয় নেয়। তোদের বলি, তনিমা শেষ পর্যন্ত আমার যে গুরুদেব, যার কাছে আমি দীক্ষা নিই, তার কাছেও দীক্ষা নেয় মন-প্রাণ দিয়ে। গুরুর নির্দেশে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে। রুদ্রাক্ষ গুনে গুনে প্রতিদিন সে জপও করত।' আমি আবার চুপ করে গেলুম। আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমার কথাগুলির মধ্যে এবার কোথাও বুঝি একটা পাপের ছায়া পড়েছে। হয়তো ওরা তা বুঝতে পারছেনা!

'থামলি কেন সুহাস? বল্!' প্রণবের ভেজা বিষণ্ণ গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল।

'তনিমার সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যায় মায়ের মৃত্যুতে।' এক মুহূর্ত থেমে থাকি। 'তনিমা ঈশ্বরকে বুঝতে চেয়েছিল নিজের অসহায়তা আর মায়ের বাঁচা-মরার সম্পর্ক দিয়ে। মার মৃত্যু তাকে চরম নাস্তিক করে। তনিমার মায়ের মৃত্যু হয় রাতে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ি এসেছিল পাগলের মতো। দু'চোখে

ভয়াবহ অবিশ্বাস। পোষাক অগোছালো, মাথার চুল উশ্‌কো-খুশ্‌কো। নাকের পাটা উত্তেজনায় ফুলছে। আমার সামনেই হাতের তাগা-তাবিজ ছিঁড়ে ফেলে, গলার মালা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একটানা বলে যায়,—সুহাস, তুমিও আমাকে সব মিথ্যে বলেছ, ভুল বুঝিয়েছ। তোমরা সকলে এক। আমাকে তোমরা ঠকিয়ে ধরে রাখতে চাও। তুমি এক ভণ্ড কাপুরুষ। ধর্মের আড়ালে লম্পট তুমি। মাকে বাঁচাবার একটা অজুহাত বানিয়েছিলে মাত্র! এসব বলতে বলতে হঠাৎ থেমে, আমার দিকে এক অদ্ভুত কঠিন স্থির চোখে তাকিয়েছিল। আমি সেই কয়েক মুহূর্ত চোখ সরাতে পারিনি। আর—' আমার শ্বাস দ্রুত হতেই যেন আটকে আসছে বলে থামলুম। ঢোক গিললুম—'আর সেই চোখ আমার সামনেই ক্রমশ করুণ বিষণ্ন হল। কেমন যেন ভেঙে পড়ল। আমার তখনি মনে হয়েছিল, তনিমার চারপাশে কেউ নেই।'

আমি কথা বন্ধ করলুম। আমার বুকের ভিতরটা এক অজানা আশংকায় জমে থাকায় কনকন করছিল। তনিমার সেই সময়ের মুখ ছোটো ছায়া-ছায়া মেঘের মতন বার বার ভেসে-ভেসে সরে যাচ্ছে সামনে থেকে। আমি ভিতরে ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। চারপাশের ঝিঁঝিঁপোকার কান্নাই যেন তীব্র হয়ে আমার সামনে-পিছনে ঢেকে দিচ্ছে। আমার চোখে কি জল? চশমাটা ঠিকমত বসাবার ছলে একবার ডান চোখের কোণে আঙুল ছোঁয়ালুম। আঙুলের প্রান্ত ভিজে গেল মনে হচ্ছে। হয়তো বা আমি মাথা নীচু করে অদূরে শায়িত মৃত তনিমাকে সামান্য শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সবার অগোচরে। প্রণব, অশোক, গগন —কেউ কোন কথা বলছে না। ওরাও বুঝি একই সঙ্গে তনিমার মা আর তনিমা—দুই মৃত্যুর কথা ভেবে আরও গভীর এক অলৌকিক শোকের মধ্যে স্থির!

আমার ভিতরে আর-এক কষ্ট খোঁচা দিচ্ছিল। যেন বিড়বিড় করার মতন বললুম, 'প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল তনিমার সে সময়ের কথাগুলো রাগে, উত্তেজনায়, মায়ের মৃত্যুশোকের জন্যেই বলা, সত্য নয়। কিন্তু পরে নিজেকে চিনেছি। বুঝেছিলুম, আমার সংসার করার বাসনা না থাকলেও তনিমাকে কেন্দ্র করে বহুবার আমি বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আখড়ার কথা কেন মনে করেছি? সেটাই বুঝি আমার পাপ। আমার পাপেই ওর মৃত্যু এমন।' শেষ কথাগুলো জড়িয়ে গেল জিভে।

আমার ভিতরে তনিমার প্রতি গোপন কপট ব্যবহার এবং মিথ্যাচারের গ্লানি ভারি পাথর হয়ে গেল। আমাকে ধীরে ধীরে একা করে এমন ভার। আমি

সেই নিঃসঙ্গতায় একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলুম। মাথা নীচু করে বসে রইলুম আরও কিছু সময়। কারোর দিকে তাকাতে আমার লজ্জা করছে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। হঠাৎ একটা দ্রুতগামী খালি রিকশার শব্দ আমাদের সচকিত করে দূরে মিলিয়ে গেল। এখন সকলেরই বেশ শীত করছে। এই মুহূর্তে আর কেউ কোন কথা বলছে না কেন? যেন শুধু আমার কথাটা নিয়েই মনকে বেশি নিবিষ্ট রাখতে চাইছে ওরা। আমার ভিতরে একটা চাপা অস্বস্তি নড়ে উঠল। আচমকা শব্দ করেই বললুম, 'মা মারা যাবার পর তনিমা সেই যে শেষ দেখা করেছিল, তারপর আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি। ওর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে থাকলেও কিছুতেই রাখতে চায়নি।' একটু থেমে যেন দম নিলুম। 'আমার ব্যবহার তনিমাকে নিঃসঙ্গ করে ভয়ংকরভাবে। তার জন্যে সত্যি আমিও দায়ী।' শেষ কথাটা বলার সময় উত্তপ্ত চাপা কিছু অশ্রুর বিন্দুতে আমার টাকরা জ্বালা করে উঠল।

গগন বলল, 'কাল সন্ধ্যেয় দেখা হওয়ামাত্র তনু এমনভাবে গায়ে পড়ে কথা বলছিল যে তাতেই মনে হয়েছিল, ও যেন কত বদলে গেছে! ভীষণ অস্বাভাবিক ও!' একটু থেমে গগন স্বর গাঢ় করল, 'তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমার সেই খারাপ উদ্দেশ্যকে ও এতদিন বাদে উদারতা দিয়ে ক্ষমা করতে চায়।' গগন তনিমার মৃত শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখে উদাস।

আর কোনো কথা বলছে না গগন। অশোক বড় করে শ্বাস ফেলল। 'তোদের বলিনি, অনেকদিন পর তমা কাল হঠাৎ আমার সঙ্গেও দেখা করেছিল।' একটু থামল, 'শুধু বলেছিল, সব কিছু ভুলে যেও অশোক। আমি কিছু মনে করিনি। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। হয়তো আমাকে সান্ত্বনা বা নিজেকেই যাচাই করা! খুব হাসিখুশি। ওর এত হাসি-খুশি ব্যাপারটা তখন তমার স্বভাবে একেবারে কেন যে বেমানান মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারছি।' অশোক অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

'আমার সঙ্গেও কাল যখন দেখা করে তনিমা, আমি রীতিমত ভয়ে চমকে উঠেছিলাম।' থামল প্রণব, 'আমার সেই অবস্থা বুঝতে পেরেছিল তনিমা। শুধু বলেছিল, প্রণব, কোন মানুষ ভুল করলে শুধরে দিতে যদি না-ও পারে, বেশীদিন সেটা মনে রাখারও কোন মানে হয় না। দেখা আচমকা কলেজের মাঠের কাছে। একটু হাসল ও। চলি, বলেই আমাকে এড়িয়ে চলে গেল। ওর কথা বলার ভঙ্গি, যাওয়াটা এমন বেমানান ছিল যে সত্যি আমার সেই

অন্ধকারে গা ছমছম করেছিল।' থেমে গেল প্রণব। মৃত তনিমার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে প্রণব মর্গের বন্ধ দরজায় দৃষ্টি থামিয়ে দিল।

'আমাকে ব্যঙ্গ করেছিল কিনা বুঝি না, কাল হঠাৎ আমার সঙ্গেও দেখা করেছিল তনিমা। কেন যেন রাত করেই ফিরছিল ও। হঠাৎ অফিস ফেরত ওর বাড়ির পথে যেতে আমার বাড়ির সামনেই দেখা। বলল, পুজো-আচ্চা ভালো করে করো সুহাস। সামান্য একটা মেয়ের কথায় এসব ব্যাপারে গুরুত্ব না দিলেই ভালো। তোমরা পুরুষ তো। এমন আচমকা কথা বলেছিল আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলতে যাব, বলে, চলি রে, রাত হয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে একটা বানানো হাসির রেখা।' আমি হঠাৎ কথা-বলা বন্ধ করলুম। আমার শ্বাস উত্তপ্ত ও দ্রুত। বললুম, 'হঠাৎ এমন নিজে থেকে কেনই বা কথা বলল, আবার ওভাবে হঠাৎ চলেই বা গেল কেন—সেটা সারারাত ভেবেছি। কেন যেন তনিমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল। হাসিটাই আমাকে সারারাত বিরক্ত করেছে। ভেবেছিলুম, একদিন দেখা হলে তনিমার কাছে এর ব্যাখ্যা চাইব।' তলানির মতন পড়ে থাকা একটা কষ্টকর শ্বাসের টুকরো শ্বাসনালীর মধ্যেই জড়িয়ে আমার দু'চোখে চাপা জল এনে দিল।

চাপা শব্দ করে হাসল অশোক। আমার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফেলল তনিমার শবের ওপর।

মফঃস্বল শহরে শীতের সন্ধে। এদিকটায় মর্গ থাকায় সাধারণ মানুষের চলাফেরাও কম। আমরা চারজন ছাড়া কেউ নেই। আমরা হঠাৎ নীরব হয়ে গেছি। অন্ধকার ওপর থেকে নেমে চারপাশ ঘিরে হিমে ভিজিয়ে আমাদের একসঙ্গে তনিমার কাছে ধরে রেখেছে। ঠিক চুম্বকের অমোঘ শক্তির মতন। না হলে এমন করে ওর কথায় ডুবে আছি কেন? দূরে বুঝি টোটনদের রিকশায় আসতে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ গগন বলল, 'তনিমাকে দুঃখ দিয়ে আমরা সকলেই পাপ করেছি।' ফিসফিস স্বর-মাত্র শব্দগুলো। শীতের অন্ধকারের মতো ভারি।

'আমাদের সেই পাপ তনিমাকে নিঃসঙ্গ করে।' আমি বললুম। 'তনিমা তাই মৃত্যুর সময় কাউকে কাছে ডাকেনি, রাখেওনি।' আমি বুঝতে পারছি, আমার কথা বিষণ্ণ স্বগতোক্তির মতন হয়ে গেল।

'আমরা তা হলে বিশ্বাসঘাতক, সুহাস ?' অশোক তাকায়। ওর গোটা প্রশ্নটাই যেন অভিযোগ নয়, আত্ম-অনুশোচনা।

'হয়তো তাই।' আমি অন্যমনস্কের মতন বলি।

'হয়তো কেন ?' গগন প্রতিবাদ করে। 'আমরা প্রত্যেকেই তা-ই।' গগন মাথার চুলের মুঠি জোরে নেড়ে বলে। স্বরে আত্মবিশ্বাস। দৃষ্টি সামনে এগিয়ে-আসা টোটনদের রিকশার ওপর।

কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে তনিমার শবদেহ নেয়ারের খাটে গোছাতে বেশি সময় লাগল না। আমরা নিঃশব্দ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা হাতে হাতে শেষ করে ফেলেছি।

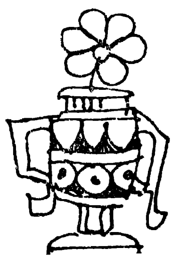
খাট মাটি থেকে কাঁধে তুলতে তুলতে হরিধ্বনি দিলেন তনিমার কাকা আমাদের প্রত্যুত্তরের স্বর দুঃখে, শোকে, বিষণ্ণতায় জড়িয়ে একটা গুমরে-ওঠা কান্নার মতন হয়ে তনিমার শব ছাড়িয়ে ধোঁয়া-কুয়াশা-ঢাকা ওপরে মিলিয়ে গেল। শবদেহ কাঁধে নিয়ে হঠাৎ মনে হল, তনিমার শব অস্বাভাবিক ভারি। মৃত্যুর পর মানুষের শবদেহে ভার আসে বেশি। যতক্ষণ শরীরে জীবন্ত সব বাসনা ক্রিয়া করে, ততক্ষণ সে স্বাধীন, মুক্ত, লঘু। বাসনাশূন্য মৃত শরীরে ভার তো থাকবেই! আমরা চার বন্ধুই তনিমাকে কাঁধে নিয়েছি। কাকাবাবু, টোটন, খুড়তুতো ভাই —ওরা তিনজন শোক-স্তব্ধ শবযাত্রী হয়ে পিছনে হাঁটছে। আমার মনে হল, আমরা তনিমাকে নয়, একটি সচেতন সামাজিক মানুষের জীবনের কিছু বিশ্বাসকে বয়ে নিয়ে চলেছি শ্মশানের দিকে। গগনের কাঁধে তনিমার মিথ্যে বন্ধুত্বের প্রতি অস্বীকারের ভার, অশোকের কাঁধে প্রেমের প্রতিবাদের, প্রণবের কাঁধে কৃতজ্ঞতাকে উপেক্ষার, আমার কাঁধে অলৌকিক অধ্যাত্মবিশ্বাসের প্রতি নির্মল উদাসীনতার ভার। আমার মনে হয়, আমরা চারজনেই শান্ত শীতল হরিধ্বনির শব্দের মধ্যে আত্মগোপন করে সেই ভারের ভিতরকার যন্ত্রণা, জ্বালা, অসহায়তা, হয়তো বা গভীরতম অপরাধবোধ চাপা চোখের জলে মিশিয়ে বুকের গভীরে লালন করে এগিয়ে চলেছি।

নদীর ধারে শ্মশান। ঘন কুয়াশায় নদীর জলের ওপর দুধের সরের মতন আবরণ। শ্মশানে কেউ আমরা কোন কথা বলিনি। তনিমার চিতা কখন সাজানো হয়ে গেছে! মুখে আগুন দিয়েছে তনিমার ভাই টোটন। আমরা চিতার আগুনে আলোকিত হয়ে চিতার মুখোমুখি কাছাকাছি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে বসে গেছি নরম ঘাসের ওপর। তনিমার কাকা, ভাই—ওরা দূরে চুপ

করে বসে। তনিমার শরীর কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তা-ও আমাদের কারোর খেয়াল হয়নি। চিতার কয়েকটি মোটা কাঠের গায়ে পাতলা আগুন বাতাসে চঞ্চল, হালকা পোষাকের মতন বিছিয়ে ছড়িয়ে জ্বলছে। আমরা সকলেই সেই নিভে-আসা আগুনের শিখার দিকে স্থির তাকিয়ে।

এই মুহূর্তে আগুনের রঙ গেরুয়া বস্ত্রের মতন। আমি জানি না গগন, অশোক, প্রণব এই মুহূর্তে কী ভাবছে।

আমার মনে হল, যেন-বা একটা পরিণত জীবনেরই সমস্ত বিশ্বাস, ভার, কাজ, দায়িত্ব স্বেচ্ছায় একেবারে নিজের মতই শেষ করে উপেক্ষায় তনিমা গেরুয়া বসনের মধ্যে আলোকিত হয়ে গেছে সন্তর্পণে!





ফাটল

সামনেটা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যায় প্রভাসের। মনে হয় আর ও ওপরে উঠতে পারবে না।

একমুহূর্ত দাঁড়ায়। চশমা চেপে বসায়। স্পষ্ট দেখতে চেষ্টা করে। কেন এমন হল? অথচ বারান্দার এমন ফ্লোরেসেণ্ট টিউবের আলোয় সিঁড়ির ধাপগুলো ধোয়া-মোছা পরিষ্কার। একটু যেন মাথা থেকে শুরু করে শরীরের নীচের দিকটা টলে যায়। প্রেসার কি বাড়ল আবার? এই বিয়াল্লিশেই বাতের যন্ত্রণা বাহাত্তুরে অভিজ্ঞতার ভার চাপিয়ে দেয়।

প্রভাস সিঁড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে মোজেক-মোড়া রেলিং ধরে ফেলে। কিছুসময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের সিগারেটটা ফেলে দেয়। একটু বোধ হয় হাঁপায়। তবু মন দিয়ে দোতলার ঘরগুলোর কোলাহল শোনে। হাসির শব্দে করুণা ফেটে পড়েছে। টিভি খুলে দু'ছেলে গানের তালে পা মেলাচ্ছে, মেয়ে দুটোর গলায় গানের কথা। বেসুরো লাগে, তবু প্রভাসের অপছন্দ নয়। নতুন বাড়িতে ঢুকতে পেরে সকলেই দারুণ খুশি। প্রভাসও কম তৃপ্ত নয়।

এতক্ষণে দু'চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক প্রভাসের, প্রেসারও বোধ হয় তাই। কিছু সময় দাঁড়ালে বাতের যন্ত্রণার অস্বস্তি আরামে ঢাকা পড়ে যায়। ওপরে উঠবে প্রভাস, আর একবার নীচেটায় চোখ বুলিয়ে নেয়। অনেকদিনের একটা পুরনো অঙ্ক একেবারে মিলে গেছে এখানে। করুণার সঙ্গে দিন-রাত আলোচনা করে অঙ্কটা করেছিল। স্বামী-স্ত্রীর ঘুম ছিল না কত রাত! আর রাতগুলো নির্ঘুম হলেও দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে ওরা সুখ থেকে বঞ্চিত হয় নি। এতদিনে

উত্তরও নির্ভুল ! ওদিকে গ্যারেজ—দামী কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট দেওয়া বড় রাস্তার দিকে মুখ-খোলা দুটি বড় ঘরের মতন। একটা ওষুধের দোকান ভাড়া দেবে, আর একটা মোটা ক্যাপিটালের স্টেশনারী দোকানদারকে। এমন বাড়ির অলংকার হবে দোকান দুটো। করুণারই যুক্তি—ওষুধের দোকান থাকলে ছোট-বড় সবরকম অসুখ-বিসুখে বন্ধুর মতন কাজ দেবে। নীচে আর তিনটে বেডরুম এখনো কিছু কাঠ-কুটো, সিমেণ্ট-বালিতে ঠাসা! ওগুলোর কথা এখন ভাববার দরকার নেই। করুণা মজার কথা বলে। 'জানো, ওগুলো আমার উপযুক্ত শিক্ষিত সুন্দর তিন ছেলে। পাত্রীর জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।'

একদিন ভাড়া দেবে করুণা ওগুলোকে। ভাল মোটা মাইনের ছিমছাম ফ্যামিলি। সেলামী নেবে। যেমন টাকা আসবে, তেমনি সময়ে-অসময়ে তারা কাজও দেবে। ছেলেমেয়েরা বাইরে গেলে, প্রভাস অফিস-ওভারটাইমে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে করুণা একা। কখন কি হয় বলা তো যায় না। করুণার আবার প্রেসার, অম্বল, হাঁফ-ধরার শ্বাসকষ্ট—সব মিলিয়ে একটা জটিল শরীর। মুহূর্তের অন্যমনস্কতার মধ্যে একটা পুরনো চাপা শ্বাস বেরিয়ে আসে প্রভাসের।

দোতলার বারান্দায় উঠে থমকে দাঁড়াতেই ছোটমেয়ে টুম্পা প্রভাসকে দেখতে পায়। দৌড়ে এসে হাত ধরে। 'বাপি, আজ এত দেরী করলে কেন!'

মেয়ের কথায় কান দেয় না প্রভাস। 'তুমি কি পড়তে বসেছ?'

টুম্পা হাত নেড়ে বলে, 'এখন কি পড়ব! দেখবে এসো দাদা কেমন নাচছে।' প্রভাসের হাত ধরে টানে।

প্রভাস ঘরের সামনে আসে। ছেলেমেয়েরা মায়ের শাসন কোনদিনই মানে নি। মা তাদের কাছে একেবারে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মতন। প্রভাস ছেলেমেয়েদের এতটা স্বাধীনতা ভেতরে ভেতরে কোনদিন চায় নি। কিন্তু করুণার ব্যবহার প্রভাসের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সেটুকু শ্রদ্ধা-মেশানো সমীহ করার স্বচ্ছ আবরণটাকে সরিয়ে দেয় অনেকদিন আগেই।

ঘরের লম্বা কোচের এক কোণে করুণা বসে। মেদে ভারী চেহারায় ককিয়ে হাসছে বড় ছেলের নাচ দেখে। প্রভাসকে একবার দেখে। পরমুহূর্তে নৃত্যরত দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'উহ্‌, তোরা নাচ থামাবি না কি বল্ তো? আর হাসতে পারছি না বাবা।'

'বাপি, জানো, আমাদের কলেজের সোশ্যালে এইরকম একটা নাচ দেখে-

ছিলুম। দারুণ, না!' বড় ছেলে বুকুন নাচতে নাচতেই বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রভাস হাসে। টুম্পার হাত ধরে বড় কোচটায় গিয়ে বসে। শরীরে ক্লান্তি। কোচে ঠেস দিয়ে বসে টুম্পার থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়। 'তুমি নাচ দেখ টুম্পা।' আদরের গলায় বলে প্রভাস, 'যাও, দিদির কাছে গিয়ে বসো।'

টুম্পা দিদি শম্পার কাছে চলে আসে। তখনো শম্পা দাদার দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে একটানা গানের কলি গেয়ে চলে।

বুকুনের পরে বুবুন। পিঠোপিঠি দুই ছেলে। বুবুন হাঁপিয়ে গেছে, নাচ থামিয়ে আর একটা ছোট কোচে বসে পায়ে তাল দেয়। ও সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। শম্পা উঠবে ক্লাশ নাইন থেকে টেন-এ। ক্লান্ত চোখে প্রভাস ওদের সকলের ওপর খুশির দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। ধবধবে ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় ওরা মাতালের মতন মেতে থাকে। করুণাও ওদের সঙ্গে সমান তালে ভাসে।

প্রভাস করুণার দিকে তাকায়। কোলাহলের মধ্যেও ডাকে, 'এই শোনো।'

করুণা কথাটা কানে নিল না। হাসিতে ভাসানো জোর গলায় বুকুনকে বলে, 'এই খোকা, এবার থাম।' বুকুন নেচে যায়। 'উহ, তোদের এনার্জি বটে!'

প্রভাস জোরে বলে, 'করুণা, জানো, একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মাথাটা টলে গিয়েছিল। প্রেসারটা বোধ হয়—!'

'থামো তো, পরে শুনব। এরা কেমন খেলছে দেখ না একটু। তুমি কিছু এ্যাপ্রিসিয়েট করতে জানো না। বুড়ো হয়ে গেছ।' শেষের শব্দগুলো গজ-গজ করার মতন বলে। কি কথা মনে পড়ে যায়। 'তুমি পরিতোষ কাকার কাছে গিয়েছিলে! কাকা বলেছেন না, মাঝে মাঝে খোঁজখবর না নিলে ফোনটা তাড়াতাড়ি পাবে না!'

প্রভাসের ক্লান্তিতে দৃষ্টি ঝুলে পড়ে। 'যাইনি। একদিন গেলেই হয়।' স্বরে আলস্য।

করুণা মুখে বিরক্তির ভঙ্গি করে মুখ ফিরিয়ে ওদের গোলমালে ডুবে যায়।

প্রভাস করুণাকে দেখে, ছেলেমেয়েদের ওপর চোখ বোলায়। এত গোলমালে মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে।

শম্পা গান থামায়! 'বাপি, কেমন গাইলুম বল তো?'

বুকুন নাচ বন্ধ করে। কদিন হল নতুন টিভি এসেছে। টিভি খোলা ছিল,

ওরা কেউ দেখছিল না। বাংলা খবরের আগে এক তরুণ গায়কের আধুনিক গানের সময় নব ঘুরিয়ে জোর করে খুলেছিল। সেই সময় থেকে নাচ শুরু করে বুকুন। বাংলা খবরের সময় টিভি বন্ধ না করে সংবাদ পাঠকের স্বর একেবারে কমিয়ে টিভি চালিয়ে রাখে। এই মুহূর্তে খবর শেষ হয়ে কয়েকটা বিজ্ঞাপনের চমক। বুকুন আর একটা কোচে বসে পড়ে। প্রভাসের দিকে তাকায়। নাচ বন্ধ করার পরেও দ্রুত ওর শ্বাস ওঠে-নামে। টিভির বিজ্ঞাপন দেখেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়।

'বাপি, একটা ইংরিজি কাগজে দেখছিলুম, নতুন মডেলের গাড়ি বেরিয়েছে। ওটাই ভাল হবে।'

প্রভাস বুকুনের চোখে চোখ রাখে। 'এখন ওসব থাক বাবা।' একটু কি হাঁপায় প্রভাস? ভাবে নিজেই। বুকে দম নেবার চেষ্টা করে।

'থাকবে কেন!' শম্পা মুখিয়ে ওঠে। 'তুমিই তো বলেছ, নতুন বাড়ি হলে সব হবে!'

'সত্যিই তো!' করুণা যোগ দেয়: 'শুধু টিভি আর ফ্রিজ আর বাথরুমে একটা গীজার বসালেই হল নাকি, আরও কত কি আছে! ঘর সাজাতে হবে না?'

প্রভাস হাসে। চকিতে করুণার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বুকুনের দিকে তাকায়। পরে শম্পার মুখে দৃষ্টি বোলায়। বুকুন, শম্পা মায়ের মতন। একেবারে করুণার মুখ কেটে বসানো। করুণা দেখতে সত্যিই সুন্দরী। বুকুন-শম্পার কথা ভেবে প্রভাস ভিতরে খুশি। বুবুন, টুম্পা অনেকটা প্রভাসের মুখের আদল পেয়েছে। কথাও কম বলে প্রভাসের মতন। ওরা দুজন প্রভাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের কিছু কিছু অংশ ওদেরও মুখে-চোখে একেবারে যে নেই তা বলা যায় না।

প্রভাস ছেলেমেয়েদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে এনে করুণার মুখের ওপর স্থির রাখে। 'টাকা চাই তো! এখনি এত টাকা!'

'থাম তো?' গলার স্বরে আহ্লাদ, আবদারের ভঙ্গি। স্বরে একটু চাপা কঠিন শাসনও ছুঁয়ে থাকে। করুণা মোটা চেহারা নিয়ে সোজা হয়ে বসে। সামান্য চুলের এলানো খোঁপা এঁটে বাঁধে। 'আজ তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। যাও, জামাকাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে এসো, বলছি।'

অন্যদিনের মত প্রভাস করুণার এমন কথায় একটু ঠাট্টা করতে পারত, হালকা

হয়ে যেতে পারত। আজ শরীরটা তেমন জুতসই নয় মনে হচ্ছে। ওদিকে নতুন কেনা গদরেজের আলমারীর আয়নায় বার-কয়েক দৃষ্টি দিয়ে বোঝে, ওর সারা মুখে ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছায়া। করুণা ওসব লক্ষ্যই করে না।

'আমি আসছি। তোমরা বোসো।' প্রভাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দোতলার রান্নাঘরে একেবারে সদ্য-আনা কাজের লোক মলিনাকে দেখতে পায়। এই এক সপ্তাহ আগে গৃহপ্রবেশের দিনই প্রভাস মলিনাকে নিয়ে আসে। করুণার অনেক দিনের বাসনা বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘর চিরকালের জন্যে ছাড়বে। রান্না আর বাড়ির সমস্ত কাজের জন্যে একটা দিনরাতের লোক রাখবে। মলিনাকে পেয়ে করুণা খুব খুশি।

'দাদা, বাথরুমে সব আছে। যান।'

আচম্কা মলিনার স্বরে প্রভাসের অন্যমনস্কতা ধাক্কা খায়। নিজের ঘরে ঢুকে কাপড়জামা ছেড়ে বাথরুমে চলে যায় প্রভাস।

গা ধুয়ে জলখাবার খেয়ে প্রভাস ঘরে ঢোকে। করুণা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একটা রঙচঙে সিনেমা পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি মনস্ক রাখে।

সমস্ত শরীরের, বুক-পিঠের বাড়তি মেদ ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না করুণা কোনদিনই। প্রভাসকে দেখে উঠে বসে। স্বামীর সামনে বুকের কাপড় অনেকদিন আগে থেকেই একেবারে প্রয়োজনহীন হয়ে গেছে করুণার।

'এই দেখ, আমেরিকা থেকে বরুণার চিঠি এসেছে।' খামটা পাশ থেকে নিয়ে সামনে রাখে। 'ওরা সামনের এপ্রিলে আসবে।'

প্রভাস একটু এগিয়ে আসে। ছোট শালীর নীল রঙের এ্যারোগ্রামটা তুলে নেয়। খুলতে খুলতে কোচে বসে। চিঠিখানা সামনে মেলে ধরে।

'আমি বলি কি, ও যখন আসছেই, একটা ইলেক্ট্রিক ওয়াশার আনতে বলি। যে দাম হয়, না হয় আনলে দিয়ে দেব!' প্রভাসের মতামতের কথা জানার তেমন ঔৎসুক্য নেই কথা বলার ধরনে। একটা চাপা সিদ্ধান্ত করুণার স্বরে, বলার ভঙ্গিতে আড়াল থাকে।

প্রভাস চিঠিতে চোখ বুলিয়ে যায়। করুণার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

করুণা চিঠি পড়া না শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

প্রভাস চিঠিটা পাশের টেবিলে রাখে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায়। নিশ্চুপ থেকে কিছু যেন ভাবে।

'কি-গো, আমি কি বললাম, শুনলে না?' করুণা সোজা হয়ে বসে। প্রভাসের মুখচোখ দেখে।

'শুনেছি।' প্রভাস যেন দম নেয়। 'এখন ওসব থাক করুণা। অনেক খরচের ধাক্কা।'

'কিসের খরচ?' করুণার চোখে বিস্ময়। 'বরুণাকে যেটা আনতে বলছি, তার?' নিজের জিজ্ঞাসাতেই চাপা হাসি যোগ করে করুণা। একটা সতর্ক সচেতন কৌশল ওর দু'চোখ চকচকে করে তোলে। 'আরে, আমি এমনি কথার কথা বললাম। বরুণাকে আনতে বলে দি। আনলেও সোমনাথ কি আর দাম নেবে? অনেকদিন পরে দেশে ফিরছে, দিদিকে প্রেজেণ্টেসান!' করুণা ভবিষ্যৎ জয়ের আনন্দে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত করে।

প্রভাস করুণার মুখ-চোখের ভাব লক্ষ্য করে। স্বরের ওঠা-নামায় সেই রামচাঁদ নন্দী লেনের করুণাকে ছুঁয়ে ফেলে। ছেঁড়া ময়লা পোশাকের আড়ালে, সেই একতলার অন্ধকার ঘরগুলোর পরিবেশে এইরকম এক করুণাকে দেখতে পেত প্রভাস। তার কাছে হার মানতে মানতেই তো আজকের এই! সামনে সিগারেটের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় দু'চোখ জ্বালা করতেই প্রভাস মুখ অন্যদিকে ফেরায়।

প্রভাসকে নীরব থাকতে দেখে করুণা খুশি হয়। অন্য প্রসঙ্গ মনে পড়ে। 'হ্যাঁ, আর একটা কথা। দর্জিপাড়ার সেই শান্তবাবু একবার বলেছিলেন না, গাড়ি কিনলে বলবেন। ওঁর গাড়িটা বেচে দেবেন কম দামে।'

প্রভাস করুণার দিকে তাকায় না। বলে, 'সেই গাড়ি কেনার কথাই তো বলছ বার বার, কিন্তু—'

'আহ্। কিন্তু-টিন্তু এখন বাদ দাও।' করুণা সিনেমা পত্রিকাটা কোলে উপুড় করে রাখে। 'শুনলে তো বুকুন কি বলছে! একেবারে নতুন মডেল কিনতে। ওসব সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনতে বারণ করছে।'

'হুঁঃ, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কেনারই পয়সা নেই!' প্রভাস গলায় শ্লেষের শব্দ করে, 'আবার নতুন!'

'হবে হবে। তুমি তো আর অথর্ব হয়ে পড়োনি। তা ছাড়া ঠিক করেছি, খুব তাড়াতাড়ি নীচের ঘরগুলোর একটা ভাড়া দেব!'

প্রভাস সোজা হয়ে বসতে যায়। শিরদাঁড়ায় চাপা যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে। প্রভাস তাকিয়ে থাকে। দু'চোখে বিস্ময়। 'সব ঘরেই তো জিনিসপত্তর ঠাসা!'

'ও একটা ঘর খালি করা যাবে। এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। বুকুনের কলেজের এক বন্ধুর চেনা। ভাল সেলামী দেবে। তার ওপর কিছু টাকা দিলেই গাড়িটা হয়ে যাবে।' সিনেমা পত্রিকার রঙিন প্রচ্ছদে দৃষ্টি রেখে করুণা হাই তুলতে তুলতে বলে, 'জান, বুকুনের দু'তিনজন বন্ধু গাড়ি করে কলেজে আসে।'

'না, না, তা হয় না। এত তাড়াতাড়ি কোরো না। এখনো ছেলেমেয়েদের এডুকেশন্—'

'বুকুন, এই বুকুন!' করুণা গলা তুলে ডাকে। 'একবার তোরা এঘরে আয়!'

চার ছেলেমেয়েই একসঙ্গে ঘরে ঢোকে।

'তোরা বল বাবাকে, আমি বললে তো শুনছে না!' করুণা সোজাসুজি বুকুন আর শম্পার সতর্ক ইশারায় চোখ রাখে, সেই সঙ্গে দু'চোখে খুশি উপচে পড়ে।

শম্পা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বুকুন, বুবুন দামী মোজেকের ঝকঝকে মেঝের ওপর বসে পড়ে। টুম্পা বাবার কাছে চলে আসে। প্রভাস টুম্পাকে কোলের কাছে টেনে নেয়।

'আমি গাড়ি দেখে এসেছি বাবা, রাজভবনের সামনের দোকানে। শোভনরা তো এই নিয়ে পাঁচবার ওদের গাড়ির মডেল বদলাবে। আমরা কিনব জেনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। দারুণ মডেল। আর দেখতে যা নয়!'

বুকুনের মুখে-চোখে-স্বরে নতুন গাড়ি দেখার, কেনার অভিভূত আগ্রহ।

প্রভাস ছেলে-মেয়েদের ঝকঝকে মুখ-চোখ দেখে। করুণার তৃপ্ত, সুখী-চেহারা। কালিপড়া কাচের মধ্যে হ্যারিকেনের দপদপ করা আলোর মতন প্রভাসের সেই রামচাঁদ নন্দী লেনের একতলার তিনখানা ঘরের ছবি আবার মনে পড়ে যায়। করুণা কত খিটখিটে ছিল ওখানে। ছেলেমেয়েরা মড়ার মত ঝিমিয়ে থাকত। দুপুর থেকেই ঘরগুলোয় যেমন আবছা অন্ধকার নামত, ছেলেমেয়েরাও সে রকম হয়ে যেত। এখন ওরা কত সুখী। প্রভাসের ভাল লাগে। নিজেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে জয়ী সৈনিকের মতন মনে হয়, পর মুহূর্তে উদ্যম নিভে আসে। বুকুনের দিকে তাকায়। 'কিন্তু বাবা, এত টাকা পাব কোত্থেকে? আরও খরচ আছে! বাড়িটাই তো শেষ হল না।'

'বাড়ি ঠিক হবে। থাম তো!' করুণার স্বরে সেই আবদার আর শাসনের মিশেল।

শম্পা এবার করুণাকে জড়িয়ে ধরে, কিছু একটা বলতে চায়।

'আহ্, বল্ না কি বলবি! আমার গা ধাম্সাচ্ছিস কেন?' করুণা মেয়েকে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের সুরে শাসন করে।

'বাপি, আমাদের একটা ইলেকট্রিক মিকশার কিনতে হবে।' থেমে বাবার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মায়ের দিকে তাকায়। 'মশলার জন্যে ইলেকট্রিক গ্রিণ্ডারও!'

প্রভাস জানে এ সব করুণারই শিখিয়ে দেওয়া, এসব করুণারই চাওয়া। অসহায় হাসে। ভাবলেশহীন ফ্যাকাশে দৃষ্টি সারা মুখের ত্বকে লেগে থাকে।

প্রভাসকে হাসতে দেখে করুণার আবদারের দাবিগুলি আরও বাড়ে, জোরদার হয়। বলে, 'গাড়ি এলে আমরা সকলে প্রত্যেকদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে যাব।' থামে করুণা। 'অবশ্য তুমিও যেতে পার। তবে গেলেও তো আবার তোমার ওভারটাইম নষ্ট! না বাবা, তোমার গিয়ে দরকার নেই।' একটু থামে। মেঝের বসা বুকুনের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় এক মুহূর্ত। 'বুকুন তো বড় হয়ে গেছে।'

এত কথার ফাঁকে টুম্পা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘর থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আসে। 'দেখ বাপি, মা-দিদি এইটা দেখাচ্ছিল।' টুম্পা দামী প্রসাধনের বড় একটা বিজ্ঞাপনের ছবি দেখায়।

'জান বাপি, ইস্ কি ভাল না ওটা। আমার স্কুলের ব্রততীরা কিনেছে। সেদিন বলছিল। ওরা কবে থেকে ব্যবহার করে! আজ আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে।' শম্পার মুখ-চোখ উদ্ভাসিত দেখায়।

প্রভাস মনে মনে ভাবে, ও 'না' বললেও করুণা সব কিনবে এবং খুব তাড়াতাড়িই! ঠিক যেভাবে করুণা প্রভাসকে দিয়ে এমন একটা সমস্ত মেঝে মোজেইক-করা বাড়ি করিয়েছে, সেইভাবেই আর সব কিছু করবে ও।

প্রভাস ছোট ছেলে বুবুনের দিকে তাকায়। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে, 'কি-রে, তোর কি চাওয়ার আছে?'

সকলে বুবুনের দিকে তাকায়। বুবুন লজ্জা পায়। বুবুনকে দেখে নিজের ছোটবেলায় হঠাৎ কোন একটা ধূসর স্মৃতি প্রভাসের মনের মধ্যে চকিতে জ্বলে নিভে যায়। বুবুন অনেকটা প্রভাসের ছোটবেলার স্বভাবেই এখনো অন্যরকম।

কি কথা মনে পড়ে যেতে শম্পা বলে, 'ও মা, তুমি আজকের সকালের সেই কথাটা বাপিকে বলো নি!'

'কোন্ কথা?' করুণা সকালের স্মৃতি ছুঁতে চেষ্টা করে। কিছুতেই মনে পড়ে না।

'সেই যে বাবার সব পুরনো পত্রিকাগুলো বিক্রীর কথা!' শম্পা মায়ের স্মৃতি নিয়ে মজার খেলার জন্যে যেন মাঠে নামে।

প্রভাস থমকে দাঁড়ানোর মতন করুণার দিকে তাকায়। 'কোন্ পত্রিকা!' প্রভাসের গোপন চিন্তায় কোন পাথর বুঝি একটু নড়ে ওঠে।

করুণা উচ্ছল হেসে ওঠে। শম্পাও। বুকুন বাড়ি ছিল না। ঘটনাটা ও শুনেছে বাড়ি ফিরে। বাবার দিকে তাকিয়ে সেও হাসে। যেন সকলের মুখে-চোখে একটা কৌতুকের খেলার ঘুঁটি ঘোরাফেরা করে। 'আগের বাড়ি ছাড়ার সময় তুমি পুরনো আলমারীটা এনেছ! মনে আছে? একেবারে ওপাশের ঘরে রেখেছ না?' করুণা হাসতে হাসতে প্রভাসকে মনে করিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ।' প্রভাস মাথা নাড়ে। 'ওর মধ্যে অনেক পুরনো কাগজপত্তর বেছে বিক্রী করতে বলেছিলুম!'

'আজ দুপুরে সেই কাগজ বিক্রী করতে গিয়েই কত পুরনো সব পত্রিকা বেরিয়ে পড়ে। বুবুন বার করে দেখছিল। কোন্ সব কাগজে নাকি তোমার লেখা-টেখা ছাপা হয়েছিল! গল্প, কবিতা! সে সব দেখে বুবুন অবাক।' করুণা থামে। বুবুনকে দেখে। সকলেই বুবুনের দিকে তাকায়।

প্রভাস এতক্ষণ করুণা আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে হাওয়ায় তুলোর মতন ভাসছিল মনে মনে। এখন যেন ভারী অনড় পাথরের মতন স্থির। করুণার চোখ থেকে দৃষ্টি সরে এসে শম্পার ওপর পড়তেই শম্পা বলে ওঠে, 'জান বাপি, বুবুন ওগুলো বিক্রী করতে চাইছিল না। মা তা শুনবে না। সে কি চেঁচামেচি। সারা বাড়ি এক তুলকালাম কাণ্ড।' ঘটনাটার মজায় শম্পার স্বর ভরে থাকে।

প্রভাস বুবুনের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছু সময়। যেন নিজেকে কোথাও সন্তর্পণে খুঁজতে থাকে প্রভাস।

বুবুন বাবার দিকে তাকায়। 'আমি ওগুলো রাখব বলেছিলুম, মা রাখতে দিল না। স্কুলের বন্ধুদের দেখাতুম।' বুবুনের গলায় অভিমান, আক্ষেপ, ক্ষোভ।

'যত সব জঞ্জাল বাড়ানো।' করুণা ধমকের মতন বলে ওঠে। 'তুমি আবার কবে লিখতে! কলেজে পড়তে গিয়ে যত্তোসব পাগলামি করেছ।'

করুণার স্বর ভাঙা বিকৃত মনে হয় প্রভাসের। 'থাক ওসব কথা।' হঠাৎ যেন ধমক দেয় প্রভাস। করুণার থেকে দৃষ্টি সরায়। 'তোমরা যাও, আজ একটুও পড়তে বসলে না!'

'বাপি, কাগজ বিক্রী করে কত পয়সা হয়েছে জান !' টুম্পা বলে।

প্রভাসের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। 'কত ?'

'ষোলটাকা পঁচাত্তর পয়সা।' করুণা উত্তর দেয়। 'ওটা আছে। একটা ছুটির দিনে বেড়াতে বেরিয়ে খরচ করব। তুমি আবার চেয়ো না যেন।' প্রভাসের মুখ-চোখ দেখে। 'তোমার তো স্বভাব—।'

প্রভাস করুণার কথায় অবাক হয়। কোনদিন কি করুণার কাছ থেকে পয়সা চেয়েছে ! বরং সংসারের জন্যে মাঝে-মধ্যে যা চেয়েছে, তার অনেক বেশিই তো দিয়ে এসেছে এতকাল !

বুবুন হঠাৎ বলে, 'আমি মাকে বলেছিলুম, এতসব কাগজপত্তর বের করে গুছিয়ে দিল, তাই মলিনাপিসিকে খুচরো পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে দিতে। ও কি কিনবে বলছিল !'

'বুবুন !' করুণা চেঁচিয়ে ওঠে। স্বর নীরস, অস্বাভাবিক। 'ফের সেই কথা !' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে বুবুনের দিকে। বুকুনকে বলে, 'এই খোকা, এদের নিয়ে তোরা ওঘরে যা।'

বুবুনের দু'চোখ অভিমানে একটু ভিজে যায়।

সকলে বেরিয়ে যায়। ঘরের অফুরন্ত আলোয় এতটুকু ছায়া ছিল না। এখন এই নীরবতায় দুজনের মধ্যে কখন যেন আয়োজনহীন নির্জনতা তৈরী হয়ে যায়। করুণা-প্রভাসের মধ্যে একটা ছায়া যেন চেপে বসে।

প্রভাস হঠাৎ বলে, 'বুবুনকে এমন করে না বকলেই পারতে।'

করুণা চাপা রাগ সামলাতে পারে না, বলে, 'মলিনা ঝি। ওর হাতে পয়সা দেওয়া কি ঠিক ? ওরা ক্রমশ পেয়ে বসবে।'

ঝকঝকে আলোয় করুণার প্রসাধন-ছোঁয়া শরীর আর উজ্জ্বল পোশাকের মধ্যে প্রভাস যেন রামচাঁদ নন্দী লেনের সেই করুণাকে আবার দেখতে পায়। তখন কোন কাজের লোক থাকত না। তখন থেকেই টাকা-পয়সা করুণার বড় প্রিয় ছিল।

তবু প্রভাস করুণাকে সমর্থন করে। চাপা শ্বাস গোপন করে বলে, 'না, না, দাও নি ভালই করেছ।' একটু থামে। 'শুধু আমার পত্রিকাগুলো না বেচলেই ভাল করতে।' প্রভাসের মনের ভিতর কোন একটা জায়গায় অনেকদিন মরচে পড়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ঘষা লেগে চকচকে করতে প্রভাস যেন সেখানে থেকেই কথাগুলো বলতে চাইল এই মুহূর্তে।

'কেন, রেখে কি হবে? বুবুনকে ওসব শেখাতে চাও বুঝি?' করুণা সোজা তাকায় প্রভাসের দিকে। 'ওসব করে কিছু হয় না, দেখছ তো! আজ যে তুমি এতো বড় হয়েছে, কি করে?'

প্রভাস করুণাকে রাগাতে চায় না। সব মেনে নেয়। ঠিক আগের বাইশটা বছরের মতই। 'তা ঠিক। তোমার কথা মানি।' একটু থামে, 'তোমার জন্যেই এতদূর উঠতে পেরেছি, এটা অনেক পাওয়া।' প্রভাস যেন ফিরে আসে নিজের সেই ছোট ঘরে।

করুণা খুশি হয়। স্বামীর দিকে তাকায়। সুন্দর মুখে হেসে ওঠে।

প্রভাস হাসে। 'জান তো, আজ ভাবছিলুম, আমার নতুন বাড়ির নাম দিই। অফিসের মিত্তিরকাকা কথাটা প্রথম মনে করিয়ে দেন। 'করুণার কণা' 'দান' বা 'স্বপ্ন'—এ রকম কিছু একটা দিলে কেমন হয় বল তো? বা, এককথায় 'করুণাময়ী!' কথাগুলো বলে প্রভাস চাপা খুশিতেই একটু বেশী হেসে ওঠে।

'ঠাট্টা করছ?' করুণার মাংসল মুখ গভীর খুশিতে ফুলে ওঠে, ফর্সা চামড়া লাল হয়।

'সেকি! ঠাট্টা নয়, সত্যি!' একটু থেমে প্রভাস বলে, 'সত্যি করে বলতো! এমন সৌভাগ্য আমরা কোনদিন ভেবেছি সত্যি হবে! তুমি না থাকলে!' প্রভাসের স্বরের আপ্লুত আবেগ আর খুশি, তৃপ্তি কথা থামিয়ে দেয়।

এমন আলোয় ধোয়া ঘরে উদ্ভাসিত করুণার দু'চোখ ছল ছল করে।

বাইরে ডোর-বেল বেজে ওঠে হঠাৎ। প্রভাস এতক্ষণ করুণাকে মুগ্ধ চোখে দেখছিল, বেলের শব্দে সহজ হয়। ভালো লাগে বেলের শব্দ। মিষ্টি মিউজিক্যাল। নতুন বাড়ি। প্লাস্টিক পেইন্টিং-এর দেয়াল, মোজেকের মেঝে, দুধের মতন আলো—এ-সবের মধ্যে এমন মধুর শব্দের ঘণ্টা প্রভাসের এখনকার জীবনের মানেই যেন বদলে দেয়। একটা ঘোর আনে। পয়সা হাতে আসার পর বড় ছেলের রুচি ভাল হয়েছে। প্রভাস খুশি। বুকুনই নিজের পছন্দ মত এমন দামী বেল বসিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রভাসের সুখ কম নয়।

নীচে বুকুন যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরে দৌড়ে ওপরে উঠে আসে বুকুন। 'বাপি, তোমাকে কে এক ভদ্রমহিলা ডাকছেন।'

'আমাকে?' প্রভাস যতটা অবাক, ততটা অপ্রস্তুত।

'মনে হচ্ছে আগের বাড়িতে থাকতে তোমাদের অফিসের কোন্ একটা মেয়ে টাকা ধার চাইতে আসত, সেই!' বুকুন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

প্রভাস স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে ঈষৎ অন্যমনস্কতায় ঘাড় নাড়ে। 'না, না, তিনি তো অনেকদিন আসা বন্ধ করেছেন!' কি ভেবে বলে, 'যা, ওপরে ডেকে নিয়ে আয়।'

'উনি আসতে চাইছেন না। আগে তোমাকে যেতে বলছেন!' বুকুন বাবার দ্রুত সিদ্ধান্ত শুনতে আগ্রহ দেখায়।

'আচ্ছা তুই যা, আমি দেখছি।' অন্যমনস্ক প্রভাস উঠে দাঁড়ায়।

'শোন, কেউ টাকা ধার চাইলে দিও না যেন। তোমার তো স্বভাব।' একটু থেমে বলে, 'অনেক খরচ এখন।' স্বামীকে পুরনো শাসনের রীতিতেই সাবধান করে দেয় করুণা।

প্রভাসের মুখের রেখায় বিরক্তি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অন্যমনস্ক থেকে নীচে নেমে আসে।

খোলা দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় প্রভাস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা। ডানপাশের কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ভারী ব্যাগ।

'চিনতে পারছ?' মেয়েটি নিজেকে স্পষ্ট করে চেনবার মত সামনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। দু'চোখে চাপা কৌতুক। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি।

প্রভাস চশমাটা ঠিক করে নেয়। চেনার চেষ্টা করে। 'তুমি' সম্বোধনে যখন পরিচয় দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই খুব চেনা। প্রভাস রাস্তার আবছা আলোয় মেয়েটির মুখ ভাবতে চেষ্টা করে।

'তুমি অনেক বদলে গেছ! আমারই তোমাকে একদম না চেনা উচিত ছিল।' মেয়েটি স্পষ্ট করে হাসে। স্বর মিষ্টি, ভারী। 'অথচ দেখ, আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে ভুল করিনি!' মেয়েটির মৃদু হাসির স্বরে পুরনো আত্মবিশ্বাস। বড় বড় চোখে মেয়েটি প্রভাসকে একভাবে লক্ষ্য করে যায়।

'এষা না?' আর একবার চশমাটা ঠিক করে চোখের ওপর বসায় প্রভাস। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা গোপনতম ভয় মৃদু চাপ দিয়ে শরীরের শিহরণে মিলে-মিশে হারিয়ে যায়।

'কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?' এষা অনেক বেশী হাসে। চকিতে চিবুক তুলে নতুন বাড়ির দেয়ালে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রভাসের দিকে একটু ঝোঁকে।

প্রভাসের দু'চোখের বিস্ময় তখনো এতটুকু কাটেনি। 'তুমি! ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?'

'অন্যায় করেছি? তাহলে চলি!' মধ্যবয়সী এষা কিশোরীর মতন কৌতুকে স্বর হালকা করে।

প্রভাস সহজ হয়। 'না না, ওপরে এসো।' প্রভাস পাশ ফিরে দাঁড়ায়। এষা চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে আসে।

'যাক বাবা, তা হলে আশ্রয় মিলতে পারে মনে হচ্ছে। অনেকদিন পরে তো!'

প্রভাস কথাটার অন্য অর্থ থাকতে পারে কি না ভাবতে ভাবতে দরজা বন্ধ করে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দেয়। পিছনে এষা।

এষাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা করুণার সামনে আসে প্রভাস। 'করুণা, এই দেখ কে এসেছে।'

করুণা যেমনভাবে বসেছিল, ঠিক সেইভাবে বসে থেকে তাকায় এষার দিকে। বুকের কাপড় টানে, ওর নিষ্পলক দু'চোখে নিরাসক্ত কৌতূহল।

'একে তুমি চিনবে না, তবে অনেক আগে এর নাম শুনেছ আমার কাছে। এষা রায়।'

করুণা হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করে। 'বসুন।'

'আমার স্ত্রী।' প্রভাস বলে, 'বোসো।' ও পাশের চেয়ারটা দেখায় এষাকে।

এষা বসে না, দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, 'আমার নাম কি করে শুনেছেন?' করুণার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে প্রভাসের দিকে তাকায়। এষার চোখ বিস্ময়ে থমকে দাড়ায় যেন।

প্রভাস হাসে। 'আমাদের বিয়ের পর ইউনিভার্সিটির গল্প করার সময় অনেকবার তোমার নাম উঠেছে। তুমি তো প্রায় বাইশটি বছর কাটিয়ে এলে। দেখলে তো আমিই তোমাকে চিনতে পারছিলুম না, আর ও তো শুধু নাম শুনে ভুলবেই!'

এষার সামনে অনেক বেশী কথা বলে প্রভাস আড়ষ্ট পরিবেশ হালকা করতে চেষ্টা করে।

এষা হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে। ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখছিল। প্রভাস ডাকে, 'আয়, ইনি তোদের এক পিসি। প্রণাম কর।'

সকলেই এক এক করে প্রণাম করে। প্রভাস সকলের নাম ধরে পরিচয় করিয়ে দেয়। একসময় ছেলেমেয়েরা সামনে থেকে সরে গেলে বলে, 'আজ থাকছ তো?'

'থাকতেই তো এলাম।' প্রভাস-করুণা দুজনের দিকে তাকায়। সপ্রতিভ হাসি ঠোঁটের কোণে এষার। 'ভয় নেই, শুধু আজকের রাতটাই। কালই পালাব, ব্যাপারটা আগে থেকে জানাতে পারিনি বলে খুব খারাপ লাগছে।'

'কিছু খারাপ নেই।' করুণা ভারী চেহারা নিয়ে খাটের ধারে চলে আসে। মেঝেয় পা রাখে। 'খুব সহজভাবে থাকুন। আপনি এর পুরনো বান্ধবী। ওর নতুন বাড়িতেই এমন আচমকা আপনি হাজির। আপনাকে তো আমরা কেউই আর ছাড়তে পারি না!' করুণা সহজ সরল হাসে। প্রভাসের দিকে তাকায়। 'উনি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে বসুন। তুমিও ঘরে বসে ওঁর সঙ্গে গল্প কর। আমি ওদিকটা দেখছি।'

'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গেও গল্প করতে চাই।' এষা করুণার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে।

'সে হবে, তবে আগে গৃহস্বামীর পারমিশান্ নিন, তার পর তো?' তিনজনেই হেসে ওঠে। করুণা হাসির মধ্যেই ঘরের বাইরে চলে যায়।

তেমন কোন কারণ নেই, অথচ করুণা চলে যাবার পরেই প্রভাস-এষা কেউই কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারে না। বিরাট সময়ের দূরত্ব আচরণে, কথাবার্তায় যতটা ভার আনে, মাদকতা নিয়ে আসে, কথা বলার দ্রুততা ততটা কমিয়ে দেয়। এষা বসে বসেই সারা ঘরে দৃষ্টি বুলিয়ে যায়। প্রভাস এষাকে দেখে খুব খুঁটিয়ে। ছাত্রজীবনের সেই সব দিনের সঙ্গী কাঁধের ব্যাগটিকে ছাড়েনি। আগে এষার গায়ের রঙ ছিল ময়লা মাজা। এত পরিষ্কার হল কি করে? এষা সুন্দরী নয়, কিন্তু সহজ সুশ্রী। ছাত্রজীবনের সেই স্লিম ফিগারের আলগা চটক এখন যেন লাবণ্য হয়ে ওর ত্বক-মাংসে মাখামাখি। বিয়ে করেনি এষা! হঠাৎ প্রভাসের বুকে অতিরিক্ত শব্দ হয় যেন! সেই পাতলা ছিমছাম বুদ্ধি-মাজা চেহারায় অতি সামান্য কিছু মেদ জমা হয়ে বেশ ভালই দেখাচ্ছে ওকে। বয়সের মেদ বয়সের ভার আনে, প্রচ্ছন্ন কোন অভিজ্ঞতা মাটির নীচে শিকড় বেড়ে চলার মতন শরীর ত্বকে সূক্ষ্ম রেখা তৈরী করে। মাথার চুল পরিপাটি, রঙ আগের থেকে মাজা। টান টান চেহারায়, গ্রীবায়, হাত-পায়ের স্বভাবে এষাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। অথচ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ওদের দুজনেরই একই বয়স, হয়ত বা দু'এক বছর কম ছিল এষার ওর থেকে! এখন চল্লিশ। করুণার এই সাঁইত্রিশেই কেমন সাতান্নয় পা দেওয়ার মতন! আবার বুকের মধ্যে অতিরিক্ত একটা শব্দ হয়ে প্রভাসের রক্তে কম্পন তোলে।

'কি দেখছ? বসো! আমি একা বোকার মত বসে থাকব নাকি?' এষা দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে প্রভাসের ওপর রাখে। দু'চোখে স্বাভাবিক ভদ্রতা। একটু নড়ে-চড়ে বসে।

প্রভাস বুঝি অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। মুহূর্তে ফিরে আসে। 'বসছি, কিন্তু তুমি ব্যাগটা কাঁধ থেকে সরাও। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক বদলে বসো বরং। চা-টা খেতে খেতে অনেক কথা বলা যাবে।'

এষা উঠে দাঁড়ায়। ঝোলানো ব্যাগটা কাঁধ থেকে সরায়। 'কোথায় রাখব?

'আমাকে দাও।' প্রভাস ব্যাগটা প্রায় কেড়েই নেয় এষার হাত থেকে। ঘরের এক কোণে আলনায় ঝোলানোর জন্যে এগোয়।

'তোমার ছেলেমেয়েরা বেশ দেখতে হয়েছে। খুব স্মার্ট!' জমানো শ্বাস ফেলে এষা থেমে যায়। ঠোঁটে হাসি তখনো মেলায়নি।

প্রভাস ততক্ষণে এষার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। 'বুড়ো হয়ে গেছি তো?' কথাটা বলে এষার দু'চোখের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করে প্রভাস। এষা খুব চালাক। কি অর্থে বলেছে কথাটা? কোন শ্লেষ আছে! এষার চেহারা চোখে নিয়ে আবার বয়সটা মনে পড়ে যায়।

'তা একটু হবেই। নিজে একা খেটেখুটে এত বড় একটা বাড়ি করেছ!' এষা থেমে যায়।

প্রভাস লক্ষ্য করে এষার দুচোখ, ঠোঁট, চিবুকে এমন কথার কোন ভাবান্তর নেই। স্বর ঠাণ্ডা। এষা কি কোন গোপন শ্লেষে এমন কথা বলল? নাকি কোন করুণায় প্রভাসকে সান্ত্বনা দিতে চায়?

মলিনা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। 'বৌদি এই কাপড়-জামা দিয়েছেন। বাথরুমে যাবেন তো।' প্রভাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলে মলিনা।

এষা বিব্রত বোধ করে। 'না, না, আমার কাছে জামা-কাপড় সব আছে, লাগবে না।' এষা আলনায় ওর ঝোলানো ব্যাগের দিকে এগোয়। জামা-কাপড় বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

প্রভাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। দোতলায় ওঠার মুখে বসার ঘর। ওখানেই প্রভাস এষাকে বসায়। মলিনা চা জলখাবার দিয়ে যায়। প্রভাসের সামনেই এক কাপ চা রাখে। প্রেসার হঠাৎ ওঠা-নামা করায় প্রভাস সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশ, দিনে চারটির বেশী কিছুতেই না।

তবু এই মুহূর্তে প্রভাস সিগারেটেই যেন কোন মানসিক উত্তেজনার আশ্রয় পেতে চায়! পাজামার পকেট থেকে সিগারেট বের করে।

এষা একমনে বসার ঘরের গোছানো আসবাব-পত্তর দেখছিল। প্রভাস অকারণে এষার জন্য নির্দিষ্ট চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট একটু এগিয়ে দেয়। 'খাও, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' নিজের কাপটা হাতে তুলে চুমুক দেয় প্রভাস। এষার ভারী চিবুকের প্রান্তে দৃষ্টি রেখে বলে, 'সত্যি তুমি আমাকে খুঁজতে ও বাড়ি যাবে, এটা ভাবতেই পারছি না!'

এষা চায়ের কাপ হাতে নেয়। আসার সময় যে স্কার্ফটা গায়ে ছিল সেটা এখন নেয় নি। এখন আরো ঝকঝকে লাগে ওকে। 'না গেলে এখানে আসব কি করে? তোমার ও বাড়িই চিনতাম! মাসিমা বেঁচে থাকতে বার-তিনেক এসেছিলাম বলেই না গলিটা চিনতে পেরেছি আজও!' এষা গরম কাপে আলতো ঠোঁট ছোঁয়ায়। 'ইস না চিনতে পারলে কি যে করতাম!'

'নতুন ভাড়াটেদের অবশ্য ঠিকানা দিয়ে বলেই এসেছিলাম কেউ এলে এখানে পাঠিয়ে দিতে।' প্রভাস সিগারেটে টান দেয়।

'আমার কথা নিশ্চয়ই সেই 'কেউ'-দের মধ্যে ভাবো নি।' গলায় হাসির শব্দ করে এষা। 'যেভাবে ঢুম করে বিয়ে করে লুকিয়ে পড়েছিলে, তাতে আমার সন্দেহ হয়, ব্যাপারটা মাসিমাকেও জানিয়েছ কিনা।' এষা খাবারের প্লেটে হাত রাখে। বোধহয় মুখটা প্রভাসের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্যেই।

প্রভাস এষাকে বুঝতে চেষ্টা করে। 'তুমি ঠাট্টা করছ? কিন্তু আমার বিয়ে মা বেঁচে থেকে পছন্দ করেই দিয়ে গেছেন। মায়ের চাপেই বিয়েটা হঠাৎ হয়েছিল।' কথাটার মধ্যে কি কোথাও কোন ক্ষমা চাওয়ার মত স্বর ধরা পড়ে যাচ্ছে! ভিতরে গুটোতে থাকে প্রভাস।

হেসে ওঠে এষা। 'আমি কিন্তু তাতে অন্যায় দেখছি না প্রভাস!' প্রভাসের চোখে চোখ রাখে। 'আমার শুধু দুঃখ হয়, আমাকে একবার জানালে কি তোমাকে খুব অসুবিধেয় পড়তে হত? আমি তোমার বান্ধবীটুকুই তো ছিলাম? তাই না?' এষা দৃষ্টি সরায় না। প্রভাসের ভিতরটায় কিছু সে খুঁজতে চাইছে যেন। প্রভাস মুখ ঘুরিয়ে একভাবে চায়ে চুমুক দিতে থাকলে এষা বলে, 'পুরনো কথা ভাল লাগছে না।' হঠাৎ নিজের মধ্যে বিরক্ত ক্লান্ত বোধ করে এষা। কোচে ঠেস দিয়ে বসে।

প্রভাস ভাবে, সত্যিই তো এষা তখন ওর বান্ধবীই ছিল, তার বেশী নয়।

ইউনিভার্সিটির ক্লাস সেরে সকলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে একসময়ে ওরা দুজন মহম্মদ আলি পার্কের এক কোণে বেঞ্চে বসত। পার্কটা রাস্তার লোকজন, কলকাতার অনেকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখত ওদের। দুজনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, অথচ যেন একটা ঘোরে ঐ পার্কটাতেই বসে থাকত সন্ধে গড়িয়ে যাওয়ার পরেও। এষা এসেছিল ওর বাড়ি। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রামচাঁদ নন্দী লেনের সেই একতলা ঘরে এষা কত আপন হয়ে গিয়েছিল বাড়ির সকলের। সে সবের মধ্যেই এষার কি আর কোন দাবি ছিল প্রভাসের কাছে?

এষার দিকে তাকায় প্রভাস। প্লেটের খাবার খেতে খেতে টিভির পর্দার দিকে এষার চোখ। না, কিছুমাত্র না। তবু প্রভাস বিয়ের কথা গোপন করেছিল কেন? এষাকে কি ভয় করত? নাকি ছিল: তা না হলে আজ এতদিন পরে এষাই বা সে প্রসঙ্গ তোলে কেন? এষা কি এতদিন পরে কোন গোপন অভিযোগ জানাতে এসেছে? নাকি দেখতে এসেছে প্রভাস কত সুখী হয়েছে নতুন বাড়ি করে? এষাই বা বিয়ে করে নি কেন? প্রশ্নটা মনে হতেই প্রভাস সচেতন হয়। এষা যে ধরনের মেয়ে, হয়ত বিয়ে করার পর সংসার করতে পারেনি স্বামী নিয়ে!

'তুমি তো আমাকে দেখছ, তোমার কি খবর বল?' প্রভাস ঘুরিয়ে বলে।

'আমার!' এষা সহজ হয়। খাবারের প্লেট সরিয়ে রাখে, 'এই তো দেখছ।' জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খায়। গ্লাস নামিয়ে রেখে বলে, 'আমার বিয়ে হয় নি বলে অবাক হয়েছ তো?'

প্রভাস একভাবে তাকিয়ে থাকে এষার দিকে।

'আমি বিয়ে করিনি।'

'কেন!' প্রভাস কথাটা বলে নিজের মধ্যে সতর্ক হতে থাকে।

'এই তো বেশ আছি। পাটনায় চাকরী করি, খুব ভাল একটা কোয়ার্টার পেয়েছি। একা থাকতে দারুণ লাগে। বৌদি আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একবার ওখানে ঘুরে এসো। খুব ভাল লাগবে।' এষা অনেক কথা বলে থামে।

প্রভাস সাধারণ সাংসারিক অন্তরঙ্গতার স্বরে যেন সেই আগের বাড়ির পরিবেশের এষাকে অনুভব করে। ফেলে-রাখা চায়ের কাপ তুলে নেয়। 'মেয়েদের পক্ষে সারা জীবন একা থাকা কঠিন।' প্রভাস যুক্তি দেয়।

'কে বলে?' এষা দু'চোখ তোলে। চোখের সাদা জমিতে প্রতিবাদ চকচক

করে। 'আমি ইউনিভার্সিটিতে যা ছিলাম, এখনো তা-ই আমি। এমন মুক্তি কোথায় পাবে তুমি?' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি মেলে। 'তুমি তো মরে গেছ!' শেষ কথা ফিসফিস করা-স্বগতোক্তির মতন।

এষা শেষের কথাটা কেমন অস্বাভাবিক করে বলায় প্রভাস চমকে ওঠে। 'তার মানে!' প্রভাস যেন প্রতিবাদ করে। এষা কি বলতে চায় পুরোটা বুঝতে পারে না। আগের কোন বন্ধুত্বের অধিকারের জায়গায় দাঁড়িয়ে কি কথা বলছে? নাকি তারও বেশী কোন গোপন দাবি জানাতে এমন অভিযোগ!

এষা হাসে। এবার হাসির মধ্যে চাপা শ্লেষ স্পষ্ট হয়। 'সুন্দর বাড়ি, টাকা-পয়সা করেছে, এত সুন্দর ছেলেমেয়ে! এত সুখ! এর পর আরও মানে খুঁজতে গেলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না।'

প্রভাস সোজা হয়ে বসে। সিগারেটে পর পর দু'তিনটে টান দেয়, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'জীবনের একটা মানে এখানেও আছে এষা, তুমি যতই তর্ক কর না কেন।' আত্মরক্ষার স্বর প্রভাসের।

'আমি তো অস্বীকার করছি না প্রভাস।' এষা থামে। 'কিন্তু সেই প্রভাস কোথায় যে এমন বাড়ি, গাড়ি, বউ-ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা! যে আজ থেকে তেইশ-চব্বিশ বছর আগে বার বার নানা যন্ত্রণায় ছটফট করত! গল্প-কবিতা লিখত, দারুণ গলায় গান গাইত, সংসারে থেকেও সংসার থেকে আলাদা হওয়ার যার ভয়ংকর ক্ষমতা ছিল! সেই প্রভাস কোথায়?' এষার দু'চোখ জ্বলতে থাকে। চাপা শ্বাসে বুক ওঠে-নামে দ্রুত। যেন এখনি সেই প্রভাসকে খুন করার জন্যে আজকের প্রভাসের চোখে চোখ রেখে ওকে দায়ী করতে চায় এষা।

প্রভাস যেন এষাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই বলে, 'সে সব ছেলে-মানুষী ভাবনা। এখনো তুমি সে সব ভাবো! জীবনটা বদলালে এরকমই তার চেহারা! সকলেই তা-ই।' প্রভাসের গলায় সহজ ঠাট্টা কথার ভার আড়াল করে।

'বাজে-কথা।' এষা যেন ধমক দেয়। 'আমি জানতাম যেভাবে তুমি নিজের সংসারে ঢুকেছ—তাতে তোমার কাছে একথাই শুনব।' এষা থামে। কিছু পরে গলার স্বর অনেক নামায় এষা। যেন বিড় বিড় করে, 'অথচ আমার আদর্শই ছিল তোমার কত কথা, কত বুদ্ধিমান শপথ! আমি কিন্তু তোমার থেকে অনেক লাইভলি প্রভাস। আমার এখানে এসো, দেখবে। আমার সুখ তোমার থেকে কত বেশী!' এষা হঠাৎ নীরব হয়ে যায়। সামনের টেবিলের

কাঁচে আঙুল দিয়ে কিছু লেখে। 'তুমিও তো শিখিয়েছিলে জীবনের কাছে কখনো কিছু না চাওয়া!'

প্রভাস চুপ করে থাকে কিছু সময়। অন্যমনস্ক এষাকে দেখে। এষা কি ওর আজকের সুখকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই এখানে এসেছে? পাটনার মেয়ে, কলকাতার হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত এষা। প্রভাসকে নানাভাবে সাহায্য করত, নানাভাবে বড় হয়ে ওঠার জন্যে প্রেরণা দিত, যুক্তি, বুদ্ধি যোগাত! ছাত্র প্রভাসের অভাবের দিনে অর্থও কম খরচ করেনি এষা! সে সবের জন্যেই কি ও আজ অপমান করতে চায়? নাকি ঘুরিয়ে সেই খরচ করা অর্থ শোধ নিতে চায়! মাথা ঘাড় গরম হয়ে ওঠে প্রভাসের। এষা পাঁচ শ' টাকা ধার দিয়ে ফেরত নেয়নি। ফেরত দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না প্রভাসের। আজ কি তা ফেরত চায়, না অপমান করতে চায় প্রভাসকে? নাকি প্রভাসকে গোপন কোন ভালবাসার শিকার ভেবে এভাবে জাল পেতেছিল সেদিন? আজ তারই ব্যর্থতায় এমন ক্ষোভ!

'আমার কথায় তুমি আঘাত পেলে? আমি কিন্তু আঘাত দেবার জন্যে বলিনি প্রভাস।' এষার স্বরে ক্ষমা চাওয়ার মতন করুণ মিনতি। শ্বাস ফেলে বলে, 'আমি তোমাকে এমনভাবে দেখব ভাবিনি।'

'কি দেখতে চেয়েছিলে?' প্রভাসের মুখ-চোখ উৎসুক হয়ে ওঠে।

'তুমি অনেক টাকা পয়সা করেছ, এতো ভালোই। তা ছাড়াও তুমি নিজেকে এসব থেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছ, এটাই ভেবেছিলাম। এখন তো তোমার কোন অভাব নেই!'

'তোমার ঋণ আমার মনে আছে এষা।' প্রভাস কথাটা বলে।

'কিসের ঋণ?' এষার দু'-চোখে বিস্ময়। 'আমি কিন্তু কোন ঋণ শোধ নিতে আসিনি!' মাথা নাড়ে এষা। মুখটা অভিমানে, না অপমানে হঠাৎ বোঝা যায় না, একটু ছায়াময় বিমর্ষ দেখায়।

মুহূর্তে কথা ঘোরায় প্রভাস। 'তোমার ঋণ তো শোধার নয় এষা। আমাকে সঙ্গ দিয়ে তুমিই তো বাঁচাতে চেয়েছিলে।'

'কিন্তু বাঁচোনি! এতসব বিষয়-আশয়ের মধ্যে তুমি কোথায়?' গলার স্বরে ঝাঁঝ এষার। একটা পুরনো ক্ষোভ যেন মাথা চাড়া দেয়। 'কেমন বুড়ো হয়ে গেছ। চোখের চশমার পাওয়ার বাড়িয়েছ। লেখা-পড়ার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু কত ভাল গল্প ছিল তোমার! তা কোথায় গেল! কি

ভয়ংকর জীবন্ত ছিলে তুমি! কত বাইরের বইপত্তর পড়তে! সে সব উদ্যোগ তোমার কোথায়?' একটু থেমে দম নেয় যেন এষা। প্রভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ওর ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যায়, 'ছেলেমেয়েরা বরং তোমার থেকে বড় লাইভ্লি! আর তুমি! কুঁজো হয়ে গেছ এই বয়সে।' এষা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'অথচ আমাকে দেখ, আমার দিকে তাকাও! তাকাও?' এষার কথাগুলো জোর হতে হতে শেষ দিকে নরম হয়ে স্বর নেমে আসে।

প্রভাস তাকায়। এষাকে যেন নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখে। এতক্ষণ একবারও চোখ পড়ে নি। দু'চোখের সাদা জমির ওপর তারা দু'টো জ্বলছে যেন। চোখে চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক থেকে এষা চোখ সরিয়ে নেয়। ঠোঁট, চিবুক থুতনি. গ্রীবা কত সতেজ এষার।, সবুজ শাড়ি ব্লাউজে ঢাকা শরীর। প্রথম বর্ষায় ধোয়া ছোট গাছের পাতার মতন যৌবন। কোমর ক্ষীণ। ঋজু শিরদাঁড়ায় এষার পোশাক-ঢাকা কোমর থেকে পা পর্যন্ত যেন মোটা ভারী বেতের মতন মসৃণতা! প্রভাসের পাশে এষা যেন জীবন্ত বিদ্রোহের বিগ্রহ। দেখতে দেখতে হঠাৎ প্রভাসের শরীরে শীতল স্রোত বয়ে যায়। এষা সোজা টান টান হয়ে বসে তখনো অন্য-দিকে তাকিয়ে। টিভিতেও দৃষ্টি নেই। এমন বসার ভঙ্গিতে কোন উদ্দেশ্য আছে কি? ভারী চুলের খোপা খোলা কাঁধে পড়ে প্রভাসকে আকর্ষণ করে তীব্রভাবে। এষা কি চায়? এভাবেই এই সংসারের টানা বাইশটা বছরের প্রতিদিনের অন্ধ বদ্ধ নিয়ম কানুন থেকে একটা সময় কি ওকে টেনে বের করে নিয়ে যেতে চায় ও? কোথায়? এষার নিজেরই কাছে? তাতে কার লাভ? এষা তার মনের মতন প্রভাসকে দেখতে চায়? সেখানে ঠেলে দিতে চায়? এষা কি এখনো প্রভাসকে ভালবাসে? এখনো! আগে তো কোনদিন এমন ব্যক্তিগত হয়ে প্রভাসকে চায় নি, প্রভাসের কাছে আসেও নি!

'আমার খুব ভয় এষা।' অসহায় শোনায় প্রভাসের স্বর।

'কাকে?' এষা দৃষ্টি ফেরায় প্রভাসের দিকে।

'তোমাকে।' অস্ফুটে বলে প্রভাস।

এষা হাসে। 'এই ভয়ে বোধ হয় বিয়ের সময় খবরটুকুও দাওনি!'

'তখন কোন ভয় ছিল না।'

'আমি যদি বলি ছিল!'

'কিসের!'

'আমার সামনে দাঁড়াবার।' এষা থামে। 'কিছু মনে কোরো না প্রভাস,

আজও তোমার সেই ভয়।' চাপা শ্বাস ফেলে। 'আমার সামনে দাঁড়ানো মানেই তো কৈফিয়ৎ দেওয়া। কৈফিয়ৎ দিতে ভয় পাও ?' এষার হঠাৎ থেমে-যাওয়া, যেন একটু দম নেওয়ার প্রস্তুতি। 'আমি জানি, এমন ভয়ংকর আলোয় এত সুখ পেয়েও তুমি ফাঁকা, ফাঁপা। তাই বিয়ের সময় লুকোতে চেয়েছিলে!'

এষার কথাগুলো কাঁটার মতন বেঁধে যেন প্রভাসকে। 'আমাকে আমার মতন থাকতে দাও এষা।' কঠিন স্বর প্রভাসের। বুঝিবা অনেক দূরে সরে যায় প্রভাস।

প্রভাসের গলায় স্বীকারের, না পালিয়ে যাবার প্রয়াস, অথবা কথার প্রতিবাদ —তা এষা বুঝতে চেষ্টা করে কিছু সময়। পরমুহূর্তে কি রকম করুণা হয় প্রভাসের ওপর। 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভাস। মাত্র একটি রাত কাটাতে এসে এত কথা বলা আমার উচিত হয়নি।' থামে এষা। শ্বাস ফেলে বড় করে। 'হঠাৎ কখন যে কি ভুল করে ফেলি!' এষা টিভির দিকে মুখ ফেরায়। বোধহয় বুকের বড় শ্বাস লুকোতে চায়।

প্রভাস নিজেকে সহজ করে। এষাকে বেশ কিছু সময় চুপচাপ দেখে। এষাও নিশ্চুপ। সামনের চায়ের টেবিলের কাঁচে আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটে। প্রভাস, কি মনে হয়, বলে, 'তুমি একটা সংসার করলে পারতে।'

এষা হাসে। 'তোমার বউয়ের মতন হতাম তা হলে।'

'না-ও তো হতে! সবাই কি একরকম হয়।'

'সবাই তোমার মত নয় বলছ ?' এষা অন্যমনস্ক হয়। 'মনে পড়ে প্রভাস, পার্কে বসে আমরা দুজন একটা বেড়াতে আসা পরিবারকে দেখে কত কথা বলেছিলাম! কত হেসেছিলাম। ছ'সাতটা ছেলে-মেয়ে, মোটা-সোটা বউ নিয়ে ভদ্রলোক কত সুখী। জীবনের একটা নির্ভুল মানে ওরা পেয়ে গেছে বলে কত হাসতাম! মনে পড়ে ?'

'আবার আমাকে ঠাট্টা করছ ?'

'তোমাকে ?' চোখ বড় করে এষা। 'নাহ, ঠাট্টা নয়! সত্যি বলছি, তুমি কেমন বুড়ো হয়ে গেছ অকালে। প্রতিদিনের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কিছু অভ্যাসের মত তুমি পরিত্যক্ত। আমিও হয়ত তাই। তবে, আমি আমার মত জীবনটাকে নিয়ে যেতে পারি,' স্বর ভারী হয় এষার, 'তুমি তা পার না। তোমাকে দেখে বুঝি, ক্রমশ খুব তাড়াতাড়ি শেষের দিকে এগিয়ে যাবে।' এষা চুপ করে যায়। শেষ কথায় গভীর ব্যথা বেদনার একটা তাপ এষাকেই নিঃসঙ্গ করে দেয়।

প্রভাস তাকায়। এষার স্বরের মধ্যে জোলো ঠাণ্ডা বাতাসের মতন কিছু ছুঁয়ে যায়। কি ভাবছে এষা ওর সম্পর্কে?

এষা আরও মাথা নীচু করে। 'আমার খুব কষ্ট হয় প্রভাস, খেলায় তুমি এত তাড়াতাড়ি হেরে গিয়ে মাঠ ছাড়তে চাইছ!' মুখের ভাব লুকোবার জন্যেই বুঝি এষা একভাবে থাকে। 'অথচ—'হঠাৎ থেমে এষা মুখ আড়াল করে।

প্রভাস মুহূর্তে সামনে এষার পাশাপাশি করুণাকে দেখে। এমন স্বর, এমন ভঙ্গি করুণার তো কোনদিন চোখে পড়েনি! কত বেহিসেবী অন্তরঙ্গ এষা! সেই এষাই আছে। আর বিয়ের পর থেকে করুণা কত হিসেব করে প্রভাসকে কাছে রেখেছে। বাইশ বছর ধরে প্রভাস করুণার কাছে একটা সহজ অঙ্ক। বার বার কষে বসে করুণার গভীর গাঢ় আলস্যে-সুখে অঙ্কটা মিলিয়ে এসেছে। সেই অঙ্ক মেলানোর ফলেই এসেছে বুবুন, বুকুন, শম্পা-টুম্পা, এসেছে এই ঝকঝকে বাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, করুণার এত সুখ, তৃপ্তি! যে অঙ্ক কোনদিন মেলে না, ভুল হয়ে যে অঙ্ক বিভ্রান্ত করে বার বার, অথচ একটা অসীম আনন্দে ডুবিয়ে রাখে, এষা এখনো কি তারই মধ্যে প্রভাসকে ধরতে চায়? প্রভাসের কি আর ক্ষমতা আছে?

ইংরেজি-খবরের পরেই এক সুবেশা সুকণ্ঠী তরুণী মহিলার ছবি পর্দায় ভেসে ওঠে। টিভি-র প্রোগ্রাম শেষ হয়ে এল। এষা সচেতন হয়। প্রভাসের দিকে তাকায় এষা। 'আমার কথাই শুধু বললাম।'

'আমারও অনেক কথা আছে এষা।'

এষা চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে প্রভাসের দিকে। 'আমার আর শোনা হবে না।' এষা বিড় বিড় করে। শব্দে হতাশা নিরাসক্তির মতন লেগে থাকে।

'কটা দিন থেকে যাও!' প্রভাসের চাপা কণ্ঠে অনুনয়।

এষা নড়ে-চড়ে বসে। 'তা হয় না।' প্রতিবাদ নয়, যেন জোর করেই এষা চলে যেতে চায়। স্বরে তা বুঝিয়ে দেয় প্রচ্ছন্নভাবে।

'কাল ভোরেই চলে যাবে?' প্রভাসের স্বরে অসহায়তা। একটা বড় করে শ্বাস ফেলে।

'তাই।' এষা জোর দেয় স্বরে। 'তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা বোধ হয়। শেষ কথাও।' এষার স্বরে একটা শীতল ব্যথা লেগে থাকে। 'তুমি অস্থির হয়েছ আমার কথায়। জানি না ভুল করলাম কিনা। আমি আর

আসব না, কথা দিচ্ছি।' এষার গলার স্বর অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বলার মতন শোনায়। যেন এটুকু সময়েই বিদায় জানিয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে ও।

টিভি-তে জোর শব্দ হওয়ায় প্রভাস উঠে পড়ে। টিভি বন্ধ করে, পিছন ফিরে দেখে করুণা চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে। সারা মুখে কাজের ক্লান্তির সঙ্গে হাসি জড়ানো।

'আসুন, এতক্ষণে আপনার সময় হল?' এষা হাসিমুখে সহজ গলায় করুণাকে ডাকল।

'আর বলবেন না। একেবারে নতুন কাজের লোক। রান্নার ব্যাপারটা সব ধরে ধরে দেখিয়ে না দিলে আপনার মত অতিথি একবার এসে আর কোনদিনও এ-পথ মাড়াবেন না!' বলতে বলতে করুণা এষার মুখোমুখি কোচে বসার জন্যে এগোয়। ভারী চেহারা নিয়ে বসতে সময় লাগে।

চোখের চশমা দু'ভুরুর মাঝখানে আঙুল দিয়ে চেপে বসায় প্রভাস, করুণা-এষা দুজনকেই নির্বিকার চোখে দেখে: 'আমি-তো অনেকক্ষণ এষাকে অ্যাটেণ্ড করলাম, এবার তুমি একটু কথা বলো। আমি আসছি।' প্রভাস ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ধীর পায়ে।

রাত কত ঠিক বোঝা যায় না। প্রভাসের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম নয়, বোধ হয় তন্দ্রাই। এই কিছু আগে পর্যন্ত ছটফট করছিল প্রভাস। ওর ঘর থেকে ছাদের ঘর দেখা যায়। ও যতক্ষণ জেগে ছিল ততক্ষণ এষার ঘরের আলো জ্বলছিল। এষা কি প্রতীক্ষা করছিল? এখনো আলো জ্বলছে এষার ঘরে। রাত তা হলে বেশী হয় নি?

প্রভাস বিছানায় উঠে বসে। নতুন বাড়িতে এসে শোয়ার নতুন ব্যবস্থা। একটা ঘরে এক বিছানায় বুকুন-বুবুন শোয়। আর একটা ঘরের খাটে টুম্পাকে নিয়ে করুণা। সেই ঘরেই ছোট খাটে শম্পা একা। প্রভাসের একা শোবার জন্য আলাদা একটা ঘর। মলিনার রান্নাঘরের পাশে ডাইনিং হলে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা।

বিছানায় বসে প্রভাস আলো জ্বালে না। ওর দু'চোখে অসম্ভব জ্বালা। এষার ঘরের আলো আচমকা নিভতেই প্রভাস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এষা এতক্ষণ জেগেই ছিল, নাকি এইমাত্র ঘুম ভেঙ্গে আবার আলো নিবিয়ে শুলো? প্রভাসের মধ্যে ভয়ংকর এক অস্থিরতা ওকে তাড়া করে ফেরে। নতুন বাড়িতে দরজায় খিল দিয়ে শোয়ার অভ্যেস করে নি প্রভাস। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

পাশের ঘর থেকে করুণার আরামের নাক ডাকার শব্দ কানে আসে। হেমন্তের হিমেল হাওয়া গায়ে লাগে। কতদিন এমন গভীর রাতে ঘুম ভাঙেনি প্রভাসের। প্রভাসের দৃষ্টির আড়ালে চাঁদ। কিন্তু চাঁদের আলো বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে দিয়ে ঘুমে নিথর। প্রভাস বুক ভরে কুয়াশা-মোড়া জ্যোৎস্নায় শ্বাস নেয়। একটু আগেও বুকে জ্বালা ছিল। সেই জ্বালাতেই আচমকা ঘুম ভেঙে গেছে প্রভাসের, প্রভাস বোঝে।

এষা এখনো ঘুমোয় নি। ওকে অনেক কথা বলার আছে। কাল ভোরেই ও চলে যাবে। এষাকে তার কথা বলা দরকার। সব কথা। মোজেক-মোড়া রেলিং-এ হাত রেখে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাস কিছু-সময়। কি বলবে এষাকে? গত বাইশ বছর সব কিছু ভুলে গেছে যে প্রভাস! সব। কিছু মনে পড়ে না। পার্কে সিনেমা হলের অন্ধকারে, রেস্তোরাঁয়, কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার অপরিচিত মানুষের ভিড়ে,—সব জায়গায় প্রভাস একদিন যত কথা বলত, সে সবই ভুলে গেছে! কি করে ভুলে গেল সে! আজ রাতে শোয়ার পর সেইসব কথা গোছাতে চেষ্টা করেছে প্রভাস। সব কথা, কেটে যাওয়া ঘুধের মতন প্রভাসের মধ্যে ছেঁড়া-খোঁড়া অবয়বহীন অস্তিত্ব হয়ে মিলিয়ে যায়। প্রভাসের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে! তবু এষার কাছে যেতে হবে। এষাকে বলতে হবে, আমি আছি, আমি বুক ভরে শ্বাস নিয়ে এখনো বাঁচতে চাই। তুমি এখন যেয়ো না। আর কদিন তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখি। তুমি কত সুন্দর!

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ছাদে ওঠার সিঁড়িতে পা দেয় প্রভাস। অন্ধকারে পায়ে শব্দ করে ঠোক্কর লাগে। চশমা চোখে দেয় নি। উঠতে হবে সন্তর্পণে। প্রভাস চশমার জন্যে আর ফিরে আসেনা, সন্তর্পণেই দেয়াল ধরে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা রেখে ছাদে ওঠে। কে যেন একটা ঘোর লাগিয়ে প্রভাসকে ছাদে ডাকে! এই এষা, এষার স্মৃতি? নাকি প্রভাসের ভিতরের আর এক প্রভাস? আবার সিঁড়ির ধাপে হোঁচট খায় প্রভাস। একটু হলেই টলে পড়ে যেত। দেয়াল চেপে ধরে। ছাদে উঠে হাঁপায় প্রভাস। দু'চোখ মেলে তাকায়। কেন এত বেশী ঝাপসা দেখায় চারদিক? কুয়াশায়? সামনের খোলা-মেলা আকাশ চোখে পড়ে, দূরের চাঁদও। চাঁদে কি ক্ষয় ধরেছে? একটা কোণ যেন খাওয়া! ইস, কতদিন চাঁদ দেখেনি প্রভাস! আর এক পা বাড়াতেই মাথা টলে যায় প্রভাসের। ডান দিকে এষার ঘর! সামনেই দরজা! কনকনে ঠাণ্ডা এক দমকা হাওয়া প্রভাসকে কাঁপিয়ে দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রভাস কোমরে ব্যথা

পায়, শিরায় টান ধরে। প্রভাস দেওয়াল হাতড়ায়। সামান্য দূরে দরজা। হাতড়ানো হাত হঠাৎ থেমে যায়। এ কি! দেওয়ালে এমন ফাটল তো থাকার কথা নয়! প্রভাস বড বড় চোখে ফাটলের উৎস খোঁজে। গাছের সূক্ষ্ম শিকড়ের মতন কালো ফাটলের রেখা ধরে প্রভাস আঙুল বসায়, বুলোয়। আঙুল কাঁপে। দরজার রঙ মরা সবুজ। সেই দরজার প্রান্তে সূক্ষ্ম ফাটলের রেখা শেষ। প্রভাসের বুক কাঁপে। যেন আর এগোতে পারে না। তবু কোনরকমে দরজায় হাত রাখে। আস্তে ঠেলা দেয়। ভিতর থেকে বন্ধ। কে যেন ভিতর থেকে ফিস ফিস করে বলে, 'ফিরে যাও প্রভাস, তুমি কিছু পুরনো অভ্যাসের মত পরিত্যক্ত।' প্রভাস কাঁপে, হাঁপায় এমন ঠাণ্ডায়। ঘামছে কি? প্রভাসের মধ্যে থেকে কেউ যেন বলে, 'এষা, আমি হেরে গেছি। আমার অক্ষমতা ক্ষমা কোরো। আমার আর কোন কথা নেই এষা।'

প্রভাস ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকে। ভীষণভাবে কাঁপে। এমন ঠাণ্ডার দিনেও অফুরন্ত ঘেমে যায়। একসময়ে দরজার গোড়ায় বসে পড়ে ঘাড় গুঁজে। একেবারে নিজের মতন করে একটা বিশ্রাম ওর দরকার!

পূর্ণ চাঁদের ক্ষয়-ধরা অংশ থেকেই যেন ঘন অমা-রাতের কালো ছায়া চুঁইয়ে নামে নীচে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে।





রঙিন চশমা

হঠাৎ নীচের ঘুপ্‌চি অন্ধকার কলঘর থেকে ছোট বালতিটা বাইরে সশব্দে আছড়ে পড়ে। তার পরেই স্নান করার পুরনো টিনের ডিবের মগও।

শব্দটা মুহূর্তে হকচকিয়ে দেবার মত। এমন সকাল দশটাতেই বাড়ির ওপর যেন সদ্য আঁচ-ফেলে-দেওয়া উনুন উপুড় করে দেয় সূর্য। গরমে হাঁস-ফাঁস করে চারদিক। তার ওপর আচমকা এমন কাকের কর্কশ কণ্ঠের মত বালতি পড়ার শব্দ। মগটা বুঝি কলঘর সংলগ্ন নোংরা নালার গায়ে ঠিকরে লেগে ময়লা জলে ডুবে যায়।

দোতলার জানালা দিয়ে মুখ ঝোলায় বেলি। লোহার গরাদে বুকচাপা।

'কি হল রে বেলি?' মা সৌদামিনী রাঁধছিল রান্নাঘরে। চড়া চাপা গলা তুলে বলে।

'কি জানি, একটু আগেই তো কেলি চানের জন্যে কলঘরে ঢুকল, দেখলাম।' বেলি একভাবে তাকিয়ে থাকে বালতিটার দিকে।

সৌদামিনী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ্যাই কেলি, কি হল তোর?'

কেলি এতক্ষণ কলঘরে ছাড়া শাড়ীটা গায়ে জড়াতে ব্যস্ত ছিল। কলঘরের আবছা অন্ধকারে সারা শরীর উদোম করেই সে সাবান খুঁজছিল। পায়নি। রেগে বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন শাড়ী জড়িয়ে বুক-পিঠ ঢেকে বাইরে আসতে সময় লাগে। চীৎকার করে ওঠে, 'আমার সাবান কে মেখেছে

এভাবে ?' চারপাশের এমন তেতে-ওঠা গুমোট বাতাসের মত ফেলির গলা। পাশের পাচিলে একটা কাক ডাকছিল। ফেলির গলা সে শব্দকে অনায়াসেই ঢাকা দিয়ে দেয়।

'তাই বলে তুই সব ছুঁড়ে ফেলে দিবি ? ওগুলো ভেঙে গেলে কে দেবে তোকে ?' বড় বোন বেলি চাপা শাসনের গলায় বলে। যদিও জানে, ওর শাসনের ধার কেউ ধারে না, তবু সব সময়েই কথা বলার ধরনে বড়দির মত একটা বিশেষ ঢঙ বজায় রাখে।

'তুই চুপ কর বেলি।' মুখের দিকে তাকানো যায় না—এমন একটা ভঙ্গি করে। নীচের তলার ঘরের দিকে তাকায়। 'আমি কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, সব বুঝি কারা নেয়। ইতরের বাচ্চা সব, হাঘরে বিত্তি যাবে কোত্থেকে।'

নীচের তলায় দূরের ঘরে ওদেরই আত্মীয় থাকে। পুরনো আমলের বাড়ি। শরিকী ভাগে টুকরো হতে হতে যেমন অনেক ঘর, কুঠরি গজিয়ে উঠেছে, তেমনি লোকের সংখ্যাও বেড়েছে দ্রুত হারে।

জানালা দিয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে দেখছিল বেলির প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো বোন কান্দু। বেরিয়ে আসে তরতর করে। 'ফেলি, তুই কি আমাদের কথা বলছিস্ ?'

'হঠাৎ তুই কথা বলতে এলি কেন ? তা হলে তোরাই বুঝি এর ভেতরে আছিস ? লজ্জাও করে না। ঠাকুর ঘরে কে, না…' হঠাৎ কথাটা বন্ধ করে।

ছুটে আসে বেলির পরের বোন নেলি। অবস্থা বুঝে একটু আগেই মা ওকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'এই দিদি,' বালতি আর ডিবেটা দু'হাতে তুলে নিয়ে কলঘরে ঢোকে। গলা নামিয়ে বলে, 'আমিই একবার হাত ধোবার জন্যে তোর সাবান নিয়েছি, কেন মিছিমিছি ঝগড়া করিস ?'

ফেলি নেলির দিকে তাকায়। নিজের মনেই যেন গজগজ করে, 'ঠিক আছে, তোকেও আমি আজ দেখব। না বলে নেওয়া বের করব। আগে চানটা করে নি।' বলতে বলতে নেলিকে হাত ধরে টেনে বের করে দেয়। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে রাগে গজগজ করে। 'সাবান কিনতে যেন পয়সা লাগে না !'

'একটু আস্তে বন্ধ কর। দরজাটা কারোর একার নয়।' কান্দু ঠেস দিয়ে কথা বলে। 'রাগ দেখাতে হলে নিজেদের দরজায় দেখাস।'

'চুপ কর্, আমার বাবাই এটা সারিয়ে দিয়েছে।' ফেলি কুৎসিৎ চীৎকার করে ওঠে। 'আমার বাবার কষ্টের পয়সায় তোরা তো দেখি সব সময়েই হাত বাড়িয়ে আছিস।'

'থাক, থাক, বাবার ওপর কত দরদ! দেখে—' হঠাৎ কান্দুর কথা বন্ধ হয়ে যায়। পেছন থেকে ওর মা হাত দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে দেয়।

'ঝগড়া করিস না কান্দু।' চাপা গলায় বলে। 'রোজ রোজ এ আর ভাল্লাগে না।'

'তা বলে সব সহ্য করে যাবে? শুনলে না, কেমন ঠেস দিয়ে কথা বলে আমাদের সন্দেহ করল! অথচ নিজের বোনই তো নিয়েছিল। ফিসফিস করে বলে গেল শুনলুম।'

ফেলি কলঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় চারপাশ নীরব হয়ে যায়।

'তাড়াতাড়ি কলঘর খালি হয় যেন। বেলা হলে আমি জল পাবো না।' কান্দুর গলা আদেশ করার মত শোনায়।

'আমার না হলে তো বেরুবো না। দেরী হবে।' ফেলির কথাগুলো তাচ্ছিল্যে উপেক্ষার মত শোনায়।

গা থেকে কাপড়টা সরিয়ে নীচে ফেলে দেয় ফেলি। উবু হয়ে বসে। ঝুঁকে দেখে ওর পড়ে-যাওয়া দাঁতটা। একটু আগে কলঘরে ঢুকে ফেলি কুলকুচি করে মুখ ধুতে গিয়েছিল. হঠাৎ ওপরের পাটি'র সামনের কদিন ধরে সামান্য-নড়া দাঁতটা খসে পড়ে যায়। দাঁত পড়ে যেতেই ফেলির মাথা গরম হয়ে ওঠে। দাঁতের সামনে নয়, পিছনে পুরনো পাইওরিয়া ছিল। তাতে মুখে দুর্গন্ধ হত। তা ঢাকতে ফেলি পান খেতে শুরু করে। কিন্তু এভাবে হঠাৎ আজই পড়ে যাবে ও ভাবতেই পারে নি। অথচ আজই বিকেলে যে সমীরের সঙ্গে দেখা করার কথা, কি করবে?

মনের এমন অসহায় অবস্থায় সাবান খুঁজতে গিয়ে দেখে, সাবান ভিজে, বেশ খানিকটা ক্ষয়ে গলে গেছে। ফেলি আর সামলাতে পারে নি নিজেকে। এখন দাঁতটা হাতে নিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। কি ভেবে নোংরা দাঁতটা কলঘরের জানালা দিয়ে বাইরের ড্রেনে ফেলে দেয়। নিজের কষ্টের পয়সায় কেনা সাবানটার এতটা ক্ষয়ে যাওয়ার দুঃখ ওকে নেলির ওপর এক চাপা রাগে ধরে রাখে।

স্নান সেরে ওপরে উঠে এসে ফেলি কাপড় বদলায়। দূরে রান্না ঘরের সামনে এসে দেখে, নেলি মায়ের রান্নার যোগাড় দিতে ব্যস্ত।

'মা তুমি বলো, কেন নেলি আমার সাবান নেবে?'

নেলি তাকিয়ে থাক ফেলির দিকে।

'তাতে কি হয়েছে, বোন একটু নিয়েছে।' সৌদামিনী ফেলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ ফেলি নেলির চুলের মুঠি ধরে। ঠাস ঠাস করে চড় মারে গালে। মুখটা ঘসে দেয় পুরনো খসখসে দেয়ালে।

'ও কি! এত বড় মেয়েটাকে মারলি!' সৌদামিনীর স্বর সহজ। নেলীকে একবার দেখে নিয়ে ফেলির দিকে তাকায়। ফেলির রাগের চোখ নেলির দিকে স্থির। সৌদামিনী ফেলির মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যেই যেনবা সস্নেহে বলে, 'তোর কি সামনের দাঁতটা পড়ে গেছে?'

মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরে চলে আসে দ্রুত পায়ে।

এভাবে এ বাড়ির ভাই-বোনেদের ঝগড়া চলে। আবার ভাবও হয়ে যায়। ফেলিরা পাঁচ বোন, এক ভাই। ফেলির শুধু বড় দিদির বিয়ে হয়েছে। দিদি-জামাইবাবু এখন আসানসোলে। কাদুরা তু'বোন এক ভাই। ফেলির জ্যেঠাইমারা থাকে ছাদের ঘরে। তাদেরও ছেলেমেয়ে আছে। বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে জ্যেঠাইমা ছাদের ওপর একটা ঘর করে নিয়েছে। এতগুলি লোক নিয়ে এ বাড়ির কয়েকটি স্বার্থের ভাঙ্গাচোরা সংসার। সারা বাড়ির একটি কলঘর, একটিই পায়খানা। বাড়ির পুরুষরা সকলে অফিস বেরিয়ে গেলে মেয়েদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়া বাঁধে। কখনও কখনও পুরুষরা থাকলেও ঝগড়া বন্ধ থাকে না, তখন চীৎকার চেঁচামেচিতে আর এক দৃশ্য। উত্তর কলকাতার এমন পুরনো বনেদী বাড়ির ঐতিহ্য বস্তির মানুষকেও লজ্জা দেয়।

ফেলি সেজ বোন। তিনবার স্কুল ফাইনাল, চার বার হায়ার সেকেণ্ডারি, আর তিনবার বি. এ. ফেল করে সম্প্রতি বি. এ. পাশ করেছে। ফেলির বড় গুণ—লেগে থাকতে জানে। আর কোন বোন পারে না। ফেলির চেহারা আঁট-সাঁট, গায়ের রঙ দেখার মত ফর্সা। অন্য সব জাঠতুতো আর নিজের বোনের থেকে দেখতে বেশ ভাল। এমনি সহজ হয়ে থাকলে মুখ-চোখে একটা মিষ্টি মায়া লেগে থাকে। মাথার চুল কমতে কমতে যে অবস্থায় এসেছে, তাতে যেনবা

ফেলির বয়স চল্লিশে নিয়ে যায়। আজকাল চুলে ট্যাসেল লাগায়। বয়স ছাব্বিশ, দেখলে কুড়ির ওপর কিছুতেই ওঠে না।

ফেলি নেলিকে মেরেই ঘরে আসে। কাঠের আলমারীর ঝাপসা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেনবা নিজের বয়সটাই নিখুঁত করে জরিপ করে ফেলি মনে মনে। নিজের দাঁত দেখে। দাঁতগুলো সাজানো, মুখের গন্ধ দূর করতে পান খাওয়ার জন্যে লালচে ভাব, কিন্তু একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় কেমন বিশ্রী দেখায় নিজেকে। কি করবে এবার? সমীরের সামনে তো এভাবে আজ যেতেই পারবে না! তা হলে?

নিজেকে দেখতে দেখতেই কাপড় বদলায়, মুখের দু'দিকের চিবুকের ওপর ছুলির দাগ লক্ষ্য করে। দু' কানের ভেতর ফরফর করায় মাথার কাঁটা দিয়ে কানের ময়লা টেনে নাকের কাছে এনে ভিজে কাপড়ে মুছে নেয়। নাক খোঁটে কিছু সময় ধরে। কলঘরে এত করে নাক পরিষ্কার করল, তাতেও হয়নি। ফেলি সেই পচা সর্দি'র গন্ধ পায়। সর্দি'র ধাতটা ওর যাবার নয়। মায়ের ওপর রাগ হয়। মায়ের জন্যই ওর এমন ধাত। বুকে সর্দি বসলেই পচা সর্দি'র গন্ধ ওকে সব সময় বিরক্ত করে। আগে বিরক্ত হত না, সমীরের সঙ্গে মাস তিনেক আগে আলাপ হওয়ার পর থেকে ফেলি এসব নিয়ে বিরক্ত বোধ করে।

সমীরের সঙ্গে ওদের কলেজেই একদিন আলাপ। রত্নার প্রেমিক প্রদীপ। প্রদীপ যে অফিসে কাজ করে, সেই অফিসেই সহকর্মী সমীর। প্রদীপ এসেছিল কলেজে রত্নার কাছে। সমীরও সঙ্গে ছিল। রত্না আলাপ করিয়ে দেয়। ফেলি নামটা বাড়ির ডাক-নাম। রত্না বা কলেজের পরিচিতদের কেউই তা জানে না। কলেজে ফেলি হল দেবযানী মল্লিক।

'বাঃ, সুন্দর নাম তো আপনার।' প্রথম দিন পরিচয় হওয়ার সময় নাম শুনে সমীর ফেলিকে মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে বলেছিল।

'শুধু নাম সুন্দর নয়, যার এই নাম, সে-ও কিন্তু খুব সুন্দর।' বলেছিল রত্না।

ফেলি লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করেছিল। ফেলির এমন লজ্জা বাড়ির লোক কেউ কোনদিন দেখেনি। ওর দাদা বৈদ্যনাথের বন্ধুদের সামনেও এমন লজ্জা আসেনি ফেলির, বরং বৈদ্যনাথের এক বন্ধুকে এমন আচমকা কাঁসার বাটি হাত থেকে পড়ে যাওয়ার মত শব্দের গলায় মুখ করেছিল, সে তো আর বাড়িতেই ঢোকেনি। সেদিন ওরা চারজনে রেস্টুরেন্টে খেয়েছিল।

কেলির বন্ধু রত্নার বয়স সে সময়ে সত্যিই কুড়ি।

সমীর জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনারা দুই বান্ধবী বয়সে একই রকমের দেখছি।'

কেলি আবার লজ্জা পেয়েছিল। ওর মনে ছিল ওর বয়স ঠিক ছাব্বিশ, কিন্তু মা আজও বলে আঠারো। ও আরও লজ্জা মিশিয়ে বলল, 'জানেন, মা বলে আঠারো, একটু কমায়। আসলে আমার বয়স কুড়ি।'

সমীর মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন অকপটে একটি মেয়ে নিজের বয়স না কমিয়ে ঠিক-ঠিক বলে যাওয়ায় ওর কেলির ওপর চাপা আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে। এমন সহজ সরলভাবে সত্যি কথা বলতে কোনদিন কোন মেয়েকে দেখেনি সমীর। ওর দু'চোখের তারা প্রীতি-মেশানো শ্রদ্ধায় ঘন হয়ে আসে।

রত্না চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনি আচ্ছা মানুষ তো!' সমীরের দিকে কটাক্ষ করে, 'মেয়েদের বয়স জানতে চাইছেন?'

প্রদীপ টেবিলের তলায় ওর পা দিয়ে রত্নার পা চাপে। চোখের ইশারা করে।

রত্না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সামলে নেয়। মুহূর্তে বুঝে যায়, সমীর বয়সে দেবযানীর সঙ্গে ম্যাচ করবে কিনা তাই বুঝতেই এমন অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা। চাপা হাসে।

'আমার বয়স কিন্তু ছাব্বিশ! কি রে প্রদীপ তোরও তাই না।' সমীর কেলিকে একবার দেখে নিয়ে প্রদীপের দিকে তাকায়।

হো হো করে হেসে ওঠে প্রদীপ। 'আমাদের চারজনের কি অদ্ভুত মিল দ্যাখ, ওরা দুজনেই কুড়ি, আমরা দুজনেই ছব্বিশ। সমীর, এবার বন্ধুত্বটা তুই ব্যালান্স কর।'

কেলি কথাটার সূক্ষ্মতা ধরতে পারে না। রত্না ওকে চিমটি কাটে। দু'চোখে গভীর ইঙ্গিত নিয়ে কেলির দিকে তাকায়, তাতেও বোঝে না। তবু কোথাও কোন একটা মজার সম্পর্কের মানে আছে ভেবে মুখ টিপে হাসে। ও যে কিছু না বুঝে হাসছে, বোঝা যায় না। সমীরের দিকে তাকায়। সমীর তখন একভাবে কেলিকে দেখে যায়। কি মিষ্টি হাসি কেলির!

তখন কিন্তু দু'পাশের চিবুকে এমন ঝুলি ছিল না। কেলি আয়নায় ঘনিষ্ঠ হয়ে মুখ দেখতে দেখতে পাউডারের প্যাফটা ঘষতে থাকে। পুরনো স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করে। কোত্থেকে যে এসব এলো!

তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করে হাতের ব্যাগ গোছায়। বাইরে আসে কেলি: 'মা, আমি একটু আসছি।'

'এই তো টিউশিনি থেকে ফিরলি, কোথায় বেরুচ্ছিস ?'

'দরকার আছে, আসছি এখুনি।' হাতের ব্যাগের মধ্যেটা দেখে নেয়। ব্যাঙ্কের পাশ-বই, চেক-বই ঠিকমত নিয়েছে সে। রাস্তায় নেমে ঠিক করে নেয়। ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলবে। তারপর পাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে যে ডেন্টিস্টের চেম্বারের কথা মনে পড়ছে এখন, ওখানে যাবে। জানে, এখন খোলা নেই, জেনে আসবে কটায় খুলবে। আজ দেখা করতে পারবে না, সেটা সমীরের অফিসে এখনি ফোন করে জানাবে না। ডেন্টিস্টের সঙ্গে কথা বলে ডেটটা ঠিক করবে। ফেলির মনটা একটু খিঁচিয়ে ওঠে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে খারাপ লাগে। টিউশনির জমানো টাকার একটি পয়সাও ওর কাছে এক বিন্দু রক্ত। তবু...। সমীরের মুখটা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় ওদের বাড়ির পরিবেশ। বাড়ি থেকে তো এবার চলে যেতে হবে। সমীর তার একমাত্র সঙ্গী যে। সমীর ওকে ভালবাসে।

ডেন্টিস্টের চেম্বার দুপুর তিনটের সময় খুলে যায়। ফেলি তার একটু পরেই এসে পড়ে। ডঃ পি. দাস ফেলিকে চেয়ারে বসিয়ে পিছনে একেবারে শুয়ে পড়ার মত ঠেস দিতে বলে। ঝুঁকে ফেলির দাঁত মাড়ি পরীক্ষা করেন।

'মিস মল্লিক! কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলব?' ডাক্তার সংকোচ বোধ করে।

ঘাড়টা আরামে ফেলে রেখে ফেলি বলে, 'বলুন।'

'আপনার কি একটু বেশি সর্দি'র ধাত?'

ফেলি ডাক্তারের চোখে চোখ রাখে। ভিতরে বিরক্ত বোধ করে। দাঁত দেখিয়ে দাঁত বাঁধাতে এসেছে ও, হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ কেন?

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আমরা তো ডাক্তার। আমাদের সবই দেখতে হয়।' ডাক্তার হাতের যন্ত্রটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখে। 'আপনার শ্বাসে পচা শুকনো সর্দির গন্ধ আছে।' থেমে যায় ডাক্তার।

ফেলি সোজা হয়ে বসে। 'ডাক্তারবাবু, কি করে এটা সারাই বলুন তো?'

'আপনার নীচের দাঁতেও পাইওরিয়া, মুখেও একটা গন্ধ। ব্যাড ব্রেথ বন্ধ করার চেষ্টা করুন, না হলে, আলটিমেট্‌লি ইউ উইল সাফার ভেরি মাচ।'

'আপনি তো ডাক্তার, এ্যাড্‌ভাইস্‌ করুন না!' ফেলি জড়োসড়ো হয়ে বসে

থাকে। ডাক্তারের হাতে একটুকরো নরম ময়দার তালের মত জিনিসটার দিকে লক্ষ্য রাখে।

ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে। 'আপনি যেমন ছিলেন তেমনিভাবে শুয়ে পড়ুন।' ফেলি আগের মত ঠেস দিয়ে শুলে ডাক্তার আরও ঝুঁকে পড়ে। 'আপনি বরং প্রতিদিন বার কয়েক ওডিকোলন দিয়ে গার্গ্‌ল্ করবেন, পারলে মুখও ধোবেন, গন্ধটা বোঝা যাবে না।' হাতের নরম জিনিসটা ফেলির দাঁতের ওপরের পাটির সারিতে মাড়ির গায়ে চেপে বসিয়ে চাপ দেয়। 'নীচের দাঁতগুলো দু'তিন সিটিং-এ মাজিয়ে নিন আমার কাছে। আপনার ট্রাব্‌ল্ কমবে।'

এতক্ষন ছাপ উঠে এসেছে। ডাক্তার নরম জিনিসটা ওপরের মাড়ি থেকে খুলে নেয়। দেখে নিখুঁত করে।

ফেলি মন দিয়ে ডাক্তারের কথাগুলো শোনে। নাক আর মুখের গন্ধ ঢাকা যাবে একসঙ্গে এমন ব্যবস্থায় খুশি হয়। সমীরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এটাই ওর ভাবনা ছিল।

'এবার উঠব?' ফেলি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার দাঁতের ছাপটা সাদা ট্রেতে রাখে। দাঁতের রঙ ম্যাচ করার জিনিসটা হাতে নেয়। ফেলির দাঁতের পক্ষে কোন্‌টা ম্যাচ করবে তা ধরতে বেশ কিছু সময় দেখে। 'আপনি কিন্তু আর পান খাবেন না। দাঁত লাল থাকলে তৈরী দাঁতটা বোঝা যাবে।' ডাক্তার সরে আসে সামনে থেকে। 'আপনারা কলেজে পড়া মেয়ে, ভেরি ইয়াং, বাঁধানো দাঁত বিয়ের আগে কাউকে বুঝতে না দেওয়াই ভাল।' মৃদু হাসে যুবক ডাক্তার। 'নেমে পড়ুন, হয়ে গেছে।'

ফেলি চেয়ার থেকে নেমে পাশের বেঞ্চে বসে। ছোট চেম্বার, অবশ্য দাঁতের সাধারণ ডাক্তারের পক্ষে এটাই যথেষ্ট। ফেলি বলে, 'আপনি তো ওডিকোলন ব্যবহার করতে বললেন, তাহলে আর পান খাবো কেন?'

'ইয়েস, এটাই ঠিক।' যুবক ডাক্তার কাঁধ স্রাগ করে ফেলির দিকে তাকিয়ে বলে, 'তবে যা বললাম, দাঁতগুলো একবার আমার কাছে মাজিয়ে নিন। অনেকটা কিওর্ড হবেন আপনি। টাকা খুব একটা লাগবে না।'

ফেলি উঠে দাঁড়ায়। হাত-ঘড়ি দেখে। ডাক্তারের শেষ কথায় কান দেয় না। ও জানে, দাঁত মাজাতে অনেক খরচ। 'ডাক্তারবাবু, দাঁতটা পাবো কবে?'

ডাক্তার হাত ধুতে থাকে বেসিনে। 'মাস তো শেষ হয়ে গেল। এক তারিখে বা মাসের শেষেই বিকেলে আসুন, পাবেন।'

'মাসের শেষেই বরং আসব।' ফেলি কি ভেবে কথাটা ঠিক করে। ডাক্তারের হাতে এ্যাড্‌ভান্স পাঁচ টাকা দেয়, 'চলি ডাক্তারবাবু, ঠিক সেদিন এসে যেন পাই!'

'ও সিওর।' ফেলির সামনে সোজা দাঁড়িয়ে ডাক্তার আবার ভদ্রতা ও সম্ভ্রমে স্মার্ট হতে গিয়ে কাঁধ শ্রাগ্‌ করে।

ফেলির এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। দ্রুত পায়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে। দেরী হয়ে গেছে খুব। এখনি সমীরের অফিসে ফোন করতে হবে। আজ বিকেলেই ওদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যদি অফিস থেকে বেরিয়ে যায়, সব গোলমাল হয়ে যাবে। প্রাইভেট ফোন থেকে বরং পোস্ট-অফিসের টেলিফোনে কম পয়সা লাগে। ফেলি মোড়ের পোস্ট-অফিসে চলে আসে। রিসিভার তুলে ডায়াল করে সমীরের অফিসে।

'হ্যালো, সমীর ঘোষ আছে?'

'কথা বলছি।'

'ইস, তুমি! এই শোন।' ফেলি চাপা নরম গলায় বলে। নিজের গলার স্বরে নিজেই ঈষৎ অবাক হয়। এভাবে কারোর সঙ্গে কোনদিন ফেলি কি কথা বলেছে, না, বলে?

সমীর খুশিতে উপচে ওঠে। 'দেবযানী, তুমি!'

'হ্যাঁ কেন, চিনতে পারছ না?'

'তোমার গলা কি মিষ্টি, আহ্‌, ইউনিক দেবযানী। ফোনে কারোর গলা এত মিষ্টি হয়, এই প্রথম বুঝতে পারলাম।'

ফেলি ভিতরে খুশি হয়। সমীরের প্রশংসা শোনার জন্যেই ও আরও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।

'দেখ দেবযানী, তা হলে কেন তোমাকে আমি গান শিখতে বলি!'

'থাক ওসব কথা।' ফেলি আদুরে গলায় কৃত্রিম ধমক দেয়। 'শোন, আজ কিন্তু আমাদের দেখা হবে না।'

'সে কি, কেন?'

'বাড়িতে মা আর বোনদের নিয়ে একটু বেরুতেই হবে। মা-বোনদের আবদার, কিছুতেই ছাড়ছে না ওরা।'

'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

'শোন, কবে আবার দেখা করবে বলো?'

'সত্যি আসতে পারবে না! ধরো, আমি না হয় ঘণ্টা দুই পরে মিট করব, তুমি ওদের ছেড়ে দিয়ে এসো!'

'না, তা হয় না। তুমি তাড়াতাড়ি বলো, কবে দেখা করবে।'

সমীর একটু ভাবে। 'শোন, মাসের শেষ দিক তো। অফিসের পে বিল করার ব্যাপার-স্যাপার আছে। এক কাজ কর, বরং এক তারিখেই এসো। ভাল দিন!'

'তাই।' ফেলি কি ভাবে। 'জীবন-দীপ'-এর সামনে তো!'

'নিশ্চয়ই। অফিস থেকে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে দেখতে পাবো। বেশী দূরে তখন তুমি থাকলে আই উইল ডাই দেবযানী!'

ফেলি রিসিভারের সামনেই ফিক করে হেসে ফেলে। 'রাখছি।' ওপাশ-থেকে কিছু শব্দ শোনার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখে। ফোন করতে করতে বার বার ঘড়ি দেখছিল ফেলি। তিন মিনিট হয়ে গেলেই যদি এক্সট্রা চার্জ করে!

নাহ্, এক মিনিটের বেশী হলেও ফোনের সামনে-বসা ভদ্রলোক কমই রসিদ করলেন। ফেলি পয়সা দিয়ে রাস্তায় নামে। রাস্তায় বিকেলের ভিড়। ওপরের পাটির দাঁতের ফাঁকা জায়গাটায় জিভ বোলাতে বোলাতে ফেলি রাস্তা পার হয়। সামান্য দূরেই মনোহারি দোকান। একটা ওডিকোলনের শিশি কিনবে, তারপর পড়াতে যাবে ও।

দুপুর তিনটেয় কোনদিন কলঘরে ঢোকে না ফেলি। কিন্তু আজ এক তারিখ। সাড়ে চারটের মধ্যে 'জীবন-দীপে'র সামনে পৌঁছতেই হবে। রাতের টিউশানি যাবে না। তাই কাউকে কিছু না বলে কলঘরে ঢুকে পড়ে ফেলি। সবে মাত্র গায়ের কাপড় সরিয়ে জামা খুলতে গেছে, কলঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা, 'কলঘরে এখন কে ঢুকল আবার! খোল।' কান্দুর মায়ের গলা।

'আমি।' ফেলি গম্ভীর গলায় বলে। গত দু'দিন আগে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে কান্দুদের সঙ্গে, সারা বাড়ির যাতায়াতের কমন প্যাসেজ নোংরা করা নিয়ে। ফেলির মা কান্দুর মা সমানে ঝগড়া করে। চীৎকার করে বাড়ি ফাটায় কান্দু আর ফেলি। ফেলির খনখনে চেরা গলা বাড়ি মাথায় করে। বেলি, নেলিও ঝগড়ায় যোগ দেয়। ফেলি বোধ হয় মারতে গিয়েছিল কান্দুর মাকে, কান্দু তেড়ে এগিয়ে আসতে ফেলি বাপ-মা তুলে গালাগাল দেয়। অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায় কান্দুর পাড়ার কোন্ ছেলের সঙ্গে দুপুরে একা একা গল্প করা নিয়ে কথা বলে, তাতে কান্দুর মায়ের সঙ্গে ফেলির হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়।

সেই থেকে কথা বন্ধ। এই মুহূর্তে কান্দুর মায়ের গলা পেয়ে ফেলি স্বর গম্ভীর করে। কান্দুর মা জোরে ধাক্কা দেয় দরজায়। 'খোল, আমি কি পায়খানার কাপড়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব!'

'তাতে আমি কি করব? এতক্ষণ আসো নি কেন?' ফেলি গলা চড়ায়।

কান্দুর মা হঠাৎ মাথা গরম করে, 'হারামজাদি, চোখে দেখিস নি, আমি পায়খানায় আছি!'

ফেলি শব্দ করে দরজা খোলে। 'গালাগাল দেবে না বলে দিচ্ছি। এই ভর দুপুরে তুমি কোথায় আছ খুঁজতে যাবো?'

কান্দুর মা ভ্যাংচায়। 'তা হলে এবার তোর সামনেই ওই কাজটা করব, কষ্ট করে তোকে খুঁজতে হবে না। তুই যেমন মেয়ে তেমনি চাস তো!'

ফেলি হঠাৎ উপরের দিকে তাকায়। অকারণ গলায় একটা চীৎকার করার শব্দ করে। দু'তিনটি কাকের সমস্বরে ডাক চাপা পড়ে যায়। 'দেখছ মা, কি বলছে। তুমি সাবধান করে দাও।'

ফেলির মা ঘুমোচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে। 'একটু দাঁড়াও সাবিত্রী, ওর তাড়া আছে আজ। এখুনি বেরুবে!' ফেলির মায়ের গলা খুব নরম, অসহায়।

কান্দুর মা সাবিত্রী সম্পর্কে ছোট জা। হঠাৎ ওর কি মনে হয়, বোধ হয় আর ঝগড়া চায় না, পায়খানার কাপড় থাকায় একপাশে সরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফেলি তার আগেই কলঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। গায়ে জল ঢালার শব্দ কানে আসে।

কলঘরে একটুও দেরী করা সম্ভব ছিল না এখন, ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে সোজা ওপরে আসে ফেলি। দরজা বন্ধ করে দ্রুত কাপড় বদলায়। মাথার চুলটা ভাল করে বসিয়ে নেয়। চুলের ডগায় ট্যাসেল ঝোলায়। চুলটা বসালেই মুখের চেহারা বদলে যায় ফেলির। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় আবার বাঁধানো দাঁতটা দেখে। দাঁতটা যেন ওর মাড়ি কামড়ে বসে আছে। মুখে অস্বস্তি। কালই নেবার সময় ডাক্তারকে অস্বস্তির কথা বলেছিল। ডাক্তার বলে, 'প্রথম প্রথম থাকবে, তারপর দেখবেন অনেক লুজ হয়ে গেছে, তখন আপনারই খারাপ লাগবে।'

'খুলে পড়ে যাবে না তো ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার হেসেছিল। 'কিছু হবে না, বাড়ি গিয়ে দেখুন! আপনাকে এখন দারুণ লাগছে! শুনুন, হেলদি দাঁত হল মুখের সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

ফেলি ভাল করে দাঁত দেখে আয়নায়। সত্যি, বাকি দাঁতগুলোর মধ্যে এমনভাবে মিশে গেছে, কোনটা আসল কোন্‌টা নকল বোঝাই যায় না! দেখতে দেখতে নাক খুঁটে নেয় বার কয়েক। পাউডার ঘষে চিবুকের ছুলির দাগ চাপা দেয় সযত্নে। গায়ের কাপড় সরিয়ে জামা ফাঁক করে বুকের মধ্যে পাউডার ঢালে। পিঠময় গোল গোল চাকা চাকা ছুলি। বিশ্রী লাগে আজকাল। সমীর কি আর এই ছুলি বুঝতে পারবে? খুব ভাগ্য ভাল ঘাড় পর্যন্ত আসেনি। চিবুকের যা একটু! জামায় গায়ের সব ঢেকে যায়। ফেলি নতুন ব্রা-টা বের করে। মা ওটা কিনে দিয়েছিল গতবছর পুজোয়, ব্যবহার করেনি। পরলেই তো নষ্ট হবে। আজ কি এটাই পরবে? নাহ্, পুরনো ব্রা হাতে নেয়। তেলচিটে, ময়লা, গতকাল কেচেছে, তাতেও ময়লা যায়নি। পিছনের হুকের কাছে সবে সুতো সরতে আরম্ভ করেছে। দরকার কি নতুন পরার? সমীর তো আর এখনি…। ফিক করে হাসে ফেলি। আবার গোটা বুক ভর্তি পাউডার ঢালে। পিঠেও। দ্রুত প্রসাধন শেষ করে। ঠোঁটে লিপস্টিক দেবার আগে আর একবার ওডিকোলন দিয়ে মুখ ধুয়ে আসে।

প্রসাধন শেষ, কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেছে। ছোট বোন ডলি ঘরে ঢোকে। 'এই দিদি, আমাকে কুড়িটা পয়সা দেবে?'

'কেন?' আয়নার সামনে কাপড় ঠিক করতে করতে বলে।

'আমার যে পয়সা জমাই, দেখবে, তাতে ন' টাকা আশি পয়সা হয়েছে, আর কুড়িটা পয়সা হলেই দশ টাকা, দেবে?' বলতে বলতে দূরে দেয়াল-তাকে রাখা পলিথিনের লম্বা পুতুলটা আনে। ওরই মধ্যে পয়সা।

'না, না, যাঃ, আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

'দাও না।' ডলির উৎসাহ কমে আসে।

'ভাগ্। আমাকে এখন বিরক্ত করবি না। তাড়া আছে।'

'আমাকে সকলে দেয়, না চাইলেও দেয়, তুমি কোনদিন দাও না।'

ফেলি ডলির দিকে তাকায় না। একটানা উপেক্ষার ভঙ্গিতে নিজের প্রস্তুতিতে মেতে থাকে। ডলি পলিথিনের পুতুলটা যেখানে ছিল সেখানে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ফেলি হাতঘড়ি দেখে। এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে খিল আঁটে। ওর টিনের বাক্স খুলে ভ্যানিটি ব্যাগ বের করে। তার মধ্যে ছোট ব্যাগটা হাতে নেয়। ব্যাঙ্ক থেকে আজকের জন্যে তোলা টাকা আছে। খুচরোগুলো দেখে।

খুচরোয় ছোট ব্যাগটা ফুলে আছে, তবু যদি দরকার পড়ে ফেলি ডলির পয়সা-জমানো পলিথিনের পুতুলটার দিকে তাকায়। এগিয়ে যায়। ডিবেটা থেকে দ্রুত হাতে কয়েকটা খুচরো বের করে ছোট ব্যাগটায় নিয়ে নেয়। পলিথিনের পুতুলটা ঠিক জায়গায় রেখে দেয়।

তৈরী হয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই মায়ের মুখোমুখি পড়ে। 'তুই বেরুচ্ছিস?' সৌদামিনী ধীরে কথা বলে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'তোর বাবা বলছিল পঞ্চাশটা টাকা দিতে। দু'তিন দিন পরেই দিয়ে দেবে।'

ফেলি বিরক্ত মুখ করে। তার পরেই অবাক হয়। 'কোথায় পাবো! তোমরা কি করে চাও মা? আমি কি রোজগার করি।'

সৌদামিনীর মুখ চিন্তিত দেখায়। 'আমার কাছেও যে নেই!'

ফেলি মাকে দেখে। বাবাকে, ছেলেমেয়ে সকলকে লুকিয়ে মায়ের নিজেরই এ্যাকাউন্ট আছে দু'টি ব্যাঙ্কে। মোট পঞ্চাশ হাজার। কি করে এত টাকা হয় মায়ের? মা তো চাকরী করে না। সেখান থেকেই বা বাবাকে দেয় না কেন! অন্যমনস্ক হয়। 'রাস্তা ছাড়ো, দেরী হয়ে যাচ্ছে।' সৌদামিনী সরে দাঁড়ায়। ফেলি বেরিয়ে যায়।

'সত্যি, তুমি এত দেরী করলে!' ফেলি বাস থেকে নামা মাত্রই সমীর সামনে এগিয়ে আসে। গলা নামিয়ে কথাটা বলে। একটা সিগারেট ধরায়।

ফেলি মিষ্টি করে হাসে। চিবুক কাত করে ভুরু তুলে তাকায় সমীরের দিকে। বাড়ির পরিবেশের সেই ফেলি এখন ওর মধ্যে নেই।

সমীর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ফেলির দিকে। 'তুমি কি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ? দাঁত এত ঝকঝকে! দারুণ লাগছে!'

'তুমি একদিন বলেছিলে লাল দাঁত বিচ্ছিরি লাগে, তাই।' ফেলি হাসে। 'সত্যি, আমারও খারাপ লাগে।'

'চল, কোথাও একটু বসি। উহ্, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি!' বার কয়েক টান দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দেয়।

'কোথায় বসবে?'

'বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনের মাঠে।'

'চল।'

ওরা দুজন নরম ঘাসের ওপর মুখোমুখি বসে।

বসার পরেই ফেলির নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি ওঠে। নাক খুঁটতে গিয়ে সমীরকে সামনে দেখেই হাত নামায়।

'আজ তোমাকে একটা দারুণ জিনিস দেব। তোমার ফেবারিট।' সমীর ওর হাতের ফোম লেদারের ব্যাগের চেন টানে। হাতের মুঠি ব্যাগের মধ্যে রেখে বলে, 'বলতো কি হতে পারে?'

ফেলি জলজ্বলে চোখ করে তাকায়। সমীরকে তার এখনি ভাল লাগছে। সমীর বের করে। সাদা পাতলা পলিথিনের প্যাকেটে ঢাকা গগল্‌স্। 'নাও।'

'ওমা, এটা কেন আনলে!' খুশি চেপে ফেলি মৃদু অনুযোগ শোনায়।

সমীর সহজ হয়, খুশীও। 'তুমি একদিন আমারটা দেখে বলেছিলে না, তোমার গগল্‌স্ পরতে ভাল লাগে। নিয়ে এলাম।'

ফেলি রঙিন চশমাটা হাতে নেয়। অত্যন্ত দামী লেডিস গগল্‌স্। সমীরও ওর নিজের রঙিন চশমাটা ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছে। 'তুমি পরে দেখ। তোমাকে কি রকম মানায় দেখি।'

ফেলি পরে। এপাশ-ওপাশ তাকায়। 'ইস্, দু'চোখ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।' একটু থামে। 'চারপাশ কেমন নীল-নীল।'

সমীর আপ্লুত কণ্ঠে বলে, 'দেখাচ্ছে কিন্তু খুব ভাল। একজন নিখুঁত পবিত্র প্রেমিকার মুখ—যার অনেক অনেক কল্পনা!' সমীর নিজেরটা পরে। 'আমারটা কিন্তু হালকা গোলাপী। তুমি তো সেদিন পরে দেখেছ। এর থেকেও তোমারটা ভাল না?'

'ভীষণ ভাল।' ফেলি চোখ থেকে গগল্‌স্ সরায়। মুখের ওপর গরমের দিনের পড়ন্ত রোদ মুহূর্তে স্রোতের মত দেখা দেয়।

সমীর দেখছিল চশমা চোখে। চশমা খুলতেই গরম হাওয়া এসে লাগে। এক ঝলক। রোদে সারাদিন অফিসের কাজে ডুবে থাকা মুখের নরম চামড়ায় জ্বালা ধরে।

'এই!' সমীর বলে, 'এখন বেশ রোদ। চল, একটু ঠাণ্ডা ঘরে গিয়ে বসি।'

ফেলি অবাক হয়। 'কোথায়!'

'ওই যে, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে। আগের শো এইমাত্র ভেঙেছে। চল প্রায় এক ঘণ্টার মত ওখানে কাটিয়ে আসি। আর, মহাকাশের রহস্য—দেখবে, দারুণ ভাল লাগবে।'

ফেলি পিছন ফেরে। 'জান, আমি কিন্তু ওখানে কোনদিন যাইনি।'

'সত্যি!' সমীরের স্বর অকৃত্রিম বিস্ময়ে থপ্‌ করে যেন বসে পড়ে।

'সত্যি।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সমীর। 'চল, এখন ঢুকি। বেরিয়ে এসে বরং এখানেই এসে বসব। তখন দিনের আলো থাকবে, কিন্তু রোদ থাকবে না।'

ফেলি উঠে দাঁড়ায়। দুজনে টিকিট কেটে প্ল্যানেটোরিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কাউণ্টারে ভিড় নেই। এত বড় হল হলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বড় জোর তিরিশজন দর্শক হতে পারে। ওদের চারপাশে কাছাকাছি কেউ নেই এমন দু'টি চেয়ার দেখে দেয়ালের গা ঘেঁষে বসে পড়ে। একটা চাপা আরামে দুজনেই কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে যায়। একসময়ে সমীর ফেলির দিকে তাকায়, ফেলিও সমীরের চোখে চোখ রাখে। দুজনে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হাসে। সে হাসির অর্থ দুজনেই বুঝি জানে না।

শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের শেষ বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামতে থাকে হলে। যেন দিন শেষ হলে অদ্ভুত মায়াময় সন্ধে নামার সন্ধিক্ষণ। তারই মধ্যে যিনি বক্তৃতা দেবেন, বিরাট মেসিনের সংলগ্ন মঞ্চে এসে দাঁড়ান। একসময় চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায়। বক্তা বলতে শুরু করেন বাংলায়।

ফেলি অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশ দেখছিল। 'সমীর, দারুণ লাগছে কিন্তু!' ফিসফিস করে বলে।

'তুমি দেখ দেবযানী, চারপাশে দিগন্ত ছুঁয়ে বিশাল অন্ধকার আকাশ, অজস্র নক্ষত্র।' সমীর সরে আসে আরও ফেলির কাছে।

বেশ কিছু সময় দুজনে নিবিষ্ট হয়ে শোনে। সমস্ত হল নিথর, নিস্তব্ধ। শুধু এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সারা আকাশটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে অগণন নক্ষত্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। একসময় ফেলি আর সমীর দুজনেই ভুলে যায়, বক্তা কি বলছেন, কোন্ প্রসঙ্গ বোঝাতে চাইছেন।

'দেবযানী।' ফিস ফিস করে ডাকে সমীর। ওর হাতটা হাতে নেয়।

ফেলি তাকায় সমীরের দিকে। ওদের চারপাশে কাছাকাছি কেউ নেই ও জানে। দূরেও সামান্য কজন দর্শক। আর, এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ফেলি সমীরের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়। ফেলির মুখ থেকে ওডিকোলনের গন্ধ ভেসে আসে।

সমীর ঝুঁকে পড়ে ফেলির মুখের কাছে। 'এই, তুমি একটু হাঁ কর তো।'

'কেন!'

'এত সুন্দর গন্ধ তোমার মুখে!'

ফেলি হাসে, খুশি হয়।

'কই, হাঁ করো!'

ফেলি হাঁ করে।

সমীর ফেলির মুখের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে মিষ্টি ঘ্রাণ নেয়। যেন ঘুম ঘুম পেয়ে যায় সমীরের। 'দেবযানী।'

'বল।'

'বিয়ের পর তোমাকে আমি এই মুখে··· ···' থেমে যায় সমীর।

ফেলি হাসে। 'এই। মুখে কি?'

'কত যে আদর করব। তোমার এমন সুগন্ধ সান্নিধ্য আর সংসার তখন এক।'

ফেলি গলা আরও নামায়। সমীরের ঠোঁটে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিয়ে সামান্য সরিয়ে নেয়। 'এখনি বা আপত্তি কিসের!' চাপা হাসে ফেলি। শুধু বাঁধানো দাঁতটার কামড়ে ধরে রাখার অনুভূতিটা ওকে হঠাৎ একটা ভয় দেখিয়ে এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক করে। যদি খুলে যায়!

সমীর সাহস পায়। ফেলির ঠোঁট ঠোঁটে চেপে ধরে। স্থির অনড়। ওদের মাথার ওপরে তখন অজস্র নক্ষত্র পাক খেয়ে যায়। কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত। কোন্‌টা ধ্রুবতারা, কোন্‌টা মঙ্গল গ্রহ, কোন্‌টা চাঁদ গোড়াতেই ওরা বুঝে নিয়েছে। এখন ওডিকোলনের গন্ধ চুম্বনের সঙ্গে মিশিয়ে সমীর যেন আকাশটাকে একেবারে কাছে পায়। যেন ওর প্রেমিকা দেবযানীর মুখের মধ্যে। সমীর উন্মাদের মত চুমু খেয়ে যায় একটানা। একবার মঙ্গল গ্রহে, একবার চাঁদে, একবার শুধু তারায়। পরমুহূর্তে আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্রের আলোয় আলোয়। বক্তা এই মুহূর্তে সারা হল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার করে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ আর উল্কাদের উদ্দাম গতির রূপ, স্বরূপ, তাৎপর্য বুঝিয়ে চলেন বক্তৃতার আবেগে, আন্তরিকতায়।

প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে ওরা আবার উল্টোদিকে ফাঁকা মাঠের একটু ভিতরে গিয়ে বসে। দুজনের কোন কথা নেই। বসার পর দুজনেরই চোখে চোখ আটকে যায়। হেসে ওঠে দুজনেই।

'আমি কোনদিন দেখিনি তো, দারুণ লেগেছে।' ফেলি মুগ্ধ গলায় বলে।

'আমারও।' সমীর হাসে। 'আগে দেখেছি, তবে এভাবে নয়।' সমীর একভাবে চেয়ে থাকে। 'তোমার দাঁত দেবযানী তোমার সম্পদ।'

ফেলি খুশির হাসি হাসে।

সমীর একভাবে তাকিয়ে থাকে ফেলির দিকে।

ফেলি পিছনে হাত রেখে ঠেস দেওয়ার মত আরাম করে। ডান দিকের বুক থেকে কাপড় সম্পূর্ণ সরে গেছে জেনেও অলস উদাসে বসে থাকে। শরীরের সূক্ষ্ম স্বভাবে এই মুহূর্তে যেন কোন প্রয়োজন নেই ফেলির।

সমীর ফেলিকে স্পষ্ট দেখে। ফেলির মুখ, বুক, শরীর। মৃদু হাসে। কি ভেবে বলে, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমার গগল্‌স্‌-এর মধ্যে দিয়ে দেখি।' গগল্‌স্‌ বের করে। চোখে লাগায়। ফেলিকে এবার রঙিন কাচের আড়ালে নিজের মত করে দেখে। মুখের চামড়া গোলাপী। খোলা একটা বুকে মিষ্টি আপেলের রঙ। ফেলিকে সমীরের নিখুঁত প্রেমিকার মত মনে হয়।

'দেবযানী।' ডাকে সমীর।

'কি ?'

'তুমি কথা বলো। তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করে। কি সুন্দর গলা তোমার !'

সমীরের কাছে থাকলে সত্যিই যে কখন গলা নরম হয়ে যায়, ফেলি নিজেও বুঝতে পারে না। নিজেই অবাক হয়! অথচ বাড়িতে! বাড়ির কথা মনে হতেই অস্বস্তি বোধ করে।

'তুমি আজ মাইনে পেয়েছ না ?' খুব নরম গলা ফেলির।

'শুধু মাইনে নয়, বোনাসও। দেখবে ?' সমীর নতুন নোটের বাণ্ডিল ব্যাগ থেকে বের করে দেখায়।

'এত !' ফেলি অবাক হয়, পুলকিতও। এপাশ-ওপাশ তাকায়। 'এই, এভাবে বের কোরো না, রেখে দাও।' গলা সন্তর্পিত।

সমীর রেখে ব্যাগ বন্ধ করে। 'একটু পরে উঠে এসপ্ল্যানেডে চলে যাবো। ওখানে ভাল করে খাবো। তোমাকে আজ প্রচুর খাওয়াবো।'

ফেলি একভাবে বসে থাকে। আর একটা দিকের বুকের কাপড় হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঈষৎ সরে গিয়ে থেমে যায়। এমনভাবে বসে থেকে ফেলি অন্যমনস্ক হয়ে যায়! সমীরের এই সমস্ত টাকা একদিন ওর হয়ে যাবে! স—ব! যেমন বাবা সব টাকা এনে মায়ের হাতে দেয় সেইভাবে দেবে তো ?

'দেবযানী।' সমীর চোখ থেকে চশমা খোলে না। 'বিয়ের পর আমি কি করব ভেবেছি জান ?'

'না বললে জানব কি করে ?'

'সব টাকা আমি তোমার হাতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো। সব দায়-দায়িত্ব তোমার।' ফেলির সম্মতির আশায় তাকিয়ে থাকে।

'ভালই তো!' চাপা খুশি স্বরে লেগে থাকে ফেলির।

'বাড়িতে এখনো আমি ঠিক কতো পাই বলিনি। তোমার কাছে কিন্তু সব হিসেব থাকবে। একটাও মিথ্যে না।'

ফেলি নিবিষ্ট চোখে সমীরকে লক্ষ্য করে যায়। 'আমাদের বিয়ের পর কিন্তু আরও টাকা লাগবে।'

'নাহ্, এতেই যথেষ্ট।' সমীর মৃদু আপত্তি জানায় হাসতে হাসতে।

ফেলি চুপ করে থাকে। আবার অন্যমনস্ক হয়। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়! বাবার সব মাইনে নিয়ে মা বাবার নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। বাকি সব টাকা সরিয়ে গোপনে নিজের নামে। সংসার চালায় যতটা সম্ভব কম টাকায়। খাওয়ার কোন বিলাসিতা যেমন করে না, প্রয়োজনটাকে চরম অভাবের দোহাই দিয়ে মানায়। গোপনে আত্মীয় স্বজনের বিপদের সময় গয়না বন্ধক নিয়ে, অন্যের কাছে বাঁধা রাখত—এই মিথ্যে বলে নিজের কাছে রেখেই টাকা মোটা সুদের হারে ধার দিত। বাবার টাকাই। তাতেই মায়ের অনেক টাকা এখন ব্যাঙ্কে। মা কেমন বাবার টাকা সরাতো চালাকি করে। দিদি-জামাইবাবু যখন কলকাতায় ছিল, ওদের বাড়ি এলে বাবা খাবার খাওয়ার জন্য টাকা দিত। মা খুব সামান্য খরচ করে বাকি সব লুকিয়ে ফেলত, কখনো বা জামাইবাবুকে খাওয়াতোই না। ভিতরে একটা চাপা খুশি তৈরী হয় ফেলির! গুছিয়ে সংসার করার লোভ। একটু আগে দেখা সমীরের মোটা টাকার বাণ্ডিলটা চোখের সামনে ভাসে। বাবাকে মা মাসের শেষ হলেই বলত, 'এমাস চলার আর টাকা নেই, যেভাবে হোক ধার করে আনো।' বাবা ক্রমশ ওভারটাইমে ডুবে যায়! ওভারটাইম মানে ডবল টাকা!

'কি ভাবছ ?' সমীর হঠাৎ প্রশ্ন করে। হাতে ওর সদ্য-ধরানো সিগারেট।

'আচ্ছা, তোমাদের অফিসে ওভারটাইম আছে ?'

সমীর হঠাৎ এমন কথায় অবাক হয়। 'হাঁ, আছে, তবে আমি করি না। ওভারটাইম করা মানে লাইফ শেষ দেবযানী। ব্যাপারটাই হরিবল্।'

ফেলি কোন কথা বলে না।

'এবারে পুজোয় নানা খরচের প্ল্যান দেবযানী। তুমি খুশিই হবে। গতবার তো তুমি কাছে ছিলে না ?' সমীর নতুন প্রসঙ্গ ধরে।

'যেমন।'

'এবার তোমার শাড়ি জামার জন্যে বাজেট শ' আটেক।'

ফেলি রাণীর মত নিজেকে ভাবে কয়েক মুহূর্ত।

'তোমার তো আর এটুকু ইন্‌কাম নয়।' ফেলি যেন আরও কিছু বলতে চায়।

'বাবাকে জামা-কাপড়, জুতো, গেঞ্জি দিতে হবে। বুড়ো বাবা আমার জন্যে সারা জীবন যা করেছেন, তাঁর ঋণ তো শোধ করা যায় না।' একটু থামে। 'বাবাকে গুছিয়ে সব দামী দামী জিনিস দি। এবারে তুমি আছ একসঙ্গে কিনব।'

'তোমার তো আরও ভাই আছে।' ফেলি সোজা হয়ে বসে বুকের ওপর কাপড় টানে।

হঠাৎ এমন কথার কোন তাৎপর্য সমীর বুঝতে পারে না। তার প্রেমিকা দেবযানী তার সামনে। অনেক কল্পনা, অনেক আশা রামধনু-রঙ মেঘের মত ভেসে যায়।

'জানো, মাকেও যা দিই পুজোয়, বাড়িতে সব অবাক হয়ে যায়। আমার বাবা মা আমার বড় সেন্টিমেন্টের জায়গা! তুমি এলে দেখবে বাবা মা কি রকম মানুষ।'

ফেলি ভুরু কোঁচকায়। চুপ করে সমীরকে জরিপ করে।

'আর একটা ছোট বোন আছে। যা হুল্লোড়ে না! ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট, পড়াশুনা ভালবাসে। আমার তো আর অত দূর হল না! ওকে ভীষণ ভালবাসি। ওর জন্যে প্রতি বছর পুজোয় খুব ভাল রকমের মার্কেটিং, সিনেমা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া বাঁধা।'

ফেলি হঠাৎ বিরক্ত হয় নিজের ভিতরে। 'এত খরচ করো! এর পর আবার তোমার!'

'আমার সামান্যই!'

'তুমি তাহলে জমাও না একটুও।' ফেলির স্বরে বিস্ময় ও বিরক্তি একই সঙ্গে মিশে থাকে।

'এখন তো এইভাবে চলুক, পরে ভাবা যাবে।' সমীর হাসে। 'তুমি এলে!'

ফেলি আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়িতে এক পিসি ছিল। ছিল ফেলির ঠাকুর্দা, ঠাকুমা। তাদের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করতে দিত না মা। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে এক এক সময় তুমুল ঝগড়া হত। কিন্তু বাবা ঠিক মায়ের কথা মেনে নিত। ফেলি সমীরকে দেখে। মায়ের তখন স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। বাবা ওভারটাইম খেটে এসে মায়ের কাছে জুজু হয়ে যেত। ফেলির চোয়াল শক্ত হয়। সোজা হয়ে বসে কি ভাবে। চুলের বেণীটা বুকের ওপর আনে।

'আমার কিন্তু অনেক কিছু ভালো লাগে না জান সমীর। অনেক বাড়াবাড়ি মনে হয়।' ফেলি সমীরের দিকে তাকায় না।

সমীর এই মুহূর্তে ফেলিকে অন্য চোখে দেখছিল। ফেলি—ওর প্রেমিকা দেবযানী—চিরকালের অন্তরঙ্গ। ফেলির কথার কোন গুরুত্বই দিল না। কোন তাৎপর্য ভাবতে চাইল না। বলল, 'তোমাকে কিন্তু ভীষণ ভাল লাগছে দেবযানী এই ভঙ্গিতে। এমন বুক, এমন শরীর, এমন মুখ-চোখ-নাক। একটু দাঁড়াও, গোলাপী চশমাটা চোখে দিয়ে দেখি আরও কত সুন্দর হও তুমি!' সমীর ওর রঙিন চশমাটা চোখে দেয়।

ফেলির চোয়ালে আবার ভাঁজ পড়ে। কঠিন, তবু হাসে। যেন, বুঝিবা শ্বাপদ-শয়তানের চোখে সমীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে যেন ফেলি একটা রূপালি মাছ! শীতলভাবে হাসে। হাসিটা মুখে লেগেই থাকে। বুকের কাপড় বেণীর দোলায় সরে যায়। দুই বুকের মাঝখানে আঁচল আটকে থাকে। ফেলি শরীরের সূক্ষ্মতা নিয়ে আর ভাবে না। জানে, এমন শরীরটাই চিরকালের সত্য।

'এই, তুমি তোমার চশমাটা পরো। দুজনে দুজনকে দেখি। কার কি রকম লাগে, চমৎকার একটা দেখার খেলা হবে।'

'না।' ফেলি ঘাড় নাড়ে, হাই তোলে। বাঁ হাতের মুঠোয় সমীরের দেওয়া চশমাটা ধরে ঘাসের ওপর হাতটা রাখে। মনে হয় এখনি চাপে এটা ভেঙ্গে যাবে। 'তুমি আমাকে দেখো, আমার ভীষণ ভাল লাগছে এভাবে তোমার কাছে থাকতে।'

সমীর হাসে। রঙিন চশমাটা ভাল করে চোখের ওপর বসিয়ে নেয়। এখন ওর চোখের সামনে ওর প্রেমিকা দেবযানী ছাড়া কিছু নেই। নানা রঙে বিচিত্র দেবযানী!

ফেলি বড় খুশি হয়। খালি চোখে স্পষ্ট করে সমীরকে দেখতে দেখতে ভবিষ্যৎ

কোন গভীর আদরে-আহ্লাদে-আদিখ্যেতায় মেয়েদের আর একটা মনোরম ভঙ্গি শরীরে আনে। যুবতী শরীরে অনায়াস আকর্ষণ তৈরী হয়। চিবুক তুলে মাথা শুইয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। বেণীটা বুঝি সাপের মত ওর বুকের শ্বাসে শ্বাস মেলায়।

ও জানে, এমন ভঙ্গিতে, ভালবাসায় ওর নিশ্চিত বড় জেতার জায়গাটা কি, কোথায়।



আমি ও সে

হঠাৎ বাইরের দরজার মাথায় ডোরবেল বেজে ওঠে।

আমার সামনে একটু বাঁদিকে সরানো একটা টি-টেবিল। তার ওপর ক্লে-মডেলের এক বিনীত মাথার মজুর মূর্তি। ডিপ খয়েরি রঙ করা। মডেলের মাথায় পোষ মানানোর মত আমার এতক্ষণের বুলোনো বিলাসী বাঁ হাতটা কখন থেমে গেছে। আমার ডান হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের ছাই লম্বায় অনেকটা। ডান হাতেই ধরা হেডলী চেজের একটি উপন্যাস খোলা। একটা ভয়ংকর খুন হওয়ার মুহূর্ত, থমথমে পরিবেশ। আমি গিরগিটির মত গভীর-নিবিষ্ট, উন্মুখ, নিঃসাড়।

ঠিক এরই মধ্যে আচমকা ডোরবেল বেজে ওঠে। কানে এলেও আমি কিন্তু এখনো গভীর অন্যমনস্ক। আমার দুচোখ বই-এর অক্ষরগুলোর ওপর যেন জোঁকের মত লেগে থাকে। আবার সামান্য কয়েক সেকেণ্ড বেশী সময় নিয়ে ডোরবেল বেজে যায়। আমি নড়ে-চড়ে উঠি। ভিতরে চাপা বিরক্তি। একভাবে বই-এ মুখ রেখেই ডাকলাম, 'বাবু!' কয়েক মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে আমার মনে পড়ে যায়, ও তো একটু আগেই চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার গেল। বড় ছেলে তো সাত-সকালে আমারই এক জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে।

সামনের ওয়ালক্লকে চোখ রাখি। ন'টা বাজতে যায়। আজ ছুটির দিন। কখন আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। টি-টেবিল পরিষ্কার। স্ত্রী বুঝি এখনো পুজোর ঘরে। হেডলী চেজের বইটাকে টেবিল উপুড় করে রেখে হাতের নিবে-যাওয়া সিগারেট অ্যাসট্রেতে ফেলি। উঠে দাঁড়ালাম। মাথায় সিলিং ফ্যানের

বাতাস কিছুটা জড়িয়ে সরে যায়। বইটার ঝকমকে কভারের ওপর চোখ পড়ে। এক প্রায়-উলঙ্গ সুন্দরী যুবতীর আতঙ্কিত মুখচোখের ছবি। সামনেই উদ্যত পিস্তল। ছবিটা যেন একটা ঘোরে টানে। দৃষ্টি সরিয়ে দরজার সামনে আসি। ডোর-আই-এ চোখ রাখি। দরজার ওপাশে এক আগন্তুক স্থির দাঁড়িয়ে। একেবারেই অচেনা মুখ।

লকের নব ঘুরিয়ে দরজা খুললাম। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত অতি দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। 'কাকে চাই?' মুহূর্তে বুঝতে পারি, বিভিন্ন স্তরের চেনা-অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার গলার স্বরে যে নানান স্পষ্ট বদল ঘটে, এখানেও তা কানে বেজে গেল। স্বর অনেকটা দূরের সম্পর্ক জানিয়ে দেয়। চাপা বিরক্তি কিছুটা স্পষ্টই হয়ে ওঠে।

লোকটি কয়েক সেকেণ্ড একভাবে তাকিয়ে থাকে। রোগা লম্বা পুরুষ। ময়লা রঙ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। পায়ে পুরনো ধুলো-মলিন চটি। ডান দিকের কাঁধে ঝোলানো সুতির ব্যাগ। 'আপনিই তো বিশ্বরূপ পাঠক?' দু'চোখে চাপা বিস্ময় লোকটির।

আমার দৃষ্টি একবার, বলতে গেলে অকারণেই, দরজায় আটকানো ঝকঝকে নেম-প্লেট ছুঁয়ে সরে যায়। ভুরু স্বাভাবিকভাবেই কুঁচকে ওঠে। এবার বিরক্তি চাপা থাকে না। 'হ্যাঁ বলুন।'

'বোধ হয় এমন হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম!' গলা সসম্ভ্রম শোনায় লোকটির। গলা নামায়। একভাবে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমার একটু দরকার ছিল।'

আমি একটু সময় নিই। লোকটি একেবারেই অচেনা বলে একটা দ্বিধা আমার মধ্যে ঠেলে ওঠে। একে কোথাও দেখেছি কি? পরমুহূর্তে ব্যস্ত হই। এভাবে কাউকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলা ঠিক নয়। 'আসুন।' দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়াই।

'জুতো কি এখানেই খুলবো?' লোকটি ঝকঝকে মোজেইকের মেঝেয় পা রেখে অস্বস্তি আর আড়ষ্টতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমি দরজা বন্ধ করে এ ঘরে চলে আসি। 'হ্যাঁ, ওখানেই।' কোচে এসে বসে পড়ি।

লোকটি সামান্য দূরে সামনের কোচে বসে। বসার ভঙ্গিতে সসম্ভ্রম ভদ্রতা, নম্রতা স্পষ্ট হয়। আমি আশ্বস্ত হই। অচেনা হলেও—

'আপনি এখানে কদ্দিন হল এসেছেন ?' লোকটির চাপা বিস্মিত স্বরে অন্তরঙ্গ হওয়ার ভঙ্গি।

আমি গভীর দৃষ্টি দিয়ে লোকটির চোখে চোখ রাখি। 'কেন বলুন তো !'

'না, এমনি !' আমাকে দেখতে থাকে ও। 'আবছা মনে পড়ছে, আগে আপনি বোধহয় ছাতুবাবুর বাজারের কাছে একটা গলির মধ্যে থাকতেন ! তাই না ?' সারা ঘরে চোখ বুলোয়।

আমার মধ্যে সন্তর্পিত বিস্ময় জমতে থাকে। লোকটি কি আমাকে চেনে ? মুহূর্তে আমি মনের মধ্যে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে ফেলি। ছাতুবাবুর বাজার। সেই গলি ! লোকটি চকিতে আরও সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে আসে। সে তো একযুগ আগের ব্যাপার ! তখন আমি ঠিক এই লোকটির মত ছিলাম। এমন ধুতি পাঞ্জাবি-পরা, কাঁধে স্থতির ব্যাগ। পায়ে অল্পদামের চটি। সে সময়ে এই লোকটির দোহারা চেহারার সঙ্গে আমার হুবহু মিল ছিল। ক্রমশ রুদ্ধশ্বাস হই। কিন্তু লোকটি কে ? একটা চাপা সন্তর্পিত ভয় মুহূর্তে ছায়া ফেলে সরে যায়।

লোকটির কথায় কিছু বলতে যাবো, পাশের ঘরের দরজায় শব্দ হয়। আমার স্ত্রী ডাকছে। 'একটু বসুন, আমি আসছি।'

চারপাশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকায় ও। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি আসুন। বেশী সময় নেবো না আপনার।'

'না না, আপনি বসুন।' আমি উঠে দাঁড়াই। ধীরে পায়ে পাশের ঘরে চলে আসি।

আমার স্ত্রী মণিমালা আমাকে ঘরের ও-কোণে টেনে নিয়ে যায়। দুচোখে সদ্য পুজো সারার সস্নিগ্ধ ভক্তির আবেশ লেগে। 'হ্যাঁ গো, লোকটা কে ?' গলায় কিছু শব্দ, কিছু ফিসফিস।

'জানি না !' চাপা বিস্ময় থেকেই আমার উত্তর বেরিয়ে আসে।

'কিন্তু উনি যে ছাতুবাবুর বাজারের গলির কথা বলছিলেন ?' মণিমালার গলার স্বর কোন কারণে কঠিন, কিছুটা বা রহস্যময় শাসন মেশানো হয়ে ওঠে।

আমি হাসলাম। 'আমিও তাই শুনেছি। মনে হয় আমি না চিনলেও যেভাবে হোক উনি আমাদের চেনেন।'

মণিমালার দুচোখে একটু আগের পুজোর ভক্তির যে স্নিগ্ধভাব ছিল, এই মুহূর্তে তা সরে যায়। দৃষ্টি একটু কঠিন, চোয়ালের রেখা স্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। 'হঠাৎ যেন টাকা ধার চাইলে দিয়ে বোসো না। তোমার তো আবার—!'

'চাইবে কেন ?' আমি অপ্রিয় প্রসঙ্গটায় সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিই।

'আহা! চাইতেও তো পারে। পুরনো পাড়ার কথা বলছেন। নিশ্চয়ই শুনেছেন আমরা এরকম একটা ফ্ল্যাটে চলে এসেছি! অনেক পয়সা হয়েছে! হয়ত সেই ভেবেই কোথাও ঠিকানা যোগাড় করে এখানে এসেছেন।' মণিমালা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি ওর কথাটাকে স্বরে, উপেক্ষায়, তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে বলি, 'এলেও আমার কি ?'

'তুমি যা ভালো বোঝ কর। আমি শুধু মনে করিয়ে দিলুম!' মণিমালা নিজের কাজে চলে যায়।

আমি এ ঘরে আরও কিছু সময় থাকি। এটা আমার ভেতরের ঘর। একটা সিগারেট ধরাই। মণিমালার কথাই হয়ত ঠিক, লোকটি টাকা ধার করতেই এসেছে। ছাতুবাবুর বাজারের সামনে যে গলিটায় থেকেছি, তার থেকে শুধু নয়, পর পর বাসা বদলাতে বদলাতে শেষ ফুলবাগানের দোতলার ফ্ল্যাট ছেড়ে একেবারে এখানে এই দামী ফ্ল্যাটে চলে আসা! গোড়ায় ছিলাম সামান্য এক মার্চেন্ট অফিসের চাকুরে। এখন আমি একজন বিল্ডিং মেটিরিয়াল্‌স্‌-এর কণ্ট্রাক্টর। সেই সঙ্গে সরকারি অর্ডার সাপ্লায়ারও। ছাতুবাবুর বাজারের সেই এঁদো গলির জীবন আমাকে গভীর চাপা হীনমন্যতায় এখনো লজ্জা দেয়, আড়ষ্ট করে। সে জীবন ভুলেই গেছি কবে। লোকটি কেন এসে এমন মনে করিয়ে দিল ? কে, কে লোকটি ? একেবারেই অচেনা মুখ!

'ও ঘরে লোকটা একা বসে!' মণিমালা কোন বিষয়ে বুঝি আমাকে সতর্ক করার জন্যে সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওর স্বরে আমার চমক ভাঙে। এমন স্বর হঠাৎ আমায় ভয় দেখায়। লোকটি সম্পর্কে সতর্ক সন্তর্পিত হতে কোথাও বুঝি ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'এই যে যাচ্ছি।' উঠে দাঁড়াই। ব্যস্ত হই ও-ঘরে যাওয়ার জন্যে।

'চা দিতে হবে নাকি ?'

'পাঠিয়ে দাও। আমি সিগারেটের ধোঁয়ায় বুক ভরতে ভরতে বাইরের ঘরে চলে আসি।

আমি যে ঘরে এসে বসেছি, লোকটির খেয়াল নেই। সামনের টেবিল থেকে আজকের বাংলা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে মুখ গুঁজে কেমন নিবিষ্ট। ঠিক এই মুহূর্তে আমি কোন কথা বলি না। লোকটিকে লক্ষ্য করি। গায়ের ময়লা-

রঙ রোদে তেতে-পুড়ে উঠলে বুঝি এমন পুরনো তামাটে হয়। মাথার চুল অগোছালো। পায়ের পাতার শিরাগুলো স্পষ্ট। পায়ের দুপাশের সীমা বরাবর ফেটে যাওয়ার হিজিবিজি দাগ। পাশ থেকে লোকটার মুখ লক্ষ্য করি। তীক্ষ্ণ নাক। এমন নাক আর উজ্জ্বল দুটি চোখ লোকটিকে সাধারণের থেকে যেন কিছুটা আলাদা করে। বয়স কত হবে? আমার থেকে বড়, না ছোট? আমার এখন পঞ্চান্নর কাছাকাছি, লোকটি নিশ্চয়ই পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে, বা হয়ত আমার কাছাকাছি বয়স ওর। আমার নিজের পোশাকের দিকে তাকাই। এই পরিবেশে আমার এমন দামী পোশাকে আমাকে হয়ত বয়সে অনেক কমই মনে হয়। খুশি হয়ে সিগারেটে বার কয়েক টান দিই।

কাজের লোক ট্রে নিয়ে ঢোকে। সামনে দাঁড়ায়।

'নিন, চা খান।' আমি কোচে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসি।

লোকটি অপ্রস্তুত বোধ করে। মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরিয়ে ভাঁজ করে টেবিলে রাখে। চায়ের কাপ হাতে নেয়। মণিমালাই বোধ হয় দুটি বিস্কুট দিয়েছে প্লেটের ধারে। লোকটি বিনয়ে ভদ্রতায় হাসে। 'আজকের কাগজে দেখেছেন, ওদিকের কি অবস্থা?'

'কোন দিকের।' আমি অবাক স্বরে ঈষৎ ভুরু তুলি। কপালে ভাঁজের রেখা স্পষ্ট হয়। লোকটি এমন কথা দিয়ে কোন্ প্রসঙ্গ তুলতে পারে মাথায় ঢোকে না। আমি তো টেণ্ডার নোটিশের বিজ্ঞাপনগুলো নিখুঁত করে দেখে, বাকি কয়েকটা খবরের হেডলাইনে চোখ বুলিয়েই সকালের কাগজ-পড়া শেষ করেছি।

লোকটি একটু অবাক হয়েছে বোধ হয়। নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। 'গ্রামের দিকে বন্যার জল যত কমছে তত প্রবলেম মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইস কি বীভৎস অবস্থা।' স্বরে অনুশোচনার সঙ্গে দুঃখ আর গভীর অসহায়তা মেশানো। একটু সময় অন্যমনস্ক। সেইভাবেই চায়ে চুমুক দেয়।

'আর কি? নেচারকে তো ঠেকানো যায় না।' প্রসঙ্গটা থেকে সরে আসার ইচ্ছে যে আছে, আমার স্বর আমাকে বুঝিয়ে দেয়। আসলে এমন সকালে বন্যা আর তাতে ক্ষতিগ্রস্তদের কথা আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি হেডলী চেজের বইটার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিই। প্রসঙ্গ বদলে বলি, 'আচ্ছা, ছাতুবাবুর বাজারের কথা কি যেন বলছিলেন! আমাকে কি আপনি আগে দেখেছেন?'

লোকটি চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকায়। অদ্ভুতভাবে

হাসে। হাসিটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। কেন? লোকটি কি আমার চেনা? আমি হয়ত ভুলে গেছি। নাকি, আমি চিনি না, আমাকে ও চেনে!

লোকটি কাপ-ডিস সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখে। আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে বলে, 'আপনাকে ওখানেই যেন দেখেছি! অবশ্য ভুলও হতে পারে!'

আবার আমি লোকটির ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় সেই চাপা হাসি লক্ষ্য করি। কেমন চেনা মনে হয় হাসিটা, নাকি ঐ রকম হাসি দিয়ে লোকটি আমাকে কিছু চিনিয়ে দিতে চায়? কি?

'আপনি বন্যার ব্যাপারে নেচার বললেন, কিন্তু ম্যান-মেড ব্যাপারটাও এতে আছে স্যার।' একটু সামনে ঝোঁকে লোকটি।

আবার সেই প্রসঙ্গ। বিরক্ত হই। এমন সকালে ওসব দুঃখটুঃখ আমার ভাল লাগছিল না। একটা নতুন সিগারেট ধরাই। থাক, বা না থাক, লোকটিকে সিগারেট অফার, এতটা সৌজন্য দেখানোর দরকার নেই। কথাটা মনে ভেবে নিয়ে বলি, 'বাদ দিন এসব কথা। আমরা কিই বা করতে পারি বলুন?'

'কিছু তো নিশ্চয়ই!' ঠিক ছিপে মাছ ধরার মত সুযোগ বুঝে টুপ করে টেনে নেয় কথাটা ওর দিকে। 'এখন সমস্ত গ্রাম তো শহরের দিকেই তাকিয়ে আছে।'

আমি যেন একটা বিষম খাই। আমাকে কি কিছু ধমক দিয়ে শেখাতে চায় লোকটি? কি চায় ও? ওর সঙ্গে আমার তফাৎটা বুঝতে চেষ্টা করি। লোকটা চাষাভূষাই হবে। কথাবার্তায় এখনো খুব শিক্ষিত বলে মনে হয় না। তবু লোকটি শিক্ষিতের মত, একজন বুঝদার লোকের মত কথা বলতে চায়। আমার স্ট্যাটাস থেকে অনেক নীচের মানুষ। আমার এই ঘরে, আমার সামনে ওর এমনভাবে বসে থাকাটাই বেমানান। ভিতরে বিরক্তি এবার সামনে আসে। 'আপনার দরকারের কথাটা কিন্তু এখনো বলেননি!' গলা বেশী ভারী আর লোকটির থেকে দূরত্বের, কিছুটা আদেশের মত যে শোনায়, আমি বুঝি।

লোকটির মুখ-চোখ নির্বিকার। সেই রহস্যময় হাসিটা এবার বিনয়ের স্বভাব নেয়। 'আপনি তো শহরের মানুষ।' একটু থামে। কি যেন ভাবে কয়েক মুহূর্ত।

আমি ভিতরে অস্বস্তি বোধ করি। 'আপনি কি শহরে থাকেন না?'

লোকটি এবার স্থির চোখ রাখে আমার দিকে। 'ছিলাম। এখন গ্রাম-শহর মিলে-মিশে আমার কাছে এক!'

'মানে!' আমি লোকটির ভিতরের রহস্য বুঝতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলি।

'আগে এই শহরেই থাকতাম। এখন শহরের থেকে গ্রামেই বেশী কাটাই। বন্যার পরে আরও।' লোকটি থামে। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগে হাত ঢোকায়।

'গ্রাম থেকেই আসছেন তা হলে?' বলেই আমি লোকটির পায়ের দিকে তাকাই। পোশাকে চোখ বুলোই। এতক্ষণ তেমনভাবে চোখে পড়েনি। দেখি জামা-কাপড় বেশ ময়লা। লোকটি কি চাষ-বাস শেষ করে পোশাক বদলেছে?

'ঠিকই ধরেছেন। এখন গ্রাম থেকেই আসছি। বন্যায় যা দশা হয়েছে গ্রামের, জল কিছুটা নামলে নিজের চোখেই দেখে আসছি তো!' ওর স্বরে কথাগুলো স্পষ্ট শোনায়।

লোকটি কি চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে কথাগুলো? আমাকে কি কিছু শেখাতে চায়? কিছু উপদেশ? 'কিন্তু আপনি আমার কাছে ঠিক কি জন্যে এসেছেন এখনো বলেননি।' আমি এবার সোজাসুজি উত্তর চাওয়ার জন্যে ওর মতই স্পষ্ট করে কথাগুলো বলি। আমি চাই, লোকটি এখনি এখান থেকে চলে যাক।

এবারও লোকটি সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে না, কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। 'আপনার কাছে একটা আবেদন আছে।'

'বলুন।' সিগারেট টানতে টানতে আমি একভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

'বন্যার্তদের জন্যে কিছু সাহায্য করুন।'

আমি সোজা হয়ে বসি। লোকটি হঠাৎ যেন অনেক দূরে সরে যায় আমার কাছ থেকে। 'আমরা এখানে এসে অনেক দিয়েছি।' একটু থামি। 'পাড়ার ছেলেরা সব লরি নিয়ে মাইকে বলতে বলতে এসেছিল। পুরনো জামা-কাপড় চাল-ডাল, আটা অনেক নিয়ে গেছে। টাকা-পয়সাও কিছু দিয়েছি।' আমি চুপ করি।

লোকটি আমার কথা মন দিয়ে শোনে। আবার সাইডব্যাগের ভিতরে হাত, ঢোকায়। 'আমরা এ ব্যাপারে স্থায়ী কিছু করতে চাইছি।' নিজের কথায় বুঝি কোন অস্পষ্টতা আছে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'মানে টাকা-পয়সা নিয়ে এমনভাবে এগোতে চাই যাতে বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও অন্যভাবে ওদের সাহায্য করা যায়।' ব্যাগ থেকে একটা ছোট বিল বই বের করে। 'আপনাদের সমবেত সাহায্য ওদের আশীর্বাদ।'

আমি হাতের বিল বইটার দিকে চোখ রাখি। 'এভাবে কত বাড়ি ঘুরবেন?' শ্লেষে জড়াতে চেয়েছি, কিন্তু স্বর ভদ্রতায় ঢেকে যায়।

'যতটা পারি! এই পরিচিত, সামান্য-পরিচিত, শুধুই মুখ-চেনা—এমন সব খুঁজে খুঁজে বেড়াই। দেখা পেলে ধরি, খোঁজ-খবর একটু-আধটু পেলেই গিয়েই হাজির হই। এ অবস্থায় আপনাদের মত লোকের সাহায্যেই তো গ্রাম-গঞ্জ বাঁচবে।' একটু থেমে ঝুঁকে লম্বা হাত বাড়িয়ে বিলবই আমার সামনে ধরে। 'বিলের সঙ্গে লিটারেচার আছে দেখুন।'

আমি হাতে নিতে নিতে চকিতে ভেবে নিই লোকটি তাহলে পুরনো ঠিকানায় খোঁজখবর নিয়েই এভাবে এসেছে। ভিতরে বিরক্তি কুণ্ডলী পাকায়। একেবারে গোড়ার দিকের জীবন যে ভুলতে চাই। দ্রুত বিলে চোখ বুলোই, লিটারেচারেও। লোকটি কি প্রমাণ করতে চায় ও ঠগ নয়, জেনুইন? ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি লেগে থাকে। লোকটিকে কেন যেন আর সহ্য করতে পারছি না। 'নিন', বিলটা সামনের টেবিলে আস্তে ছুঁড়ে ফেলে দিই। 'কত দিতে হবে?' লিটারেচারের কাগজটা ফেরত দিতে হাত বাড়াই।

লোকটি হাসে। 'ওটা আপনার কাছে রাখুন পরে পড়বেন।' বিলটা তুলে নেয়। 'যতটা সম্ভব দিন। আপনার তো দিন বদলেছে।' স্বর সরস শোনায়।

কথাটা আচমকা ভয়ংকর ধাক্কা দেয় ভিতরে। আশ্চর্য! লোকটি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার অধিকার পায় কি করে? ঘরে এনে বসিয়েছি বলে? দিন বদলেছে মানে? আমার এই ফ্ল্যাট, পোশাক-আশাক—এসব দেখেই কি—! একটু নড়ে-চড়ে উঠি। নাকি কোন সূত্রে খবর পেয়েছে, আমি একজন বড় মাপের কন্ট্রাক্টর! কোন্ সূত্রে লোকটি এল! আমি হেঁট-মুখ লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকি। বিলের পাতায় আমার নাম-ঠিকানা লিখছে নিশ্চয়ই! আমি এখন কত দিতে পারি? দেওয়া কি উচিত আমার? মণিমালা গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছে টাকা ধার না দিতে! এটা তো ধার নয়, দান! লোকটির সঙ্গে আমার তফাৎ অনেক। লোকটি তো ভিখিরি! ওর পোশাক-আশাক, এমনভাবে চাইতে-আসা, চাওয়া, বিনয়—সবই ভিখিরির মত। চকিতে আমার দৃষ্টি ক্লে-মডেলের মজুর মূর্তিটা ছুঁয়ে যায়। এটা কি ওর দেশ-সেবা, না আত্মসেবা? এমনও হতে পারে এই বিল বই, লিটারেচার সব মিথ্যে! সমস্ত ব্যাপারটাই বানানো! টাকা যা-ই দিই, সবটাই তছরুপ। পরমুহূর্তে মনে পড়ে যায়, আজ বড় ছেলেকে একটা বেশ মোটা টাকার কন্ট্রাক্টরির যোগাযোগে পাঠিয়েছি।

লোকটিকে কিছু না দিয়ে ফেরানো দিন শুক্রর পক্ষে অমঙ্গল। ঠেস দিয়ে বসি কোচে। বাঁ হাতটা বুশশার্ট ঢাকা মাদুলিগুলো ছুঁয়ে যায়।

বিল বইয়ের দু'দিকের পাতায় নাম-ঠিকানা লিখে মুখ তোলে লোকটি এতক্ষণে। 'বলুন কত লিখব?'

'একশ।' সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তর দিই।

'ধন্যবাদ।' লোকটি কৃতজ্ঞতায় মুখ-চোখ ঢেকে বিলে টাকার অঙ্ক বসায়। বিলের একদিক ছিঁড়ে আমার দিকে এগিয়ে দেয়।

আমি বিলের পাতায় চোখ বুলোই।

উঠে দাঁড়ায় লোকটি। 'এবার চলি, আরও কিছু জায়গায় যেতে হবে।' দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করে ও।

আমি মানিব্যাগ থেকে একশ' টাকার একটা ঝকঝকে নোট ওকে দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়াই। লোকটি গিয়ে পায়ে চটি গলায়। লকের নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে থমকে দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় হাসে।

'আমি কিন্তু এখনো মনে করতে পারছি না আপনাকে কোথাও দেখেছি কিনা!' কথাটা বলে চাপা সন্দিগ্ধ চোখে তখনো লোকটির মুখ নিরীক্ষণ করে যাই।

লোকটি একভাবে হাসে। সেই রহস্যময় হাসি। দু'চোখ ভাবলেশহীন। 'হয়ত কোথাও দেখেছেন, আবার নাও দেখতে পারেন।' একটু থেমে বলে, 'চলি।' লোকটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। পিছন ফেরে না।

দৃষ্টির আড়াল হলে আমি দরজা বন্ধ করি। একবার কটক স্টেশনে ট্রেনে তুলে-দিতে-আসা হোটেলের বয়টাকে তিনশ' টাকা বখশিসই দিয়েছিলাম সেদিন হাজার তিরিশেক টাকার একটা সরকারী অর্ডার পাওয়ায়! বড় ছেলে এখনো কোন খবর আনেনি, তবু লোকটিকে একশ' টাকা দিলাম। ভুল করিনি মনে হয়। এমন একটা মুহূর্তের অঙ্ক মনে মনে কষতে কষতে আবার কোচে এসে বসি।

কিন্তু লোকটিকে কি আমি চিনতে ভুল করলাম? মুখ-চোখ, হাসি, এমন বাড়ি চিনে আসা—এসবের মধ্যে কোথাও কোন অস্বস্তি, চাপা বিরক্তি আমাকে কাঁটার মত খোঁচা দিতে থাকে। ক্রমশ বিরক্তি চেপে বসে। হেডলী চেজের বইটা আর পড়তে ইচ্ছে করে না। ওটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর অবহেলায়

রেখে নিই। কোচে ঠেস দিয়ে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরাই। লোকটা কে? ওর তো নাম জানা হল না! অবশ্য নাম জিজ্ঞেস ক'রে লোকটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার ইচ্ছেও হচ্ছিল না একটু আগে। টাকা দেওয়ার পর যে রসিদ দিয়ে গেল ওতে কি ওর নাম আছে? রসিদটা হাতে নিয়ে দেখি। সই অস্পষ্ট। লোকটি আমার সামনে সই করল, না আগে অন্য কারোর করা ছিল? সাহায্য নেওয়ার নাম করে ঠকালো না তো! যাই করুক, তবু হঠাৎ-হঠাৎ লোকটিকে চেনা মনে হচ্ছিল! নাকি আজও আগের মত ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে, পায়ে চটি থাকলে, কাঁধের সাইড-ব্যাগে আমি এরকমই হতাম! পুরনো চিন্তায় মাথার স্নায়ুতে বুঝি জট পাকায়। লোকটি নিজে থেকেই বা পরিচয় দেয়নি কেন? আমার স্ট্যাটাসের সঙ্গে ওর এত তফাৎ বলে? আত্মীয়তা বজায় রাখতে অনিচ্ছায়, না নিজের হীনমন্যতার লজ্জা ঢাকতে চেয়ে? নাকি আমাকে কোনভাবে করুণা করে গেল ও!

আচমকা আমার অর্থ-উপার্জনের প্রথম জীবনের অফিস মনে পড়ে যায়। ছোট মার্চেন্ট অফিস, মৌলালির দিকে নিউ সি. আই. টি. রোডে। হ্যাঁ, আমি তখন মণিমালাকে নিয়ে ছাতুবাবুর বাজারের কাছে এক অন্ধকার গলির শেষ প্রান্তের ড্যাম্প ঘরে থাকতাম। অফিসের সাইকেলে ঘুরে ঘুরে অফিসের চিঠিপত্তর পার্টির কাছে পৌছে দিতাম, নতুন অর্ডার আনতাম, কখনো বা অফিসের চেয়ারে বসে কেরানীর কাজও করতাম! তখনি কি এই লোকটির সঙ্গে পরিচয়? সিগারেটে দ্রুত কয়েকটা টান দিই। ধোঁয়ায় ত্ু'চোখ জ্বালা করে।

…'দাদা, এবারের অর্ডারটা পেয়েছেন?' এমন কথা দিয়েই এক পার্টির বাড়ি প্রথম আলাপ—এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। একটা সিগারেট আমায় দিয়ে লোকটি নিজে আর একটা ধরায়।

'হ্যাঁ, বড় অর্ডার। আমাদের প্রাইভেট ফার্মের পক্ষে সুখবর।' ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে ওর আগুনে ধরিয়ে নিই। তখন লোকটির ঠিক আমারই মত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চেহারা। বয়স, পোশাক-আশাক, হাঁটা-চলা—সব কিছুতেই আমরা তুজন প্রায় এক ছিলাম! কাছাকাছি কোন ফ্যাক্টরির আউটডোর স্টাফ! বার কয়েক পর পর দেখা হতে হতে বেশ মুখ-চেনা হয়ে গিয়েছিল।

'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।' লোকটি হঠাৎ একদিন বলে।

'বলুন।'

'আমাদের একটা ক্লাব আছে, যদি কিছু সাহায্য করেন!' ওর স্বর বন্ধুত্বে অকৃত্রিম।

'আমি!'

'সামান্য যা কিছু পারেন! যার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়, এভাবেই চাই। আমি আপনি—এরকম লোকেদের সাহায্যেই ক্লাবটা চালাই।'

'ক্লাবের কাজ কি?' আমার স্বরও বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ ছিল।

'কাজের বেলাতেও আমরাই আছি। এই ফ্যাক্টরির ছুটির পর ক্লাব নিয়ে মাতি। আমাদের কাজ কিন্তু অপছন্দ হবার মত নয়। ধরুন, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে নৈশ-বিদ্যালয় চালানো, মাঝে মাঝে দরিদ্রনারায়ণ সেবা, খেলা-ধুলো, সরকারী দুধ-রুটি বণ্টন—এইরকম সব! এইসব ছেলেমেয়েরাই তো বড় হয়ে দেশের আগে গিয়ে দাঁড়াবে!'

এরকম কথাই তো বলেছিল লোকটি! ওদের একটা বস্তির মধ্যে সংগঠন ছিল! 'কিন্তু আপনাদের এত সব চেষ্টার পরিণাম কি? এই শহরের মস্তান-গুণ্ডা-বদমাসদের তো কমাতে পারবেন না! পরিবেশ থেকে সামলাতে পারবেন এদের? আপনাদের সব চেষ্টাই কিন্তু পণ্ডশ্রম। এটাই তো ওদের ফেট।'

লোকটি কিছু সময় নীরব থেকেছিল। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক থাকার পর শ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখাই যাক কি হয়! লেগে তো আছি!' চাঁদা চাওয়ার বিনয়ে কিনা জানি না, লোকটির ঠোঁটে তখন এক অদ্ভুত হাসি ছিল দীপ্ত! লোকটি কি যেন নাম বলেছিল! ভুলে গেছি। আমরা দুজন তখন বুঝিবা একই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে! তফাৎ শুধু—ও থাকত নোংরা এক টালিখোলার বস্তির ঘরে, আমি থাকতাম একেবারে ভেঙে-পড়া এক নিম্নবিত্তের পক্ষে ভাড়া-নেওয়া একতলার এক এজমালি বাথরুম-পায়খানার অন্ধকার ড্যাম্প ঘরে! সে ঘর ছিল ছাতুবাবুর বাজারের কাছে এক গলির শেষ প্রান্তেই!...

সেই চার রুমের মোটা টাকার ভাড়ার সুদৃশ্য ফ্ল্যাটও একদিন ছাড়লাম! এখন আমি এই সল্টলেকে নিজের তৈরি নতুন বাড়ির বাসিন্দা। নিজে যেমন নাম-করা বিল্ডিং মেটিরিয়াল্‌সের কনট্রাক্টর, তেমনি নিজেরই যে ফ্যাক্টরিটা দাঁড় করিয়েছি, তাতে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ করে। আমার বড় ছেলে তার ম্যানেজার। আমি এখন সেই ফ্যাক্টরির অ্যাডভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান! এই বাড়ি সুদৃশ্য, মনো-রম। সিঁড়ি, বারান্দা, ঘর-দালান, চাতাল দামী মোজেইক-মোড়া। এক চিলতে বাগানে লাইলাক, বোগেনভেলিয়া গাছ কেয়ারি করে সাজানো। ছোট ছেলেকে

ব্যবসার টেকনিক্যাল কিছু বিষয় শেখার জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছি। আমার একমাত্র মেয়ে-জামাইও নাতি-নাতনী নিয়ে ওখানে। ছোট ছেলে ওদের কাছেই থাকে। মেয়ে-জামাই অনেকবার যেতে বলে, ভাবছি, এবার মাস কয়েকের জন্যে কণ্টিনেণ্ট ট্যুরে বেরিয়ে ওদের ওখানে যাব। বিজনেসের ব্যাপারটাও সেই সঙ্গে মাথায় আছে। মণিমালা ঝি-চাকরদের ওপর কাজের ভার দিয়ে এখন সেবা-সমিতি, নানা ধরনের ফাংশন অ্যাটেণ্ড করে। আমার দুটি লেটেস্ট মডেলের মারুতি। একটি বড় ছেলের জন্যে, আর একটি আমার নিজস্ব।

এখন সন্ধের মুখ। গাড়ি ড্রাইভারকে গ্যারেজ করতে বলে আমি একটু আগেই ওপরে এসেছি। ক্লান্ত। হাত-মুখ ধুয়ে, বেশ কিছুটা ফ্রেশ্ হয়ে এই বারান্দায় বসেছি। বাইরে প্রচণ্ড গরম। আর শহর ছাড়িয়ে গ্রাম-গঞ্জ ছেয়ে খরা চলছে দাপটের সঙ্গে। যেন চারপাশে রহস্যময় বড় বড় অদৃশ্য সাপের শ্বাস! অবশ্য আমার এতে তেমন অস্বস্তি নেই। সারা বাড়ি এয়ারকণ্ডিশন করা। প্রয়োজনবোধে আমার গাড়িও বাতানুকূল করার ব্যবস্থা আছে। এই সাময়িক ক্লান্তিটুকু ছাড়া তেমন একটানা শারীরিক কোন ক্লান্তি আমার থাকে না। একটু আগে পর্যন্ত মণিমালা বাড়িতে ছিল। চাকর রতনকে দিয়ে আমার সব ব্যবস্থা করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে আমার ফেরার পরই। বাড়ি ফিরে, সত্যি কথা বলতে কি, মনের দিক থেকে আমি একটু নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। শরীর নয়, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়, মানুষের মনের গভীরতম কোন অবসাদ তার সামনে স্বচ্ছ আয়না তুলে ধরে। সে আয়নার নাম বুঝি নিঃসঙ্গতা। এমন সন্ধের অবসরে আমি মাঝে মাঝেই সেই আয়নায় নিজেকে দেখি।

আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে একটা চুরুট ধরালাম। গন্ধ আমার তন্দ্রা এনে দেয়। চারপাশের ধোঁয়ার মৃদু ভাবে আমি এই মুহূর্তে বড় ছেলের একটা মোটা মুনাফার কনট্রাক্ট নেওয়ার বুদ্ধিমত্তাকে মনে মনে তারিফ করছিলাম। এবার বড় ছেলের বিয়ে দিতে হবে—এরকম একটা ভাবনাও মনে আসছিল। আচম্কা কানে আসে নীচে ডোর বেল বেজে ওঠার সিঙ্গিং টোন্। মণিমালা কি এখনি ফিরে এল? বলে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেও পারে! আমি ব্যস্ত হই না। নীচে রতন আছে। হঠাৎ বাইরের কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কিভাবে ভদ্রতা দেখিয়ে বসাতে হয়, ওকে শেখানো আছে।

একটু পরেই রতন আসে। 'বাবু, কে একজন এসেছেন, আপনাকে খুঁজছেন।'

'আমাকে!' ভিতরে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে মনে মনে ভাবি। একভাবে শুয়ে থেকেই বলি, 'বসিয়েছিস তো?' রতন ঘাড় নাড়লে জিজ্ঞেস করি, 'চেনা কেউ?'

'বয়স্ক এক ভদ্রলোক।'

'যা, আমি যাচ্ছি।'

রতন চলে যায়। এখন কে আসতে পারে? এসময়ে তো কারোর আসার কথা নয়। তা ছাড়া সকলকেই আজকাল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে আমার বাড়ি আসতে হয়! কারোর আসার তেমন দরকারও পড়ে না। কারণ আমার—ফোন নেই এমন কোন লোক বা পরিবারের সঙ্গে তো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। কাজের চাপে একজন সোস্যাল বিয়িং হিসেবে সমস্ত পাবলিক রিলেশান্‌স্‌ও প্রায় অনেকদিন বন্ধ!

তবু একটা হালকা অবসর যাপনের বিলাসিতায় নীচে নেমে আসি। বড় ড্রইং-রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। চশমাটা বাঁ হাতে ঠিক করে বসাই অকারণ। ডান হাতে চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামাই। দূরের কোচে একটা লোক বসে। সাদা টিউবলাইটের আলোয় লোকটা স্পষ্ট। চমকে উঠি। এ কে? ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা কাঁধে ব্যাগ একটা লোক! একে তো চিনি না! যেন নানান ঝড়-ঝাপটায় ভেঙে-পড়া একটা মানুষ। একটু এগিয়ে যাই। লোকটা দেয়ালের ছবিগুলোয় দৃষ্টি রেখে অন্যমনস্ক। কেন যেন একটা চাপা রহস্যময় ভয়ে আমার শ্বাস দ্রুত হয়। তবু নিজেকে স্বাভাবিক রাখি।

'আপনার কাকে চাই? গলার স্বর বেশ গম্ভীর হয়ে যায়, দূরত্ব আনে অবলীলায়।

লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরায়। হাসবার চেষ্টা করে। 'আপনাকেই।'

সাধারণত পরিচিত লোকজন এলে আত্মীয়তায়, বন্ধুত্বে যে সান্নিধ্যে বসি, তার থেকে বেশ কিছুটা দূরের কোচে বসলাম। আমার দু'-চোখের বিস্ময় কাটেনি। একটা চাপা কঠিন বিরক্তি লোকটার চেহারা আর এমন অবাঞ্ছিত উপস্থিতির কারণে আমার মধ্যে দলা পাকিয়ে যায়। দু' আঙুলের ফাঁকে চুরুট পুড়ে যায়।

লোকটা ভোঁতা মুখ নিয়ে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। 'আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?' ভদ্র বিনয়ে স্বর চাপা সংযত শোনায় লোকটার।

আমি একভাবে তাকিয়ে থাকি। ওকি ভেবেছে, আমি বসলাম বলেই ওকে

চিনেছি ? 'না।' কিছুটা চাপা সূক্ষ্ম ধমকের মত স্বরে শব্দ করে মাথা নাড়ি। 'আপনি হঠাৎ এভাবে—'

'না চেনাই স্বাভাবিক!' হঠাৎ থেমে লোকটা যেন সময় নেয়। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে যায় বিষণ্ণতার সঙ্গে জড়িয়ে। দু'টো চোখ স্থির আমার দিকে।

আমি কথাটায় বিরক্ত হই আরও। ভিতরটা শক্ত হয়ে ওঠে। একে চিনতে হবে কেন ? ভিখিরির মত পোশাক, হাঁটুর ঠিক নীচে পর্যন্ত ধুতির পাড় টানা। জামা-কাপড় একটু যা পরিষ্কার। গাল ভাঙা, চুল এলোমেলো। দৃষ্টি পায়ে থেমে যায়। পা দু'টো নোংরা। যেন কত গ্রামের মাঠ-ঘাট-পুকুর-ডোবা পেরিয়ে আসা! আমার মধ্যে বিরক্তির সঙ্গে ঘৃণা তৈরি হয়। এই লোকটাকে রতন ঘরে বসিয়েছে কেন! রতনের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে রাগে আমার শরীর গরম হয়ে ওঠে। তবু ভালো, লোকটাকে জুতো জোড়া খুলে বাইরে রাখতে বলেছে রতন! দরজার বাইরে রাখা জুতো-জোড়ার গোড়ালি ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। জুতোর দু'পাশ থেকে দগদগে ঘায়ের মত কুচো কিছু চামড়া বেরিয়ে। এ ঘরে দামী কার্পেট পাতা। জুতো পরে ঘরে ঢোকায়, বসায় কোন আপত্তি নেই! তবু রতনের উপস্থিত বোধ-বুদ্ধিকে মনে মনে ঈষৎ তারিফ না করে পারি না।

'আপনি কি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন ?' লোকটা এবার বেশী হাসার চেষ্টা করে। যেন অনেক দিনের পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায়! 'আমি বেশী সময় নেব না।' ঠাণ্ডা স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলে লোকটা।

আমি এবার ভিতরে চমকে উঠি। এই হাসি, এই মুখ-চোখ যেন চেনা! হঠাৎ প্রথম কেরানী-জীবনের স্মৃতি মনে পড়েই মিলিয়ে যায়। পুরনো সেই স্মৃতির মত লোকটাকে কি আমি ভয় করি ?

'বলুন, কি দরকার।' স্বরে একটা দূরত্ব স্পষ্ট রেখে আমি জিজ্ঞেস করেই থামি। 'আপনি কি গ্রামে থাকেন ?'

'হ্যাঁ, এখন পুরোপুরি গাঁয়ের লোক বলতে পারেন। সমস্ত গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে চষে ফেলেছি ক'বছরে। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।' লোকটার স্বরে বুঝি উৎসাহ ঠেলে ওঠে। 'একটা জিনিস বুঝি, এই গাঁয়ের লোকদের একটা সংগঠন দরকার।'

'মানে!' বিড়বিড় করি। আমার চাপা কোন ভয় যেন একটু একটু করে

শীতল হতে থাকে। আজকাল কিছু অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কাজ করে? গোপনে! এ কি তাদেরই কেউ? পলিটিক্যালি মোটিভেটেড? আমার সারা শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। 'আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের—'

'মোটেই না।' প্রবল মাথা নেড়ে লোকটা আমার কথার মাঝখানে বলে ওঠে। আবার সেই হাসি। 'তবে আপনাদের ভয় পাওয়ার মত কিছু করি না।'

আচমকা ধাক্কা খাই ভিতরে। আমার এই মুহূর্তের গভীর গোপন ভয়কে কি ও বুঝতে পেরেছে? লোকটা কি কিছু চেনাতে চায় আমাকে? নিজেকে দিয়ে আমাকে? আমি শক্ত হয়ে উঠি। 'আপনি কি চান?'

'গ্রামের অবস্থা তো সবই জানেন! খরায় সব জ্বলছে। চাষ-বাসের কথা বাদ দিন, গাঁয়ের মানুষের এমনিতেই আর বাঁচার কোন পথ নেই!' থেমে অন্যমনস্ক হয়ে গেল লোকটা।

আমি লোকটাকে এবার বুঝতে চেষ্টা করি। 'তাতে আমাদের কি বলুন?' ওর আলোচনায় যোগ দেওয়ার অনিচ্ছার মধ্যেও কথার কথা বললাম।

লোকটা যেন নিজের ঘোরে কথা বলে। 'খরার ছবি তো দেখছি আপনার ঘরেই যত্ন করে টাঙানো!' থামে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা।

আমার দৃষ্টিও থেমে যায় দেয়ালে। আমার বড় ছেলে কাজের জন্যেই একবার গ্রামের ইন্টিরিয়রে গিয়ে দামী ক্যামেরায় এমন ছবি তোলে। সেটাই ডেভেলপ করে বাঁধিয়ে রেখেছে। ঘর সাজানোর পক্ষে আইডিয়াল, নেচারের এমন নির্মম রূপ! বিশাল ফাঁকা মাঠ, নির্জলা, ফুটিফাটা, রসকসহীন এক কোণে গামছা কাঁধে উদোম গায়ে এক চাষী। সামনের টেবিলে রাখা সেই বড় ক্লে-মডেলের বিনীত শ্রমিক-মূর্তিতেও আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে যায়। এইটারই একটা বেশ ছোট আকারের নকল আমি আমার গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারের সিটের সামনে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। মডেলটা আমার এত প্রিয়! নিখুঁত শিল্প বলে কিনা জানি না, আমি দেখে বেশ খুশি হই।

'জানেন, এই চাষারাই আজ শহরে চলে আসছে!' আচমকা বলে লোকটা, 'অথচ এরাই তো সব—'

এমন কথা বাড়ানোয় চাপা রাগ ঠেলে ওঠে। 'মানে কিছু সাহায্য চান তো? এদের জন্যে ক্লাব করেছেন।' সোজা কথাটা বলি।

লোকটা বোকার মত মাথা নাড়ে। 'না, না, ক্লাবের কথা বলবেন না। এমন ক্লাব করে কি হয় এইসব শহরে, তা তো দেখেছি। আমার জানাও আছে।'

থামে। 'সব ফাঁকা, ফাঁপা। গ্রামে যান, গ্রাম-গঞ্জের মানুষ আর জীবনের কাছে এসব কিছুই নয়।'

লোকটা আমাকে জ্ঞান দিতে চায়! উপদেশ! ওর কথায় বাধা দিয়ে বলি, 'এইসব সামান্য ভিক্ষেয় কি আপনাদের বড় বড় কাজ হবে?'

আমার কথার শ্লেষে লোকটা নীরব থাকে। মুখে সেই হাসি এবার স্পষ্ট হয়! 'অন্তত এখন আপনাদের সাহায্যটুকু ছাড়া ওদের আর কি আছে?'

দাঁত দাঁত ঘষি। 'আমার কোম্পানি থেকে আমি ইতিমধ্যেই অনেক টাকা পে করেছি!' বেশ কিছুটা কঠিন শোনায় কথাগুলো নিজের কাছেই। ভদ্রবেশী ভিখিরি। মনে মনে উচ্চারণ করি। এই মুহূর্তে লোকটার মুখভঙ্গি অনেকটা স্তম্ভিত, বিমূঢ়ের মত। ও কি আমার এমন রূঢ় কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না? এবার বলি, 'আমাদের একটু সুস্থভাবে বাঁচতে দিন।'

লোকটা নড়ে-চড়ে ওঠে। 'শহরটা তো আপনাদেরই, আপনারাই থাকুন। তবে—।' ওর মুখের হাসি এখনো মেলায় না, কিন্তু হাসিটার স্বভাব বুঝি আলাদা!

'আর কিছু বলার আছে আপনার?' ওর বলার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠি। কথাটা যেন ঈষৎ চীৎকার করে ধমক দেওয়ার মত শোনায়।

লোকটার দু'চোখ মুহূর্তে চকচক করে ওঠে। ঠোঁটের কোণেও সেই বিষণ্ন হাসি লেগে যায়। এটা কি শ্লেষ? হঠাৎ বলে, 'দেখবেন একদিন ওদের কাছে আপনারা—'

'ওদের কাছে!' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে ওঠে। হয়ত এখনি লোকটা 'সর্বহারা' না কি একটা শব্দ আছে—বলে বসবে। আর সে কথাও শুনতে হবে ওর কাছে! ও কি ভয় দেখাতে চায়? ব্লাকমেইল! চকিতে উঠে দাঁড়াই।

লোকটা একভাবে বসে থেকে তেমনি মৃদু হাসে। 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন? মাপ করবেন; আমি কিন্তু—।'

'থাক, বুঝেছি। আপনি কিছু ভিক্ষে চান তো? নিন।' ট্রাউজারের পকেট থেকে পার্স বের করি। আমি বুঝতে পারি, আমার হাতটা উত্তেজনায় কাঁপছে। একটা এক'শ টাকার নোট বের করি। হাত টান টান লম্বা করে মুঠোটা ওর সামনে ধরি। 'কোন বিল-টিল আমাকে দিতে হবে না।'

লোকটা তবু বসে থাকে। একভাবে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। এমন

নির্বিকার, শীতল মুখ-চোখের ভাব আমার মধ্যে রহস্যময় এক ভয়ের গোপন শিহরণ জাগায়। ওকে যেন আমার প্রবল প্রতিপক্ষ করে তোলে। 'উঠুন, আমার আর কথা বলার সময় নেই।'

লোকটা উঠে দাঁড়াবার তোড়জোড় করে। আমি ভাঁজ-করা নোটটা ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিই। 'এর বেশী আর চাইবেন না।' লোকটার ডান দিকের কাঁধের ব্যাগটা ছেঁড়া, ময়লা, ভিখিরিদের ভিক্ষের চাল নেওয়ার মত থলি। ভিতরে হাত দিতে গিয়েও থেমে যায়। ভাবছিলাম, বলি, 'আপনি নিজেও টাকাটা খরচ করতে পারেন, আপত্তি নেই। ভিক্ষের চালের আবার বাছবিচার!' কিছু না বলে নীরবে ওকে লক্ষ্য করি।

আশ্চর্য! লোকটা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে! হঠাৎ বলে, 'একশ' টাকাতেই হবে, আমরা অনেকের কাছ থেকেই নিচ্ছি তো! ওদের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার খরচ! না নিয়ে গেলে এখানে এসে শহরের কল-কারখানায় ওরা কি-ই বা করবে? তা হলে তো শহরই বাঁচবে না!'

'এত বড় বড় কথা বলার কি আছে?' ঘৃণা, উপেক্ষা, অবজ্ঞা আমার কথায় ঢাকা থাকে না। আমি ওকে অস্বীকার করার ভঙ্গিতে পাশ ফিরে সরে আসার জন্যে তৈরি হই। 'পেয়েছেন যখন, এবার যান।' কথাটা আরও রূঢ় হয়ে যায়। এতক্ষণে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। রোগা পাকানো চেহারা হলেও বেশ লম্বা লোকটা। সোজা দাঁড়িয়ে কোচের কাছ থেকে সরে আসে। আবার হাসে। প্রতি-বাদী ক্ষুধার্ত সতর্ক কোন মানুষের চোখের মত ওর দু'চোখ জ্বলে। 'জানেন, এরা শহরে এলেই কত মানুষ যে বিরক্ত হয়। অনেকে ভয় পায়! আশ্চর্য!' একটু থামে। আমাকে ওর দিকে ফিরতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বলে, 'বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। নমস্কার। চলি।' লোকটা আর কোন কথা বলে না। একবারও পিছন না ফিরে কেমন সহজ ভঙ্গিতে বেরিয়ে যায়!

আমার মধ্যে তীব্র এক অস্বস্তি ভার হয়ে বসতে থাকে। লোকটাকে আমি এত ভয় পাই কেন? লোকটা কে? কয়েক মুহূর্ত নির্জন পরিবেশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি। এক সময়ে শান্ত হয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াই।

আমি একজন কাজের মানুষ। ছুটি-ছাটা আমার জোটেনি আগে। আমার বড়ছেলে আমার সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজেই ক্রমশ নিয়েছে বলে আজকাল বেশ কিছুটা অবসর পাই। আর, এমন অবসর মানেই আমার নিরঙ্কুশ নিঃসঙ্গতা!

মাঝে-মধ্যে মণিমালাকে সঙ্গে নিয়ে, বেশির ভাগ সময়ে একাই বেরিয়ে পড়ি গাড়ি নিয়ে। আজ আমার সেরকম এক অবসরের দিন! এমন সন্ধ্যেয় নিজেকে কিছুটা ভারমুক্ত মনে হয়। ক'দিন অসহ্য গরম যাওয়ার পর আজ বেশ উপভোগ করার মত বাতাস বইছে। একা-একাই গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন বেরিয়ে পড়ি। সামনে ঝোলানো মাটির শ্রমিক-মূর্তির মিনিয়েচার মডেলটার নড়া-চড়া বার বার উপভোগ করার মত লক্ষ্য করতে করতে গাড়ি চালাই। ফাঁকা রাস্তায় এদিক-ওদিক লক্ষ্যহীন ঘোরার পর একসময় রাস্তার দু'পাশে ভিড় বাড়তে দেখি! ফুটপাতে এখানে-ওখানে হকার। যেখানে হকার নেই, সেখানেই ভিখিরিদের সংসার। রান্নাবান্না, ধোঁয়া, কাঠকুটো, জঞ্জাল, ডাস্টবিন! কি রকম রুদ্ধশ্বাস মনে হয়। বুকে হঠাৎ-হঠাৎ হাঁপ ধরে। কাগজের খবর—গ্রাম প্রচণ্ড খরায় পুড়ছে, চাষীর ঘরে চরম অভাব। সবাই শহরে ভিড় করছে দলে দলে।

এরা কি তারাই? গাড়ি মন্থর করি। সারা শহরই যেন পলিউটেড! বিড় বিড় করি। খালি গায়ে, ভাঙা হাঁড়ি-কড়া, বাসন-পত্তর, কাঠকুটো নিয়ে এরা যেন বিরাট একটা ডাস্টবিন করে তুলতে চায় শহরটাকে! অসহনীয় সাফোকেশান! জোরে গাড়ি চালানোও দায়! তবু যতটা সম্ভব লোকজন বাঁচিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়েও চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক-পুলিশের নির্দেশে আমার গাড়ি পার হওয়ার মুখেই থেমে যায়! গোল-চোখ বৈদ্যুতিক সিগন্যাল জ্বলে। পিছনে-পাশে একের পর এক গাড়ি ভিড় করে দাঁড়িয়ে যায়। আমি দৃশ্য দেখার মত এপাশ-ওপাশ ফুটপাতের নতুন বাসিন্দাদের লক্ষ্য করি।

এমন সাময়িক জ্যামে দু'পাশের ফুটপাত থেকে এপাশ-ওপাশ ছিটকে আসে কিছু ছেলে-বুড়োর দল। কিছু ছোট, মাঝবয়সী মেয়েও। ভিখিরি সব। এ-গাড়ি ও-গাড়ির জানালায় ভিক্ষের হাত বাড়ায়। স্বরে কাতর প্রার্থনা। এক-সময়ে আমার গাড়ির দু'দিকে আসতেই তটস্থ হই। একটা রোগা, লম্বাটে চেহারার বুড়ো ভিখিরি আমার সামনে আসে। হাত পাতে। 'কিছু দিন বাবা!'

ওর মুখের দিকে তাকাই না। সন্ধের আবছা আলোয় আমার মুখের ভাব স্পষ্ট উপেক্ষায় নির্বিকার।

'দিন, ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে হবে।'

ভাবলেশহীন চোখে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। কে? কে তুমি? আচমকা মনের গভীর থেকে কথাটা ভেসে উঠেই ডুবে যায়। যেন খুব

পরিচিত কোন মুখ! লোকটার দু'পাশে ভিড় বাড়ে। বাড়ে চাওয়ার সমবেত শব্দ, স্বর।

'দিন বাবা!' লোকটা আমার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে।

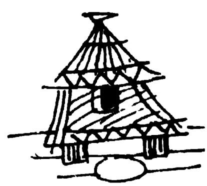
আমি নিথর, গভীর আড়ষ্ট। ওর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছি না। কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে লোকটার মুখ বিশ্রী। একেবারে শতচ্ছিন্ন ময়লা একটা গেঞ্জি গায়ে। কাপড়ের ছেঁড়া অংশগুলো টেনে তুলে কোমরে গোঁজা। সেই মুখ, সেই চোখ! হাসি নেই। চোখ দু'টো কি জমা রক্তেই এমন লাল? ও কি আমাকে চিনতে পেরেছে? নাকি লোকটা আমিই। আমারই প্রসারিত ছায়া? বুকের ভিতরটা হঠাৎ অসম্ভব কেঁপে ওঠে।

'কিছু দিন বাবা।' আবার অস্ফুট শব্দ করে। দৃষ্টি অপলক।

ওর হাতটা কি আমার গলার টাইয়ের দিকে এগোয়? চারপাশে এত হাত, এত শব্দ! আমার শ্বাস দ্রুত হয়। আমি এক অদ্ভুত ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। মুহূর্তে মনে হয়, চারপাশের এত লোক আমার দিকেই সব হাত বাড়াচ্ছে! অনেকের হাত সবল, মুষ্টিবদ্ধ। ওপরে তোলা যেন! হাতগুলো কি ভিক্ষের! না—!

ঠিক তখনি সিগন্যালের আলো সবুজ হতেই গাড়িতে স্টার্ট দিই। স্টার্ট নিয়েই সামান্য খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আচমকা গাড়ি লাফিয়ে থেমে যায়। রাগে গরগর করে। ঝোলানো মজুর-মূর্তিটা এমন ধাক্কায় ভেঙে ছিটকে পড়ে সামনেই।

সেদিকে তাকাবার সময় নেই আমার। আর এতটুকুও দেরী করি না। গাড়িটা তীব্র বেগে মোড় পার হয়ে ছোটে। বুঝিবা পালায়।





অভিজ্ঞান

অত্যন্ত নিরীহ মুখ-চোখ ছেলেটার। ঠাণ্ডা স্বভাবের। কী নাম বেশ! বাবু! ওর মা যেন ওই নামেই ডেকেছিল। সুপ্রিয়কে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই কোথায় যে আড়াল হয়ে গেল মুহূর্তে, সুপ্রিয় বুঝতে পারে নি! এপাশ-ওপাশ তাকালো সুপ্রিয়। কোথাও নেই। এতক্ষণ ওর আগে আগে আসছিল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে অবাক চোখে দেখছিল ওকে। দূরের ঘর দেখিয়ে এইমাত্র কোথায় উধাও!

তবু সুপ্রিয়র কানে লেগে আছে ওর শেষ কথাটা। 'ওই যে একেবারে কোনের দিকে ঘরটা, ওটাই সতীশদাদের। আপনি এগিয়ে গিয়ে ডাকুন।'

'সতীশদা' মানে অতীশের ছোট ভাই, ডাক-নাম সতু। অতীশ এদের বাড়ি আসার আগে অনেকবার এই নামটা বলেছে ওকে।

সুপ্রিয় এমন সকালে সামনের সিমেন্ট বাঁধানো ফাঁকা চাতালের প্রান্তে স্থির দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অনেক টালি-খোলার ঘরের মাঝের সিমেণ্ট-বাঁধানো খোলা ড্রেন-টানা সরু অন্ধকার প্যাসেজ, খোলা-মেলা আব্রুহীন ঘর পাশে রেখে বাবু নামের ছেলেটা ওকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল! ভাগ্য ভাল যে, ছেলেটা ওকে এই পর্যন্ত দিয়ে গেছে! তা না হলে ও তো ফিরেই যেতো! সেই সুদূর ঠাকুরপুকুর থেকে এই নর্থে আসার আগে একবারও ভাবেনি এমন জট-পাকানো বস্তির মধ্যে ওকে ঢুকতে হবে! গিয়েছিল দর্জিপাড়া বাই লেনে। অতীশদের আগের ঠিকানা। অতীশ তা-ই দিয়েছিল। অতীশও জানে না এখনো ওর

বাবা-মা-ভাই-বোনেরা ওখানে নেই। উঠে এসেছে মাস ছয়েক আগে এখানে! কিন্তু ওখানে পাওয়া নতুন ঠিকানা যে এমন বস্তির মধ্যে হবে সুপ্রিয়রও ধারণাই ছিল না! তা ছাড়া লণ্ডন থেকে কলকাতায় সুপ্রিয়রও বছর চার-পাঁচ পর পর হয়তো এক-আধবার আসা ঘটে। ওরও কোন ধারণা ছিল না! কতদিন দেশ-ছাড়া ও নিজেই!

হাতের সিগারেটটায় সুপ্রিয় শেষ টান দিয়ে পাশে ফেলে দিল। বস্তির মধ্যে ঢুকে সুপ্রিয়র চোখে পড়েছে রাস্তার কলে চারপাশের বাসিন্দাদের জল নেওয়ার ব্যস্ততা। সকালেই ঘুপ্‌চি অন্ধকার ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেছে রাস্তায়। বস্তির কিছু ব্যস্ততা ওখানেই ছিল যা। এদিকটা, এমন বড় বস্তির এক কোণ—নির্জন। সুপ্রিয় হাতঘড়ি দেখল। এখন ঠিক সাড়ে ন'টা। সামনের চাতালটা পার হতে সুপ্রিয় পা বাড়াল।

টালি-খোলার চাপা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই নিজের মধ্যে এক অস্বস্তি ঠেলে উঠল। হালকা বাতাসে একটা গন্ধ নাকে এল। খোলা ড্রেনের গন্ধ। সামনেই অন্ধকার দালান। ভিতরের ঘরও অন্ধকার এমন সকালেই। ওকে দেখে ছায়া-ঢাকা ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়স হবে। স্বাস্থ্য ভাল, সুশ্রী। এ কি নয়না, না মহুয়া? অতীশ যা বর্ণনা দিয়েছে নয়নাই হবে। বোনেদের মধ্যে বড়, দু'চোখ বেশ সুন্দর টানা।

অবাক চোখে মেয়েটি স্থির তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। 'কাকে চাই?' গলায় আড়ষ্ট খসখস শব্দ হলো।

'এখানে কি যতীন্দ্রনাথ দাস নামে কেউ থাকেন?' সুপ্রিয়র স্বরে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব কাজ করে.

'হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে আসছেন?' মেয়েটির চোখে-মুখে-স্বরে এখনো বিস্ময় লেগে থাকে।

'আপনার নামই কি নয়না!' সুপ্রিয় ঠোঁটের চারপাশে হাসি স্থির রাখে।

'হুঁ।' নয়নার বিস্ময় একটুও সরে না মুখের ভাবে। সুপ্রিয়কে বড় বড় চোখে লক্ষ্য করে।

'কে রে খুকু?' বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন যতীনবাবু। সামনেই মাঝারি চেহারার, সৌম্য দর্শন, দামী প্যাণ্ট-শার্ট-পরা সপ্রতিভ সুপ্রিয়কে দেখে থেমে থাকেন কয়েক মুহূর্ত! 'কাকে চাই?'

'আমি অতীশের কাছ থেকে আসছি।' সুপ্রিয় একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমাদের অতু!' যতীনবাবু যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। পাশ থেকে চকিতে নয়না সরে গেছে। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকেছে সে। যতীনবাবুকে বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত মনে হলো সুপ্রিয়র। 'এখানে!'—যেন অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন শব্দটা।

'আপনি আসুন।' নয়না সামনে এসে দাঁড়াল। সামান্য দূরে অতীশের মা, মহুয়া, বছর-বারো বয়সের প্রীতিশ। 'তুমি যেন কী বাবা! বুঝতে পারছ না দাদা পাঠিয়েছে এঁকে! আপনি দাদার বন্ধু না?'

'হ্যাঁ।' সুপ্রিয় সহজ হয়। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের ওপর দৃষ্টি বুলোয়।

'আসুন ভিতরে।' নয়না পিছনে ফেরে।

মুহূর্তের অন্যমনস্কতা থেকে সচেতন হন যতীনবাবু। 'এসো বাবা, খুকু সঙ্গে নিয়ে যা।' সুপ্রিয়র ভিতরে যাওয়ার জন্য সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।

সুপ্রিয় নয়নার পিছন-পিছন পাশের ঘরটায় ঢোকে।

দ্রুত হাতে নয়না অগোছালো বিছানার চাদরটা টানে। বেতের পুরনো মোড়াটা মেঝের ওপর রাখে। 'বসুন।' পিছন ফিরে সুপ্রিয়র দিকে তাকায়। 'কিছু মনে করবেন না যেন। ঘরটা যা হয়ে আছে। বাবা এত সময় পর্যন্ত বিছানায় থাকে তো?' মিথ্যেটা চকিতে বানিয়ে নেয় নয়না।

'না, না। এতে ভাববার কী আছে। খুবই ন্যাচারাল।'

'একটু বসুন। আমি আসছি। বাবাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অতিথির প্রতি পরিমিত হাসিটুকু ঠোঁটের গোড়ায় লেগে থাকে নয়নার। নয়না দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়।

সুপ্রিয় আড়ষ্ট হতে থাকে ভিতরে। এই পরিবেশে এক অনড় অস্বস্তি ওর মধ্যে কোন চাপ তৈরী করে। সামান্য কদিনের হেমন্ত সরে গিয়ে কলকাতায় এখন পাতলা জ্যোৎস্নার মত শীতের আবরণ। সুপ্রিয় নিজে একজন চেইন স্মোকার। একটা সিগারেট ধরাতে চাইছে। কিন্তু অতীশের বাবার কথা ভেবে সংযত করল নিজেকে। পাশের ঘরের চাপা একাধিক স্বর কানে আসছে। তবু এত নির্জন। সুপ্রিয় সারা ঘরে চোখ বুলোতে থাকে।

বোঝা যায়, এই ছোট আর ওপাশের বড় মোট দু'টি ঘর নিয়ে যতীনবাবু মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু কোনরকমে মানিয়ে নিয়েছেন। টালির চাল ঢাকা সিমেণ্টের বারান্দা, দুটি ঘর বরাবর। এরই লাগোয়া টানা বারান্দার ওদিকে আর

এক ঘর ভাড়াটে। চৌকো উঠোনের চারপাশে ঘর আর তার ঠাসা মানুষজন ও আসায় চারপাশে উৎসুক চোখ। এ ঘরের মেঝে থেকে উঠে-আশা ড্যাম্প সামান্য শীতের আমেজেই ধরা পড়ে। ঘরের আসবাব-পত্তর, জামা-কাপড়, আলনা, নড়বড়ে তক্তপোষের নীচেকার পুরনো ট্রাঙ্ক, এসবের সঙ্গে জীর্ণ মলিন বিবর্ণ দেওয়াল অনেকটাই স্বাভাবিক মানিয়ে গেছে। অতীশের বাবা-মা কি সুপ্রিয়কে ওদের মধ্যে পেয়ে অসুবিধেয় পড়ল? আতিথেয়তায় বুঝি বিপর্যস্ত বোধ করছে? কিন্তু সুপ্রিয় তো আর বেশীক্ষণ থাকবে না। শুধু অতীশের কিছু কথা বলে, দেওয়া টাকাটা হাতে দিয়েই চলে যাবে এখনি। ও ফিরবে সেই ঠাকুরপকুর! হাত-ঘড়ির কাঁটায় অন্যমনস্ক দৃষ্টিটা চকিতে বুলিয়ে নিল। দশ বছর অতীশ বাড়ি-ছাড়া। আর কোনদিন ফিরবেও না দেশে। তবু বাবা-মা ভাই-বোনদের কিছু স্মৃতি সে রাখতে চায়। সুপ্রিয়র দেওয়া খবরগুলোর মধ্যে অতীশ পুরনো-নতুন স্মৃতি পাবে!

ঘরে ঢুকলেন যতীনবাবু। সুপ্রিয় সচেতন হয়ে নড়ে-চড়ে বসলো।

'অতু কেমন আছে?' যতীনবাবু বিছানায় বসতে বসতে বললেন। 'তুমি বাবা এখানকার ঠিকানা পেলে কি করে? অতুর তো এ ঠিকানা জানার কথা নয়!' সুপ্রিয়র চোখের দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকেন। ওঁর বলার ভঙ্গিতে ঠিকানা খুঁজে এমন এখানে হঠাৎ আসায় কোন অসন্তোষ রয়েছে কি?

সুপ্রিয় ভদ্রতা, সৌজন্যের হাসি মুখে-চোখে আনে। 'ওর কোন চিঠি পাননি?'

'হ্যাঁ পেয়েছি, সে তো মাস ছয়েক কি তারও কিছুদিন আগে, দর্জিপাড়ার ঠিকানায়।' একটু থামেন। 'চিঠিটা এত আচমকা হাতে আসে, আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি!'

'আমাকে তো সেখানেই পাঠিয়েছে! ওখানে গিয়ে শুনি আপনারা এখানে চলে এসেছেন। অতীশ তা জানে না আপনারাও বোধ হয় চিঠি দিয়ে জানান নি।'

যতীনবাবু একবার মাথা নিচু করেন। সংসারের খরচ বাঁচিয়ে একটা এয়ার-লেটার কেনারও পয়সা জোটেনি তখন! আজও না। ঘরের ছোট জানলা দিয়ে বাইরের উঠোনে দৃষ্টি ফেলেন যতীনবাবু। একটু বা অন্যমনস্ক। 'আর জানাবোই বা কি বল?' হঠাৎ চুপ করে গেলেন, কোন দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন এই মুহূর্তে। 'ও অবশ্য লিখেছিল ওর একজন বন্ধু আসবে, তার হাতে টাকা পাঠাবে।'

সুপ্রিয় ভিতরে অস্থির হয়। 'আমি সেই টাকাই নিয়ে এসেছি। নিন।' সুপ্রিয় প্যান্টের পকেট থেকে একটা লম্বা থাম বের করে। 'এর মধ্যে অতীশের একটা চিঠিও আছে।' হাত বাড়িয়ে থামটা সামনে ধরে সুপ্রিয়।

যতীনবাবু হাতে নিলেন থামটা।

'আপনারা সবাই কেমন আছেন জানতে চেয়েছে।' সুপ্রিয় তাকিয়ে থাকে যতীনবাবুর দিকে। যতীনবাবু থাম খুলে একশ' টাকার নোটগুলো গুণে নেওয়ার পর চিঠিটায় চোখ বুলোচ্ছেন। সুপ্রিয় ওঁকে খুঁটিয়ে দেখে। ষাট বছর বয়স হলেও সত্তর পেরিয়ে-যাওয়া এক বৃদ্ধ যেন। একটা শুকনো গাছ শুধু কয়েকটা ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বোধহয় কোন আকস্মিক বজ্রপাতে কিছুটা ঝলসে গিয়েও গাছটা বেঁচে আছে। যতীনবাবুকে দেখে যেন তা-ই মনে হল সুপ্রিয়র। রোগা লম্বা চেহারা, চোয়াল ভাঙা, মাথার চুল সবই পেকে গেছে যেন সেই বজ্রাঘাতেই! গায়ের চামড়া থসথসে, পোশাক জীর্ণ, মলিন। একটু বা সামনে ঝুঁকে পড়েছেন ঝড়-ঝাপটায়। দু'পায়ের পাতায়, প্রান্তে অনেক বেশী পথ হাঁটার ময়লা, শ্রমের রুক্ষতা।

'অতু কি আসবে এখানে?' হঠাৎ কাগজটা থেকে মুখ তোলেন যতীনবাবু।

'না কাকাবাবু, ওর তো তেমন কোন ইচ্ছেই নেই।' সুপ্রিয় বৃদ্ধের প্রতি মমতায় যেন একটু অন্তরঙ্গ হল। স্বরে চাপা সহানুভূতির ছায়া।

আবার অন্যমনস্ক হন যতীনবাবু। 'তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ বাবা, তুমি হলে ওর বন্ধু।' থামলেন, 'হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। তখন পিতু, মানে আমার ছোট ছেলেটা বছর দুয়েকের। তা অতু নিরুদ্দেশ হয় বছর দশেক আগেই!' নীরব হলেন কিছুসময়। 'আমরা তো কোন খোঁজখবর না পেয়ে ভেবেই নিয়েছিলাম বোধ হয় কেউ ওকে মেরেই ফেলেছে। তখন যা দিনকাল!' শ্বাস ফেললেন। 'এতদিন বাদে এই মাস-আষ্টেক আগে ওর চিঠি পেয়ে অবাক। ও নাকি আফ্রিকার কোন্ পোর্টে নেমে ওখান থেকে নানাভাবে দিন কাটিয়ে লণ্ডনে গেছে, চাকরী করছে।'

সুপ্রিয় থামিয়ে দিল যতীনবাবুকে। 'সব জানি কাকাবাবু। আমার সঙ্গে ওখানে পরিচয় হবার পরেই সব শুনেছি। শুধু আপনাদের সঙ্গে যে যোগাযোগ করতে পেরেছি, এতেই ও খুশী হবে।'

'বোলো ওকে, আমি তো রিটায়ার্ড, সংসারে কোন ইনকাম নেই। সতু বেকার। মেয়েদের বিয়ে দিতে পারিনি। পিতুর তো এখন বছর বারো বয়স,

ম্যালনিউট্রিশানের অসুখে ভোগে। আর সব ছেড়ে শেষ-মেশ এই বস্তিতে এসে উঠতে হয়েছে।' থামলেন যতীনবাবু। 'এই ভূতের বোঝা টানার জন্যে ওকে তো এখানে ফিরে আসতে বলতে পারি না!'

ঘরে ঢুকলো নয়না। হাতে চায়ের কাপ, প্লেটে দুটো বিস্কুট। 'বাবা, তুমি ভেতরে যাও, মা ডাকছে।' যতীনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। 'নিন, চা-টা খান।'

'আবার এসব করলেন কেন! আমি এখনি উঠবো।' সুপ্রিয় নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছু সময়। চায়ের কাপ নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

'যাবেন তো! তাড়া কিসের? মা বলছিল, সকালে এসেছেন, একটু ভাত-টাত খেয়ে যাবেন।' সুপ্রিয় কাপটা হাতে নিলে নয়না তক্তপোষে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

'না, না, এসব করবেন না! আমার কিন্তু খারাপ লাগছে।'

'কিসের খারাপ? আমরা বস্তিতে আছি দেখে খারাপ লাগছে?' নয়নার মুখে হাসি লেগে থাকে। 'আপনি তো দেখেই গেলেন আমরা বস্তিতে নেমে এসেছি। দাদাকে বলবেন।' নয়না হঠাৎ স্বর ভারি করে।

সুপ্রিয়কে এক বিষণ্ণতা ঘিরে ধরে। 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি কিছু ভেবে খারাপ লাগার কথা বলিনি!' সুপ্রিয় তাকিয়ে থাকে নয়নার দিকে।

নয়না হাসে। 'আপনি দাদার বন্ধু। দাদাকে তো আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ যোগাযোগ হল। আপনিও লণ্ডনে থাকেন! আজ থাকুন না একটু, অনেক কথা শুনবো আপনার, দাদার!' নয়না অনেক সহজ হয়ে যায়। 'নিন, আগে চায়ের কাপে চুমুক দিন!'

'আমার বাড়িতে কিন্তু জানে আমি ফিরে আজ দুপুরে খাবো।'

'তাতে কি!' নয়না থামে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, মহুয়া ঢোকে।

'আয়।' নয়না ডাকে। মহুয়া পাশে এসে দাঁড়ায়। 'আমার পরের বোন মহুয়া।'

সুপ্রিয়র হাতে চায়ের কাপ। একটা চুমুক দিয়ে ঠোঁট থেকে কাপ সরায়। তবু হাত-জোড় করার ভঙ্গি করে। 'আপনাদের সকলকে চিনি। আপনি নয়না মানে খুকু, ও মহুয়া মানে মিঠু। অতীশের পরে আছে সতীশ, ডাক নাম সতু।'

কথার মধ্যেই ঢোকে প্রীতিশ।

'একে আপনি চিনবেন না। দাদাই ওকে চেনে না! এ হল প্রীতিশ। পিতু বলে ডাকি।' নয়না থামে। 'জানেন, এর যখন বছর দুয়েক বয়স, তখন দাদা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় হঠাৎ একদিন। একে তো মনে রাখার কথা নয় দাদার।'

'তা ঠিক।' সুপ্রিয় চায়ে শেষ চুমুক দেয়। বিস্কুট মুখে তুললো না। সস্তা দামের চায়ের পাতা দিয়ে তৈরী চা-টা সুপ্রিয়র একটুও ভালো লাগছিল না। তবু ভদ্রতায় খেতে হল ওদের সামনে। চায়ের কাপ মেঝেয় নামিয়ে রেখে সুপ্রিয় বললো, 'আপনাদের কথা এত বলেছে অতীশ আমাকে!' যেন দম নিয়ে বলে সুপ্রিয়, 'আপনাদের অনেক স্মৃতি মরে গেছে অতীশের। আবার নতুন করে ধরতে চায় ও।'

'আমাদের আপনি বলবেন না সুপ্রিয়দা। অনেক ছোট কিন্তু!' সুপ্রিয়র কথা শেষ হতেই হঠাৎ ওকে থামিয়ে দেয় মহুয়া।

'বেশ বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু বাবাকে একবার ডেকে দাও, আমি এখনি উঠবো।' হাতঘড়ি দেখে।

নয়না অবাক হয়ে মহুয়াকে দেখে, 'তুই নামটা ঠিক মনে রেখেছিস তো?'

মহুয়া কটাক্ষ করে নয়নাকে। 'বাবাই তো ওঘরে গিয়ে বলল নামটা। আগের চিঠিতেও ছিল। তুই ভুলে গেছিস দিদি!'

সুপ্রিয় দুজনকে দেখে। চোখ ফেরায় প্রীতিশের দিকে।

পিতুর বয়স এখন বছর বারো। পাতলা রোগা চেহারা। 'আজ যেতেই দেব না। আমাদের আজ রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে!'

ধমক দেয় নয়না। 'পিতু, ভীষণ পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছিস! দাঁড়া, মাকে বলছি।'

'বাঃ রে, ছোড়দিই তো আমায় ও ঘরে বলল বলতে!' বলেই কি ভেবে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ ঘরটা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

'আপনি কিছু মনে করবেন না সুপ্রিয়দা! ও এই রকম! বয়সের থেকে অনেক বেশী পাকা। যা কিছু বলে সব দিদিদের নামে চালায়! এই বয়সে এত পাকা না?' মহুয়া কথাগুলো বলে ও ঘরে পিতুকে শেখানো সত্য কথাটা চাপা দিয়ে দেয় অবলীলায়।

সুপ্রিয় ভুরু কোঁচকায়। কোন দিক থেকে বুঝি অসবর্ণ নোংরা সম্পর্কের

প্রচ্ছন্ন খেলা শুরুর ছায়া অনুভব করে। এই টালিখোলার ঘরের দেওয়াল দেওয়া পরিবেশ, এই মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে নেমে আসা পরিবারে তা বুঝি ক্রমশ সম্ভব, মানানসই হয়। সুপ্রিয় যেন একটা দূরত্ব অনুভব করে।

হঠাৎ ব্যস্ততায় সুপ্রিয় বলে, 'বাবাকে এখনি ডাকো, আমি এবার সত্যি যাবো।'

'বসুন। আমরা আসছি।' নয়না-মহুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুপ্রিয় একা হয়ে যায়। নয়নার বয়স কত হবে? বছর চব্বিশ। মহুয়া পিঠোপিঠি বোন। একটু আগে এদের এখনো বিয়ে না দিতে পারার প্রচ্ছন্ন অসহায় হতাশা-কণ্ঠ শুনেছে সুপ্রিয় যতীনবাবুর কথায়। এরা কি এখনো পড়াশুনা করছে?

পাশের ঘরে দুই বোন ঢুকলো। মা ইন্দুমতী মেঝেয় বসে। যতীনবাবু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে।

নয়না বলল, 'বাবা, সুপ্রিয়দা চলে যাবে বলছেন! তোমায় ডাকছেন!' গলা নামাল, 'তুমি কিন্তু যেতে দিও না! বলবে, এখানে এ বেলায় খাওয়া-দাওয়া করে যাবে!'

বিকৃত হল যতীনবাবুর মুখ। 'খেয়ে! মানুষটাকে কি খাওয়াব? বাজার করার পয়সা আছে? সতু সেই সাত-সকালে উল্টোডাঙার মুচি বাজারে কাঁচা আনাজ নিয়ে বসেছে। তা থেকে পয়সা এলে তবে বাজার হবে!' গজগজ করার মত বলে গেলেন কথাগুলো। যেন খেঁকিয়ে উঠলেন হঠাৎ, 'অতো আদিখ্যেতা করিস না খুকু!'

'আহ্ এত চেঁচিয়ে কথা বোলো না, শুনতে পাবে!' ইন্দুমতী থামলেন, 'ওদের কি দোষ? আমিই তো খেতে বলেছি!'

'ভেবে বলেছিলে?' বলার ভঙ্গিতে মুখে-চোখে স্বরে কুৎসিত বিকৃতি ঠেলে ওঠে।

'কেন, খোকা তো হাজার টাকা পাঠিয়েছে? তা থেকে না হয় দাও!'

ইন্দুমতী তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে।

যতীনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়ের দিকে তাকালেন। 'তা হয় না। এই পুজো গেল। সবই খরচ হয়েছে ধারে। এই টাকায় সমস্ত ধার শুধতে হবে।' যতীনবাবুর গলা কঠিন স্থির শোনালো, 'ধার না শুধলে রাস্তায় বেরুনো যাবে না। ওসব অতিথি-আপ্যায়ন বাদ দাও।'

'ও থেকে সামান্য ক'টা টাকা খরচ করলে কিছু হবে না। তুমি চুপ করো তো!' ইন্দুমতীর স্বরে যেন কঠিন আদেশ। দাবি করার মত চাপ দিয়ে কথাটা বলে থামলেন। 'আগে বলা হয়ে গেছে, এখন আর না বলা যাবে না।'

'কী বলা হয়ে গেছে?'

নয়না বলল, 'আমি তো খাওয়ার কথা বলে এসেছি!'

'তা ছাড়া অতুর বন্ধু। না খাইয়ে ছাড়লে অতু কি বলবে? ও তো চিঠিতে খাওয়ানোর কথা বলেছে!' ইন্দুমতী স্বামীকে আগের চিঠির কথা মনে করিয়ে দিলেন।

'তখন ও জানতো আমরা ওখানে।' থামলেন যতীনবাবু, 'এখানে থেকে এই পাঠানো টাকার একটিও বাজে খরচ করা যাবে না।' যতীনবাবু সাংসারিক অংক-কষার মাথাটা নাড়তে থাকেন।

ইন্দুমতী অন্যমনস্ক। একবার মেয়েদের দিকে দৃষ্টি বুলোলেন। ছোট ছেলে পিতুর দিকেও। 'দেখ, অতুর বন্ধু এসেছে, থাক না কিছুক্ষণ। এরা একটু ওকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুক। কোথাকার ছেলে বল তো! সেই লণ্ডনের। বাবা! ভাবা যায়? কত বড়লোক! আর ছেলেটাও কেমন ঘরোয়া, কথাবার্তা ভাল, দেখতেও বেশ! মিঠুটা না হয় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে, খুকু তো বি.এ. পাশ। ও বরং বেশ খানিকক্ষণ কথা বলে অতুর বন্ধুকে জমিয়ে রাখবে!' নয়নার দিকে তাকান। 'কি রে, পারবি না?' দৃষ্টি দিয়ে মেয়ের শরীর জরিপ করেন।

নয়না ভিতরে লজ্জা পায় মায়ের দৃষ্টির সামনে। 'কেন পারব না মা? দাদার বন্ধু তো?' ভিতরে একটা সন্তর্পিত লোভ, বাসনা মায়ের প্রশ্রয়ে নড়ে-চড়ে থেমে যায়।

যতীনবাবু স্ত্রীকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিলেন। এবার নয়নার দিকে তাকালেন। নয়না খারাপ দেখতে নয়। এত অভাবেও স্বাস্থ্য বেশ ভালো। শরীরের ত্বকে লাবণ্য আছে। কথায় হাঁটা-চলায় প্রাণ আছে ওর। নয়না নামটাও সার্থক। স্ত্রীর সঙ্গে অকারণ দৃষ্টি বিনিময় হল যতীনবাবুর। কি ভাবলেন যেন!

'যা ভাল বোঝ করো।' একশ টাকার একটা নোট বের করলেন হাতের খাম থেকে। 'মিঠু, তোর মাকে দে!' ইন্দুমতীর দিকে তাকালেন, 'ভেবে-চিন্তে খরচ কোরো।' নোটটা মিঠুর হাতে দিলেন। 'আমি ওঘরে যাচ্ছি।' বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে যতীনবাবু।

এঘরে এসে বিছানায় উঠে পা তুলে বসলেন যতীনবাবু। 'তুমি এবেলা এখানেই বরং কিছু খেয়ে যাও বাবা, বেলা হয়ে গেছে।'

'তা হয় না কাকাবাবু। আমার বাড়ি বলা নেই। তা ছাড়া—'

থামিয়ে দিলেন যতীনবাবু, 'অতুও তো লিখেছে, তুমি এলে নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া করিয়ে ছাড়তে।'

সুপ্রিয় অস্বস্তি বোধ করে। এ সময়ে ঠিক কী বলবে বুঝতে পারছে না।

ইন্দুমতী ঘরে ঢোকেন। পিছনে দুই বোন আর পিতু।

সঙ্গে সঙ্গে সামান্য উঠে দাঁড়াবার মত ভঙ্গি করে সুপ্রিয় বন্ধুর মায়ের প্রতি ভদ্রতায়, সৌজন্যে। 'থাক, থাক, বোসো বাবা।' ইন্দুমতী সুপ্রিয়র এমন আচরণে খুশি হয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ান।

বাইরে যাবার চৌকাঠে নয়না-মহুয়া দাঁড়িয়ে থাকে পাশাপাশি। সুপ্রিয় বসে পড়ে মোড়াটায়। 'আমাকে আজ ছেড়ে দিন। পরে একদিন না-হয় খাওয়া-দাওয়া করে যাবো। আছি তো কদিন।'

'তা আর কি হয়? আজ যখন এসেই পড়েছ—কিছুসময় থাকলে ক্ষতি কী?' ইন্দুমতী থামলেন, 'তোমাকে কাছে পেয়ে তবু তো অতুকেই ধরতে পারছি। থাকলে আরো অনেক কথা শুনতে পাবো।' মেয়েদের দিকে তাকালেন। 'আমার ছেলে-মেয়েরা তো এখন ছাড়তেই চাইছে না তোমাকে!'

সুপ্রিয় একবার তাকালো দরজায় দাঁড়ানো নয়না-মহুয়ার দিকে।

'না না, আর বলতে হবে না, থাকবে।' যতীনবাবু এবার কথা বললেন।

সুপ্রিয় অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁটের সৌজন্যের হাসিটুকু আড়াল হয়নি তখনো।

'তুমি বসলে কেন!' স্বামীর দিকে তাকালেন ইন্দুমতী, 'বরং একটু বাজার যাও। সকালে যা বাজার করেছ তা তো আছে। এবার এর জন্যে কিছু নিয়ে এসো।' ইন্দুমতী সহজস্বরে বললেন কথাটা। মিথ্যেকে সত্যের মধ্যে আনলেন। পয়সা না থাকায় আজ বাজারই হয়নি ওদের।

'যাই।' যতীনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'তুমি বসো বাবা, মেয়েদের সঙ্গে একটু কথা-টথা বলো, আমি তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।' ইন্দুমতী মেয়েদের দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে সামনে তাকালেন।

'বেশী কিছু করবেন না যেন। আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে এভাবে আপনাদের ব্যতিব্যস্ত করতে!' সুপ্রিয় স্বর বিনীত করে।

'ও কিছু না! লোকজন এলে আমার এসব প্রায় প্রতিদিনের অভ্যেস। অতু সব জানে। তুমি বোসো।' ইন্দুমতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নয়না-মহুয়া এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এলো পিতু। মা বাবাকে সামান্য মাংস আর একটু মিষ্টি আনার কথা বলতেই পিতু এঘরে আসে। থমকে দাঁড়ালো সুপ্রিয়র সামনে। 'সুপ্রিয়দা, আপনি মাংস খাবেন তো?'

নয়না-মহুয়া সাময়িকভাবে হঠাৎ যেন থতমত হয়ে তাকিয়ে থাকে পিতুর দিকে।

সুপ্রিয়র যেন আজ সকালেই ওর বাড়ি থেকে বেরুবার সময় নিজের এক গোপন বাসনার কথা মনে পড়ে যায়। 'ওহ্‌হো, হাঁ নিশ্চয়ই! আমরা সকলেই খাবো! এই নাও পিতু।' বলতে বলতে প্যাণ্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে। তিনটি কুড়ি টাকার নোট সামনে ধরে বলে, 'নাও, বাবাকে বলো মাংস আর মিষ্টি আনতে, আমরা সবাই মিলে খাবো। আমি তোমাদের আজ ফিস্ট দিলাম।'

পিতু সুপ্রিয়র বাড়ানো হাতটার প্রান্তে মুঠোয় ধরা নোটগুলি দেখে, আর দিদিদের দৃষ্টি অনুসরণ করে।

নয়না-মহুয়া স্থির তাকিয়ে থাকে পিতুর দিকে।

'নাও, ধরো?' সুপ্রিয় হাসে।

পিতুর দু'চোখ চকচক করে ওঠে। হঠাৎ নোট তিনটি যেন ছোঁ মেরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়!

নয়না-মহুয়া তাকায় সুপ্রিয়র দিকে।

সুপ্রিয় খোলা মানিব্যাগটার চেন টানছে। চেনটা মাঝপথে আটকাচ্ছে বলে বন্ধ করতে দেরী হচ্ছে। এরই মধ্যে সুপ্রিয়র সামনে পিতুর চোখটা ভাসছে। টাকাটা ছিনিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিও! সুপ্রিয়র চারপাশে যেন মলিন দেওয়াল ক্রমশ এগিয়ে আসে।

'পিতুটা এত পাকা হয়েছে!' নয়না বলে, 'দাদাকে এটা বলবেন তো!' দৃষ্টি রাখে সুপ্রিয়র ব্যাগের দিকে। ব্যাগে ঠাসা আছে নতুন নোটের গোছা। দুজনে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখে। একসময়ে ব্যাগটার চেন বন্ধ হলে দু'বোন দৃষ্টি

বিনিময় করে। দু'জনের ঠোঁটে হাসি। চোখের সাদা জমিতে পুরনো বাসনা. লোভ অনেক দিনের একাধিক মরা প্রত্যাশার ছায়া ফেলে।

এই মুহূর্তে সুপ্রিয়র দৃষ্টি দু'বোনের মুখের ওপর নেই।

'শোন।' বলে সুপ্রিয় মুখ তোলে। নয়নাকে দেখে। 'একটা সিগারেট খেলে কিছু হবে?'

'না, না!' নয়না সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'খান না! বাবা এখন বাজারে।' নয়না থামে। 'এতক্ষণ কেন খাচ্ছেন না, তাই ভাবছিলাম। জানেন, ছেলেরা সিগারেট খেলে আমার খুব ভালো লাগে। সিগারেটের পোড়া গন্ধটায় আমার ভীষণ লোভ!' আহ্লাদে মুখ উজ্জ্বল করে নয়না।

সুপ্রিয় হাসে। নতুন একটা সিগারেট ধরায়। 'একটা এ্যাস্‌ট্রের মত কিছু দাও তা হলে।' নয়নাকে হঠাৎ যেন কিছুটা জীবন্ত মনে হয় ওর।

'দিচ্ছি।' মহুয়া বেরিয়ে যায়, একটা ভাঙা কাপ নিয়ে আসে। 'নিন, ছোড়দা সিগারেট খেয়ে এতে ছাই ফেলে।'

ছোড়দা মানে সতীশ বিড়ি খায় নয়না জানে। মহুয়া কেমন চমৎকার কথাটা বলে গেল! খুশি হয় মহুয়ার কথায়। মহুয়ার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি রাখে।

'সতীশ কোথায়?'

'ওর তো ব্যবসা!' নয়না বলে। 'সেই সাত সকালে গেছে ফিরবে দুপুরে, খেয়েই আবার বেরুবে।' মুচিবাজারে যে কাঁচা কিছু আনাজ নিয়ে চট পেতে বসে মাটিতে, তাকে উঁচু শ্রেণীর ব্যবসায় বসিয়ে নয়না ভিতরে খুশি হয়। নয়না এমনভাবে ব্যবসার কথা বলে, যাতে সতীশকে কারোর কিছুটা বড় মাপের ব্যবসাদার মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

'দুপুরে এলে দেখা হবে তা হলে।' সুপ্রিয় দুই বোনের দিকে তাকায়।

'হবে!' নয়না কথাটা বলে উৎকর্ণ হয়। পাশের ঘরে মা যেন কাউকে চাপা স্বরে বকছে বলে মনে হল ওর। পিতু বুঝি বিরক্ত করছে মাকে! 'আপনি একটু বসুন সুপ্রিয়দা, আমরা আসছি।'

নয়না এ ঘরে এলো। পিছু পিছু মহুয়াও। 'কি হল মা? এমনভাবে বকছ, ও ঘর থেকে সব শোনা যাচ্ছে।' পাশের দাঁড়িয়ে থাকা পিতুকে দেখে।

গলা অনেক নামালেন ইন্দুমতী। 'সুপ্রিয় কি টাকা দিয়েছে পিতুকে?'

'হাঁ। সকলের জন্যেই! মাংস আর মিষ্টি খেতে।' মহুয়া খুশিতে উজ্জ্বল মুখে কথাগুলো বলে মাকে দেখতে থাকে।

ইন্দুমতীর হাতের মুঠোয় কুড়ি টাকার নতুন তিনটি নোট ধরা। 'ছাখ তো, পিতুটা এখনি সব খরচ করার বায়না ধরেছে। কী বোকা ছেলে বল তো!' সস্নেহ শাসনের চোখে ইন্দুমতী পিতুর দিকে দৃষ্টি রাখেন।

নয়না বলে, 'কিন্তু মা, সুপ্রিয়দা যে সকলের জন্যে দিয়েছে! বুঝতে পারবেন না?' মায়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নয়না যেন সতর্ক করে মাকে।

'তোরা চুপ কর্। তোর বাবাকে যা আনতে বলার বলেছি। ও কিছু বুঝতে পারবে না!' একটু থামেন। 'টাকাটা তোলা রইল, পরে খরচ হবে।'

নয়না মহুয়ার দিকে তাকায়। মহুয়া পিতুকে দেখে।

'শোন্।' ইন্দুমতীর স্বর ফিসফিস শোনায়। 'এ টাকার কথা তোরা বাবাকে একদম বলবি না। আমার কাছে থাকলো, পরে তোদের দেবো।' আঁচলে টাকা ক'টা বাঁধতে থাকেন। ইন্দুমতীর সারা মুখে-চোখে গভীর তৃপ্তি মাখা হয়ে থাকে।

যতীনবাবু সামান্য বাজার হাতে নিয়ে ঢোকেন ঘরে। বস্তির গায়েই ছোট অস্থায়ী বাজার। সকালের দিকেই যা বসে। ঘরে ঢুকে বাজারের থলি, সামান্য মাছ আর কয়েক টুকরো মাংস আনার নোংরা পুঁটলিটা এক কোণে নামিয়ে রাখেন। মেয়েদের দিকে তাকান। 'তোরা মাকে একটু সাহায্য কর্।' পিতুর দিকে দৃষ্টি ফেলেন। 'যা তো বাবা পিতু, দোকান থেকে দই-মিষ্টিটা নিয়ে আয়।' পরিমাণ বুঝে টাকাটা হাতে দিলে পিতু বেরিয়ে যায়! 'ও ঘরে বুঝি সুপ্রিয় একা বসে?'

'হ্যাঁ বাবা। তুমি যাও তা হলে, কথাবার্তা বলো!' নয়না যুক্তি দেয়, 'আমরা তিনজন মিলে সব ব্যবস্থা করছি।'

যতীনবাবু এ ঘরের দিকে এগোতে থাকেন।

শরীরটাকে শিথিল, অলস করে পিছনের দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে সুপ্রিয় এতক্ষণ একটানা সিগারেট খাচ্ছিল। যতীনবাবুর পায়ের শব্দ কানে আসতেই তাড়াতাড়ি সিগারেট নিভিয়ে ছাইফেলার নোংরা কাপটা পাশে সরিয়ে রাখে।

যতীনবাবু দরজা গোড়ায় থমকে দাঁড়ান। সুপ্রিয়কে দেখেই বলেন, 'তুমি তো খেয়ে-দেয়ে যাবে বাবা, তা হলে পোশাকটা বদলে নাও।'

'না কাকাবাবু, তার আর দরকার হবে না।'

'তা কি হয়?' দাঁড়িয়ে থেকেই গলা তুলে ডাকলেন, 'খুকু, সুপ্রিয়র জন্যে আমার একটা ধুতি নিয়ে আয়। কি রে তোরা, এখনো কেন দিসনি কাপড়?'

'যাচ্ছি বাবা।' নয়না সাড়া দেয়।

'আপনি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন কাকাবাবু। ওসব কিছুর দরকার নেই!'

নয়না হাতে কাচা ধুতি নিয়ে আসে। বাবার দিকে তাকায়, 'তুমি একটু বাইরে যাও বাবা, উনি এ ঘরেই পোশাক বদলে নিন বরং।' সুপ্রিয়র দিকে তাকায়, 'তাড়াতাড়ি বদল করুন সুপ্রিয়দা, পরে আসছি।' নয়না সামনে থেকে সরে যায়।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুপ্রিয় প্যান্ট ছেড়ে ধুতিটা পরে। এ ঘরের দেওয়ালে পুরনো দু'টো হ্যাঙার পেরেকে ঝোলানো। বোধ হয় সতুই প্যান্ট পরে। ছাড়া প্যান্ট-শার্ট এতে ঝোলায়। সুপ্রিয় ওর প্যান্টটা একটায় ঝোলালো, আর একটায় বুশ শার্ট।

যতীনবাবু ঘরে ঢুকে বিছানায় বসলেন। সুপ্রিয় এখন সেই বেতের চেয়ার-টাতেই নিশ্চুপ বসে। মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকে। যতীনবাবু সুপ্রিয়কে নিখুঁত করে দেখেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে তুমি কতদিন থাকছ সুপ্রিয়, মানে কলকাতায়?'

সুপ্রিয় মুখ তোলে। 'ধরুন এক মাসের মতন।'

যতীনবাবু দেয়ালে ঠেস দেন। 'তোমাদের ইণ্ডিয়ায় আসা তো নয়, খরচের বোঝা টানা! তাই না?'

সুপ্রিয় তাকিয়ে থাকে যতীনবাবুর দিকে। 'তা ঠিক। বাইরে থেকে আসার আর ফিরে যাওয়ার খরচ শুধু নয় কাকাবাবু, এখানে এসে অনেককে অনেক কিছু দেওয়ার ব্যাপারও থাকে। বেশ কিছু কেনাকাটা করতে হয়।' একটু থামে। 'অতীশ তো এসব ভেবে আসবেই না আর বলেছে। ও বলে অযথা এত পয়সা খরচ।

যতীনবাবু সুপ্রিয়র কথা কিছু শোনেন, কিছু না শুনে নিজের গোপন ভাবনায় ডুবে থাকেন। খুকু-মিঠু-পিতু একটু আগেই বলছিল, সুপ্রিয় নাকি অনেক টাকা নিয়ে এসেছে! ওর মাণিব্যাগে অনেক নতুন নোট! অতীশের পাঠানো টাকা থেকে সুপ্রিয়কে খাওয়াতেই তো কয়েকটা টাকা বেরিয়ে গেল। যতীনবাবুর এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না এমন আদর-আপ্যায়নের! চাপে পড়ে এই খরচের ফলে যতীনবাবুর মধ্যে বিরক্তি দানা বাঁধছে সন্তর্পণে। কি ভেবে একটা অঙ্ক কষছেন মনের গভীরে।

'না, না, তুমি বরং ওকে আসতে বারণই কোরো।'

'অতীশ প্রায়ই বলে, আপনাদের সকলকে ওখানে নিয়ে যেতে পারলে আপনাদের সুবিধে, ওরও।'

'বলে বুঝি?' কথাটা যতীনবাবুর অন্যমনস্ক মনের সঙ্গে লেগে থেকেই প্রকাশ পায়। হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তো ফিরে গিয়েই দেখা করবে অতুর সঙ্গে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই। ও আপনাদের খবর শুনতে এত আগ্রহী যে লণ্ডনে পা দিলেই ও ছুটে আসবে!' সুপ্রিয় বৃদ্ধকে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার কণ্ঠেই কথাটা বলে যায়। 'আপনাদের অনেক স্মৃতি ও নতুন করে পেতে চায়।' বলার আবেগে কথাগুলো উচ্চারণ করে ও।

'তা হলে তোমাকে একটা কথা বলি, কিছু ভাববে না তো?'

'না, না, ভাবব কেন! বলুন।'

'যদি কিছু মনে না করো, অসুবিধে না থাকে,' যেন কোন প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধে ঢাকতে চান নিজেকে, যতীনবাবু ইতস্তত বোধ করেন, 'আমাকে যদি আর কিছু টাকা দিয়ে যাও!' যতীনবাবুর দৃষ্টি, মুখের রেখা শীতল। ধারের কথা বলবেন ভাবছিলেন, বললেন না।

সুপ্রিয় মুহূর্তকাল যতীনবাবুর মুখ দেখে, 'না, অসুবিধে কী?' ভিতরের বিস্ময় ঢেকে রেখে বলে, 'কত চাই বলুন?'

'যা দেবে। মানে—'

'ঠিক আছে,' সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়। যতীনবাবুর চাওয়াটা কেমন করুণ ভিখিরির মত শোনায়। নিজেকে বড় ছোট মনে হয় এসবের সামনে সুপ্রিয়র। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে। একটা একশ' টাকার নোট যতীনবাবুর সামনে ধরে। 'নিন, এতে হবে তো?' সুপ্রিয় বৃদ্ধটিকে নির্নিমেষ লক্ষ্য করে।

মুগ্ধ বিহ্বল যতীনবাবুর মুখটা কিছুটা তোবড়ানো মলিন বাসনের হঠাৎ মাজা চকচক করার মত দেখায়। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে নোটটা হাতে নেন, ফতুয়ার পকেটে ফেলে দেন।

'দরকার হলে আমি অতীশের কাছ থেকে নিয়ে নেব।' কোনদিনই অতীশের কাছে এটা চাইবে না জেনেও সুপ্রিয় মিথ্যে দিয়ে যেন সান্ত্বনা দেয় যতীনবাবুকে।

'না, না, অতুকে কিছু বোলো না বাবা। ও আবার কী ভাববে!' যতীনবাবুর উজ্জ্বল মুখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে

নিশ্চুপ হয়ে যান উনি। সারা মুখটা আবার আগের মত ভাবলেশহীন। অদ্ভুত একটা মুখ, যেখানে কোন প্রতিক্রিয়াই এক মুহূর্তের জন্য স্থায়ী থাকে না। এক কঠিন, নির্মম, কর্কশ ছায়া সারা মুখ ঢেকে রাখে।

কি এক মন্ত্রে সারা ঘর নিঝুম হয়ে যায়। সুপ্রিয় হঠাৎ যেন কোন কথা বলতে পারে না। অতীশ বলেছিল, 'দেখবি আমার বাবা অন্য জাতের মানুষ। কারোর কাছে সহজে মাথা নোয়ায় না, ছোট হাতে চায় না। তাই জীবনে কিছু করতেই পারলোনা চাকরীটা ছাড়া।' এই কি সেই যতীনবাবু? অতীশ তো এঁকে চেনে না! চিনতেও পারবে না কোনদিন। ফিরে গিয়ে কি কোনদিন অতীশকে এসব বলতে পারবে, না, বলা উচিত হবে? এসবই হবে তার স্মৃতি? সুপ্রিয় স্থির তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধের দিকে।

আজ দুপুরে একটু বেলা হল খেতে। ইন্দুমতী নিজের বুদ্ধি মত আগেই খাইয়ে দিয়েছেন খুকু, মিতু আর পিতুকে। যতীনবাবু পরে খাবেন। সতু এইবার ফিরবে, ওর সঙ্গেই খাবেন। মাঝে সুপ্রিয়কে বড় ঘরের মেঝেয় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন।

সুপ্রিয় বসে আছে আসনে। ওকে ঘিরে ঘরের মধ্যে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন যতীনবাবু, নয়না-মহুয়া-পিতু। জানলা দিয়ে দূরে সতীশকে আসতে দেখেই পিতু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সতীশের হাত ধরে দালানের ও কোণে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'দাদার সেই বন্ধু এসেছে ছোড়দা!'

'কে?' সতীশ বিমূঢ় বিস্ময়ে পিতুকে দেখে।

'সেই লণ্ডন থেকে যার আসার কথা ছিল!' পিতু বলে ওর হাতের ব্যাগটার দিকে তাকায়। 'ওগুলো এখন লাগবে না। দাদা টাকা পাঠিয়েছে বাবা তাতেই বাজার করেছে। সুপ্রিয়দা আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে তবে যাবেন।'

সতীশ ব্যাগে কিছু কাঁচা আনাজ আর চাল কিনে এনেছে বাড়ির জন্যে। দালানের এক কোণে রাখে।

'ছোড়দা,' পিতু কৌতূহলে চোখ পাকায়। গলা নামিয়ে সতীশকে কোন খবর দেয়। এমনভাবে বলে তা ওরা দুজন ছাড়া কেউই শুনতে পায় না।

সতীশ পিতুর পিছু পিছু ঘরে ঢোকে। সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

'এই তো সতু এসে গেছে।' ইন্দুমতী বললেন, 'ঢ্যাখ, এ হল অতুর বন্ধু।'

হাত তুলে নমস্কার করে সতীশ। মুখে হাসি। 'এমন জানলে আমি আগেই আসতাম!'

'তাতে কি?' ইন্দুমতী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তুই চান করে নে, বাবার সঙ্গে খেতে বসবি।'

সুপ্রিয় হাসতে হাসতে বলল, 'অতীশের মুখের সঙ্গে এর বেশ মিল!'

'হ্যাঁ তা বলতে পারেন।' নয়না বলে, 'তুই যা দাদা, সুপ্রিয়দা খেতে বসছেন এখন।'

সতীশ বেরিয়ে যায়। এ ঘরে আসে। ময়লা প্যাণ্ট-বুশশার্ট খোলে। হ্যাঙারে সুপ্রিয়দার জামা-প্যাণ্ট ঝোলানো থাকায় ও পোশাকগুলো তক্ত-পোষের নীচে রাখে। গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটা মেঝেয় রেখে পা দিয়ে এক কোণে ঠেলে দেয়। একসময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে! পিতু কি যেন বলছিল! সুপ্রিয়দা অনেক টাকা এনেছে! মানি ব্যাগে! বাইরে একবার তাকায়। দামী প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকায় অবলীলায়। ভারী মানি-ব্যাগ বের করে দ্রুত চেন টেনে খোলে। চোখের সামনে ঝকঝকে নতুন নোটগুলো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের মত যেন ঝলসে ওঠে। দ্রুত হাতে একটা একশো টাকার নোট বের করে নেয়। ব্যাগটা পকেটের মধ্যে ফেলে দেয়। মেঝে থেকে ওর প্যাণ্ট-বুশশার্ট তুলে নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে রাখে। সব নিয়ে বাড়ির পিছনে বাথরুমের দিকে চলে যায় চান করতে।

খাওয়ার মধ্যে ইন্দুমতী একসময়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ বাবা, অতু নাকি বলেছে আমাদের সকলকে ওখানে নিয়ে যেতে তার খুব ইচ্ছে?' একটু থামেন, স্বামীর দিকে তাকান, 'তোমার কাকাবাবু আমায় বলছিলেন!'

খেতে খেতে মুখ তুলে ইন্দুমতীর দিকে তাকাল সুপ্রিয়। 'ও কথার কথা। নিয়ে যাওয়া খুব সোজা নয় কাকিমা।' হাসতে থাকে সুপ্রিয়।

'তা ঠিক বাবা। তা ছাড়া, আমরা ওখানে গিয়ে কি করব? বরং তোমরা যদি খুকুকে ওখানে নিয়ে যেতে পার, আমাদের একটা সুরাহা হয়। এখনো তো তোমরা দুজন কেউই বিয়ে করো নি! ঝাড়া হাত-পা!'

সুপ্রিয় মুখ-নাড়া থামায়। তাকায় নয়নার দিকে। 'কিসের সুরাহা!' সরল কণ্ঠে বিস্ময় মিশিয়ে সুপ্রিয় বলে।

ইন্দুমতী আর একবার মেয়েকে দেখেন, পরমুহূর্তে স্বামীকে। 'খুকু তো বি.এ-পাশ, দেখতেও খারাপ নয়। ওখানে গিয়ে যদি ওর একটা ব্যবস্থা করে অতু, আমরা একটু শান্তি পাই।' শেষের স্বর ঈষৎ গম্ভীর হয়। 'তোমাদের মত ছেলেরা আছ ওখানে। ওকে ঠিক কেউ না কেউ পছন্দ করবে!' ইন্দুমতী নির্বিকার মুখে বলে যান।

সুপ্রিয় খেতে খেতেই বলে, 'যেতে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না কাকিমা। নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা আছে!'

ইন্দুমতী এবার ওঁর মনের বাসনাটা জানাবার সহজ সুযোগ পেয়ে যান। 'আমি বলি কি, তুমি তো বললে এখনো একমাস কলকাতায় আছো, এর মধ্যে ওর যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করো না বাবা। কি করতে হয় সব তো জানা। তোমার সঙ্গেই তোমার খরচেই ও চলে যাক। অতু সব তোমায় দিয়ে দেবে!' থামেন ইন্দুমতী। মাথা নীচু করে খেয়ে-যাওয়া সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'তোমাকে আমার খুব বিশ্বাস বাবা। ছেলের বন্ধু যখন, তোমার সঙ্গে পাঠাতে আমাদের কোন ভয় নেই!'

সুপ্রিয় কথা বলে না। মাথা নীচু করে খেতে খেতে ভাবে, সুপ্রিয় বোধ হয় এভাবে এবাড়ি এসে কোথাও ভুল করেছে। মানুষের লোভ, স্বার্থ, লজ্জাহীনতা যেন সুপ্রিয়র চারপাশে দগদগে ঘায়ের স্বভাব নিয়ে বার বার দেখা দিতে চাইছে! সুপ্রিয়র কোন কথা না থাকায় সারা ঘর শব্দহীন। নয়না চাপা অস্বস্তিতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ও কোণে দাঁড়িয়ে। মুখ নীচু। মহুয়া-পিতু সুপ্রিয়র খাওয়া দেখছে একমনে। যতীনবাবু নীরব থেকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছেন। এমন শব্দহীন পরিবেশে সুপ্রিয় হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করল। মুখ তুলে ইন্দুমতীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে কাকিমা, আমি এবার ফিরে গিয়ে অতীশকে আপনাদের কথা বলি, তারপর না হয় একটা ব্যবস্থা হবে।'

যতীনবাবু এবার মুখ খুললেন, 'তা-ই ভালো।' ইন্দুমতীর দিকে তাকালেন। 'সব কিছু তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নয়।'

'বেশ তাই। কথাটা তবে মনে করে বোলো বাবা অতুকে। ভুলে যেও না যেন।' ইন্দুমতী চুপ করলেন।

খাওয়ার পরেই এই ছোট ঘরের বিছানায় সুপ্রিয়কে একবার শুতে হল। শোয়ার আগে একটা কাচা চাদর বিছিয়ে নয়না ভদ্রস্থ করেছে। তক্তপোষের এক ধারে সুপ্রিয়। একটু তফাতে নয়না-মহুয়া আধ-শোয়ার ভঙ্গিতে থেকে গল্প করতে থাকে।

'সুপ্রিয়দা, আজ একটা সিনেমা দেখতে যাবেন?' মহুয়া বলল।

'মন্দ হয় না কিন্তু।' নয়না সায় দেয়, 'চলুন না, গিয়েই টিকিট পেয়ে যাবো।'

সুপ্রিয়র তন্দ্রার মত চোখ-জ্বালা-করা ঝিমুনি আসছিল, ছুটে গেল। 'তা হয় না। আমাকে চারটের মধ্যে বেরুতেই হবে।'

'তার মানেই তো সন্ধে!' নয়না বলে। 'সেই সন্ধেই যখন হবে তখন সিনেমাটা দেখেই যান না। কত আর রাত হবে?'

'আবার তো একদিন আসবো বলেছি। তোমাদের ঠিকানাও দিয়েছি আমার ঠাকুরপুকুরের বাড়ির। ওখানে একদিন এসো, একসঙ্গে দেখব।'

'তা হয় না!' মহুয়া শুয়ে শুয়েই মাথা নাড়ে। 'আপনি একবার এখান থেকে চলে গেলে যোগাযোগ হওয়া কঠিন সুপ্রিয়দা!' মহুয়া খরচ করার মত অর্থের অসহায়তার কথা মনের গভীরে ভাসায়। চুপ করে থাকে। ভাবনার মধ্যে তন্দ্রা দু'চোখ জড়ায়।

শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছে সুপ্রিয়। নয়নার দিকে তাকায়। নয়না ওকে দেখছে নিষ্পলক। সুপ্রিয় অস্বস্তি বোধ করে। নয়নার বুকের কাপড়-জামা অগোছালো। নয়নার ভঙ্গিতে বুঝি অব্যর্থ কোন আকর্ষণ স্থির থাকে!

'তুমি কি সত্যি ইণ্ডিয়ার বাইরে যেতে চাও নয়না?' সুপ্রিয় দৃষ্টি সরিয়ে হাসতে হাসতে বলে।

নয়নার চোখে অকারণ কটাক্ষ তৈরী হয়। গলা নামায়। 'মা কিন্তু অন্য ধান্ধায় কথাটা বলেছে, জানেন তো?' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তোলে।

'ধান্ধা!' সুপ্রিয় বিড় বিড় করে। 'মানে!'

'দাদার বন্ধু, দাদার বয়সী, বিয়ে হয়নি, এটাও বুঝলেন না!' নয়না চতুর খেলা মুখের রেখায়, দু'চোখের পাতায় আনে। আবার একটা হাই তোলে। বিছানায় বুক চাপে। একটু যেন শোয়ার মধ্যেই সুপ্রিয়র দিকে এগোয়। 'আপনাকে মায়ের খুব পছন্দ।' খিক খিক করে হাসে নয়না। যেন ভাল একটা ঠাট্টা করছে ও। 'আমারও।' অতি অস্ফুটে বলেই নয়না মুখটা বিছানার চাদরে আড়াল করে।

সুপ্রিয় শেষ শব্দটা শুনতে পায়নি। কিন্তু কোথাও বুঝি এক বিরক্তি ঠেলে ওঠে ওর মধ্যে। এ বাড়িতে ঢোকার পর থেকে আস্তে আস্তে এক ধরনের ব্যবধান অনুভব করছিল সুপ্রিয়, তা এই মুহূর্তে অনেক দুস্তর হয়ে ওঠে যেন! দমকা শীতল হাওয়ায় বাড়ির পিছনের খোলা ড্রেন থেকে ময়লা জলের গন্ধ নাকে আসে। সুপ্রিয় সিগারেটের শেষটুকু জোরে বার-কয়েক টানে।

ঘুমের মধ্যে ডুবে যায় নি সুপ্রিয়, শুধু ওর তন্দ্রার মধ্যে ছিল শীতের আলস্যের জড়তা। এসবকে চাদরের মত গায়ে নিয়ে সুপ্রিয় এক সময় বিছানায় শুয়ে থেকেই বিকেলের শীতকালীন অন্ধকার ছায়া দেখল বাইরের উঠোনে। দ্রুত উঠে বসল।

নয়নারা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি তক্তপোষ ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করল। কাপড় ছেড়ে ওর প্যাণ্ট পরল। পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখল, বাক্সটাই নেই। সিগারেট কি ফুরিয়ে গিয়েছিল? বাক্সটা কি ও নিজেই বাইরে ফেলে দিয়েছে ফুরিয়ে যেতে? মনে পড়ছে না।

'পিতু!' সুপ্রিয় ডাকল।

সঙ্গে সঙ্গে পিতু এ ঘরে এলো।

'এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে পারবে?'

'হ্যাঁ।' বড় করে ঘাড় নাড়ল। এমন কাজ পেয়ে ও যে খুব খুশি, মুখে-চোখে তার চিহ্ন প্রকট।

'দিদিরা কোথায়?'

'বড়দি গা ধুচ্ছে, ছোড়দি কোথাও গেছে, দেখতে পাচ্ছি না।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। পিতু কি ভেবে বলে, 'ছোড়দাও সেই দুপুর থেকেই বেরিয়ে গেছে!'

একটা দশ টাকার নোট পিতুর হাতে দিল সুপ্রিয়। সিগারেটটার নাম বলে দিল। 'যাও, খুব তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো, আমি এখনি বেরুবো।'

পিতু বেরিয়ে গেল দৌড়ে।

একটা সিগারেট না খেলে মাথা ভার যাবে না, সুপ্রিয় অনুভব করে।

'তুমি একটু চা খেয়ে যাবে তো বাবা!' ইন্দুমতী জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'না কাকীমা! কিছু খাবো না। অবেলায় খেয়েছি তো!'

'তা হলে থাক। তুমি তো যাবে, দাঁড়াও, খুকু আসছে।' সরে গেলেন কাছ থেকে।

এক দৌড়ে বাইরের উঠোন থেকে ঘরে ঢুকলো পিতু। হাঁপাচ্ছে। 'এই নিন।' প্যাকেট হাতে দিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পিতু সামনে। মুখে হাসি।

'কত পয়সা ফিরল?' সুপ্রিয় বুশশার্ট পরতে পরতে উদাসীন গলায় বলল।

'বাঃ! আমি যে এত কষ্ট করে এনে দিলুম। আমাকে কিছু পয়সা দেবেন না?' পিতু কোন সম্মতির আশায় তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ দুম্ করে কেউ বুঝি সুপ্রিয়র মাথায় ধাক্কা মারল। অবাক চোখে তাকিয়ে

থাকলো পিতুর দিকে। যেন বিড় বিড় করল গভীর এক অসহায়তায়, ঘৃণায়, 'নাহ্‌ এ আমার বন্ধুর ভাই।' বলল, 'তা হলে ওটাই তুমি নিয়ে নাও।'

পিতু আর দাঁড়াল না। এক দৌড়ে উঠোন পেরিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছু সময় নিজের মধ্যেই হতভম্ব হয়ে সুপ্রিয় বাইরের ছায়ায় ঢাকা উঠোনে চোখ রাখল।

জুতো-মোজা পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মহুয়া ঢুকলো ঘরে।

'বাঃ সুপ্রিয়দা! বেশ লুকিয়ে পালাচ্ছেন!'

'তার মানে!' সুপ্রিয় হঠাৎ কঠিন হয়ে যায় স্বরে। 'তোমায় কে বলল আমি পালাচ্ছি?' ভিতরে বিরক্ত হয়, তবু বুঝতে দেয় না।

'পিতু এই মাত্র আমাকে খবর দিয়ে গেল। আমি এক বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছিলুম!' মহুয়া হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে সুপ্রিয়র দিকে।

'আমি তো তোমাকেও খুঁজছিলাম। যাওয়ার আগে দেখা করে যাব না কেন?'

মহুয়া এগিয়ে আসে। 'ওসব বাদ দিন। এখন আমার সিনেমা দেখার টাকাটা ছাড়ুন তো!'

'কিন্তু এখন তো আর আমাদের যাওয়া হচ্ছে না! তোমরা তো বললে একদিন আমার ওখানে যাবে!'

মহুয়া মুখ বাঁকায়। 'দিদির কথা ছাড়ুন। দিদি কেবল স্বপ্নই দেখে। আমি ওসব ভাবি না। আপনি যাবেন না যখন, আমাকে দেখতে টাকা দিয়ে যান।'

'তুমি একা যাবে!' সুপ্রিয় স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।

মহুয়া আরও এগিয়ে আসে। 'সে যেভাবেই যাই না কেন! আপনি আগে ছাড়ুন তো!' বলেই সুপ্রিয়র মনিব্যাগ রাখা পকেটটায় দ্রুত হাত ঢোকায়। ব্যাগটা তুলে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। নির্দ্বিধায় চেন টেনে ব্যাগ খোলে। 'বেশী নিচ্ছি না সুপ্রিয়দা। একটা কুড়ি টাকার নোট নিলাম। একা তো যাবো না। তার ওপর সিনেমা দেখে রেস্টুরেন্টে খাওয়া আছে।' শব্দ করে হেসে ওঠে। ব্যাগ বন্ধ করে আবার সুপ্রিয়র পকেটের মধ্যেই ফেলে দেয়।

সুপ্রিয়র ভিতরটায় গভীর এক ঘৃণার ছায়া ঘনতর হয়। বুঝতে দেয় না মহুয়াকে। ওকে লক্ষ্য করে।

মহুয়ার হাতের মুঠোয় ধরা নতুন নোটটা। পাড়ার সুজয়দার কথা মনে পড়ে। এ পাড়ায় এই ছ'মাস এসে আলাপ হয়েছে। কতদিন সুজয়দাকে নিয়ে সিনেমায়

যাওয়া হয় নি! খুশি যেন শরীরের মধ্যে চন্দনের গন্ধ ছড়ায়, আবেগ আনে। 'চলি সুপ্রিয়দা! একটু দাঁড়ান, দিদি আসছে।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় মহুয়া। রীতিমত অন্ধকার উঠোনের ও প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যায় মহুয়া।

'আপনি চা খেলেন না কেন সুপ্রিয়দা!' নয়না এ ঘরে ঢোকে। 'আপনি শুয়ে আছেন দেখে আমি গা ধুতে গিয়েছিলাম। আমি চা করিনি বলে খেলেন না!' হাসে নয়না নিজের কৌতুকেই। 'মা কিন্তু সত্যি চা করতে চাইছিল।'

সুপ্রিয় কথা বাড়ায় না। 'বাবা কোথায়?'

'বাবাকে এখন পাবেন না। মা আছে। আসুন, যাবেন তো?'

'হ্যাঁ, চল।' সুপ্রিয় নয়নার পিছু পিছু দালানে আসে: সামনেই ইন্দুমতী দাঁড়িয়ে।

সুপ্রিয়র কেন যেন প্রণাম করার ইচ্ছে হল না। মনে হল, এরা বোধ হয় এসব কিছুর ধার ধারে না! 'চলি কাকিমা।'

'আবার এসে। কলকাতায় তো আছো। নিশ্চয়ই ঘুরে যেও।'

'আসব।' সুপ্রিয় উঠোনে নামে।

'খুকু।' ইন্দুমতী নয়নাকে ডাকেন।

নয়না একটু আগে ঘরে ঢুকেছিল কি দরকারে। বাইরে আসে। পোশাকের ঘরোয়া সামান্য আয়োজনে চমৎকার সেজেছে নয়না। আঁট-সাঁট গড়নে, হাঁটা-চলায় যৌবন যেন উত্তাল, অফুরন্ত, টালমাটাল। এত অল্প সময়ের রূপচর্চায় নয়না সত্যিই এক নিপুণ শিল্পী!

'যা তো মা সুপ্রিয়র সঙ্গে। একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

সুপ্রিয় এগোয়, পিছনে নয়না।

'বেশী দূর যাস না যেন।' ইন্দুমতী সাবধান করেন মেয়েকে। সুপ্রিয়কে ডাকেন। 'বাবা, পিছু ডাকলাম একটু দাঁড়িয়ে যাও।'

'বলুন।'

'অতুকে বোলো বাবা যেন চিঠিপত্তর দেয়, মাঝে-মধ্যে টাকা-পয়সা পাঠায়। সবই তো দেখে গেলে!' একটু থামেন। 'খুকুর কথাও ভাবতে বোলো।'

সুপ্রিয় একভাবে তাকিয়ে থেকে ইন্দুমতীকে দেখছিলো। 'বলব।' শান্ত স্বরে বলে। আড়চোখে নয়নাকে একবার দেখে নেয়।

উঠোন পেরিয়ে ওরা দুজন বাড়ির আড়াল হয়ে যায়।

'এবার সাবধানে চলুন।' সুপ্রিয়র পিছনে এসে দাঁড়ায় নয়না। 'এখান থেকে খুব সরু গলি। খোলা নর্দমা আছে কিন্তু।'

'জানি, সকালেই বাবু বলে ছেলেটা দেখিয়ে দিয়েছে।' সুপ্রিয় হাঁটতে হাঁটতেই বলে।

চারপাশ অন্ধকার। এদিকটায় আলো নেই। সামনেই দুই টালিখোলার মাঝের সরু প্যাসেজ। লম্বা। তারই মধ্যে ড্রেন। অন্ধকারে পথ-ড্রেন একাকার।

নয়না বলল, 'আমার হাতে আপনার হাতটা দিন সুপ্রিয়দা, আমার পাশে পাশে চলুন।' নিজেই সুপ্রিয়র হাত ধরে। পাশাপাশি হাঁটে। সুপ্রিয়র কব্জি শক্ত হাতে ধরে নয়না মুঠিটা ওর মুখের সামনে আনে। নাকে আসে পোড়া সিগারেটের গন্ধ। 'ইস, আঙুলে সিগারেটের এত ফাইন গন্ধ।' নয়না বিড় বিড় করে।

দু'পা সামনে ফেলতেই সুপ্রিয় আড়ষ্ট হয়ে যায়। নয়না এবার ওর বাহু ধরেছে শক্ত মুঠোয়। এত টানছে কেন সুপ্রিয়কে? রাস্তা চলায় সাবধান করার জন্যে, না অন্য কোন কারণে? হঠাৎ সুপ্রিয় অনুভব করে ওর বাহুর ওপর নয়নার বুকের চাপ। নয়না ওর অনেক ঘন হয়ে ওর পদক্ষেপ সামলায়। কিন্তু সারা শরীর জুড়ে নয়নার বুকের এত তাপ সে পায় কেন? নয়না কোন শব্দ করছে না। বাহু পিঠ জুড়ে নয়নার স্তনাগ্র একটানা কি এক খেলায় মাতে! এত কুৎসিৎ কেন এই খেলা? সুপ্রিয় বিরক্ত হয়। ঘৃণা প্রবল হয়ে ওঠে ভিতরে।

'তুমি এবার যাও নয়না। মা এতদূর আসতে বারণ করেছেন!'

খিল খিল করে হেসে ওঠে নয়না। 'ভয় পাচ্ছেন? মা ওরকম বলে। চলুন না, অনেকটা অন্ধকার তো, এগিয়ে দি।' একটু থেমে ফিস ফিস করে, 'একদিন ঠাকুরপুকুরে সত্যি যাচ্ছি কিন্তু।'

'না।' সুপ্রিয় যেন প্রতিবাদ করে, 'আর এগিয়ে এসো না।' বাহু সরাতে পারছে না, যদি পা ভারসাম্য হারিয়ে ড্রেনে পড়ে যায়। কথাগুলোও থেমে থেমে বলে সুপ্রিয়। নয়নার শেষ কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না।

নয়না কথা বলে না। আরও বুকের মধ্যে চেপে ধরে সুপ্রিয়র বাহু। 'আপনি কিন্তু ভীষণ টলছেন সুপ্রিয়দা।'

'আহ্ ছেড়ে দাও।' এক ঝটকায় সুপ্রিয় হাত ছাড়িয়ে নেয়। এগিয়ে যায় বেশ কয়েক পা। নয়না আচমকা পিছনে পড়ে যায়।

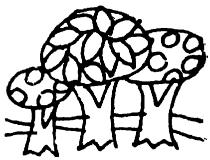
নয়না দাঁড়িয়ে থাকে। এ অন্ধকারে নয়না অভ্যস্ত। হেসে ওঠে শব্দ করে। 'সাবধানে যান। সত্যি পড়ে যাবেন কিন্তু!' জোরে ককিয়ে হাসে। 'আপনি এগোন, আমি দেখছি!'

সুপ্রিয় পিছন ফেরে না। কেউ যেন ওকে তাড়া করে। একটু আলোর আশায় দ্রুত পা বাড়ায় ও।

এবার ড্রেনের পচা গন্ধ পায় সুপ্রিয়। সারাদিন এই গন্ধটাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাকের মধ্যে নিচ্ছিল সুপ্রিয়।

এখন সেই গন্ধ বড় উগ্র, অসহ্য। ভিতরে ছটফট করে ওঠে সুপ্রিয়।

সামনে ল্যাম্পপোস্টের আলো রাস্তায় পেয়েই সুপ্রিয় এবার সত্যিই যেন দৌড়য়, বা পালিয়ে যায়।





থাকা না-থাকা

মনের গভীর শূন্যতার কি কোন অবয়ব আছে ? কোন নিতল স্মৃতি, নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা, কোন অসহায় দুঃখবোধ কি শূন্যতার শরীর দেয় ? দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে নিঃসীম অপ্রাপ্তির কারণে মনের স্বাদহীন নৈরাজ্যে শূন্যতা কি কোন আশ্রয় পায় ? সারারাত ধরে বিরামহীন শিশিরপতনে যে অদৃশ্য হিমেল আস্তরণ তৈরী হয় চারপাশে, আমার এতদিনের অসুস্থতায় যেন সেইরকম এক শীতল বর্ণহীন অস্তিত্ব আমাকে ভয় দেখায়।

এমন সকালে, এই নির্জন ঘরে বিছানায় শুয়ে থেকে হঠাৎই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে। আশ্চর্য ! ভারী অসুখ থেকে ক্রমশ সুস্থ হতে হতে এইরকম সব ভাবনা আমার মনে মাঝে-মধ্যেই খেলা করে। একবার কলকাতার কোন এক ব্যস্ততম বড় রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ কয়েক মুহূর্তের রহস্যময় চেতনা-লুপ্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে পার হয়েছিলাম একা ! ঠিক সেইরকম এক মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন কথাগুলো মনের গভীরে ভেসে ওঠে আচমকা।

আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি এ সময়ে ! মাস-তিনেক একটানা রোগ-ভোগের পর এমন হয় বুঝি ? আমি শুয়ে থেকেই নড়ে-চড়ে উঠি। একসময় বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসি। শোয়া অবস্থায় আমার মুখ ঘোরানো দরজার বাইরে আকাশের দিকে। শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। তার আগে নন্দা আমাকে জাগিয়ে মুখ ধোবার জল দিয়ে গিয়েছিল টি-টেব্‌লে। আমি মুখ ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চুপ শুয়েছিলাম। হাতের সেই সিগারেট কখন যেন

আলসো পুড়ে অর্ধেক ছাই। উঠে বসে এ্যাশ্‌ট্রেতে নিভে-যাওয়া সিগারেট ফেলে দিলাম। টেব্‌লের ওপর নন্দা কখন সকালের চা রেখে গেছে খেয়াল নেই।

একটানা শুয়ে থাকায় এমন দুর্বল শরীরে ঘাড় কিছুটা শক্ত, অস্বস্তিকর। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে নিই বারকয়েক। ঘাড়টা সহজ হতেই নাকে আসে ওষুধ আর ভিটামিন ট্যাবলেটগুলোর বিরক্তিকর গন্ধ।

সুনন্দা, মানে আমার স্ত্রী, যাকে নন্দা বলে ডাকি, ঘরে ঢোকে।

'কি গো! এখনো চা খাওয়া হল না!' সামনের কোচে বসে পড়ে নন্দা। দু'চোখে হালকা বিস্ময় ভাসে।

আমি কেমন এক অবসাদের মধ্যে নন্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। ওর উপস্থিতিতে আমার এমন নিস্পৃহতা একটুও কাটছে না।

'ও মা! চায়ের কাপে এখনো মুখই দাওনি! জুড়িয়ে যে জল!' আমার দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকায় নন্দা। মুখে প্রচ্ছন্ন ভয় ও হালকা অসন্তোষ মিশিয়ে থাকে, 'আর খেও না। ঠাণ্ডা চা বিষ।' চায়ের কাপ-ডিস সামনে টানতে টানতে আমার চোখে চোখ রাখে। 'তোমার আবার শরীর খারাপ হল না তো!' চাপা আতঙ্কে আমার বাহুতে হাত রাখে, চিবুকে কপালে হাত বুলোয়।

আমি হাসি। 'না, না, সে ভয় আর নেই।'

'কি জানি, এই ক'মাস যা দেখালে।' নিজের মত করে একটা শ্লেষ স্বরে মিশিয়ে নেয়। বুঝিবা একটু আশ্বস্ত হয়। 'ক'মাসে টাকার তো শ্রাদ্ধ হল। আবার যদি ফিরে আসে অসুখ—'। থেমে নীচু হয়ে চায়ের কাপ-ডিস তুলে নেয়: 'তুমি একটু অপেক্ষা করো, একেবারে সকালের জলখাবারের সঙ্গে চা পাঠাচ্ছি।' সোজা হয়ে দাঁড়ায় নন্দা। ও ঘরে যাওয়ার দরজার দিকে যেতে পিছন ফেরে।

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই।' নন্দাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নন্দা ঘুরে দাঁড়ায়। 'ডাক্তার আবার সিগারেট খেতে বলেছে বলে খালি পেটে তোমার সিগারেট খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়।' গলায় চাপা শাসন লেগে থাকে যেন।

'পুরনো অভ্যাসে কখন সিগারেট চলে আসে হাতে—'। আমি হঠাৎ থেমে যাই নন্দার মুখ-চোখ দেখে। প্রসঙ্গ হালকা করার চেষ্টায় আমার স্বর লঘু।

নন্দা বিরক্ত বোধ করে। 'আমার কিছু বলার নেই, যা ভাল বোঝ কর।' ওঘরে যাওয়ার চৌকাঠে পা রাখে। 'আবার ফিরে পড়লে টাকা-পয়সার যা অবস্থা, সারানো যাবে না।' বলতে বলতে নন্দা ওঘরে আড়াল হয়ে যায়।

না, আমি আর এখনি অসুখে পড়ব না। আমার এখনকার শরীরের ধাত দেখে নিজেই বুঝতে পারি। ডাক্তারের কথামতো দিন-চারেক হল, ভোরে সামনের ঘাস-ঢাকা লনে কিছু সময় ঘুরে বেড়ানোর জন্যেই বোধ হয় একধরনের দুর্বলতার চাপ শরীর ঢেকেছে। আজ থেকে বেড়ানো বন্ধ রেখেছি ডাক্তারের কথাতেই। এতদিনের অসুখে ভয়ংকর দুর্বলতায় বেশ একটু নুয়ে পড়েছিলাম। কদিন বেড়ানোর সময় তা বুঝেছি। এখন একটু সোজা হয়েছি। এই ঘরের মধ্যে থাকলে আমার সাহস থাকে। দুর্বলতা বেশ আছে, কিন্তু তা নীরোগ, কিছুটা বা সদ্য-সুস্থ-হওয়া মনের আলস্য-আরাম মেশানো।

কিন্তু আমাকে এসবও দ্রুত সরাতে হবে। নন্দার প্রতিদিনের কথায় তারই নির্দেশ। বুকটা কেমন ফাঁকা মনে হয়, মুখে বিস্বাদ। এখনি সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে হলেও ধরাই না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনের দামী স্টীল আলমারীর বড় আয়নায় দৃষ্টি রাখি। অসুখে ভেঙে গেছে আমার মুখ। দু'চোখ, মুখের ত্বক, চিবুক থেকে অসুস্থতার বিষণ্ণ, ক্লান্ত, নির্জীব ভাব সব যায় নি। হঠাৎ মনে হল, এভাবে একা-একা নিজেকে যেন কতকাল দেখিনি। এমন একান্ত করে নিজেকে দেখা!

সেই ভোর ছ'টা থেকে ছাত্র পড়াতে বসতাম। আট থেকে দশ জনের এক-একটি গ্রুপের সময় দেড ঘণ্টা। কলেজ যাওয়ার আগে তিনটি দল। কলেজের সামান্য ক'টি ক্লাশ শেষ করেই কিছু বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে ফিরতাম রাত দশটারও পর। এই মাস-তিনেকের অসুখে পড়ার আগে পর্যন্ত তা-ই ছিল। আয়নার দিকে এভাবে কোনদিন তো নিজেকে দেখার অবসর হয় নি। আমার কত সুখী, পরিতৃপ্ত মুখ-চোখ চেহারা ছিল তখন নন্দার নিরলস যত্নে, পরিচর্যায়! নন্দা আমার ক্লান্তি, অবসাদ ভুলিয়ে দিয়েছিল কিভাবে যেন। আচমকা আমি আয়নায় দৃষ্টি স্থির রেখে উন্মুখ হই। আমার কি এই বছর-আটতিরিশ বয়সে চোয়াল ভেঙে গেছে? সামনের দিকের মাথার চুলে, কানের চারপাশে যেন সাদা চুলের কয়েকটি রেখা! এত রুক্ষ বিরক্তিকর মুখ কি এই অসুখের জন্যেই? অসুখ হওয়ার আগে কি ছিল না? কি জানি!

দেয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় একটু নড়ে-চড়ে বসি। মাথার বালিশটাকে কোলের ওপর তুলে নিই। ভিতরে বুঝি হাঁপ ধরে। চাপা উত্তেজনায় এমন অস্বস্তি। এই সময়েই একটা রহস্যময় শূন্যতা সন্তর্পিত ছায়ার মত ভিতর থেকে মাথা চাড়া দেয়। সারা ঘরে অন্যমনস্ক দৃষ্টি বুলোই। সুন্দর সাজানো ঘর। ডাইনিং

স্পেস নিয়ে আমার এই সমবায় আবাসনের দোতলায় দক্ষিণ-খোলা বড় বড় চাররুমের ফ্ল্যাট। শীত শেষ হয়ে আসার এমন দিনে চমৎকার এমন সহনীয় ঠাণ্ডা এই ঘর, ঘরের চারপাশ! এমন কি তা সামনের ফাঁকা বড় লনটাও ঢেকে রাখে। আমার ভাল লাগে এমন। রোদ এসে যেন ঘরের মেঝে, আসবাবপত্তর, দেয়াল ধোয়া-মোছা করে। মেঝের ওপর চড়ুই-এর চিকচিক শব্দ কানে আসতেই আমার অন্যমনস্কতা সরে যায়। মনে পড়ে যায়, কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা হলের সকালের শো-তে একেবারে নীচু ক্লাশে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে একটা ইংরাজী বই দেখেছিলাম—'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালি'। তারই একটি দৃশ্য মনে পড়ে যায়। সেই অসুস্থ সদ্য-কিশোর, সেই রোদ, সেই সবুজ পরিবেশের নীরবতা, মেঝেয় খেলাকরা ছোট পাখি আর নতুন করে বসন্ত আসার শব্দহীন অনুভূতি ঘোষণা!

তখন আমরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতার বেলেঘাটার একটা সরু গলির একতলার অন্ধকার দু'টি ঘরের ভাড়াটে। বাবা একজন কঠোর আদর্শবাদী স্কুল-শিক্ষক। স্কুলে যা পেতেন তাতেই ঠিকঠাক সংসার চালাতেন। মায়ের ভিতরের শক্তি ও সামর্থ্য অসাধারণ। মা আমাদের তিন ভাই আর দু'বোনের অসহায় সংসারকে সেই অল্প টাকায় ঠিক মানিয়ে চালাতেন। আমি বাড়ির বড় ছেলে। বাবা টাকা নিয়ে কখনোই ছাত্র পড়াতেন না। তবে ছাত্ররা এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের নিয়ে সময় কাটাতেন। অসামান্য নিষ্ঠা ছিল বাবার পড়াশুনায়, পড়ানোয়।

'দ্যাখ খোকা, তোদের সময়ের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে যাবো না। স্কুলের চাকরীই যথেষ্ট। প্রাইভেট টিউশানি করে পয়সা নিয়ে সংসার সচ্ছল করার চিন্তাই করি না, তা করলে লেখাপড়ার মধ্যে যে বড় মুক্তি আছে, তার একটুও থাকবে না।'

বাবা একথাটা প্রায়ই বলতেন। বাবার কথাগুলো সে সময়ে আমার ভিতরে গিয়ে ঘা মারত। তখন, সেই অসহায় অবস্থার মধ্যেও মাথা উঁচু করে থাকতাম নিজের কাছে। বাবার সম্মান রেখেই কবে যেন আমি খুব ভালো ফল করে এম. এস-সি. পাশ করলাম। অধ্যাপনার চাকরি পাই সঙ্গে সঙ্গে। আমাকে সংসারে জড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর বাবা আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

তার পর থেকেই কেমন করে যেন জীবনটায় কয়েকটা জট পাকিয়ে যায়।

ফুলশয্যার দিন থেকে বেশ কয়েকটা রাত কেটে যাবার পর একদিন সুনন্দা, মানে আমার স্ত্রী নন্দা বলল, 'শোন, এবার আমাদের অনেক কিছু ভাববার আছে।'

'কি?' আমি নন্দার কর্তৃত্ব-চাপা স্বরে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'তুমি কিছু মনে কোরো না।' নন্দা হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কিছু ভাবে। 'এমন ছোট মাপের বাড়ির জীবন আমার অসহ্য লাগছে।'

আমি ওর পাশে শুয়ে থেকে অন্ধকারের মধ্যে স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ এমন এক প্রসঙ্গের অর্থ বুঝতে একটু দেরী হয়। কয়েক মুহূর্ত পরে বলি, 'তুমি কিন্তু এমন ভাড়া বাড়ীর জীর্ণ ঘরেই দিন কাটিয়ে এসেছ নন্দা!' যেন আমার কোন এক চাপা অভিমানের কেন্দ্র থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে।

নন্দা স্পষ্ট করে আমার দিকে তাকায়। যেন এমন কথা ও শুনতে প্রস্তুত ছিল না। 'সেইজন্যেই তো আর একদিনও এমন প্রতিদিনের জীবন ভাল লাগছে না।' দৃষ্টি সরিয়ে আবার আমার বুকের গভীরে মুখ আড়াল করে ওর স্বরে আমার কথাটাকে উপেক্ষা করে, শ্লেষের মিশেল দেয়।

এমন উত্তরে আমার কিছু সময় নিশ্চুপ থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখি না।

'কি, কিছু কথা বলছ না যে!' নন্দা প্রসঙ্গটা ধরে রাখে।

'কি বলতে চাইছ?' আমি নন্দার সিদ্ধান্ত শুনতে উন্মুখ হই।

গলা নামিয়ে, যেন স্বর লুকোতে চায় এমনভাবে বলে, 'আমাকে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

'কোন নতুন ফ্ল্যাটে। সেখানে তুমি নিজের মত করে আলাদা আয় করবে কলেজে পড়িয়েও। এখানে থাকলে বাবার সামনে তুমি কোনদিনই মাথা তুলতে পারবে না।' থামে নন্দা। 'আমরা একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনব। একেবারে নিজেদের পছন্দ মত। দারুণ সাজাবো। সেখানে তোমার কলেজের ছেলে-মেয়ে পড়ানোর কোন অসুবিধেই হবে না।'

আমার ভিতরে একটা ভয় কাজ করে। কিছু পরে আমার মধ্যেই কোন লোভ-চতুর সাপের লকলকে জিভের মত নড়ে-চড়েই লুকিয়ে পড়ে। 'কিন্তু নন্দা, আমার বাবা—'।

'অনেকদিন তো করলে!' নন্দার উষ্ণ শ্বাস আমার বুকে লাগে। 'এবার আমাদের ভবিষৎ দেখো।' নন্দার স্বরে আবদার জড়িয়ে থাকে।

সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছিল এক প্রৌঢ় মানুষের ছবি। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরা, দীর্ঘদেহী, শক্ত সমর্থ চেহারায় আমার বাবা! কেবল গভীর-নিবিষ্ট হয়ে ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছেন। নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, অসম্ভব নিষ্ঠা সততা সারা মুখে-চোখে চেহারায়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনধারণে কি দীন পরিবেশ! একালে যেন কত বেমানান। আর তখনি, হ্যাঁ, ঠিক তখনি, আমার মধ্যে, তাঁর সেই বড়-খোকার মধ্যে, একটা পাথরের মত ভারী লোভ, সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিলাস বারবার ধাক্কা দিচ্ছিল। নন্দাকে অনেক গভীর করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'তাই হবে নন্দা, সব হবে, তুমি যা চাও, সব।' শেষের শব্দগুলো ভয় জড়িয়ে চাপা ফিসফিস মনে হয়েছিল।

বেলেঘাটার সংসার ছেড়ে আমি-নন্দা অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিই। তার পর থেকে বাবা একটি পয়সাও সংসার খরচের জন্যে আমার কাছ থেকে নেন নি। আমি যাতে কোন সম্পর্ক আর না রাখি, নন্দা ওর সূক্ষ্ম আচার-আচরণে তা বুঝিয়ে দিত। অদ্ভুত এক আত্মধ্বংসী নিষ্ঠুরতার মধ্যে আমারও কেমন যেন ইচ্ছে হত না, কখনো-কখনো নিজের মত করে ইচ্ছে হলেও সময় পেতাম না। আমার ভিতরের এক চাপা লোভ নন্দার মধ্যেকার লোলুপ বাসনার সঙ্গে মিলিয়ে আমার মধ্যে একটা যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে। তার কাছে আমি একটা স্প্রিং-দেওয়া পুতুল। সেইভাবে থাকতে থাকতেই একদিন এই চার রুমের দামি মোজেইক করা ফ্ল্যাট কিনেছি। আমাদের দুজনের মধ্যে এসেছে বড় ছেলে বাপ্পা, ছোট মেয়ে মৌমন। আমি খেয়ালই করিনি, নন্দা এক এক করে কত দামী দেশী-বিদেশী জিনিসে আমাদের এই ফ্ল্যাটটাকে করেছে একেবারে মডার্ণ। এক নিম্নবিত্ত পরিবারের রীতিমত শিক্ষিত মেয়ে নন্দা। অভাব, দুঃখ-কষ্ট-ভোগকে সে যে ঘৃণা করে, তার নিজের পছন্দ মত এই ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেয়।

প্রতি সপ্তাহান্তে জানলা-দরজার পর্দা বদলানোর জন্যে চার সেট দামী পর্দা, প্রতি ঘরের দেয়ালের কিছু কিছু অংশে সুদৃশ্য মনোরম মূল্যবান ওয়াল পেপার পেষ্ট করা, প্লাসটিক পেইন্টিং-এর দেয়াল, রঙিন টি. ভি, ফ্রিজ, ফোন, একটি ভি. সি. আর, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কুলার, লোডশেডিং-এ আলো জ্বালাবার রাজকীয় ব্যবস্থা—এসব দিয়ে নন্দা রাণীর মত ঘুরে বেড়ায়। এতসব কবে কি করে হল খেয়াল নেই। আমার অসুখে পড়ার মাস দেড়েক আগেই নন্দা ভাবছিল একটা মারুতি কিনবে। হয়ত টাকাও জমা দিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আমি অসুখে পড়ে গেলাম বলে নন্দা আপাতত সে প্রসঙ্গ থেকে সরে আছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সচেতন হই। এ ঘর নন্দা দু'টো বই-এর আলমারী দিয়ে সাজিয়েছে। আমি মনে মনে হাসি। কোনদিন এই আলমারীর বই পড়ার সুযোগ হয়নি। অন্যদের যত্ন করে পড়িয়েছি। সকাল ছ'টায় ছাত্রদের ব্যাচটি পড়ানো শেষ হওয়ার আগেই পরের ব্যাচের ছেলেরা ওই বড় ঘাস-ঢাকা লনের বেঞ্চে অপেক্ষা করত। এভাবেই একটা শক্ত সুতোয় একাধিক গিঁট দেওয়া প্রতিদিনের জীবনের টানাপোড়েনে আমি নিজের মত করে বইপত্তর পড়ার কোন-দিনই সময় পেতাম না। সেসব ছাত্র এখন কোথায়? আমি বাইরের বারান্দা ছাড়িয়ে সবুজ লন, খোলা-মেলা আকাশে দৃষ্টি বুলোই।

হঠাৎ নন্দা ঘরে ঢোকে। আমার গভীর অন্যমনস্কতা সরে যায়। আমি ওর দিকে তাকাই। 'বোসো।' নন্দাকে বলি। ও বোধ হয় বাইরে বেরুবে এখনি, খুব যত্ন করে প্রসাধন করেছে।

নন্দা বসে। আমার ছোট মেয়ে বছর দশেকের মৌমন মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। একেবারে নন্দার ছাঁচে মুখ তৈরী মৌমনের। লম্বায় আমার কিশোর কালের মত টান টান।

'শোন, আমি মৌ-কে নিয়ে একটু বেরুচ্ছি।'

'কোথায় যাবে।'

'কিছু কেনাকাটা আছে। ফেরার সময় ডাক্তারের কাছে যাবো। তোমার ডাক্তারবাবুকে কি কিছু বলার আছে?' থেমে এদিক-ওদিক চোখ বুলোয় ঘরে, 'এ কি! সকালে খাওয়ার ওষুধ আজ এখনো খাওনি!'

আমি পাশেই টেব্‌লের ওপর রাখা ওষুধের শিশিগুলোর দিকে তাকালাম। সেই বিশ্রী গন্ধটা হঠাৎ আমার নাক-মুখ ঢেকে দিল। 'আর ভালো লাগছে না নন্দা।'

'তা কি হয়?' নন্দা উঠে দাঁড়ায়। 'আজ সকাল থেকেই তোমার কি হয়েছে বলো তো? সব কেমন ভুলে যাচ্ছ?' তেতো মিক্সচারের শিশি থেকে চিহ্নিত করা এক ভাগ ওষুধ গ্লাসে ঢালে নন্দা।

এবার স্পষ্ট করে সেই বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগে। চাপা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাই।

'নাও, খেয়ে নাও।' ওষুধের গ্লাসটা সামনে ধরে। 'আর ক'টা দিন খাও, মনে হয়, ডাক্তারবাবু এবার ওষুধপত্তর একেবারেই বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন। খাওয়া-দাওয়ার ওপর জোর দিতে চাইছেন।' যেন সান্ত্বনা দেবার মত বলে নন্দা।

আমি নন্দার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে মুখে ঢেলে দিই।

গ্লাসটা ফিরিয়ে নিয়ে নন্দা বলে, 'এই দু'টো ভিটামিন বড়ি মুখে দিয়ে জল খেও আধঘণ্টা পর। পাশেই জলের গ্লাস আছে।'

আমার নাকে উৎকট গন্ধ ধাক্কা দেয়।

নন্দা খালি গ্লাস টেবিলে রেখে কোচে গিয়ে বসে। 'গ্লাসটা মঙ্গলা একটু পরেই ধুয়ে দেবে বরং। আমি চলে যাচ্ছি।' স্বগতোক্তির মত বলে কথাগুলো। 'আর শোন, সুবির মা রান্না করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটু পরেই মঙ্গলাও তোমার জলখাবার দিয়ে যাবে। আর একটু অপেক্ষা করো।'

মৌ-য়ের দিকে তাকালাম। 'মৌ-কে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

নন্দা মুখ বাঁকায় চাপা বিরক্তিতে। 'তুমি আর সংসারটা দেখলে কবে? ছেলে-মেয়ে কি করে তারও খোঁজ রাখো না!' নন্দা থামে। মৌ-য়ের দিকে তাকায়। 'ওকে নাচের স্কুলে দিয়ে আসি আজ, জান না? আবার নিয়ে আসতে হবে তো?'

আমি বোকার মত মুখ করে সস্নেহে মৌ-এর দিকে তাকিয়ে থাকি। মৌ-কে ওর চেহারায় কেমন বয়স অনুপাতে বেশী বয়সের মনে হয়। সারা মুখ-চোখে সারল্য এতটুকুও সরে যায়নি এখনো।

'হ্যাঁ, শোন, বাপ্পার তো এখন স্কুলের ছুটি যাচ্ছে। ওকে ক্যাসেট আনার টাকা দিয়েছি। ও ক্যাসেট নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আসবে। ওঘরে ভি. সি. আর চালাবে, তুমি যেন বন্ধুদের সামনে রাগারাগি কোরো না।' সন্তান-স্নেহে নন্দা আমাকে সামলাতে চায়। একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া আমার বারো বছরের একমাত্র পুত্র বাপ্পা। ভি. সি. আর-এ ক্যাসেট দিয়ে কি দেখে জানি না, এতদিন, এই অসুখে পড়ার আগেও কোন খবর রাখতাম না। নন্দার এমন কথায় বোকার মত স্থির। 'আমি কেন বলতে যাবো?' যেন ক্ষীণ প্রতিবাদ করি নন্দার অভিযোগের।

'বলা যায় না, তুমি চেঁচিয়ে উঠতে পারো। এতদিনের অসুখে ভুগে একটু তো খিটখিটে হয়েছ বুঝতে পারি।' নন্দা মৌ-কে দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকায়। 'মোট কথা, আজকালকার বাচ্চা ছেলে তো! বন্ধুদের সামনে কিছু বলতে যেও না!' নন্দা যেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে কোচে ঠেস দেওয়ার ভঙ্গি করে।

আমি তাকিয়ে থাকি নন্দার দিকে। ওর মুখে-চোখে নিশ্চিন্ত ভাব। আমি

বুঝতে পারি, আমার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী এইসব কথায় কত দূরের মানুষ আমার কাছে! অসুখে পড়ার আগে একবারও একথা মনে হতো না। এতদিনের অসুখের পর তেমন একাত্ম হতে পারছি না। কেন? আর ঠিক এই মুহূর্তেই আমার মধ্যে এক রহস্যময় শূন্যতা মাথা চাড়া দিতে থাকে ধীরে ধীরে।

'মৌ, দেখ তো, মঙ্গলার কাজটা হয়ে গেছে কিনা! তাড়াতাড়ি করতে বল্‌গা। বলো যে দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমরা বেরুতে পারছি না।'

মৌ এ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নন্দা এবার একেবারে ঠিক নিজের মত করে লক্ষ্য করে। যেন আমার মধ্যে কিছু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে। 'যাই বলো, আজ থেকে তোমাকে কিন্তু অনেক ফ্রেশ লাগছে। আবার ভোরের দিকে আমাদের লনটায় হাঁটা-চলা করলেই দেখবে একেবারে ফিট্‌।' খুশি আর আহ্লাদের মুখে-চোখে আমাকে লক্ষ্য করে যায়। 'ডাক্তারবাবু কি বলছিলেন জানো?'

'কি?'

'আর দিন-পনেরো পরেই তুমি একেবারে স্বাভাবিক হয়েই বাইরে বেরুতে পারবে।' থামে নন্দা। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় বুঝি কোন অঙ্ক কষে নেয়।

আমি চুপ করে বসে থাকি। নন্দার দিক থেকে দৃষ্টি সরাই না।

'তোমার এবার সত্যিই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা দরকার। কলেজে অবশ্য জয়েন না করলেও মাইনে পাবে। তবু, তুমি তাড়াতাড়ি জয়েন করো, আমি চাই। আর—।'

আমার মুখ দেখেই বোধ হয় নন্দা থেমে গেল।

'তুমি রাগ করবে না তো?' স্মিত হাসিতে নন্দার চিবুকে ভাঁজ পড়ে।

'কেন! রাগ করব কেন?'

'না, তুমি বলছিলে না, আর ছেলে-মেয়ে পড়ানোর মধ্যে থাকবে না!' নন্দার স্বরে, বলার ভঙ্গিতে ভিতরের স্থির লক্ষ্য আমার অনুভবে আসে।

হঠাৎ আড়ষ্ট হই। চুপ করে বসে থাকি। বাইরের আকাশে চোখ বুলোই।

'ডাক্তারবাবু কি বলেছেন জানো?'

'কি?'

গলায় খুশির হাসির শব্দ করে নন্দা। 'চেইন স্মোকার যেমন অসুখ সারলেও দিনে তিন-চারটে সিগারেট অন্তত খাবেই, তেমনি তোমার টিউশানিও বন্ধ করা

-যাবে না!' একটু থামে নন্দা। গলা নরম করে, যেন আমার এমন অসুখে নন্দার গভীর সহানুভূতি ঠেলে ওঠে, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন, একেবারে ছেড়ে দিলে আবার অন্য কোন অসুখ আসতে পারে।'

'ডাক্তারবাবু কিন্তু বলেছিলেন, এত পরিশ্রমেই আমার এমন অসুখ!' ভিতরের চাপা বিরক্তি থেকে পুরনো কথাটা মনে করিয়ে দিই নন্দাকে। 'তা ছাড়া, আর দরকার কি? বরং—।'

'এ তুমি কি বলছ?' কথার মধ্যে কথা বলে আমাকে থামিয়ে দেয় নন্দা। গলার স্বর চাপা হলেও চড়া। 'অসুখ-বিসুখ সকলেরই হয়। তা বলে থেমে থাকতে হবে! এখন তো বয়স কম, এখন না খাটলে কখন খাটবে?' গলা নামায়, 'ছেলে-মেয়েদের তো বলা যায় না, তোমাকে বলি, খরচ কিন্তু অনেক হয়ে গেছে!'

'আমার অসুখে?'

'তা-ই।' নন্দা প্রসঙ্গ বদলায়। 'তা ছাড়া ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন—।'

মৌ ঘরে ঢোকে। 'মা, মঙ্গলাদির হয়ে গেছে। চলো।' নন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই মৌ আমার দিকে তাকায়। 'বাপি আসছি।' মুখে কোন শব্দ না করে চলে যাবার জন্যে হাত নাড়ে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এমন ছোটবেলা থেকে পড়ে মৌ একেবারে একালের আদব-কায়দা, ভাব-ভঙ্গি বেশ শিখেছে। আমি ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে মাথা নাড়ি।

'একটু দাঁড়াতো, তোর গায়ে আর একটু পাউডার দিই।' আমার ঘরের টেব্‌লে রাখা পাউডারের ডিবে থেকে কিছুটা মৌয়ের ঘাড়ে, পিঠের দিকে কাঁধের কাছে খোলা অংশেও কিছুটা বুলিয়ে দেয়। 'এবার চল্।' আমার দিকে মুখ ফেরায়। 'আর একটা কথা শোন। সুবির মায়ের বোধ হয় কাজ হয়ে গেছে, ও এখনি চলে যাবে। তুমি একটু আস্তে আস্তে এঘর-ওঘর কোরো! একেবারে এভাবে সারাদিন বসে থাকলে তোমার নার্ভাসনেস তাড়াতাড়ি যাবে না!'

বলা শেষ করে নন্দা দরজার দিকে এগোয়। পাশে মৌ। আমার চোখ নন্দার দিকে। কি সুখী, সচ্ছল নন্দা এখন! কত সুশ্রী, পাতলা লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল নন্দার! এখন ভোগে-সুখে সাচ্ছল্যে, আহ্লাদে আবদারে-আদিখ্যেতায় বিশ্রী ধরনের স্থূলাঙ্গী। আমার মধ্যে কেন যেন বিরক্তি, অস্বস্তি, নিস্পৃহতা ঘন হতে থাকে।

ওরা চলে যাবার কিছু পরে সুবির মা এঘরে এলো। 'আমার হয়ে গেছে,

'যাচ্ছি।' আমি নীরবে তাকিয়ে থাকি। নন্দা বাড়ি না থাকলে স্থবির মায়ের এটাই ওর যাওয়ার ও আমার কাছে বিদায় জানানোর রীতি। চোখের আড়াল হয়ে গেল ও। এখন ফ্ল্যাটে আমি আর আমাদের কাজের মেয়ে কিশোরী মঙ্গলা। মঙ্গলা এমনিতেই চুপচাপ থাকে। ও ওর খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটু আগে এমন নির্জন পরিবেশে মঙ্গলার গুছিয়ে দেওয়া প্রাতরাশের পথ্য খেয়ে নিয়েছি।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে একসময় সামনের কোচে বসলাম। বুঝতে পারি, দুর্বলতা অনেকটা কেটেছে এমনিতেই। তবু একটু হাঁপাচ্ছি। এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে কোচে ঠেস দিলাম। ওয়ালক্লকের শব্দ কানে আসে একটানা। মাঝে মাঝে রঙ-কানেকশানে ফোনে অকারণ রিঙ হওয়ার শব্দ হয়ে থেমে যায়। সদ্য-ধরানো সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়াই। আমি ধীর পায়ে এঘরে আসি। নন্দার বাইরে বেরুবার ব্যস্ততায় ড্রেসিং টেব্‌লের সামনেটা অগোছালো হয়ে আছে প্রসাধনের জিনিসপত্তরে। আমি ঝুঁকে আয়নায় নিজেকে দেখতে যাই। আচম্‌কা আমার হাতের ধাক্কা লেগে বিলিতি দামী সেন্টের খোলা-মুখ শিশিটা উল্টে যায়। খানিকটা সেন্ট বাইরে পড়ে। শিশিটা তুলে বন্ধ করতে গিয়ে মিষ্টি গন্ধ আমাকে ঘিরে ধরে। এ ঘর থেকে আবার আমার ঘরে আসি। আমার ঘরে রাখা পাউডারের ডিবেটাও বন্ধ করে রাখেনি! অনেক থাকলে মেয়েদের বিলাসের মধ্যে বুঝি এমন এক খোলামেলা স্বভাব তৈরী হয়ে যায়! আমি এগিয়ে গিয়ে ডিবেটা হাতে নিই। খেলার ছলে কিছুটা পাউডার হাতের মুঠির মধ্যে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে রাখি। আর একটা গন্ধ নাকে আসে। ওষুধের সেই বিশ্রী গন্ধটা আর পাই না। সারা ফ্ল্যাটে নিরঙ্কুশ একা থাকলে এ আমার এক মুক্তির আনন্দ!

এক অদ্ভুত বিচিত্র যৌগিক গন্ধের পরিবেশে আমি আবার কোচটায় বসি, শেষে অস্থিরতার মধ্যে বিছানায় বসে দেয়ালে ঠেস দিই। শরীরটা দুর্বলতায় কাঁপে। দুর্বলতায়, না মুহূর্তের কোন কারণহীন আত্ম-উত্তেজনায়?

হঠাৎ মিউজিক্যাল ডোর-বেল বেজে ওঠে। সুর তুলে বেজে যায় একটানা। কে এলো এসময়ে? বাপ্পা? বোধ হয় বন্ধুদের নিয়ে এসেছে। এবার ভি. সি. আর. চালাবে। আমাকে আর উঠতে হল না, মঙ্গলা দরজা খোলে। কার সঙ্গে কথা বলে মঙ্গলা? তা হলে বাপ্পা ফেরে নি! কে? মঙ্গলা ঘরে ঢোকে। 'একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'আমার সঙ্গে!' অবার হয়ে মেরুদাঁড়া টান টান করে সোজা হয়ে বসি। 'ভেতরে নিয়ে আয়।'

মঙ্গলা সামনে থেকে সরে যায়। একটু পরেই সঙ্গে করে নিয়ে আসে মেয়েটিকে। সামনে ওরা দুজন দাঁড়াতেই মঙ্গলাকে বলি, 'একটু পরে চা-টা দিয়ে যাবি। যা।'

মঙ্গলা বেরিয়ে গেলে আমি সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটিকে লক্ষ্য করি।

'আমাকে চিনতে পারছেন?' মেয়েটির মুখে সৌজন্যের হাসি লেগে থাকে।

আমি একভাবে তাকিয়ে থাকি ওর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে স্মৃতির একটা অংশ নড়ে-চড়ে ওঠে। 'না তো!' অস্ফুটে বলি। 'আগে বোসো এই কোচটায়, পরে ভাবছি।'

মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে থাকে। 'চিনতে পারছেন না তো? তা হলে আর বসব কেন! চলে যাই!' স্বরে, শরীরের ভাব-ভঙ্গিতে সূক্ষ্ম চপলতা লেগে থাকে।

আমি বেশ অপ্রস্তুত বোধ করি। মাস-খানেকের অসুস্থতায় কি আমার স্মৃতির অনেকটাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে গেছে? সামনে এভাবে এমন এক তরুণীর দাঁড়িয়ে থাকাটা কিন্তু আমার একটুও ভালো লাগছে না। 'আগে বোসো তো!' আমার মধ্যে এখনো সন্তর্পিত অন্যমনস্কতা কাজ করে।

মেয়েটি বসতে বসতে বলে, 'আমাকে কিন্তু ভোলার কথা নয়!'

'আমার কোন ছাত্রী কি?'

মেয়েটি এতক্ষণে কোচে বসে পড়েছে। প্রবল মাথা নাড়ে। 'না, আপনার ছাত্রী নই। আমি সায়নি চৌধুরি।'

আমি একভাবে তাকিয়ে ছিলাম মেয়েটির দিকে। আমার স্মৃতির অন্ধকার একটা জায়গায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। 'সায়নি!' অস্ফুটে বলি। আমার এবার মনে পড়ে যায়। 'আমার কলেজেরই তো!'

'কিন্তু আপনার ছাত্রী নই!' সায়নি অকপটে হাসে। 'আপনি সায়েন্স পড়ান। আমি আর্টসের ছাত্রী ছিলাম। আপনি আমাকে কোনদিনই পড়ান নি।'

'তা ঠিক।' আমি অন্যমনস্ক থেকেই বলি। একটা সিগারেট ধরাই। সারা ঘরে একটা মিষ্টি গন্ধ ভাসতে থাকে। আমার মনে পড়ে যায় সায়নিকে। অসম্ভব প্রাণবন্ত ছিল মেয়েটি। কলেজের ছাত্রদের প্রায় সব ছোট-বড় অনুষ্ঠানেই

কয়েকজন শিক্ষক-প্রতিনিধিদের মধ্যে আমি নির্দিষ্ট থাকতাম। বিতর্ক, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, গান, স্পোর্টস্, রাজনৈতিক দু'দলের স্লোগান-যুদ্ধ, স্বরচিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ পাঠ—এসবের মধ্যে একে আমি দেখেছি গভীর বিস্ময়ে। পরিচয় এইসব সূত্রেই!

'আপনি কি অসুস্থ ছিলেন?' সায়নি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তিন মাস। কলেজ যেতে পারি নি।' আমার স্বরে অসহায়তা স্পষ্ট হয়।

'আমি কিন্তু এখন কলেজে নেই।' সায়নি যেন ওর পরিচয়টা আরও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ করতে চায়।

এখন আমি আমার স্মৃতিকে স্পষ্ট ধরতে পেয়েছি। বললাম, 'থাকার তো কথা নয়! বোধ হয় আজ থেকে বছর তেরো-চোদ্দ আগের ছাত্রী তুমি!'

'মনে পড়েছে!' সায়নি হাসে। 'আমি আপনাকে কলেজে দেখেছি এক বছর মাত্র। সদ্য পাশ করে আপনি সেই বছরেই কলেজে প্রথম আসেন। আমি তখন হায়ার সেকেণ্ডারির টুয়েল্‌ভের ছাত্রী। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেই আমি চলে যাই দিল্লী। বাবার বদলির চাকরী।' একটু বেশী কথা বলে সায়নি আমার স্মৃতির সূত্র ধরাতে চেষ্টা করে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দূরের একটা সময়ের স্মৃতি জ্বলজ্বল করে। প্রথম চাকরীতে ঢুকে আমি কি দুরন্ত উচ্ছল ছিলাম কলেজে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অফুরন্ত জীবনের অসাধারণ স্বাদ পেতাম। তারই মধ্যে সায়নি নামের একটা মেয়ে ছিল উদ্দাম জীবনের প্রেরণা! পরের বছরেই নন্দার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়। আচম্‌কা প্রদীপ নিভে যাওয়ার মতই জটিল এক অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে ফেলি।

'কি ভাবছেন!' সায়নি হঠাৎ নীরবতা সরায়। গলায় গভীর অন্তরঙ্গতায় হাসির শব্দ করে। 'আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন!'

'কি রকম!' আমি সচেতন থেকে হাতের সিগারেটে কয়েকটা টান দিই। সায়নিকে সেই পুরনো দিনগুলির স্মৃতিতে ছুঁতে চেষ্টা করি। এখন তো তিরিশ-একত্রিশে বয়স থেমেছে সায়নির। ফর্সা বুদ্ধি-ভরা মুখ-চোখ, বেতের মত চেহারা, হাসি-খুশির আবেগে উচ্ছল সায়নি আমাকে ভয়ঙ্কর কাঁপিয়ে দিত। সায়নি তা জানত না, জানার কথা নয়। নাকি, জানত, আমাকে বুঝতে দিত না! অত্যন্ত চতুর ছিল সায়নি। এখন এই বয়সেও বুঝি সেই রকম আছে! সেই টান টান গ্রীবা! সেই উৎসুক অন্তরঙ্গ কৌতূহলী দৃষ্টি! শরীরে বয়সের সামান্য ভার বেমানান নয়। মুখের প্রচ্ছন্ন হাসিতে চন্দনের গন্ধ মাখানো!

কিছু সময় সায়নি নিজের নিশ্চুপ অন্যমনস্কতায় একটু আড়ষ্ট থাকে। মুহূর্তে কিছু ভাবে। 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না!'

আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি। আমার দু'চোখে কৌতূহল, সংশয়।

'আপনি কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন তখন। দারুণ স্মার্ট। কি উৎসাহ উদ্যম ছিল আপনার!' হঠাৎ কথা বন্ধ করে সায়নি। 'আমার কাছে আপনি তখন এক জীবন্ত আদর্শ।' যেন গাঢ় গভীর কোন স্মৃতির স্বরে স্বগতোক্তি করে।

আচমকা আমার ভিতরে এক রোমাঞ্চকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আমি কি সায়নির মুখে সেই মুগ্ধতা খুঁজছি এখন? সেই দুরন্ত স্বভাবের উজ্জ্বল লাবণ্য?

'আপনার কাছেই নিখুঁত আবৃত্তি করা শিখেছি বলতে পারেন! আপনি ধরে ধরে শিখিয়েছিলেন! বিতর্ক কিভাবে করতে হয় বোঝাতেন। আপনি একবার খালি গলায় আমাদের নবীনবরণের অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন, মনে পড়ে? সে তো আজও আমি ভুলতে পারিনি!' সায়নি থেমে গিয়ে মেঝেয় উদাস দৃষ্টি ফেলে।

সায়নির চমৎকার কণ্ঠস্বর যেন আপ্লুত মোহে আমায় মধ্যে বেজে যায়। আমি বুঝি এখনি সায়নির মধ্যে দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছি। নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। প্রসঙ্গ বদলে নিই, 'তুমি হঠাৎ আমার কাছে এসেছ কেন?'

'আমি ইণ্ডিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি। এম. এ. পাশ করে এখানে বছর চারেক ধরে গবেষণার কাজ শেষ করেছি। বাইরে গিয়ে আর ফিরব না। তাই, কদিন হল কলকাতায় ফিরে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি।'

'একা যাচ্ছ?' এতক্ষণে আমি সায়নির সিঁথির ওপর সন্তর্পিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিই।

সায়নি বোধ হয় আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝেছে। হাসল উজ্জ্বল মুখ করে। 'আমি এখনো বিয়ে করিনি!'

'এতদিনেও—!' থেমে গেলাম। সায়নির কি কোন বয়ফ্রেণ্ড ছিল! সেখান থেকে দূরে থাকার জন্যেই এমন চলে-যাওয়া? নাকি, বাইরে কোন বিদেশী বয়ফ্রেণ্ড আছে, যার জন্যেই এমন চিরকালের জন্যে প্রবাসী হওয়ার বাসনা? সায়নি কি আমার কথায় কিছু মনে করল? আজকালকার মেয়ে। ভিতরে বুঝি ভয়ংকর সব এ্যাডভেঞ্চার পুষে রাখে, সময় হলেই তার মধ্যে এরা কোন কিছু নিয়ে মাততে দ্বিধা করে না! সায়নির বড় বড় চোখে আমার এখনকার দৃষ্টি চাপা অন্যমনস্কতায় স্থির।

আমার সামনে এবার মনকে অবারিত করে সায়নি। 'আপনার মত তো কাউকে আর খুঁজেই পেলাম না! এবার বাইরে গিয়ে দেখি—'শেষ কথা বলে মাথা নীচু করে ও।

আমার ভিতরটা কেঁপে ওঠে। সায়নি কি এতদিন পরে আমাকে এমন ব্যঙ্গ করতেই এসেছে? আমি সায়নির সামনে কী ছিলাম? কেমন ছিলাম? সামনের আয়নার দিকে তাকাই। সেদিনের আমি কোথায়? ভিতরে একধরনের বিরক্তি তৈরী হয়। বিরক্তি থেকে এক গভীর শূন্যতা ছায়া ফেলে। আমি অস্বস্তি বোধ করি। সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘোরাই। 'তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোত্থেকে? এটা তো আমার পুরনো ঠিকানা নয়।'

'কলেজ থেকে নিয়ে এসেছি। ওখানেই শুনলাম, আপনি মাস তিনেক ছুটিতে আছেন।' কোচের মধ্যেই নড়ে-চড়ে বসে সায়নি। 'কলকাতায় এসেই ভেবেছিলাম, আপনার সেই বেলেঘাটার বাড়ি যাবো।' আমার দিকে তাকায়: 'মনে পড়ে, আমাদের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে আপনার সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন!'

আমি আরও যেন ছোট হয়ে যাই। সত্যিই, তখন তো কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী কাজে-অকাজে'ওখানে আসত।

'আপনার বাবা কেমন আছেন?' সায়নি সোজা তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। 'অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। আপনার বাবাকে দেখে আপনার বাবার সঙ্গে আপনাকেও শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসে কত বড় করে নিয়েছিলাম!' থেমে নীচু স্বরে, যেন পুরনো শ্রদ্ধাতেই বলে, 'বাবা এখনো আছেন?'

আমি মাথা নাড়ি। 'না, তিনি কয়েক বছর আগেই স্বর্গত।' কথাটা মনে মনেই বলি। কিন্তু আজ হঠাৎ সায়নি বাবাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কেন? বাবার সঙ্গে আমার তুলনা করতে চায়? কিছু শোনাতে চায় আমাকে! ও কি সব শুনেই এমনভাবে আমার সামনে এসে বসেছে?

মঙ্গলা ট্রে-তে দু'কাপ চা, সায়নির জন্যে কিছু খাবার সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

টেব্‌লের ওপরে রাখে সাবধানে। একদিকে ওষুধের শিশিগুলো সরিয়ে দেয়। 'আপনি এখনো ওটা খান নি?' মঙ্গলা হঠাৎ মনে করিয়ে দেয়।

সায়নির দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মঙ্গলাকে দেখি। 'তুই যা, আমি খাচ্ছি।'

মঙ্গলা বেরিয়ে গেলে সায়নি আমার চোখে চোখ রাখে। 'বউদি বাড়ি নেই?'

'মেয়েকে নিয়ে নাচের স্কুলে গেছে।'

'ওষুধটা তা হলে খেয়ে নিন!'

'সে হবে। তুমি চা-টা আগে খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!'

'তা হয় না', সায়নি হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। 'দেখিয়ে দিন কোন্ ওষুধটা, আমি দিচ্ছি।' কয়েক পা এগিয়ে আসে সায়নি।

আমি হাসলাম। 'মনে হচ্ছে, তুমি আমায় জোর করছ?'

সায়নি হেসে ওঠে। 'আগে কী ভীষণ লাজুক ছিলেন বলুন তো? আমাদের কোন অনুষ্ঠানেই আপনি আমাদের দেওয়া খাবার খেতেন না!' একটু থামে, 'আমিই তো জোর করতাম! কিছুতেই না করতে পারতেন না। মনে পড়ে?'

আমি অবাক হয়ে ওর মুখ-চোখ দেখি।

'কি? এই ওষুধটা তো?' ভিটামিন ট্যাবলেট দুটো হাতে নেয়।

আমি মাথা নেড়ে সমর্থন জানাই। হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিই।

'আপনি এখন সিগারেট ফেলে দিন। ওষুধ খাওয়ার পর সিগারেট খাবেন না কিছুক্ষণ। একটু পরে চা খাবেন। নিন।'

এত দ্রুততায় আমাকে ওষুধটা খাওয়ালো সায়নি, আমি কোন বাধা দিতেই পারলাম না। 'খেয়েছি, এবার তুমি বসে চা আর খাবারটা খেয়ে নাও।'

'খাচ্ছি। একটু পরেই তো আপনি চা খাবেন, তখন আমিও শুরু করব।' সায়নি আবার কোচে বসে পড়ে। নির্নিমেষ আমাকে লক্ষ্য করে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। হঠাৎ নীরবতা ভাঙে। 'সত্যি, আপনি এত বদলে যাবেন ভাবিনি।' সায়নির স্বরে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে সরে যায়। ক্রমশ সায়নির মুখ গম্ভীর, চিন্তাচ্ছন্ন দেখায়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দেয়। বলে, 'আপনি এভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন, ভাবাই যায় না!' স্বরে হতাশা, নৈরাশ্য চাপা থাকে। সায়নি এরই মধ্যে প্লেট থেকে খাবার মুখে তোলে।

আমার ভিতরে কোথাও বুঝি একটা অহংকার চাপা ছিল, লুকোনো ছিল। অহংকারটা অভিমান হয়ে এতদিন থেকেছে। এখন সায়নির কথায় বুঝি কোথাও ধাক্কা খেলো। 'কি করে বুঝলে তুমি সায়নি?'

'আমি সব শুনেছি।' সায়নি হাতের খাবার মুখের সামনে মুঠোয় ধরে যেন নিজের মুখ আড়াল করে। হাত সরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতেও কিছু সময় নেয়।

'কি শুনেছ!' রুদ্ধশ্বাস আমি। ভিতরে রাগ তৈরী হয়। রাগ আমার নিজের ওপরেই।

'সে সব শুনে আপনার লাভ কী?' চায়ের কাপের আড়াল সরায় মুখের সামনে থেকে। বিষণ্ণ চোখে তাকায় আমার দিকে। 'বয়সের মাপে আপনি কিন্তু এ:কেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছেন!' আমার মুখ নিরীক্ষণ করে, মাথার চুলে দৃষ্টি রাখে।

সায়নি কি আমার এমন নির্জীব, নিষ্প্রাণ বুড়িয়ে যাওয়ার কথা বলছে? বাইরে এবং ভিতরে? নাকি আমার এমন যন্ত্রের মত জীবনটাকে ব্যঙ্গ করতে চাইছে? কী সব শুনেছে ও?

সায়নি নিশ্চ্রুপ বসে থাকে কিছু সময়। 'আমিও।

আচমকা সায়নি পরিবেশ সহজ করে নেয়। আমার দিকে তাকায়। হাসে।

আমি বিষণ্ণ হাসি। হয়ত এটাই আমার সায়নির সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর।

সায়নি হাতঘড়ি দেখে। 'এবার উঠব।' একটু থামে। 'বৌদির সঙ্গে দেখা হল না।' কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে যেন অনুরোধ করে, 'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না কিন্তু! আসলে কি রকম একধরনের কষ্ট হচ্ছিল আপনার কথা ভেবে, তাই বললাম।'

আমি উৎসুক চোখে সায়নিকে দেখছি। অস্ফুটে ডাকলাম, 'সায়নি।'

সায়নি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। কোন কথা না বলে শুধু আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে অপেক্ষা করে ও। যেন আমার কথা কিছু শুনতে চায়।

'তুমি এসেছ, আমি কিন্তু দারুণ খুশি হয়েছি।' আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে থাকি। 'এভাবে মাঝে মাঝে এলে ভালো লাগে। কিন্তু সে তো হবার নয়।' আমি দীর্ঘশ্বাস চাপি।

সায়নি নতুন কোন প্রসঙ্গেই গেল না আমার কথার সূত্রে। হঠাৎ বলে, 'চলি।' অদ্ভুত সারল্যে ওর মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়।

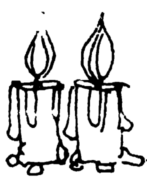
আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই ও বাইরে বেরুবার দরজার কাছে চ:ল যায়। ওখান থেকেই দু'হাত জড়ো করে। 'আপনি বসুন, আসতে হবে না।' মঙ্গলা তালার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে দেয়। একসময়ে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমার কানে আসে সায়নির সিঁড়ি ধরে ধীর পায়ে নেমে যাওয়ার শব্দ।

আমি কোচটায় বসে পড়ি। যেন পুরনো অভ্যাসেই কখন একটা সিগারেট

ধরাই। নির্জন ঘরে বেশ কিছু সময় আমার সামনে এক মায়াময় শান্ত বাতাস ভাসতে থাকে। কেউ ঘরে নেই। এরই মধ্যে এক অদ্ভুত শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরে আচমকা। শূন্যতাবোধ আমাকে গভীর যন্ত্রণা দিত। এখন যেন সে যন্ত্রণা নেই। এক বিস্ময়কর গন্ধ আমার নাকে আসে, আমাকে শিশিরের স্পর্শের মত ঢেকে দেয়। আমার মধ্যে এক নতুন অনুভূতি ক্রিয়া করে। এ কি সায়নির জন্যেই? সায়নি ছিল না বলেই কি আমার শূন্যতা ভয়াবহ ছিল এতদিন? কিন্তু সায়নি থাক না-থাক, এখন শূন্যতা আমাকে যেন এক অলৌকিকের মধ্যে নিয়ে চলেছে ক্রমশ। সেখানে কেউ নেই। না-নন্দা, না-সায়নি। আমি এক মনোরম সুগন্ধময় শূন্য অস্তিত্বের মধ্যে ভাসছি। স্বচ্ছ সেলোফেন কাগজে মোড়া কিছু একটা যেন আমার সামনে ভাসে। অদ্ভুত এক গন্ধে আমি বেশ কিছুটা সময় ধরে আচ্ছন্ন থাকি।

ডোর-বেল বেজে ওঠে। কে এলো এসময়ে? নন্দা? না, ক্যাসেট আর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমার ছেলে বাপ্পা? কে? বাপ্পা আর বন্ধুদের গলা কানে এল।

ক্রমশ ওষুধের গন্ধে ক্লান্ত হতে হতে আমি আবার কিসে যেন অস্থির হয়ে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ বসে থাকি।





লখিন্দরের ভেলা

জলজ্যান্ত বৌটা কেমন টকাস করে টেঁসে গেল! সারাদিন শুধু নয়, তার আগের কদিন কেন যেন একবারও উঃ-আহ্ করল না, বুক ধড়ফড়ানির চিহ্নমাত্র ছিল না শরীরটায়! যেমন করে, ঠিক তেমনিই সারাদিন ধরে ঘরের কাজকম্ম করল, রান্না-বাড়া করল, খেয়ে-দেয়ে মেঝের বিছানায় একটু গা এলিয়ে গিয়েছে কি, মুখে রা নেই! একেবারে শেষ ঘুমে কেমন ডুবে গেল!

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দুর্লভ মিস্ত্রি কদিন-আগে-মরা বউটার কথা ভাবছিল। এখন ভরা দুপুরে ওর টালিখোলার ঘরটায় বড় একা লাগছে। তাই এমন উঠতে-বসতে বউটার মুখ, চলা-ফেরার কথা মনে পড়ছে। বাবুরা একেই নাকি 'স্ট্রোক' বলে। অথচ ওদের একমাত্র মেয়ে ভবানীটা পাড়ার পাঁচুর সঙ্গে ভেগে যাবার পর নিত্যদিন শরীর নিয়ে খিটখিট করত। আজ অম্বলের ব্যথা, মাথা-ধরা, কাল পেট খারাপ, পরশুদিন বুক ধড়ফড, জ্বর-জ্বালার কতরকম যে অসুখের বায়নাক্কা ছিল মায়ারানীর! শরীরটা যেন একটা ছোটখাটো ডিসপেন্সারি! আর মরার সময় সে সব একেবারে বেপাত্তা! ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্তর নেই, হাসপাতাল নেই, দৌড়াদৌড়ি নেই, কেমন ঝাড়া হাত-পা স্বগ্যে চলে গেল! অথচ কত না কথা শোনাতো দুর্লভকে!

'তোমার হাড়-মাস কালি করে তবে আমি মরব রে মিন্সে, তখন ঠ্যালা বুঝবি।' মরার কদিন আগেও গাল-মন্দ দিয়ে কথা শুনিয়েছিল মায়ারাণী।

বয়স যত না হোক, তেজ যে কমে আসছিল দুর্লভের নিজেরই, দুর্লভ অনুভব

করে। তাই না চেঁচিয়েই বলেছিল, 'সে তো তোমার বলার আগেই ধরে রেখেছি বৌ !'

'তা তো রাখবেই !' আরও গলা চড়ায় মায়ারাণী, 'আমি মরলে দু'হাত তুলে নাচবে তো ! ছেলেটা বাপের মত মস্তানি করতে গিয়ে মরেছে, মেয়েটাকে তো তাড়িয়েছো বাড়ি থেকে। এখন আমি বাকি !'

দুর্লভ বলতে যাচ্ছিল মেয়েকে সে তাড়াবে কেন ! বলেনি। কথার পিঠে কথা বাড়ালে রাগে মায়ারাণীর দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না। আরও মুখ খারাপ করবে। তার ওপর ছেলে-মেয়ের কথা বললেই দুর্লভের ভিতরেও একটা গভীর কোন জায়গায় যে বড় কষ্ট হয়, বুকটা টনটন করে, কেমন ঝিমিয়ে যায়, মায়ারাণী বোঝে না। বা, হয়ত মায়ার নিজের কষ্টটা বোঝানোর জন্যেই ছেলে-মেয়ের কথা ইচ্ছে করে তোলে স্বামীর সামনে !

শেষ টান দিয়ে ঘরের কোণে ফেলে দিল বিড়িটা। এমন একা থাকার কষ্টে, বড় দুঃখেও দুর্লভ হাসল। প্রত্যেকদিন যে মেয়েটা একা চীৎকার করে স্বামীকে শাসাত, মরার সময় নাকানি-চুবানি খাওয়াবার ভয় দেখাত, সে কেমন শেষটায় ঠকিয়ে দিয়ে গেল ! কিছুই করল না, দুর্লভকে জানতেই দিল না, চলে গেল ! এটা কি তার ঠকানো, না অভিমান ?

জীবনটাই বুঝি এই রকম ? সময় হলে, সে যেই হোক, যত দরের যত বড় সম্পর্কের মানুষ হোক, কাউকেই রেয়াত করে না, সব কিছু লাথি মেরে চলে যায় ! সব কিছু থেকে বুঝি ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয় ! ঘরের দরজার চৌকাঠ দিয়ে যে জীবনকে মাপা, সেই জীবনই কেমন চৌকাঠ পেরিয়ে কোথায় চলে যায়, হারিয়ে যায় ! কেউ তার হদিসই পায় না ! এ এক তাজ্জব চিজ !

কি ভেবে দুর্লভের চোখে জল এলো। ন'বছর বয়েস থাকতে বাবাটা গাঁয়ে-গঞ্জেও দু'টো ভাত যোগাতে না পেরে রেখে গেল কলকাতায় ঠাকুরপুকুরে বাসব মিত্তিরদের বাড়ি ফাই-ফরমাশ খাটার কাজ করতে। বাড়ির লোকজন দুর্লভকে খুব বিশ্বাস করত। বাবুর গিন্নি-মা রীতিমত যত্ন-আত্তি, তোয়াজ করত দুর্লভের। বই পত্তর, শ্লেট-পেন্সিল কিনে এনে লেখাপড়া শেখাতো। ওদের বড় ছেলেকে সামলাতো দুর্লভ। টানা দশ বছর কাজ করেছে দুর্লভ। এর মধ্যে বাবাটা একদিনও দেখতে আসেনি দুর্লভকে। বাবু মনিঅর্ডার করে ওর মাইনে পাঠিয়ে দিত ! তার পরে একদিন, কি যে হল দুর্লভের, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, বাবুর বাড়ি কিছু না বলেই ছেড়ে পালিয়ে যায় ! তখন হয়ত বাবা-মার কথাই

মনে পড়েছিল! কোনদিন আর সে বাড়ি-মুখো হয়নি দুর্লভ। তারপর কলকাতায় একা-একা ঘুরে, থেকে কী না করেছে দুর্লভ! জীবনটা যেন লখিন্দরের ভেলা হয়ে উঠেছিল! একের পরে এক হারাতে হারাতে মরা লখিন্দর যেন নিঃস্ব!

বড় করে শ্বাস ফেলল। দু'চোখে জল বাধা মানছে না। মায়ারাণী সেই দিনগুলো একবারও ভাবল না! না ভেবে এমন দুর্লভকে একা রেখে চলে যেতে পারল! কি জানি, জীবনের এটাই বুঝি নিয়ম। সব পরিচয়ই দু'দিনের। আসলে কেউ কারোর নয়! দুর্লভ সারা ঘরে চোখ বুলোল। বউটা মরে যাওয়ার পর কদিন দুর্লভ নিজেই যা-হোক করে রান্নার পাট চুকিয়েছে। আজও তা-ই। এখন যেন দু'চোখ জড়িয়ে আসছে ঠিক তন্দ্রায় নয়, বুঝি একা থাকার দুঃখে, অবসাদে। এবার ও কী করবে? আর বেঁচে থাকারই বা কি দরকার? ইস্, মায়ারাণীর মত ও যদি হঠাৎ চলে যায়, সব ঝামেলা থেকে বাঁচে সে! সব চুকে-বুকে যায় ইহলোকের পাট, জ্বালা যন্ত্রণা?

ময়লা তেলচিটে বিছানায় গা এলিয়ে ছিল দুর্লভ। এপাশ-ওপাশ করল বার-কয়েক। মেঝেটা সিমেন্টের হলে কি, দেয়াল মাটির, দরমা-ঘেরা। কত ভারী বর্ষায় মেঝেতে শুতে পারেনি মায়ারাণী। খোকাকে নিয়ে তার সে কী মুখের চেহারা! মুচিবাজারে পান-বিড়ির দোকান থেকে ফিরে এলে মায়ারাণীর সে কি যত্ন-আত্তি, ভবানীটা পেট থেকে পড়লে মায়ারাণীর সে কি মূর্তি! আজ সে নেই, খোকা জেলে পুলিশের গুলি খেয়ে মরল, মেয়েটা ভাগলো পাঁচুর সঙ্গে—তার পরেও মায়ারাণী বড় কষ্টে দুর্লভের ঘর করেছে! আর আজ! দুর্লভ বড় একা!

ঘরে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এলো দুর্লভ বাইরে। কাঠের পলকা দরজায় তালা ঝোলালো। ওর এখন কোন কাজে মন নেই। বড়খোকাটা বেঁচে থাকলে টান থাকত। মেয়েটা কোথায় যে আছে, বেঁচে আছে কিনা, থাকলে যদি যোগাযোগ রাখত তা হলেও দুর্লভের বাঁচার সাধ হত। কিন্তু এখন! কি করলে ও মায়ারাণীর কাছে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে!

বড় রাস্তায় চলে এলো দুর্লভ। এখান থেকে ওই দূরে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি-গুলোর মাঝখানে ওদের টালি-খোলার বস্তির ঘরগুলোকে এক একটা অন্ধকূপের মত মনে হয়! থমকে দাঁড়াল দুর্লভ। রাস্তার ধারের লাইটপোস্টে ঠেস দিয়ে বিড়ি ধরালো। কদিন পান বিড়ির দোকানটা খুলছে না। কেমন ইচ্ছেই হচ্ছে না। কার

জন্যেই বা দোকানপত্তর নিয়ে বসা! কার জন্যেই বা বেঁচে থাকা! বউটা ছিল, তাই বাঁচার একটা মানে হত। কিন্তু এখন!

চোখ পড়ল সামান্য দূরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি কিশোরী মেয়ের ওপর। একজন ফ্রক-পরা। দুর্লভ অপলক তাকিয়ে রইল। সেই বছর ষোল-সতেরো বয়সে ঠাকুরপুকুরে থাকার সময় ওদের বাড়ির সামনের গলি পার হলেই পড়ে যে উমার কাজের বাড়ি, তার কথা মনে পড়ল। উমা কোন্ বাড়িতে যেন কাজ করত। মাঝে মাঝে দুর্লভের গিন্নিমার দরকারেই আসত ওদের বাড়ি। লাজুক মেয়েটা। ঠিক এইরকম ফ্রক-পরা, কালো, ঢ্যাঙা চেহারা ছিল মেয়েটার। মুখটা তেমন দেখতে ভাল ছিল না, তবে মুখরা ছিল। একবার কথা আরম্ভ করলে থামত না। পাতলা শরীরে বুকের গড়ন, কোমর দেখতে বেশ ছিল। ঠিক এই রকম। ওকে বলত দুর্লভদা! একদিন হালকা শীতের সন্ধেয় উমা গিন্নিমার সঙ্গে কথা সেরে ওদের বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল। শীতের গলি নির্জন।

দুর্লভ ডাকল। 'এই উমা, শোন্।'

'কী?' ফ্রক-পরা উমা থমকে দাঁড়াল। তখন কি ছাই বুঝত যে উমা তার এই ডাকটার জন্যেই ভিতরে অপেক্ষা করছিল!

'একটু কাছে আয়।'

'এই তো।'

দুর্লভের বুকের খাঁচাটার মধ্যে কি যে তখন হচ্ছে! ক'টা হাড়ের খাঁচার ওপর পুরু নরম মাংসের আবরণ। খাঁচার ভিতরে সব সময় তাপ! আবার সেই সময়ে তারই মধ্যে যেন ভরা বর্ষার ঝড়-ঝাপটার নদীর ধারে ঢেউয়ের তোলপাড়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জাপটে ধরল উমাকে আচমকা। চুমু খাওয়ার জন্যে কামড়ে ধরল উমার ঠোঁট। আর অমন সুন্দর বুক একেবারে তছনছ করে দিল দুর্লভ। দুর্লভ আগে বুঝতেই পারে নি উমার ফ্রকের নীচে আর কোন কিছুই নেই! আর আশ্চর্য! উমাও বাধা দেয়নি! একটু পরে ভয়ে শীত-শীত করতে উমাকে ছেড়ে দিতেই মেয়েটা কেমন এক দৌড়ে গলি ছেড়ে পালালো! তার পর সে কী ভয় দুর্লভের! কিন্তু কিছুই হল না। পরে ওই ভীতু লাজুক মেয়েটাকে দিনের পর দিন কেমন সাহসী মনে হয়েছে দুর্লভের। যদি বাড়িতে বা অন্য কাউকে বলে দিত! দুর্লভ মার খেতো ভয়ানক। হ্যাঁ, তখন দুর্লভের তাগৎ ছিল শরীরে। বুকের খাঁচাটা ছিল শক্ত। মারলেও মরত না!

আজ যদি এখনি ওই মেয়েটাকে ধরে দুর্লভ! সচেতন হয়ে মেয়েটাকে দেখতে

লাগল। সামনে রাস্তায় একটানা গাড়ি যাচ্ছে। বুঝি পার হতে পারছে না রাস্তা। দুর্লভ যদি আজ ওকে কিছু করে? এই খোলা রাস্তায়! এখন দুর্লভের বুকের খাঁচায় এতটুকু মাংস নেই। মাত্র হাড় ক'খানা। যেন এক চিত্তির। এই অবস্থায় কীই বা করতে পারে মেয়েটাকে! কিছুই নয়, যদি শুধু হাতটাই ধরে! অচেনা পুরুষ ধরলেই তো মেয়েমানুষের ইজ্জৎ যায়। তখনি মেয়েটা চেঁচাবে। লোকজন জড়ো হবে। তার পর দুর্লভকে মার! উহ্, সে কি প্রচণ্ড মার। রাস্তায় পকেটমারকে মারার কত যে ছবি মনে আছে ওর। সেই মারে অন্তত আজকের দুর্লভ রাস্তাতেই অক্কা পাবে। তা হলে তো ভালই! দুর্লভ তো মরতেই চাইছে। ছেলে-মেয়ে নেই, বউ নেই। এভাবে মরলে কারোর বলার থাকবে না যে দুর্লভ রাস্তার মাঝখানে মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে গিয়ে মরেছে! পাপ করেছে!

'দাদু!' কে যেন ওকে ডাকল!

দুর্লভ সচেতন হয়ে তাকাল। সামনে সেই ফ্রক-পরা মেয়েটা। দুর্লভ অবাক। দূরে দাঁড়ানো ওর সঙ্গী শাড়ি পরা মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে।

'আমাদের একটু পার করে দেবে রাস্তাটা?' বোকা-বোকা, ঠাণ্ডা গলায় মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে।

'পার হতে ভয় পাচ্ছ?' গলার স্বর নরম হল দুর্লভের। 'চলো।' মেয়েটার পিছু-পিছু এগোল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মেয়েটার হাত ধরল দুর্লভ। নরম কোমল কচি একখানা হাত! আচমকা ভবানীকে মনে পড়ল। ভবানী যদি পাঁচুকে নিয়ে কোথাও সংসার পেতে থাকে, তাহলে এতদিনে তার এইরকম একটা মেয়ে হয়েছে নিশ্চয়ই। দুর্লভের কত দিনের সাধের নাতনী। দুর্লভ হাত-ধরা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে শ্বাস ফেলল। 'এবার চলো।' হাত ধরে টান দিল। মেয়েটার হাত ধরে আছে শাড়ী-পরা মেয়েটা।

ওদের রাস্তা পার করিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল। দু'টি মেয়ে একবার ওকে দেখে নিয়ে দূরের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। দুর্লভের চোখে জল। এরকম একটা নাতনী থাকলে দুর্লভ কিছুতেই মরতে চাইত না! কখনো না! ভাবতে ভাবতে বেখেয়ালে মাথা নেড়ে চলেছে দুর্লভ। রাস্তা পেরিয়ে এসে ধারের বাড়ির রকে একটু বসল দুর্লভ। কেমন যেন হাঁপাচ্ছে। উপচে-পড়া বাস-ট্রাম লক্ষ্য করছে দুর্লভ।

সেই আঠারো-উনিশ বছর বয়সে ঠাকুরপুকুর থেকে চলে এসে দুর্লভ কী না

করেছে। তখন নিজের জমানো কিছু টাকা ছাড়া বাড়তি একটা পয়সাও ছিল না। জমানো পয়সা যখন খরচের শেষ অংকে, তখন দুর্লভ এক অসম্ভব কাজ করে বসে!

সেদিন ছিল কলকাতায় দুপুর। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছিল দুর্লভ। খুব বেশী না হলেও ভিড় ছিল। দুপুরেও কিছু বাবুলোক খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিস পাড়ায় যায়। গায়ে গা লেগে আছে দাঁড়ানো মানুষগুলোর।

'টিকিট!' পাশের লোকটাকে টিকিট চাইল কণ্ডাক্টর।

লোকটি ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। মানিব্যাগ বের করে ভাড়া দিয়ে আবার ব্যাগটা পাঞ্জাবীর পাশ-পকেটে ফেলে দিল। আর আশ্চর্য, ব্যাগটার স্পষ্ট ছোঁয়া পেলো দুর্লভ ওর ডান হাতের মুঠির উল্টো পিঠে। দুর্লভ পাশ ফিরে দেখল। চোখে পড়ল ব্যাগটা। লোকটা অন্যমনস্ক। দুর্লভের কি যে হল, যেন খেলা করার মজাতেই মানিব্যাগটা তুলে নিল পকেট থেকে। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ভিতরে ভয়ংকর কাঁপছে। বুঝিবা কাঁপতে কাঁপতে শরীর ভেঙে ট্রামেই বসে পড়বে! একটা স্টপ যেতেই দুর্লভ ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। নেমে কোন দিকে তাকায় নি। কয়েকটা ছোট-খাটো গলি পার হয়ে দুর্লভ একটা পার্কে বসেছিল। সেই ব্যাগ কয়েকটা একশো টাকার নোটে ভর্তি!

দুর্লভের ভাগ্য ফিরল সেখান থেকেই। মুচিবাজারে আলু বিক্রী থেকে শুরু করে ক্রমশ কাঠের খাঁচা তৈরী করে হল রাস্তার পাশে পান-বিড়িওলা। বস্তিতে ঘর নিল। বিয়ে করল মায়ারাণীকে। প্রথম খোকা হল, পিঠোপিঠি এলো ভবানী। সংসারে অভাব থাকলেও তা মেটাতো দুর্লভ। কি করে তা বৌ-ছেলে-মেয়ে কাউকেই বুঝতে দিত না। তখন কষ্ট করেছে যেমন দুর্লভ, পাপও করেছে। মাঝে-মাঝে তঞ্চকতা করে কিছু পয়সাও উপায় করেছে! কিন্তু তা করেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারল না।

তখন চারপাশে কি এক নকশাল আন্দোলনের ভয়। সে সময়ে কী যে হল অল্পবয়সী লেখা-পড়া-জানা ছেলে-মেয়েদের, দুর্লভ বুঝতে পারে নি। বুঝতে হল যখন নিজের ছেলেটা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল-হাজতে ঢুকল। খোকাটা পাড়ায় যে মস্তানি করত এটা দুর্লভ জানত, কিন্তু বোমা বাঁধত, পুলিশের উদ্দেশে বোমা ছুঁড়ত, কখনো বেধড়ক ধোলাই খেত অন্য দলের ছেলেদের কাছে, এটা জানত না দুর্লভ। রাতবিরেতে বাড়ি আসত না কখনো-সখনো। একবার তো

কারা যেন ছ'মাস ওকে লুকিয়ে রাখল ! তুর্লভের কথাই শুনত না। হয়ত অত মার খেয়ে খেয়ে ছেলেটা কেমন ঢ্যাটা হয়ে গিয়েছিল।

জেল হাজতে গেলে ছাড়িয়ে আনার জন্যে অনেক টাকা দরকার। কোথায় পাবে ? তুর্লভ মায়ারাণীর কান্নাকাটি, চীৎকারে পাগল হয়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। মায়া তখন সামালাতো মেয়েটাকে। ভবানী তখন বেশ বড়, যুবতী।

একদিন রাতে বস্তিতে ঢোকার আগে বড় রাস্তায় সোডা লেমনেড-পান-সিগারেটের দোকানে এক ভদ্রলোককে বেশ চোখে লেগে গেল। হাতে বড় চৌকো ব্যাগ। প্যাণ্ট-শার্ট-টাই-আঁটা পোষাকে বেশ জাঁদরেল ভদ্রলোক। দোকানের সামনে ব্যাগ রেখে সিগারেট কিনছে।

তুর্লভ দোকানের সামনে দাঁড়াল। দোকানি তুর্লভকে চেনে না। 'একটা পান খাওয়াও তো।' তুর্লভ তখনি পয়সা বের করার ভঙ্গি করল, দৃষ্টি কিন্তু ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক সিগারেট তু'ঠোঁটের মাঝখানে ধরে দেশলাই খুঁজছে। পাচ্ছে না।

দোকানি বলল, 'ওই তো আগুন আছে, ধরিয়ে নিন।' দেখালো ঝোলানো মোটা নারকেল দড়িটা। দড়িটার মুখে আগুন।

তুর্লভ একবার দোকানিকে দেখল, পরে ভদ্রলোককে। এক মুহূর্ত স্থির তুর্লভ। পরমুহূর্তে ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়েই দিল দৌড়। দোকানিটা প্রথম বুঝতেই পারে নি। পান তৈরীর দিকেই দিল নজর।

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে দোকানের আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে হাত বাড়ালো ব্যাগের জন্যে। কোথায় ব্যাগ ! ব্যাগটা কোথায় ?'

দোকানি অবাক। 'এই তো ছিল, দেখুন তো ওই লোকটা যে দৌড়চ্ছে !'

তুর্লভ তখন কাছের গলিতে ঢুকে পড়ার জন্যে দৌড়চ্ছে প্রাণপনে।

'চোর ! চোর !' চীৎকার কানে এলো তুর্লভের। কিন্তু এক অন্ধকার গলিতে ঢুকে তুর্লভ তখন ওদের নাগালের বাইরে। লোকটার ভারী বুটের শব্দ অবশ্য সমানে কানে আসছিল !

ব্যাগ থেকে বেশ মোটা টাকা পেয়েছিল তুর্লভ। থানায় নানাভাবে প্রায় সব টাকাটাই খরচ করল তুর্লভ ছেলে ছাড়ানোর জন্যে। কিন্তু সবরকম চেষ্টাই বৃথায় গেল। একদিন খবর এলো, জেলের মধ্যে হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গে ওর খোকাও মরেছে পুলিশের গুলিতেই !

সামনে একটা উপচে-পড়া বাস বিকট শব্দে ব্রেক কষতেই দুর্লভের সম্বিৎ ফিরে এলো। ভেসে-আসা খোকার মুখটা নতুন করে মনে হতেই কেমন কষ্ট হল। মায়ারাণীও পাথর হয়ে গিয়েছিল। আজ বউয়ের সেই মুখটাও যেন নতুন করে মনে পড়ছে। খোকা জেল-হাজতে যাওয়ার পর দুর্লভ একবার ভেবেছিল ঠাকুরপুকুরে পুরনো মনিবের বাড়ি যাবে। পুরনো মনিব ছিলেন পুলিশের বড় মাপের অফিসার। যদি কিছু করতে পারেন ছেলের জন্যে! দুর্লভ তো আর কোন চোট খাইয়ে ও বাড়ি ছাড়ে নি! তাই হয়ত আগের বিশ্বাস মত গিন্নিমাকে বললে কিছু টাকাও দিতেন! মায়ারাণীকে কথাটা বলেছিল দুর্লভ। মায়ারাণী সব শুনে মানা করে, 'এতদিন যখন কোন সম্পর্ক রাখোনি, তখন যাওয়াটা ঠিক হবে না।' বৌয়ের ছিল এই যুক্তি। দোষ অবশ্য দুর্লভেরও ছিল। চলে আসার পর প্রথম দিকে, বিয়ের পরেও একবার মনিবকে রাস্তায় মোটরবাইক করে যেতে দেখেছে দুর্লভ, দেখা করেনি, সামনা-সামনি পড়ে যাবার ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে। তার পর তো আর চোখেই পড়ে না!

দুর্লভের আবার কেমন ঘুম আসছিল। আসলে ওর যেমন এই পৃথিবীতে কেউ নেই, তেমনি কোন কাজও নেই। বউটার মরে যাওয়ার দুঃখে শুধু নয়, দুর্লভের নিজেরও যেন বাঁচার ইচ্ছে নেই। কার জন্যে বাচবে? এখন যেন মনে হয় গাড়ির সামনে পড়ে গিয়ে যদি ওর মৃত্যু হয়, তবু ভাল! কদিন ধরে যেন এটাই চাইছে দুর্লভ!

বউ বলেছিল, 'ছেলেটা তো গেল, এবার মেয়েটার দিকে তাকাও।'

কথাটা মনে ধরেছিল দুর্লভের। সত্যিই তো, ছেলে যখন নেই, তখন এই মেয়েই আমার ছেলে! আর দুর্লভ মেয়েটাকে সত্যি খুব ভালবাসতো। দুর্লভের কীই বা পয়সা-কড়ি ছিল, তবু মেয়েটাকে দিয়ে-থুয়ে একটু সুখে রাখতে চেষ্টা করত।

বউ বলল, 'এবার মেয়ের বিয়ে দেবে তো?'

'দেব।'

'তা হলে পয়সা-কড়ি জমাও, যোগাড় কর। মেয়েটার শরীরের এমন বাড় দেখে ভয় করে আমার!'

দুর্লভের কথাটা মনে লেগেছিল। সত্যি, মায়ারাণী ছিল ওর উপযুক্ত চালক। ঠিক সময়ে ঠিক কথা মনে করিয়ে দিত।

একদিন রাতে শোয়ার সময় বউ বলল, 'শোন, মেয়েটার মনে হয় কাউকে মনে ধরেছে!'

'কাকে !'

'বলছে না তো ?' গলা নামিয়ে বলল, 'চালাক আছে, বুঝতে দেয় না হারামজাদী !'

'তা হলে তুমি আর জিজ্ঞেস কোরো না। কিছু !' সাবধান করে দুর্লভ।

'না, না, সে একদিন জেনে নেব, ও নিজেই বলবে।' একটু থেমে মায়া বলল, 'এখন যাকেই বিয়ে করুক, আমরা নিজে থেকে তারই সঙ্গে দেব। তুমি টাকা-পয়সা যোগাড় কর !'

দুর্লভের সেই যে মাথায় ঢুকলো টাকা-পয়সা যোগাড়ের ভাবনা, তাতে ভিতরে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাথায় অনেক ধান্ধা ঘুরত। পুরনো ইচ্ছেগুলো পোকার মত নড়ে-চড়ে উঠত মাথায়। পাপ করতে মন চাইত না দুর্লভের ঠিকই, তবু শেষমেষ মেয়েটাকে সুখী করতে গিয়ে দুর্লভের মাথায় আর এক দুর্বুদ্ধি এল।

এক সন্ধেয় দুর্লভ এলো শ্যামবাজারের মোড়ে। প্রায়ই ঘোরে এখানে-ওখানে। তখন নকশাল আন্দোলন নিয়ে কলকাতা তোলপাড়। ভয়ে পাড়ায়-পাড়ায় তটস্থ অবস্থা। কেউ পুলিশকে ভয় পায়, কেউ বা নকশালদের। সুযোগ বুঝে ছিনতাই পার্টি, পেশাদার মস্তানরাও খুব নড়াচড়া করছিল। সেদিন শ্যামবাজারের মোড়ে ছিল লোডি-শেডিং। দুর্লভ একটা হাওড়া যাবার যাত্রীকে দেখেই এগিয়ে গেল। আগে থেকেই বেশ কিছু সময় ধরে লোকটাকে নিরীক্ষণ করছিল দুর্লভ। জামা-কাপড়ে বাবু সেজে কলকাতায় আসা গাঁ-গঞ্জের মানুষ, নিরীহ গোবেচারা মানুষ। দুর্লভের অব্যর্থ শিকার।

'কোথায় যাবেন ?'

'হাওড়া বাবু। বাস এখানে আসবে তো ?'

'আসবে। তবে একটু এদিকে সরে আসুন।' গলা নামিয়ে কথা বলছে দুর্লভ। 'গ্রামে ফিরবেন ?'

'হ্যাঁ। মেয়েটার বিয়ে, কিছু কোনাকাটা করতে এসেছি। ফিরব। কেনা-কাটা করতে করতে সন্ধে হয়ে গেল।' লোকটার গলায় সারল্য। দুর্লভের পিছু-পিছু লোকটা এদিকে এসে দাঁড়াল। এখানটায় বেশ অন্ধকার।

দুর্লভ এবার চকিতে কোমর থেকে ছোট ভোজালিটা হাতে নিল। 'এই যে।'

'কি ?' লোকটা দুর্লভের ধমক দেওয়ার মত গম্ভীর গলায় ভয় পেয়ে চকচকে ভোজালিটায় চোখ রাখল। চমকে উঠল। হতভম্ব, ভয়ে জিভ অসাড়, মুখ-চোখে চাপা আতঙ্ক।

'একটিও কথা বলবেন না! ওগুলো আমার হাতে দিন।' কাছাকাছি সন্তর্পিত চোখ ফেলতে ফেলতে দুর্লভ যেন অন্য মানুষ।

লোকটা অসহায় নির্বোধের মত স্থির তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। হাতের জিনিসপত্তর ছাড়ছে না, বাধাও দিচ্ছে না।

'তাড়াতাড়ি দিন।' চাপা ক্রোধে দুর্লভের গলায় হুংকার। 'একদম শব্দ করবেন না, তা হলেই—'দুর্লভ ভোজালিটার প্রান্ত লোকটার তলপেটের ওপর স্পর্শ করল।

লোকটা কাঁপছে। গলায় অদ্ভুত এক গোঙানির শব্দ। এদিক-ওদিক তাকাতে পারছে না, ঘাড় শক্ত।

দুর্লভ হাত থেকে টিনের বাক্স, প্যাকেট, যা কিছু ছিল কেড়ে নেওয়ার মত এক এক করে সব হাতে নিল। 'যাবার পয়সা আছে! ভাড়া?'

লোকটা বোবা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। গলায় একটা ফ্যাসফ্যাসে শব্দ।

'আসুন, আপনার বাস এসে গেছে।' দুর্লভ এগোল সদ্য-দাঁড়ানো দোতলা বাসটার দরজার দিকে। পিছন ফিরল। 'তাড়াতাড়ি আসুন।' খুব সহজ গলা দুর্লভের। মুখ-চোখ স্বাভাবিক। হাতের জিনিস-পত্তরে যেন ও নিজেই একজন অন্য কোন গাড়ির যাত্রী। লোকটা এগিয়ে এলো দরজায় সামনে। 'উঠুন।' কণ্ডাক্টরের দিকে তাকাল দুর্লভ। 'একে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দেবেন তো।'

কণ্ডাক্টর মাথা নাড়ল। লোকটা পাদানির ওপরকার সামনের ভিড়ে পিছন-ফেরা। বাস ছাড়ল।

চকিতে দুর্লভ রাস্তা থেকে সরে এসে অন্ধকার গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সব গুছিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় দুর্লভ বস্তির ঘরে ফিরল রাত দশটায়। দরজা খোলা ছিল। মায়ারাণী ভিতরে মাথায় হাত দিয়ে বসে।

'কি ব্যাপার!' হাতের জিনিসপত্তর নামিয়ে মেঝের এক কোণে রাখল।

মায়ারাণী উঠে দরজা বন্ধ করল। 'তোমার আহ্লাদী মেয়ে পালিয়েছে!'

'পালিয়েছে!'

'হ্যাঁ। পাঁচুর সঙ্গে। তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই সেই যে গেছে, ফেরেনি। শুনলুম, পাঁচু বাড়ি নেই। বলে গেছে বাড়িতে আর ওরা ফিরবে না। যেন কোন দিন খোঁজ-খবর না নেয়।'

মেঝেয় এবার বসে পড়ল দুর্লভ। ভবানীর বিয়েতে সব দেবে, যেন বাজার করেছে, এভাবেই গুছিয়ে জিনিসগুলো বাড়িতে এনেছে দুর্লভ। মায়ারাণীর কথা শুনে মনে হল, এত বড় পাপ করার কীই বা দরকার ছিল তার? রাগে, না দুঃখে, অনুশোচনায়, না ভয়ে—সে সময় রীতিমত কাঁপছে ভিতরে। ছোটবেলায় গ্রামের আটচালায় রাত জেগে বেহুলার পালা শুনত দুর্লভ। বড় হয়ে ভাবে, কার পাপে লখিন্দর সব হারিয়েছিল? কলার মান্দাকে রাখা মরা শরীরেরও সব কেমন এক এক করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল! অক্ষম প্রায়-মরা শরীর নিয়ে সারাটা জীবন ভেলায় ছিল দুর্লভ। ভেলায় তার পাশেই যে বসা তার ভাগ্যদেবী! তার বেহুলা!

সেই যে ভাগলো মেয়েটা, আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কেউ কোন খোঁজও দিতে পারল না! মেয়ে চলে যাবার পর কোন চাপা মনের অসুখেই বুঝি দুর্লভের শরীরও ভাঙলো! বার বার ওর সেই একই কথা মনে হতে লাগল, সংসারটা একটা ভেলার মত। তাতে শয্যা নেবে দুর্লভ। মনের পাপ বুঝি সারা শরীরে পচন ধরাবে। মা মনসার মত নিয়তিও বুঝি ওর পিছনে লেগে আছে। মায়ারাণীর এত গালাগালির মধ্যেও যত্ন-আত্তি তাকে বাঁচাতে পারবে না। একাই এই গাঙে ভেসে যাবে, দুর্লভ! কখন যেন ওর বিড়ির নেশাটা বাড়লো। তাতে খামতি হলো না একটুও। অবিশ্যি মদ-গাঁজা-গুলির কোন নেশা ছিল না দুর্লভের। ওদিকে বৌটাও কেমন আরও খিটখিটে হয়ে গেল। যেন স্বামী দুর্লভও তার সহ্যের বাইরে! মরার কদিন আগেও বউয়ের মুখের কথায় সেই জ্বালা, দুঃখ, অভিমান ছিল!

এখন ছেলে নেই, মেয়ে নেই, বউও নেই! কি হবে এভাবে বেঁচে থেকে? সেই দুপুরে বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে। এখানে বসে যেন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে দুর্লভ। মরণের পথ বুঝি অনেকটা! হাঁটতে হবে বলে এমন জিরোনো! বউ ওর কতদূর চলে গেছে! সেই পথে ওকে ধরতে হবে তো?

যেন এক গভীর ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। আর কিছুটা হাঁটলেই চৌমাথায় সবচেয়ে ব্যস্ত মোড়। ওখানেই যদি গাড়িগুলোর মধ্যে পিষে শেষ হয়ে যায় দুর্লভ, তবেই না শাস্তি! দুর্লভ রক ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল। চৌমাথায় এসে দাঁড়াতেই যেন এক রহস্যময় অনুভূতি ওকে ঘিরে ধরল। এ শহরে ওকে কেউ চেনে না। ওর নিজের কোন পিছুটান নেই। ওর জন্যে কাঁদার মত কোন লোকই নেই! বউ, তুমি এগোও আমি যাচ্ছি। যেন বিড়বিড় করল। ফুটপাথ থেকে নীচে রাস্তায় পা দিল! চৌমাথায় এদিকটায় ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশে কত পিছন

থেকে এক এক করে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকটা পুলিশ এখানে-ওখানে। আজকাল এক-একটা মোড়ে এতক্ষণ গাড়ি আটকে থাকে। এত ভিড় এই শহরে। ওদিকের গাড়ি তো হু-হু বেগে চলেছে। এত যাত্রী-ঝোলা ভারী বাস, মিনিবাস, ট্রাম, ট্যাক্সি! এদের মধ্যে দুর্লভ যদি একবার দাঁড়াতে পারে! তা হলেই তো সব শেষ! ভিজে চোখ পিটপিট করল দুর্লভ। বুকের মধ্যে কিসের চাপা কষ্ট যেন বুক ভেঙে দিচ্ছে।

এগোতে যাবে, হঠাৎ এক ট্রাফিক পুলিশ সামনে এলো। খপ্ করে ওর ডান হাতটা ধরল। 'এই, তোর নাম কি দুর্লভ মিস্ত্রি?'

দুর্লভ ভিজে চোখে পুলিশের দিকে তাকালো। অবাক হয়ে বলল, 'আজ্ঞে!' যেন ঘোরেই শব্দটা উচ্চারণ করল। ও মরতে চাইছে এখনি, পুলিশটা কি বুঝতে পেরেছে? দুর্লভ ভিতরে গভীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। থানায় ওদের হাতে মার খাওয়ার থেকে নিজের ইচ্ছেয় মরা যে অনেক ভাল!

'আয় আমার সঙ্গে।' পুলিশটা দুর্লভকে টানতে টানতে কয়েকটা গাড়ির পিছনে একটা এ্যাম্বাসাডারের সামনে এসে থামল।

'এবার ওকে ছেড়ে দিন।' কে যেন সামান্য দূরের গাড়িটার মধ্যে থেকে বলল।

চারপাশে গোলমাল, বিচিত্র সব শব্দ। দুর্লভ একটু আগেই মৃত্যুর কথা ভাবছিল। কে যেন ওকে ডাকল! 'এই দুর্লভ।' মহিলা কণ্ঠ।

দুর্লভ তাকালো গাড়ির দিকে: কে?

'কাছে আয়। আমি তোর গিন্নিমা। চিনতে পারছিস?' দুর্লভের চোখে চোখ রেখে একভাবে তাকিয়ে আছেন গিন্নিমা।

দুর্লভেরও চোখের পলক পড়ছে না। হঠাৎ যেন চিনতে পেরে বলল, 'গিন্নিমা আপনি!' আচম্‌কা সামনে দেখে দুর্লভ যেন কিসের কান্না সামলাতে পারল না।

'হ্যাঁ রে, আমি! তুই উঠে আয় গাড়িতে।' গাড়ির ড্রাইভারের সিটের দরজা খুলে দিলেন।

'না মা, আমি যাব না। আমাকে ছেড়ে দিন।' দুর্লভ যেন ভয়ে, লজ্জায়, মিনতিতে ভেঙে পড়ছে।

'আয় বলছি।' যেন সস্নেহ ধমক দিলেন গিন্নিমা। 'শোন্, তুই যাকে মানুষ করেছিস সেই বড় খোকার ছেলে হয়েছে। উঠে এসে বোস্, সব বলছি।'

এই মুহূর্তে দুর্লভ যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বিনয়ে ছোট হয়ে গাড়িতে ঢুকল। কুঁকড়ে একপাশে বসল। চাপা কান্নায় চিবুক ভিজছে।

'বড় খোকার ছেলের এখন দু'বছর বয়স। তুই দেখবি না?'

দুর্লভ অবোধ নির্বাক বিস্ময়ে তাকালো গিন্নিমার দিকে।

'বেশ তো না বলে পালিয়ে এসেছিলি। খুঁজেও তোকে পাইনি। এবার ছাড়ছি না, চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়!' ভয়ে ভয়ে বলল দুর্লভ। 'আমি তো আপনার ওখানে কোন অন্যায় করিনি গিন্নিমা!' যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করল।

'এখন আর ঠাকুরপুকুরে নেই, দমদমে বাড়ি করেছি। চল, বড়খোকা তোর কথা এখনো কত বলে!'

দুর্লভের মুখে কোন রা নেই। শুধু গিন্নিমার দিকে তাকিয়ে আছে। গিন্নিমা কত বড় হয়ে গেছেন! মাথায় কাঁচা-পাকা চুল মেশানো! চেহারা কত ভারী! বড ছেলে কত বড় এখন! তার আবার ছেলে!

গিন্নিমা হাসছেন। 'এখন বাড়ি চল্। তোর কথা সব শুনব।'

মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ এতক্ষণ পরে এ দিকের গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। ওদের এ্যাম্বাসাডার স্টার্ট দিয়ে এগোল সামনে।

দুর্লভ মাথা নীচু করে বসে। গিন্নিমার নাতির মুখটা চোখের সামনে ধরতে চেষ্টা করে। অস্পষ্ট হয়ে ভাসছে সেদিনের সেই বড খোকার মুখ। যেন ওরই হাতে ধরে বড়-করা সেই বড় ছেলেরই মুখ কেটে বসানো নাতিটার মুখে!

মোড় ছাড়িয়েই গাড়ি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

একসময়ে দুর্লভের মনে হ'ল, কখন বুঝি গিন্নিমার বছর দু'য়েকের নাতিটা দুর্লভের কোলে উঠে এসে বসেছে! নাতিটার পদ্মফুলের নরম পাপড়ির মত তুলতুলে হাতটা দুর্লভের চিবুকে শিহরণ তোলে! অবোধ, উৎসুক দু'টি চোখ যেন ভগবানের! দুর্লভের মুখের ওপর স্থির!

